তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

দ্বাবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৪৯ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

দ্বাবিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

১৮২৯ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

চিত্র-সূচী।

বিজ্ঞাপনী।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমানে ৮৫ বৎসরে চলিতেছে)

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৶৹ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৶৹।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।৹ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণ এবং জীবনীসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রকাশের জন্য রচনাদি ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৫ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	৬৲	প্রতিমাসে।
„	½ „	৪৲	„
„	¼ „	২৲	„

মলাটের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনসংগ্রহকারিগণকে উপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়।

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেন্ট হইলে টাকায় ।৹ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

দ্বাবিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৫ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

৮১ অঞ্জলি—অগ্নিদেবতা।

১। তুমি অগ্নির ভিতরে অগ্নির অগ্নিরূপে বিরাজ করিতেছ বলিয়া অগ্নি মহাশক্তি ধারণ করে। হে অমৃত পুরুষ! অগ্নি তোমারই শক্তি ধারণ করিয়া আমাদের বেদনাসকল শীঘ্রই দূর করে। তোমার চরণপ্রান্ত হইতে অগ্নি উন্নতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে বহন করিয়া আনে। তোমারই আদেশে অগ্নি বনজঙ্গলের ভিতরেও পথনিষ্কাশনে মানবের সহায়তা করে। তোমারই আদেশে অগ্নি আমাদের সম্মুখে কর্ম্মযজ্ঞের উৎস খুলিয়া দিয়াছে।

২। ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু হইতে বৃহত্তম পদার্থ পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতরে তুমি তোমারই তেজকণা নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। সেই তেজের অন্ত দেখি না, বিনাশ দেখি না। তাহারই বলে তৃণ, বৃক্ষ এবং প্রাণীগণের দেহ, সকলই পক্বতা লাভ করিতেছে।

৩। তোমার তেজ অগ্নিরূপে পর্ব্বতের উপরেও যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি সাগরের অতল গর্ভেও পরিদৃষ্ট হয়। যখন সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিশ্বদহনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সেই রুদ্র ভাব ধারণ করে কাহার সাধ্য? অগ্নি যেমন জগতের প্রলয় সাধন করে, তেমনি অগ্নিই আবার সংসারের উন্নতিসাধনের সহায়রূপে ধনরত্ন প্রস্তুত করে। অগ্নি বিনা আমাদের কর্ম্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় না। হে অমৃত পুরুষ! তোমার মঙ্গলবিধানে অগ্নির সাহায্যেই আমরা ধনৈশ্বর্য্য লাভ করি এবং মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও মৃত্যুকে জয় করিতে উদ্যত হই। আমরা অগ্নিকে সহায় করিয়া শতবিধ রোগশোকের হস্ত অতিক্রম করি এবং আমাদের গৃহ ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করি।

৪। বায়ুসহায় অগ্নি যেমন দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া মৃত বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ অরণ্যসকল ভস্মীভূত করিয়া কৃষ্ণবর্ণক্ষেত্র ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের উপরে সুপরিষ্কৃত বায়ু প্রবাহিত হইবার উপায় বিধান করে, সেইরূপ তোমার দীপ্তশিখা নির্ব্বাণরহিত কৃপাগ্নি আমাদের অন্তরস্থিত পাপতাপ সকল দগ্ধ করিয়া পুণ্যের বিমল বায়ু প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিক।

৫। হে মঙ্গলময়! তোমারই মঙ্গলবিধানে আমরা অগ্নির সাহায্যে ওষধি গুল্ম বনস্পতি প্রভৃতি হইতে রস আকর্ষণ করি এবং তাহা পান করিয়া শতবিধ রোগশোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই।

৬। তুমি আমাদের সমস্ত শুভ কর্ম্মে নেতা। তোমার জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া যে মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথম অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়াছেন,

তাঁহার উদ্দেশে শতবার নমস্কার করি। অগ্নিকে আমরা নিত্যসঙ্গীরূপে পাইয়াছি বলিয়াই আমরা বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রিত করিতে পারি এবং সকলে মিলিত হইয়া তোমাকে আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে আহ্বান করিতে পারি। তোমারই আদেশে অগ্নি আমাদের প্রতিজনের গৃহে বন্ধুরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকে।

৭। তোমারই আশীর্ব্বাদে আমরা অগ্নিকে সহায় পাইয়াছি, তোমাকে নমস্কার। তোমাকে আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা তোমার স্নেহহস্তে গ্রহণ কর। তোমার একই তেজ বিভিন্ন অগ্নির আকারে প্রকাশ পাইয়া আমাদিগের অন্তরে জ্ঞান বিধান করিতেছে এবং আমাদের গৃহ ধনরত্নে পূর্ণ করিতেছে। আমরা বিভিন্ন অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিব। তুমি আমাদিগকে দুঃখদারিদ্র্যে নিপতিত হইতে দিও না।

৮। হে অমিততেজা পুরুষ! তোমারই তেজের কণামাত্র পাইয়া যে অগ্নি তেজঃপূর্ণ হইয়াছে, সেই অগ্নির সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমরা আমাদের গৃহ ও পরিবারকে শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করি। তুমি আমাদিগকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান কর। অগ্নির সাহায্যেই আমরা উদরান্নের সংস্থান করি এবং অগ্নির সাহায্যেই আমাদের বাসস্থান নিরাপদ করি।

৯। হে জ্ঞানজ্যোতি! আমরা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তোমার ভক্ত। ভয় ও বিপদের মাঝে তোমার প্রেম বর্ম্মদুর্গরূপে ঘিরিয়া থাকিয়া আমাদিগকে নিয়তই রক্ষা করে। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, হে মঙ্গলবিধাতা তুমি আমাদিগকে তাহাই প্রেরণ কর। আমরা তোমার সন্তান। তুমি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। অগ্নিকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়া তুমি যেমন আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, বিজ্ঞানের সাহায্যে দ্যুলোক ও ভূলোককে এক অচ্ছেদ্যসূত্রে বাঁধিবার পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিতেছ, সেইরূপ তোমার জ্ঞানজ্যোতির কণামাত্র আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়া প্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রজ্ঞানঘন তোমার সঙ্গে আমাদিগকে সমধর্ম্মী করিয়া গড়িয়াছ এবং এক অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে আমাদিগকে তোমার সঙ্গে আবদ্ধ করিয়াছ।

৮২ অঙ্গদি—তেজোময় দেবতা।

১। হে তেজোময় পুরুষ! তোমারই তেজের কণামাত্র লইয়া এই বিশ্বজগত তেজ বিকীর্ণ করিতেছে, এবং সেই তেজ লাভ করিয়া মানবেরা প্রহৃষ্টমনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। তুমিই বিশ্বজগতের একমাত্র আশ্রয়। তুমিই বিশ্বজগতের একমাত্র কেন্দ্র। নদীগর্ভে নিখাত স্তম্ভসকল যেরূপ সেতুকে ধারণ করে, তুমি সেইরূপ স্তম্ভের ন্যায় লোকসকলকে ধারণ করিতেছ।

২। তোমারই তেজ উত্তাপের আকারে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমারই তেজ জ্ঞানজ্যোতির আকারে মানবের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া কত না আশ্চর্য্য কর্ম্ম সংসাধিত করিতেছে।

৩। তোমারই তেজ যেমন সূর্য্যের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে মহান তেজের আকর করিয়া তুলিয়াছে, সেইরূপ তোমারই তেজ অগ্নির অন্তরে থাকিয়া তাহাকে সমস্ত ধনরত্নের উৎপাদক করিয়া তুলিয়াছে। ত্রিলোকে যেখানে যাহা কিছু আছে, তুমিই সে সকলের একমাত্র প্রভু।

৪। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমারই তেজে তেজসমন্বিত হইয়া দেবমনুষ্যের জন্মদান করিতেছে। সেই দেবমনুষ্য একহৃদয়ে তোমারই প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বজগতকে শোভন সুন্দর করিয়া তুলিল। চারিদিকে তোমারই মধুময় নাম গগন ভেদ করিয়া ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

৫। তুমিই দেব-মনুষ্যের একমাত্র অন্তর্যামী পরম দেবতা। তুমি মহান আকাশ হইতেও উচ্চতর। তুমিই আমাদের রাজরাজ। দুঃখদৈন্যের সহিত সংগ্রামে তুমিই আমাদের একমাত্র নেতা ও সেনাপতি। তুমি আমাদিগকে ধনসম্পদে পরিবৃত কর।

৬। তুমি আমাদের প্রাণ হইতে দুঃখদৈন্যের মেঘ অপসারিত কর। আমরা তোমার সন্তান। তুমি একবার কৃপাকটাক্ষ কর। উন্মুখ কৃষকের ক্ষেত্রকে যেমন বরষার মেঘ অমৃত বারিতে ভরিয়া

দেয়, তুমিও সেইরূপ তোমার এই দীনদুঃখী সন্তানগণের গৃহ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ কর। তুমি আমাদের শত্রুগণকে দূরে সরাইয়া দাও, যাহাতে তাহারা আমাদের প্রাপ্য ধনসম্পদ অপহরণ করিতে না পারে। তাহাদের নিষ্ঠুর হৃদয়কে বজ্রের দ্বারা উদ্ভিন্ন করিয়া কোমল কর।

৭। তোমারই তেজকণা লাভ করিয়া ওষধিসকল আমাদের জন্য পুষ্টিকর অন্ন যোগাইয়া দিতেছে। তোমারই তেজকণায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া বনস্পতি সকল কত বিভিন্ন প্রকারে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। তোমাকে আমরা ভজনা করি। তোমারই কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বগগনকে কি সুন্দর উজ্জ্বল সাজে সুসজ্জিত করিয়া তোলে। তোমারই কিরণের কণামাত্রে নিশীথগগনকে কোটী কোটী গ্রহনক্ষত্র কি সুন্দর দীপাঙ্কিত করে। তুমিই একমাত্র ধ্রুব সত্য সনাতন। আমরা এক হৃদয়ে তোমার নামগান করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। আমরা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

নববর্ষ।

১লা বৈশাখ ১৩৩৪।

(শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য)

১

এস প্রিয় নববর্ষ, লয়ে মহা প্রেম-হর্ষ,
ফুল্ল শত কুসুম-সম্ভার;
নব আশা নব প্রীতি, গাও ব্রহ্ম যশোগীতি,
পূর্ণরূপে খুলে স্বর্গদ্বার।

২

সবাকার আশ্রয় তুমি, ধরণী জননী তুমি,
বিরাজিত নিজ মহিমায়;
অনন্ত বিভূতি দিয়ে, পরিপূর্ণ কর হিয়ে,
এস প্রিয়, স্বাগত তোমায়!

৩

কালের অতীত হ'য়ে, কোথায় যাইছ ল'য়ে,
প্রতিবর্ষে আন শুভদিন;
সুচিকণ পত্রাবলি, করে সবে গলাগলি,
বনস্পতি শোভিছে নবীন।

৪

দক্ষিণ মলয় বায়, সুশীতল করে কায়,
কত মিষ্ট প্রকৃতির মুখ;
তরুণ অরুণ জ্যোতি, আজিকে প্রসন্ন অতি,
বাড়ে কত পৃথিবীর সুখ।

৫

পশু পক্ষী জীব কুল, হয়েছে আনন্দাকুল,
নব বার্ত্তা ঘোষিছে প্রান্তর;
মহানন্দে নদনদী, ছুটিতেছে নিরবধি,
হাসিতেছে হিমাদ্রি সুন্দর।

৬

সুনীল অম্বর কোলে, মেঘশিশু কত দোলে,
হাসে খেলে অনন্ত জলধি;
মানব ইন্দ্রিয়গ্রামে, পড়ে রবে মর্ত্ত্যধামে,
দুর্গতির নাহি যে অবধি।

৭

শুভদিনে লন তুলে, বিধাতা চরণ-মূলে,
দেন শক্তি প্রাণেতে সবার;
ব্রহ্মের গো প্রিয় যা'রা, তা'রা কি হইবে হারা,
মৃতকল্প জড়ের আকার?

৮

তা' কভু সম্ভব নয়, তাই দেন পরিচয়—
অন্তরেতে আছে ক্রমোন্নতি;
সরল কাতর প্রাণে, যে চাহে গো তাঁর পানে,
স্বর্গে উঠে যায় শীঘ্রগতি।

দেখা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষই দ্রষ্টা অর্থাৎ দেখেন। সত্যই তো স্থূল চর্ম্মচক্ষু কিছুই দেখে না; চর্ম্মচক্ষুর সাহায্যে আত্মাই দেখে—আত্মাই প্রকৃত দ্রষ্টা। অনেক সময়ে এমন হয় যে, কোন বস্তুর উপর চক্ষু পড়িয়া আছে, কিন্তু আত্মার দৃষ্টি অন্যত্র থাকার কারণে সে বস্তু আত্মার লক্ষ্যই হয় নাই। বস্তুত আত্মার একনিষ্ঠ দৃষ্টি যে বস্তুর উপর পড়ে, সেইটাই আমরা দেখিতে পাই; আত্মা শতবিধ বস্তুর মধ্যে যেটা দেখিবে বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাই আমরা দেখিতে পাই। এই জন্য একই বনে শিকারী দেখিতে পায় শিকার, কাঠুরিয়া সন্ধান পায় কাঠের এবং কলাবিৎ কবি বনের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি

করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। যে যাহার সন্ধানে থাকে; সে তাহারই সন্ধান পায়। এই জন্য ভাল লোক সংসারের সহস্র মন্দ ভাবের ভিতরেও ভালটুকুরই সন্ধান পায়, সদ্‌গ্রন্থের সন্ধান পায়, ভাল বন্ধু জুটাইয়া লয়; মন্দ ব্যক্তি সংসারের সমস্ত ভালর প্রতি অন্ধ থাকিয়া যাহা কিছু মন্দ, তাহারই সন্ধানে ঘোরে ফিরে; সর্ব্ববিধ মন্দ বন্ধু, মন্দ গ্রন্থ, মন্দ পরিপার্শ্ব তাহার নিত্য সহচর হয়। এই প্রকারে প্রত্যেকে নিজের নিজের ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার উপযুক্ত শিক্ষাই নিজেকে দেয়।

এখন বিজ্ঞান প্রমাণিত করিয়াছে যে, দৃষ্টির একটী প্রবল শক্তি আছে। সূক্ষ্ম ওজনের দাঁড়ি-পাল্লাতে দুইটী সমান ওজনের বস্তু রাখিয়া একটীর উপর তীব্র একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহার উপর দৃষ্টি ফেলা হইল, সেইটী ওজনে ভারী হইল। আমাদের দৃষ্টি যদি এইভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আমরা যে কি ভাবে কাহার উপর দৃষ্টি ফেলিব, সে সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দৃষ্টি হইতে সুফলও হইতে পারে, কুফলও হইতে পারে। দৃষ্টি হইতে সুফল ও কুফলের সম্ভাবনার ধারণা মানবসমাজে যে কতকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না। সভ্য সমাজে এই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় "কুদৃষ্টি" ও "সুদৃষ্টি" প্রভৃতি কথায়, এবং অসভ্য সমাজে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, অনেক মনুষ্যকে ডাইন বা ডাইনী বলিয়া বধ করিবার চেষ্টায়।

অন্তর্দৃষ্টিকে অভ্যাসের সাহায্যে প্রবল শক্তি-সম্পন্ন করা যায়, এবং তখন সেই শক্তি অবলম্বনেই বহির্দৃষ্টিকেও বড়ই শক্তিমান করিয়া তোলা যায়। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা এই বিষয়ের কিছুমাত্র চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই পরীক্ষা দ্বারাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দৃষ্টিকে এইভাবে শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিলে তাহাকে মন্দের দিকে পরি-চালিত করিলে মন্দের বিশেষ সাহায্য করা যায়, এবং ভালর দিকে চালাইলে ভালর সহায়তা করা যায়। বোধ হয়, পাছে এই অন্তর্দৃষ্টিকে শক্তি-সম্পন্ন করিয়া সাধারণ লোকে অন্যায় ও অসঙ্গত স্বার্থসাধনের জন্য ব্যবহার করে, সেই কারণে ভগবান ইহাকে জাগ্রত করিবার উপায় সাধারণের পক্ষে সুগম ও সহজ করিয়া দেন নাই। ইহাও পরীক্ষিত সত্য এবং সকলের জানা উচিত যে, সত্য পথে চলা, সংযম প্রভৃতি অবলম্বনের ফলে এই অন্তর্দৃষ্টি সহজ ও পরিপুষ্ট হয় এবং মিথ্যাপথে চলা, অসংযম, কুঅভ্যাস, অপরের অনিষ্টচিন্তা প্রভৃতি এবং তজ্জনিত ভয়, সংশয় ও স্নায়বিক চাঞ্চল্য প্রভৃতির কারণে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেও কমিয়া যায়, এমন কি, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াও যায়। এইজন্য যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিকে পরিস্ফুট করিতে চান, সকল বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিয়া অন্তর্দেবতার প্রতি স্থিরদৃষ্টি থাকিবেন। এই ভাবে অভ্যাস করিতে থাকিলে স্নায়বিক ও শারীরিক সকল চেষ্টাই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ করিবে এবং তাহার পুষ্টিসাধনে স্বভাবতই অগ্রসর হইবে।

এই অন্তর্দৃষ্টি সাধনের একটী প্রধান উপায় হইতেছে অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য হা-হুতাশ না করিয়া একনিষ্ঠ হৃদয়ে প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতেই ভালর দিকে অগ্রসর হওয়া, মঙ্গলময় ভগবানের অনিমেষ দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া। এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইবে যে, যে মুহূর্ত্তে এই প্রকার ভাল ভাবে জীবনকে পরিচালিত করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি নিত্য নব জীবন লাভ করিবে এবং তোমার অন্তর্দৃষ্টি প্রবল শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। এই অন্তর্দৃষ্টি জাগাইবার চেষ্টার প্রারম্ভে দুই চারবার অকৃতকার্য্য হইলেই হতাশ হওয়া উচিত নয়। যিনি কথায় কথায় হতাশ হইবেন তাঁহার ঐ শক্তি লাভ করা সম্ভবও হইবে না, আর উচিতও হইবে না। মনে রাখিবে যে, ঠিক একনিষ্ঠ মনে অন্তর্দৃষ্টি জগাইবার চেষ্টা করিলে প্রত্যেক পরীক্ষা তোমাকে অনেক পদ আগাইয়া দিবে। প্রত্যেক পদে এবিষয়ে যেমন উন্নতি লাভ করিবে, অমনি একটা মঙ্গলকার্য্য সাধনে কায়মন সমর্পণ করিবে। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞান প্রেম শক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সঙ্গে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিবে, স্থান কাল ও অবস্থা বুঝিয়া জ্ঞান ও প্রেম বিতরণ করিতে থাকিবে। ইহা অধ্যাত্মরাজ্যের একটী

সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নিজের উন্নতি চাহিলে অপরকেও গড়িয়া উঠিবার সাহায্য করিতে হয়। কেবল সদনুষ্ঠান ও মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই তোমার ক্ষমতা ও উচ্চতর শক্তিসকল প্রয়োগ করিলেই তোমার অন্তর্দৃষ্টি অনেকগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

অন্তর্দৃষ্টিকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলে দেহেরও প্রতি অমনোযাগী হইলে চলিবে না। মনে রাখিও যে, আমাদের রক্ত প্রভৃতির প্রত্যেক বিন্দু এক এক মহাশক্তির বাহক। তাই রক্ত প্রভৃতি শরীরের অংশসমূহ যতই পরিশুদ্ধ হইবে এবং সেই শক্তিসঞ্চালনের উপযুক্ত হইবে, ততই শরীরের প্রত্যেক অংশ অন্তর্দৃষ্টিতেও শক্তিপ্রদানের সহায়তা করিবে। রোগ প্রভৃতি কারণে শরীর যদি রক্তহীন হইয়া পড়ে, তবে শরীরকে পরিশুদ্ধ করিয়া শক্তিবহনের উপযুক্ত করিবার পূর্ব্বে অন্তর্দৃষ্টি বাড়াইবার চেষ্টা করা অনেক সময়ে সফলতা লাভ করে না। দেহশুদ্ধি না করিলে অন্তরে "প্রকাশ" ভাব জাগ্রত হইবে না। এই "প্রকাশ" ভাবের উপরেই অন্তর্দৃষ্টির সবলতা ও সফলতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

মকর-সংক্রান্তি।

(ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস্‌সি)

নদীমাতৃক উত্তর ভারতে গঙ্গার আবির্ভাবের উৎসবের প্রসিদ্ধি স্বাভাবিক। গঙ্গার সাগরসঙ্গমে স্নান সমগ্র ভারতের হিন্দু জাতির একটি মহাপর্ব্ব। এরূপ জনসম্মিলনের হেতুবাদ আলোচনা করিতে যাইয়া তত্ত্ববোধিনীর কোনও কোনও লেখক ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সব লোকসমারোহ সামাজিক হৃদ্যতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সব জনসমাগম ও তীর্থমেলায় জনহিতৈষণা ও লোকপ্রীতির উন্মেষ ও বিস্তার হয় সত্য, কিন্তু এই সব উৎসব, পর্ব্বাহ ও মেলার মূলভাব ও কারণগুলি অনুসন্ধানার্হ। মকর-সংক্রান্তির মূল কল্পনায় যে নৈসর্গিক ঘটনার তত্ত্বপ্রকাশের চেষ্টা আছে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দক্ষিণ ও মধ্যভারতের নদীগুলির অবস্থা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বর্ষার প্লাবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব নদীর জীবনের অবসান হইয়া যায়। গভীর শুষ্ক খাদ ও বিস্তীর্ণ বালুকা রাশি তাহাদের সাময়িক উচ্ছ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করে মাত্র; কিন্তু গঙ্গাসৈকত বর্ষব্যাপী স্রোতলহরীতে আপ্লুত। এই পার্থক্যের মূলে গঙ্গায় উৎপত্তি ও বর্ষব্যাপী স্রোতপ্রবাহের কারণগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল বর্ষার প্লাবনের উপর গঙ্গার জীবন নির্ভর করে না। হিমালয়ের তুষারস্রোত গঙ্গার জলসম্ভার যোগাইবার অফুরন্ত ভাণ্ডার। চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রি হইতে তুষারস্রোত প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্তরীর নিকট জলরাশিতে পরিণত হইতেছে। এই হিমানীধারার সঙ্গে বর্ষার জলের কোনও সম্বন্ধ নাই। বর্ষার প্লাবন গঙ্গাগর্ভ হইতে তীরভূমি ডুবাইয়া উহাকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু চিরতুষারের হিমানী-স্রোতের ধারা ইহাকে বর্ষার অন্তে অন্য বর্ষা পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়া উত্তর-ভারতের বাণিজ্যপথ স্থির রাখে এবং তীরভূমি আর্দ্র রাখিয়া উহাকে উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত করে।

শীতের প্রকোপে হিমালয়ের এই তুষারস্রোত অল্প কিছুদিনের জন্য জমাট বাঁধিয়া যায়। সূর্য্য তখন ধনু রাশিতে। সূর্য্য ধনুরাশি হইতে মকররাশিতে সরিয়া আসার নাম সূর্য্যের মকররাশিতে সংক্রমণ। ইহাই উত্তরায়ণের প্রথম সোপান ও হিমশৃঙ্গে সূর্য্যোত্তাপের বৃদ্ধির দিন। এই সংক্রমণের দিন হইতে পুনরায় হিমানী-স্রোত শীতের অবসানে জলস্রোতে পরিণত হইয়া গঙ্গায় জল সরবরাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই হইল প্রতিবর্ষে শীতান্তে গঙ্গার পুষ্টতালাভের প্রথম দিন। এই দিন হইতে চিরতুষারের হিমানীস্রোত গলিয়া গিয়া গঙ্গাকে বর্ষার বহু পূর্ব্ব হইতে জলধারা যোগাইয়া থাকে। মকর, রাশিচক্রের দশম রাশি। এই রাশিতে সূর্য্য প্রবেশ করিলে গঙ্গাপ্রবাহের বৃদ্ধি হয় বলিয়া গঙ্গার বাহনের নামে এই রাশির নাম হইয়াছে মকর।

যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে রাশিচক্রের রাশিগুলির নাম ও কল্পিত আকার কোন্ জাতির মধ্যে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল তাহার একটা মীমাংসার পথ খুলিয়া যায়। গ্রীক ভাষায় এই রাশির নাম 'ক্যাপ্রিকরনাস' (Capricornus); ইহার অর্থ ছাগ। গ্রীসীয় মণ্ডলে উহার পূর্ব্বার্দ্ধ ছাগাকৃতি ও পশ্চার্দ্ধ মৎস্যের লাঙ্গুল ভাগের অনুকৃতি। গ্রীসের এই চিত্রপট ইজিপ্টের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু বেবিলনে খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসরের প্রাচীন সীমাস্তম্ভগুলিতে ও ক্ষোদিত মণিপ্রস্তরে পাওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে, গঙ্গার বাহন মকরের কল্পিত আকৃতির আদর্শ কি ছিল? গঙ্গার বাহন মকর বলিতে আমরা হাঙ্গর মনে করি। প্রাচীন পটে ও মূর্ত্তিতে গঙ্গার বাহনের পশ্চাদ্ভাগ ঠিক মৎস্যের

লাঙ্গুলাকৃতি। বেবিলনের ঠিক সেই ছাগমৎস্য (Goat fish) যাহা, ভারতীয় জ্যোতিষে উহাই "মৃগাস্য মকর"। "মৎস্যের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ" (হারীত ১ম, ১১ অ)। এই সব কারণে আমরা মকর বলিতে হাঙ্গর ভাবিতে বাধ্য হইতেছি। চলিত কথায় অনেকে মকরকে কুমীর বলিয়া থাকেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। সংস্কৃতে মকরালয় ও মকরাবাস বলিতে সমুদ্র বুঝায়। ভারতের কুমীর (*Crocodilus palustris*) সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী জলাভূমির জীব। এই কুমীর সমুদ্রে পাওয়া যায় না। হাঙ্গরের জাত সাগরসঙ্গম হইতে গঙ্গার অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ভারতসমুদ্র হইতে জাপান পর্য্যন্ত ইহার গতিবিধি। বরহুতের রেলিংএ মকর-মুখের যে আকৃতি ক্ষোদিত আছে তাহার দাঁতের পাটি ঠিক হাঙ্গরের দাঁতের পাটির ন্যায়, কুমীরের দাঁতের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না। প্রকৃত কুমীর (*Crocodilus palustris*) লবণাক্ত জলাভূমি ছাড়িয়া মিঠা জলে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘড়িয়াল গঙ্গার অনেক দূর দেখা যায় কিন্তু উহাকে কুমীর বলা হয় না; অথচ হাঙ্গরের একটি জাত গঙ্গার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এই সব কারণে আমরা মকরকে হাঙ্গরজাতীয় মাছ বলিয়াই ধরিতে বাধ্য হইতেছি। সুতরাং সূর্য্যের যে রাশিতে গমন হেতু গঙ্গোত্তরীতে তুষারস্রোত জলে পরিণত হইয়া গঙ্গাপ্রবাহের পুনরায় উদ্দীপনা জন্মায় সেই রাশিকে গঙ্গার বাহন কল্পনা করা ও সেই রাশিকে সেই বাহনের নাম প্রদান করাই স্বাভাবিক। "মকরে প্রখরো রবিঃ" ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

বাল্মীকিরামায়ণে গঙ্গাকে হিমালয়ের কন্যা বলা হইয়াছে। ইহা খুবই ঠিক। গঙ্গার অন্য পর্য্যায় বিষ্ণুপদী। বিষ্ণুপুরাণে এই নামকরণের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিকেরা যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলে মেঘ অবস্থিত, তাহাকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সেই মেঘমণ্ডল হইতে বৃষ্টির উদ্ভব। বিষ্ণুপুরাণের মতে সেই জন্য গঙ্গার নাম বিষ্ণুপদী। কিন্তু এই নামের উৎপত্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা অধিক সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মেঘমণ্ডলে গঙ্গার উৎপত্তি নহে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বাদশ মাস অনুসারে সূর্য্যের দ্বাদশটী নাম আছে। শাস্ত্রে উহাকেই দ্বাদশাদিত্য বলে। পৌষ মাসের যে আদিত্য তাহার নাম 'বিষ্ণু'। এই আদিত্যের সংক্রমণে গঙ্গার পুনরুদ্ভব। এই জন্য ইহার অন্য নাম বিষ্ণুপদী। মকরসংক্রান্তির স্নানসমারোহ কপিলাশ্রম সাগরসঙ্গমে; আর কুম্ভস্নান গঙ্গোত্তরীতে। পৌষের তুষারস্রোতে গঙ্গোত্তরীতে স্নানের কল্পনা দুঃসাধ্য; তাই উহা হিন্দুশাস্ত্রেও স্থান পায় নাই।

পলতার বাগানের মেলা ও তথায় উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

মেলার স্থান ও তারিখ।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ এই বিষয়টীর ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়াছিলেন। সে সকল বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে দেশ-কাল-পাত্রঘটিত নানা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণের ৩৮ পৃষ্ঠায়, নবম পরিচ্ছেদের শেষভাগে, ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর) তারিখের গোরিটির বাগানের উৎসবের বৃত্তান্তের অব্যবহিত পরেই এই অংশ ছিল—"উপাসনা ভঙ্গ হইলে জগদ্দলের রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিলেন যে, "ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন আমরা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি, তখন বর্ণভেদ না থাকাই শ্রেয়ঃ। অলখ নিরঞ্জনের উপাসক শিখসম্প্রদায় বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিয়া "সিংহ" এক উপাধি দিয়া সকলে এক জাতি হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এত ঐক্যবল হইল যে, দিল্লীর দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব বাদসাকেও পরাজয় করিয়া তাহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল"। রাখালদাস হালদারের পিতা উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরী মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে এরূপ বর্ণিত হইয়াছিল যে গোরিটির বাগানে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের উৎসবে রাখালদাস হালদার "উপবীত পরিত্যাগ করা হউক" এইরূপ প্রস্তাব করেন, এবং স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য শিখ-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন।

(২) প্রিয়নাথ শাস্ত্রী রচিত মহর্ষির আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, মহর্ষির মুখে তিনি এইরূপ শুনিয়াছিলেন:—

"৭ই পৌষ আমার দীক্ষার দিন। আমার দীক্ষার পর বৎসরে ৭ই পৌষ দিবসে এই দিনের স্মরণার্থ গোরিটির বাগানে এক মেলা হয়। এই মেলার দিনে আমরা সকল ব্রাহ্ম মিলিয়া মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষতলে ছায়ায় বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম। উপাসনার পর কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম একত্রে বসিয়া উপবীত রাখা বা না রাখা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে আমরা যখন জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছি, তখন কেহ বা উপবীতধারী, কেহ বা উপবীতহীন থাকিবেন,

এ পার্থক্য ভাল নহে। অতএব অধিকাংশের মতে উপবীত না রাখাই স্থির হইল। আমি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিলাম যে, 'দেখ, পঞ্জাবের শিখ-সম্প্রদায় এক ঈশ্বরের উপাসক হইয়া সকল জাতি মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইল এবং তাহাতে তাহাদের এত বল হইল যে, তাহারা দিল্লীর বাদসাকেও রণে পরাজয় করিয়া আপনারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল।' আমার এই কথাতে সকলের মনে আরও উৎসাহ জন্মিল। জগদ্দলনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র* হালদার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর উপবীত রাখিবেন না। সত্য সত্যই তিনি বাড়ীতে যাইয়া উপবীত ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার পিতা ইহা জানিতে পারিয়া নিজের বক্ষে ছুরি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

"এই উপবীত বর্জ্জনের বিষয় ভালরূপ স্থির করিবার জন্য আমি ইহার পরে কলিকাতায় সমাজগৃহে ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলাম। সমাজমন্দিরের দোতালায় তাঁহাদের অধিবেশন হইল। এমন কি, এই সভাতে কি স্থির হয় তাহা জানিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া বাহিরের ভদ্রলোকও অনেকে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদের মতে স্থির হইল যে ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহার পর হইতে যিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসিতেন, তখন তাঁহাকে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পরে আমি শিমলা পর্ব্বতে ভ্রমণের নিমিত্ত বাহির হই।"

এই দ্বিতীয় বিবরণ অনুসারে, (ক) শিখসম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তটি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথেরই উক্তি, রাখালদাস হালদারের নহে; এবং (খ) এই মেলা দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার পরবৎসর, অর্থাৎ ১৭৬৬ শকে হইয়াছিল, ১৭৬৭ শকে নহে। এই দুইটি কথা আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণের বর্ণনার সহিত মিলিতেছে না।

উক্ত উভয় বিবরণই ঘটনার বহু বৎসর পরে স্মৃতি হইতে মুখে বর্ণিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে এই সকল বিষয়ে ভুল হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

সৌভাগ্যক্রমে, বহুকাল পরে বর্ণিত ঐ দুই বিবরণ ব্যতীত, সেই সময়ে লিখিত দুইটি বর্ণনাও পাওয়া যাইতেছে; এবং এই দুইটি বর্ণনার পরস্পরের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। প্রথমটি রাখালদাস হালদার মহাশয়ের দৈনন্দিন লিপি অনুসরণে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় "A Mid-Victorian Hindu, a sketch of the Life and Times of Rakhal Das Haldar" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়টী স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে ২৭শে পৌষ (১৭৭৫ শক) তারিখে পত্র লিখিয়াছিলেন; 'পত্রাবলী' পুস্তকের ৩৭ সংখ্যক পত্রে তাহা মুদ্রিত আছে।

মহর্ষিদেবের পত্রের বর্ণনাটি এইরূপ—

"১৮ পৌষে আমাদিগের পল্‌তার উদ্যানে কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম; প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্ম একত্র হইয়াছিলেন। বৃক্ষতলে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং সামিয়ানার ছায়াতে ভোজন কার্য্য সমাধা হইল। সেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মদিগের এক দলবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান চালান যায়। তাহা হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনাথাচরণ করিতে কাহারও বাধ্য হইতে হয় না। এই প্রস্তাবে ৮ জন ব্রাহ্ম অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, আমরা ইহাতে প্রস্তুত আছি এবং আমাদিগের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করিব। এইক্ষণে এই বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করা যাইতেছে, ইহা সিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের মূল বদ্ধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্ম অতি কঠিন, তাহাতে বাঙ্গালির মন অতি কোমল, দেখা যাউক কি হয়।"

"A Mid-Victorian Hindu"র বর্ণনাটি ঐ পুস্তকের ২৭—২৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার পিতার হস্তলিখিত দৈনন্দিন লিপির যে অংশ অনুসরণ করিয়া ঐ বর্ণনা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটি নকল তিনি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ অংশ বাংলায় লিখিত। সুকুমার হালদার মহাশয়ের এই অনুগ্রহে ঐ ঘটনার একেবারে তৎকালে লিখিত একটি বিবরণ পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সুযোগ পাওয়া গেল; এবং তাঁহার ইংরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদ করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। রাখালদাস হালদার মহাশয়ের দৈনন্দিন লিপির সেই অংশটি এই:—

"১৭৭৫ শকের ১৮ অগ্রহায়ণ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন যে ১৮ই পৌষ রবিবারে তাঁহার পল্‌তা স্থিত উদ্যানে যাইয়া প্রীতি-ভোজনাদি করিলে তিনি সুখী হইবেন। এই অনুগ্রহজনক প্রস্তাব অনুসারে ১৮ই পৌষ দিবা দ্বিপ্রহরাতীত চারি ঘণ্টার পর আমি এবং ভবানীপুরস্থ আরও কতিপয় নিমন্ত্রিত বন্ধু একত্রে জগন্নাথ ঘাটে গমন করিলাম; তথায় নৌকা প্রস্তুত থাকিবার কথা ছিল।

"গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া কয়েকখণ্ড উৎকৃষ্ট নৌকা

* 'দাস' হইবে। প্রবাসী

দৃষ্ট হইল ; আমরা উপস্তরণী * সহকারে প্রধান নৌকায় আরোহণ করিলাম। দেবেন্দ্রবাবু সকলের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমাগত হইলেন। তৎকালে দেবেন্দ্রবাবু সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি নিবারণার্থ যাদৃশ পরিশ্রম করিলেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইল। নৌকাসকল সুনিয়মে পূর্ণ হইয়াছিল। একখণ্ডে কৃষ্ণনগরস্থ ঊর্দ্ধসংখ্যা ১০ জন ব্রাহ্ম অবস্থিত হয়েন ; বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত তাহার তত্বাবধারক ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ভবানীপুর ও খিদিরপুরের জন নয় (৯) ব্রাহ্ম উঠিয়াছিলাম ; উমাচরণ হালদার তত্বাবধারক। তৃতীয় খণ্ডে আন্দুলিয়ার কতিপয় ব্রাহ্ম, এবং তত্বাবধারক বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত। চতুর্থ খণ্ডে কলিকাতার কতিপয় ব্রাহ্ম, তত্বাবধারক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। পঞ্চমখণ্ডে দেবেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা ও পুত্রগণ উঠিয়াছিলেন, এবং ষষ্ঠখণ্ডে স্বয়ং শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রতি নৌকায় যথাপ্রয়োজন খাদ্যসামগ্রী একজন ভৃত্য, শয্যা, এবং এক প্রস্থ তাস্ প্রদত্ত হয়। সমুদায়ে ৫০ জন ব্রাহ্ম আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। জোয়ার আগত হইলে আমরা বিবিধ আমোদের সহিত নৌকা খুলিয়া দিলাম। যথাকালে নৌকা পল্তার উদ্যানতটে উত্তীর্ণ হইল।

"প্রাতঃকালে আমরা সকলে ভ্রমণ করিতে গেলাম। বৈদ্যবাটী পর্য্যন্ত গিয়া লৌহবর্ত্ম দেখা গেল। তদনন্তর স্নানাদির পর প্রায় দ্বিপ্রহর সময়ে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। দুইটি অপূর্ব্ব ছায়াবিস্তারকারী আম্রবৃক্ষতলে সুপ্রসারিত উপবেশনস্থান প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং বৃক্ষমূলে উপাচার্য্যদের নিমিত্ত একটি মৃন্ময়ী বেদীও নির্ম্মিত হয়। উপাচার্য্যেরা বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইলেন, এবং ব্রহ্ম উপাসনা পাঠ করিলেন। পরে দেবেন্দ্রবাবু অগ্রসর হইয়া এক লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন ; তিনি কহিলেন, 'কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে প্রস্তাব করিতেছি যে, ব্রাহ্মদিগের পৃথক্ দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা উচিত হয়'। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ও অন্যান্য কহিলেন, 'সে সময় এক্ষণে আগত হয় নাই'। বাবু উমাচরণ দে বক্তৃতা করিলেন যে 'ধর্ম্মানুযায়ী চলিবার নিমিত্ত সময় বিবেচনা করা উচিত নয়।' কিয়ৎকাল তর্কবিতর্ক হইল। পরে দেবেন্দ্রবাবু কহিলেন যে, 'তবে ব্রাহ্মেরা কিয়ৎকাল এই বিষয় বিবেচনা করুন।' তিনি চারি পাঁচ দিনের নিমিত্ত সময় দিলেন। কয়েকদিন সভা তুষ্ণীম্ভাবে রহিল। অনন্তর আমি কহিলাম যে 'এই প্রস্তাব নূতন নহে, সুতরাং তাহার বিবেচনার আবশ্যক কি? আমি পৌত্তলিক মণ্ডলী হইতে পৃথক্ হইতে প্রস্তুত হইতেছি।' প্রায় ৮ জন আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সভা ভঙ্গ হইল। আহারান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।"

* ছোট নৌকা ; জালি-বোট। শ্রীসঃ

এই দুই সমসাময়িক বিবরণ হইতে দেখা যায় যে,—

(১) যে মেলাতে রাখালদাস হালদার উপস্থিত ছিলেন, তাহা ১৭৬৬ অথবা ১৭৬৭ শকে না হইয়া ১৭৭৫ শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ (অর্থাৎ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) তারিখে হইয়াছিল। M. V. H. পুস্তক হইতে দেখা যায় যে ১৭৬৭ শকে রাখালদাস হালদারের বয়স ১৩ বৎসর মাত্র ছিল ; সে সময়ে তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মদের মেলায় উপস্থিত হইয়া উপবীত পরিত্যাগ বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল।

(২) আত্মজীবনীতে এই মেলার স্থান 'গোরিটি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে ; মহর্ষির পত্রে ও রাখালদাস হালদার মহাশয়ের এই দৈনন্দিন লিপিতে 'পল্‌তা' বলিয়া লিখিত আছে। গোরিটি ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে, ও পল্‌তা পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার পিতার নোটবুকে তাঁহার অঙ্কিত ভাগীরথী নদীর একটি নক্সা আছে, তাহাতে গোরিটি ও চাঁপদানির মাঝখানে 'পল্‌তা' লেখা রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, কোনও কারণে মহর্ষি, (ও তাঁহার অনুসরণে তাঁহার শিষ্যগণ) পল্‌তার পরপারস্থ গোরিটির বাগানকে 'পল্‌তার বাগান'ও বলিতেন। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমি পত্র লিখি। তিনি তদুত্তরে লিখিয়াছেন, " 'গোরিটির বাগান' ও 'পল্‌তার বাগান' দুইটি নহে। 'গোরিটির বাগান' যাহাকে বলে 'পল্‌তার বাগান'ও তাহাকেই বলে।" এই গোরিটির বাগানকে আগে লোকে চাঁপদানির 'বিবির বাগান' বলিত। এখন ঐ স্থানে 'Dalhousie and Angus Jute Mill, Champdany' নামক চটের কল অবস্থিত।

(৩) কিন্তু শিখসম্প্রদায়ের সহিত তুলনাটি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং রাখালদাস, এই উভয়ের মধ্যে কে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

জগদ্দলে রাখালদাস হালদার কর্তৃক উপবীত ত্যাগ ও তাহাতে তাঁহার পিতার ক্লেশ।

জগদ্দল নামে একাধিক গ্রাম আছে। এই জগদ্দল ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে (চন্দননগরের পর-পারে) অবস্থিত। কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী যে সকল গ্রাম কল-কারখানার বিস্তারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, জগদ্দল তাহারই মধ্যে একটি।

যাহাতে ফসল অধিক হয়, বীজ ভাল হয়, বিদেশ হইতে আনীত রাসায়নিক সার প্রভৃতি দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ হয়ত Denmark, America, Irelandএর কথাও তুলিবেন; এবিষয়ে আমরা দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা আশা করি—শোনা কথার উপর আমাদের আস্থা নাই। আমি এখন কৃষি সম্বন্ধে একটি পরীক্ষিত সত্য দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। এ বিষয়ে আমি বঙ্গদেশের সরকারী ও বে-সরকারী বহু কৃষি অফিসের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে চাষ-আবাদ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ চালাইয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, মজুর লাগাইয়া (Hired labour) যদি কোনও ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গে কোথাও চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত হ'ন তাঁহার ঐ কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহার চাষের খরচ যদি বা কোনওরূপে উঠে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় উপযোগী জীবনধারণের জন্য, পরিবারবর্গের শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য এবং রোগের চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তাহার কিয়ৎ অংশও উপার্জ্জন করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। এপর্য্যন্ত যে সকল ভদ্রলোক এই কার্য্যে নামিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে ইহার সত্যতা স্বীকার করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। সরকারী কৃষিবিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত পুরাতন কর্ম্মচারীও আমার এই মতের সমর্থন করেন, কথোপকথনে এইরূপ জানিয়াছিলাম। Dairy বা গরুর দুধের ব্যবসা সম্বন্ধেও তিনি উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভদ্রলোকে মজুর লাগাইয়া কাজ চালাইলে কেন অকৃতকার্য্য হ'ন—ইহা অনেকেই অবগত আছেন। তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশে honest labour বা উচিত পারিশ্রমিকে উচিত কাজ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই। নিজের কাজ হইলে চাষারা যেরূপ পরিশ্রম করে—মাহিনা হিসাবে কাজ হইলে তাহার অর্দ্ধেকও করে কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন যে, আমাদের দেশের মজুরেরা কতদূর ফাঁকিদার; এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টি দিলে খিটিমিটি বাধে ও তাহারা কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে, তখন লোকের অভাবে হয়তো কাজই বন্ধ হইয়া যায়।

সারের মধ্যে খৈল সারই এখানকার প্রধান সার। কিন্তু বিদেশে রপ্তানি হেতু ইহার মূল্য এত অধিক যে উপযুক্ত পরিমাণে খৈল সার ব্যবহার করিতে হইলে খরচে কুলাইয়া উঠে না—বিদেশাগত বৈজ্ঞানিক সারের কথা তো না তোলাই ভাল। (যদিও সরকারী কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে খুব নিপুণ)। Nitrate of Soda Sulphate of Ammonia Sulphate of Potash Super Phosphate প্রভৃতি একান্তই দুর্মূল্য বলিলেই চলে।

ফসল উৎপন্ন করিবার পক্ষে ভদ্রলোকের এই তো প্রধান প্রতিবন্ধক; যদি বা ফসল উৎপন্ন হইল, তাহার বিক্রয়ের সময় তাঁহাকে আর একবার বিষম বিপদে পড়িতে হয়। ভদ্রলোক নিজে মাথায় মোট বহিয়া বাজারে বা হাটে যাইতে পারেন না,—এ অবস্থায় মজুরেরাই তাঁহার একমাত্র ভরসা; কিন্তু তাহারা কতদূর ফাঁকিদার উহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক নিজেরা আত্মসাৎ করে ও অর্দ্ধেক বাবুকে প্রদান করে। যদি সহরের ফড়িয়াদের বিক্রয় করা যায়, তাহারা অত্যন্ত কম দরে ফসলগুলি কিনিতে চায়; ইহার কারণ তাহাদিগকে ২।৩টি লোক বা একটি গরুর গাড়ী ঐজন্য নিযুক্ত করিতে হয়—তাহাদের মজুরী বা ভাড়া পোষাইয়া তাহাকে লাভ করিতে হয়। ভদ্রলোকের পক্ষে অবশ্য উভয় ব্যবস্থাই সমান—উভয়েই লাভের আশা সুদূরপরাহত। ভদ্রলোকের চাষের খরচ চাষার অপেক্ষা অনেক বেশী—প্রায় দ্বিগুণ বলিলেই চলে। Early crop বা জল্‌দি ফসল করা ভদ্রলোকের ভাগ্যে নাই; কারণ তাঁহার নিজের ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব এবং বিজ্ঞ চাষাও যথাসময়ে মেলা একরূপ অসম্ভব; আর বিক্রয়ের সময়ও চাষা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে ভদ্রলোককে জিনিষ ছাড়িতে হয়। এই সকল difficulty বা মুস্কিলে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদের কি কখনও পড়িতে হয়? তাঁহারা অফিসে বসিয়া সৎপরামর্শ দিয়াই নিশ্চিন্ত; সুতরাং কথায় কথায় বিলাতী সারের কথাও তাঁহাদের মুখ হইতে অক্লেশে বাহির হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ করিয়া দেখান না কেন?

এক্ষণে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভদ্রলোকে মজুর রাখিয়া চাষ না করিয়া নিজেরা হাতে-কলমে চাষ করুন; তাহা হইলে ফাঁকিদার চাষার অপেক্ষা করিতে হয় না। কথাটা সত্য, কিন্তু তাহারও প্রতিবন্ধক আছে—ভদ্রলোক ভদ্রলোকের মতই লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন—ভদ্রলোকের ছেলেরা ছেলেবেলা হইতে রৌদ্রে জলে লাঙ্গল ঠেলিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই—এখন হঠাৎ পেটের দায়ে কাহাকেও এই কাজ করিতে হইলে তাহার অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া অনিবার্য্য। ইহা ব্যতীত ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি বাধ্য হইয়া কৃষকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেটাও বিশেষ উন্নতির লক্ষণ নয়।

সালতামামী
বা
জীবনের হিসাবনিকাশ। *

(শ্রীসিতিকণ্ঠ মল্লিক)

আজ বৎসরের শেষ দিন। অদ্যকার রাত্রি প্রভাতে বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হইবে এবং আমরা নব-বর্ষে প্রবেশ করিব। অদ্য নানা শ্রেণীর লোক নানা চিন্তায় প্রবৃত্ত। জননী আপন সন্তানের এক বৎসর বয়স বৃদ্ধি হইল গণনা করিতেছেন এবং শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় প্রিয় সন্তান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। তিনি ভাবিতে পারেন না যে তাঁর সন্তানের বয়োবৃদ্ধি নহে—তাহার পরমায়ুর এক বৎসর ক্ষয় হইল। জন্মের সঙ্গী মৃত্যু। সন্তান মৃত্যুর দিকে একবৎসর অগ্রসর হইল।

যুবক-যুবতীর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। জোয়ারের সময় নদীর জল তরতর করিয়া বাড়িতেছে—মনে কতই আশা, কতই চেষ্টা। তাহারা চিন্তা করে না যে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটা। ভাঁটার দিকেই জীবন ছুটিতেছে।

বিষয়ী বাসনায় ও আসক্তিতে পরিপূর্ণ। বাল-কেরা একটি খেলনা পাইলে আহ্লাদে আটখানা হয়, দুই চারি দিন পরে তাহা আর ভাল লাগে না, কোথায় তাহা ফেলিয়া দেয় মনেও থাকে না, আবার নূতন কোন খেলনা চাহে। বিষয়ীরও ঠিক ঐরূপ ভাব—একটার পর একটা কামনা মনে উঠে।

ব্যবসায়ীরা বৎসরের লাভ-লোক্‌সান গণনায় আজ ব্যস্ত। রাশীকৃত খাতাপত্র সকল নাড়িয়া চাড়িয়া যদি প্রচুর লাভ দেখিতে পান, মনে মনে কত আনন্দ কত সুখ অনুভব করিবেন। হিসাবে ক্ষতি বুঝিলে ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না।

জমিদার আপন আখিরী কিস্তির খাজনা আদা-য়ের চেষ্টায় বিব্রত। ঋণদাতা খাতকের নিকট কত সুদ পাওনা হইল তাহার হিসাব করিতে ব্যস্ত। অবশেষে হয়ত কবির সহিত তান মিলাইয়া বিলাপ করিতে থাকেন :—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল
লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে,
জীবনপ্রবাহ বহি' সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ু-হীন
হীনবল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা
ছুটিল না একি দায়"। *

ধীর সাধু ভক্তেরা আজ আধ্যাত্মিক জীবনের আয়-ব্যয় খতাইতেছেন। এই বর্ষে কত পুণ্য কার্য্য করিলেন, আপনাপন কর্ত্তব্য কত দূর সাধন করিতে সক্ষম হইলেন এবং ভগবানের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কত পাপ সঞ্চয় করিলেন, এখন এই সকল চিন্তায় অভিভূত। পরমায়ুর একবৎসর শেষ হইল, তাঁহারা ইহা মনে করেন না। আপনাদিগকে অমৃতের সন্তান, অমৃতের যাত্রী—বিশ্বাসে, সেই অমৃত পুরু-ষের দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন তাহাই স্থির করিতেছেন।

যত দূর দৃষ্টি যায়, যত দূর কল্পনা যায়, দেখেন অনন্ত জীবন সম্মুখে। সেই অনন্তদেবের অসীম বক্ষে অগণন আত্মাদের সঙ্গে তাঁহারা বাস করি-তেছেন। সেই অনন্তের আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমাগত অনন্তের দিকে যাইতেছেন; জীবন ক্ষয় না হইয়া অসীম জীবনপথে তাঁহারা চলিতেছেন; মনের আনন্দে সেই আনন্দধামের দিকে ছুটিতেছেন, ক্ষোভ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। কে তাঁহাদিগকে বলিবে যে জীবনের একবর্ষ শেষ হইল! ইঁহারা ক্ষয় না দেখিয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি—ক্রমোন্নতি—উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে পদবিক্ষেপ দেখেন। অমরাত্মার আবার ক্ষয় কি ? মৃত্যু কি ? ইঁহারা মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। এ কি মনোহর দৃশ্য! এই ভাব অর্জ্জন করিতে কাহার না অভিলাষ ? মৃত্যুর মধ্যে বাস করিতে কাহার সাধ যায় ? অন্ধকারে থাকিতে কে চাহে ? "কার রে সাধ বাস করিতে আঁধারে" অদ্যকার দিনে এই ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইব।

---

* গত ৩০শে চৈত্র বুধবার 'বর্ষশেষ' উপলক্ষ্যে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে পঠিত।

* মাইকেল মধুসূদনের এই 'আত্মবিলাপ' সর্ব্বপ্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রাখালদাস হালদারের পিতা বেচারাম হালদার (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩১—১৮৫১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ইনি সাধুপ্রকৃতি, পরোপকারী, হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের ন্যায় ইনিও পীরালিশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; শেষ বয়সে পীরালি-দোষ খণ্ডনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইঁহারই বাটীতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে "ভগদ্দল ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী না হইয়াও স্বকীয় উদারতাগুণে নিজ বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন।

বেচারাম হালদারের পুত্র রাখালদাস হালদার (১৮৫২—১৮৮৭) ঐ সময় হইতে দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন। রাখালদাস চিন্তাশীল জ্ঞানানুরাগী মানুষ ছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের ও স্বীয় বন্ধু আনন্দমোহন মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া ১৮৫২ খ্রীঃ 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। ইঁহারা ১৮৫৫ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃতমূলক উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে ও ব্রাহ্মসাধারণের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে রাখালদাস অনেক বিষয়ে অত্যগ্রসর ছিলেন।

রাখালদাস পরে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি লণ্ডনের University College-এ সংস্কৃত ও বাংলা পড়াইতেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়াছিলেন ও সেই কর্ম্মে যশস্বী হইয়াছিলেন।

কিন্তু "রাখালদাস হালদারের পিতা উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন," মহর্ষির এই উক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। রাখালদাস হালদার মহাশয়ের দৈনন্দিন লিপি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি শুধু যে উপবীত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাই নহে, কিন্তু সত্য সত্যই উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদারহৃদয় পিতা বেচারাম হালদার তজ্জন্য কেবল অজস্র অশ্রুপাত করেন; তদ্ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই এবং সেই অশ্রুদর্শনেই রাখালদাস পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। দৈনন্দিন-লিপির এই অংশও শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের অনুগ্রহ-প্রদত্ত; রাখালদাস ইহা গোরিটির বাগান হইতে ভবানীপুরে ফিরিয়া গিয়া লিখিয়াছিলেন।

"২০শে পৌষ সন্ধ্যাবেলা ভবানীপুরে আনন্দমোহন বাবুর বাটীতে গমন। আর কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তখন স্বভাবতঃই পৃথক্ সম্প্রদায়বদ্ধ হইবার বিষয় আন্দোলিত হইতেছে। কথায় কথায় আমি উপবীত ছিন্ন করিলাম। ক্রমে এই বিষয় প্রচারিত হইতে লাগিল। ভগদ্দল হইতে আমার পিতা এই কথা শুনিয়া আমার কনিষ্ঠ গগনচন্দ্রকে ভগদ্দলে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন।......রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বাটীতে উত্তীর্ণ হইলাম। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'উপবীত কি ত্যাগ করিয়াছ?' আমি উত্তর করিলাম 'ত্যাগ করিয়াছি'। পরে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া শয়নে অনুমতি দিলেন।......প্রভাত হইলে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম। অনেক লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমাকে দেখিতে আইল। কেহ গম্ভীরভাবে রহিল, কেহ হাস্য করিতে লাগিল, কেহ বা কহিল 'এমত কর্ম্ম কেন করিলে?' আমি উত্তর করিলাম, 'কর্ত্তব্যবোধ হওয়াতেই ইহা করিয়াছি।' বেলা এক প্রহরের সময় পিতার নিকট গমন করিলাম এবং কহিলাম 'মহাশয় অনুমতি করুন, আমার পত্নীকে লইয়া যাই।' পিতা রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করা তাঁহার স্বাভাবিক নহে; বিশেষতঃ আমার নিমিত্ত রোদন করিবেন, স্বপ্নেও কখন মনে করি নাই। তিনি কহিলেন, 'আমার শিরশ্ছেদ করিয়া যদি তুমি পরিতৃপ্ত হও, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।' আমি কিয়ৎকাল স্তব্ধীভূত থাকিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তৎকালে আমার মন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা অপরে অনুভব করিতে পারেন; বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। গ্রামস্থ আত্মীয় লোকেরা স্নেহমিশ্রিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন যে 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে যেমন ছিলে তেমনি হও।' আমার মহা বিভ্রাট বোধ হইল। আপনার ধর্ম্মানুযায়ী, বিশ্বাসানুযায়ী, দৃঢ়রূপে ব্যবহার করিব? কিম্বা আত্মীয় লোকের দুঃখদর্শনে দ্রবীভূত হইয়া সাধুসবস্থা হইতে বিমুখ হইব? ......জন্মদাতাকে দুঃখ না দেওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে। আমি পিতাকে দুঃখ দিলে তাঁহার কত দুঃখের বিষয়। অদ্য আমার নিমিত্ত তাঁহার বক্ষদেশ অশ্রুধারা দ্বারা সিক্ত হইতেছে। কেহই আমার বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিতে কহিতেছে না; কেবল গলে সূত্র রাখিতে অনুরোধ করিতেছে। গলে সূত্র থাকিলে ব্রাহ্ম হইতে পারা যায় না, এমত নহে; অনেকে উপবীত ত্যাগ না করিয়াও ত ব্রাহ্ম থাকিবেন। ... ... এইরূপ ভাবনার দ্বারা আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল; আমি ক্ষীণ হইয়া পড়িলাম। ক্রমে স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই এক ব্যক্তির

নিকট হইতে আমি ধর্ম্মানুযায়ী পরামর্শ প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, তাঁহারা সে সময় কহিলেন, 'যদি আর আর বিষয়ে ধর্ম্মানুযায়ী চলিতে পার, তবে উপবীতটিকে রাখিলে ক্ষতি কি ?' দুই দিন গত হইল। তখনকার এক এক দিন এক এক যুগস্বরূপ; তাহাতে আমার বীর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং দুর্ব্বলতাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনন্তর পিতা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন তোমার অভিপ্রায় কি ?' আমি কহিলাম, 'মত আমার ব্যক্তই আছে; ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিরূপে চলিতে পারি ?' তিনি পরে অনেক কথা কহিয়া বলিলেন, 'আমি আজ্ঞা করিতেছি, উপবীত ধারণ কর।' তখনও আমি সুস্থির রহিলাম। পিতা ক্রোধ করিয়া উঠিলেন। হা! এমন উপযুক্ত সময়ে সাহস আমাকে ত্যাগ করিয়াছে! দৃঢ়তা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে! তখনই আমি জীবনের মহত্তম কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার তাদৃশ মহত্ত্ব কোথায় যে এমত মহদ্গৌরব উপার্জ্জন করিব ? আমি এক অস্থিরচিত্ত, উৎসাহবিহীন, স্নেহপাশবদ্ধ, দুর্ব্বল বালক। মহৎ কীর্ত্তি মহৎ লোকেদের নিমিত্ত। আমি বিবেচনার নিমিত্ত অবসর প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু বিবেচনা আর কি করিব ? কেবল কিয়ৎকাল পরে অঙ্গীকার করিলাম, উপবীত গ্রহণ করিব। বাস্তবিকও দুই চারি দিন পরে উপবীত গ্রহণ করিলাম।"

চাষের কথা।

(শ্রী—)

আজকাল অনেকে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, কৃষি হইতে জীবিকা অর্জ্জন উপযোগী অর্থ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে; এবং ৩০৲। ৪০৲ টাকা মাহিনার চাকরী করা অপেক্ষা ৫। ৬ বিঘা জমি চাষ করিলে অনায়াসে মাসিক ৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুখবর আর কিছু হইতে পারে না, কারণ দেশের অধিকাংশ লোক আজ জীবনধারণ উপযোগী অর্থোপার্জ্জনে একরূপ অসমর্থ—বেকার-সমস্যা আজ বাঙ্গালীর কঠিন সমস্যা। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, এই মত কতদূর সত্য। এ বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ করা বড়ই বিপদসঙ্কুল। আমরা প্রতি বৎসরই চোখের সাম্‌নে দেখিতেছি যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কেহ এই কাজে নামিয়া ২।৩ বৎসরের মধ্যেই ঘরের টাকা কিছু লোকসান দিয়া চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া কারবার বন্ধ করিতেছেন। এ অবস্থায় যাঁহারা পথনির্দ্দেশ করিবেন তাঁহাদের দায়িত্ব কিছু বেশী—বিশেষ বিবেচনা করিয়া ও স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া তবে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সরকারী কৃষিবিভাগের আয় ব্যয়ের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই! কৃষিবিভাগে আদর্শ ফার্ম্মগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী; এ বিষয়ে বাংলার কোন সরকারী ফার্ম্ম্‌ই আজ পর্য্যন্ত লাভবান হয় নাই। বে-সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলি হইতেও বিশেষ আশাপ্রদ সংবাদ পাই না; অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীনিকেতন', 'চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয়' প্রভৃতির কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে বিশেষ খবর বলিতে পারেন। দেশকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত সাহায্য করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কতকগুলি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র (Model farms) কোনও শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দ্বারা আরম্ভ করা, সেগুলির রীতিমত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, উপযুক্ত সার প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং উহাদের যাবতীয় খরচ কুলাইয়া মাসিক অন্ততঃ ৪০৲। ৫০৲ টাকা আয় হইতেছে এরূপ দেখানো। ইহার দ্বারাই চাষ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হইবে এবং সফল হইলে জনসাধারণ তাহা অতি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে গ্রহণ করিবে ও চাষ-আবাদে লাগিবে; নচেৎ সরকারী কর্ম্মচারীরা হাজার আয়ব্যয়ের হিসাব দিয়া উপদেশ দিলেও কোনও উপকার হইবে না, কেবল কতকগুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিরীহ লোককে চাষ-আবাদে নামাইয়া আরো বিপন্ন করা হইবে।

আমার এরূপ নিরাশার বাণী শুনাইবার কিছু কারণ আছে—এ বিষয়ে আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি—দেখিয়া, শুনিয়া ও হাতে কলমে করিয়া। সকলেই জানেন আমাদের দেশের চাষাদের বর্ত্তমান অবস্থা—তাহাদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত, ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত এবং গ্রাসাচ্ছাদনে একরূপ অসমর্থ বলিলেই হয়। এ বিষয়ে 'কৃষিকমিশন' বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং যে কেহ একটু কষ্টস্বীকার করিয়া চাষাদের নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, চাষারা স্বয়ং প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া তাহাদের বহুপুরুষার্জ্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যেও যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছে না বা বিশেষ আর্থিক উন্নতি লাভ করিতেছে না, সেখানে কোন ভদ্রলোকের (যাঁহার কৃষি-শিক্ষা থাকিলেও theoretical বা পুঁথিগত—practical বা হাতে কলমে মোটেই নয়) মজুরের দ্বারা চাষ-আবাদ চালাইয়া লাভবান হইবার সম্ভাবনা কতটা ?

আমার এ কথায় কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভদ্রলোককে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে—

সত্য সত্যই, কি বিষয়ী, কি সাধু-ভক্ত, কি অসাধু, সকলেরই এই সকল চিন্তার বিষয় বটে। নদীর স্রোতের ন্যায় সময় চলিয়া যাইতেছে। যাহা যাইতেছে তাহা আর ফিরিবে না। পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবদিগের ন্যায় আমরা মানুষ হইয়াও কি নিশ্চিন্ত থাকিয়া কালযাপন করিব? আমরা সন্ন্যাসী বা বনবাসী নহি—আমরা গৃহী; সুতরাং নানা অবস্থায় আমাদের নানা প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। বালকবালিকারা পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আপনাপন শরীরের পুষ্টিসাধন করিবে। যুবকেরা ব্যায়ামচর্চ্চা, জ্ঞানচর্চ্চা, এবং নীতিশিক্ষা দ্বারা শরীর ও মনের উন্নতিসাধন করিবে। জনসমাজে কত দুঃখদারিদ্র্য, কত রোগ-শোক, কত অভাব, কত অজ্ঞান ও কুসংস্কার, কত পাপ তাপ ও মলিনতা,—এ সকল দূর করিবার জন্য যত্ন ও অধ্যবসায় আবশ্যক। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। শরীর, মন ও আত্মা—এই তিনের সমষ্টি মানুষ। মনুষ্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে এই তিনেরই উন্নতি চাই। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি? মন ও আত্মাকে অবহেলা করিয়া যদি কেবল শরীরকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করা যায়, তবে একজন গুণ্ডা বা পালোয়ান হইতে পারি। শরীরকে অবহেলা করিয়া কেবল মন ও আত্মাকে উন্নত করিলে, রুগ্ন শরীর লইয়া না আপনার না পৃথিবীর কোন উপকার করিতে পারা যায়। আবার শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আত্মাকে অবহেলা করিলে শরীর বলিষ্ঠ ও মন অপরা বিদ্যার বিভূষিত হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রভ্রষ্ট পাপাত্মা হইয়া জনসমাজের ও ঈশ্বরের নিকট হেয় ও ঘৃণিত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয়। পৃথিবীতে এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়া কতই পরিতাপ করিতে হয়।

এই গতপ্রায় বর্ষে এই সকল বিষয়ে আমরা কতদূর কি করিলাম তাহা কি আমরা একবার চিন্তা করিব না? এই সকল বিষয় কিছু না কিছু করিবার আমাদের সকলেরই শক্তি আছে। এমন কেহ নাই যিনি কিছুই করিতে পারেন না। এই সকল বিষয়ে আমরা সাধ্যানুরূপ যত্ন কি করিয়াছি ও পাপসংগ্রামে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং পুণ্য-সঞ্চয়ই বা কতটুকু করিতে পারিয়াছি? দরিদ্রের অভাবমোচন কতদূর করিতে পারিলাম তাহারও চিন্তা করা আবশ্যক। সংযম কতদূর অভ্যাস হইল তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাক। দেখিব কিছুই হয় নাই—সবই বাকী, সবই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সে জন্য অনুতাপ করা এবং তৎসমুদয় দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। সর্ব্বোপরি, জীবনের যে স্থানে ভগবানকে রাখা কর্ত্তব্য সে স্থানে তাঁহাকে কি স্থাপিত করিতে পারিয়াছি? যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমরা ইহলোকে প্রেরিত হইয়াছি, সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইল তাহা কি আজ একবার ভাবিব না? জীবন মরীচিকাপ্রায়। ভগবৎ চিন্তা ছাড়িয়া এই মরীচিকার আশাতে ধাবমান হইলে শান্তি-সুখ না পাইয়া মৃত্যুমুখেই যাইতে হয়; তাহা কি আমরা বুঝিয়াছি? "Mirage of Life" নামক পুস্তক অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রবীণ মন্ত্রী, মহা যোদ্ধা, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, সুবিখ্যাত কবি ও ধনকুবের প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের জীবনী হইতে লেখক দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা কেহই শান্তিসুখ প্রাপ্ত হন নাই। আমরা ঐ মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া কতদূর ভ্রান্ত হইয়াছি, তাহা কি আজ একবার চিন্তা করিব না?

এই সকল বিষয়ের মূলে প্রবেশ করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানুষ বিষয়-সুখকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানে তাহাকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া রাখে। এমন কি, আপনাপন ইষ্টদেবতার পূজা পর্য্যন্ত ঐ লক্ষ্য বিদ্ধ করার উপায় মনে করে। ধন, মান, পুত্র ও যশ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। কোথায় ভগবানকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া সংসারের সমুদয় কার্য্যকে সেই দিকে প্রধাবিত করিব, না বিষয় লাভ করিবার জন্য পরমেশ্বরকে উপায়-স্বরূপ করিতেছি! সেই জন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা।

এক ধনকুবের প্রৌঢ়াবস্থায় ধনসম্পত্তি সকল হারাইলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্য-

টনে বাহির হইলেন। হরিদ্বার গিয়া এক যতির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যতি তপস্বী। বহুক্ষণ পরে যতি চক্ষু মেলিলে ঐ ভ্রমণকারীকে দেখিয়া কি অভিপ্রায়ে তাঁহার আগমন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রমণকারী আপনার অবস্থা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন। যতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন তুমি কি করিতে চাও ?" উত্তর আসিল "সন্ন্যাসী হইয়া আপনার সঙ্গে থাকিব"। যতি বলিলেন "বড় কঠিন সংকল্প। আমি জনসমাজের গতি, মতি ও আপন মনের অবস্থা দেখিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলাম ; কারণ জনসমাজে ও সংসারে শান্তি-সুখ পাই নাই। সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, এক খৃষ্ট ধর্ম্মযাজক Self-restraint অর্থাৎ সংযমবিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। শুনিতে যাইলাম। দেখি বহুজনাকীর্ণ। বক্তা বলিলেন সংযম অভ্যাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। একটা নূতন ঘোড়া কিনিলে দেখা যায়, সে উন্মত্ত—রাশ মানে না—চারি পা তুলিয়া কেবল লাফাইতে থাকে এবং চারিদিকের লোককে পদাঘাত করিতে থাকে। বহু কষ্টে ও যত্নে তাহাকে বশ করিতে হয়। তাহার পর তাহাকে গাড়ীতে জুতিলে বা তাহার পিঠে চাপিলে সে আর পূর্ব্বের মত অশান্ত ভাব দেখায় না, লাগামের সম্পূর্ণ বশীভূত থাকে। মানুষের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। তাহার চিত্ত অতি দুর্ব্বৃত্ত, অতি অশান্ত। অনেক অভ্যাস, সাধনা ও অবিরাম চেষ্টায় তাহাকে বশীভূত করা চাই।

দিন যায়, বৎসর যায়, একদিন পতঞ্জলির দর্শনশাস্ত্র হস্তগত হইল। মনোযোগ সহকারে আগাগোড়া পাঠ করিলাম। ঐ ঋষি লিখিয়াছেন যে কেবল সংযম শিক্ষা করিলে যতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—আত্ম-বলিদান চাই, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Self-annihilation ; সংযম প্রথম সোপান। তদ্দারা ইন্দ্রিয়, কামনা ও স্পৃহাদিকে বশে আনা গেল, কিন্তু তবুও আমার "আমিত্ব" রহিয়া যায়। এই "আমিত্বকে" বলিদান দিতে হইবে। ইহাই শেষ সোপান—ইহাই যোগ। মায়ের কোলে বসিয়া সকল ভুলিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকা ও মায়ের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করা। যাহা শুনা যায় তাহাকেই মায়ের "বাণী" বলা যায়। মানুষ এই অবস্থাতে উপনীত হইলে আর কিছু মনে রাখে না ; কেবল মাকেই ও আপনাকে দেখে। মায়ের ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছার মিলন হইয়া আপ্তকাম হইয়া যায়। পৃথিবীতে যত কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, তৎসমুদায়ই সেই ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছানুসারে। সেই ইচ্ছার সহিত সাধকের ইচ্ছা মিলিত হইলে, রোগ, শোক, মৃত্যুভয় কিছুই থাকে না। যতি বলিলেন—"ইহা পাঠ করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিলাম ও সংযম শিক্ষা করিবার পর আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।" ভ্রমণকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি তাহা করিতে পারিবে ? যদি পার তবে প্রস্তুত হও। আমি এখন সংসারে ফিরিয়া যাইব।"

সাধক বন্ধুগণ ! আমরা নববর্ষে কি করিব ? আমরা কি ঐ যতির অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিব না ? সুকঠিন হইলেও চেষ্টা করিবার বাধা কি ? চেষ্টায় অসাধ্য সাধন হয়। হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মা হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে তাঁহার কোলে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। আমরা কি তাঁহার কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব না ? সুনিপুণ নাবিক কোন স্রোতস্বতীর ঠিক পরপারে যাইবার সময় নৌকা ঠিক সোজা চালনা করে না, করিলে অভীষ্ট ঘাটের বহু নীচে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেজন্য খানিক উজানে যায়, তার পর পার হইবার চেষ্টা করে এবং ঠিক অভীষ্ট ঘাটে উপস্থিত হয়। পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহা সুকঠিন হইলেও উক্ত নাবিকের মত আমাদিগকে উজানে যাইয়া পরপারের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলে কালে আমাদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবেই হইবে।

হে করুণানিধান ! আজ এই বর্ষশেষে তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া আমাদের এই প্রার্থনা যে, আমাদিগকে উপরি-উক্ত যতির ন্যায় সংযম শিক্ষা ও আত্মবলিদান করিয়া মুক্তি ও চিরশান্তির পথে অগ্রসর হইবার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় শিক্ষা দাও।

অভ্যাস কিরূপে অর্জ্জিত হয়?

(জনৈক শিক্ষক)

আমরা অভ্যাস কাহাকে বলি? যখন কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোন-কিছু না ভাবিয়া নিতান্ত সহজভাবে করিতে না পারা পর্য্যন্ত বারম্বার করিতে থাকি, সেইভাবে কার্য্য করাকেই আমরা অভ্যাস বলি এবং ঐরূপ অনায়াসসিদ্ধ কার্য্যসকলকে আমরা অভ্যাসের ফল বলি।

আমাদের চলিত ভাষায় একটী প্রবাদ পচলিত আছে যে, বিন্দু বিন্দু বারিপতনে সুকঠিন প্রস্তরখণ্ডও ক্ষয়িয়া যায়। ইহা হইতে অভ্যাসের ফলের কতকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাটের উৎপত্তিও অনেকটা এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম রাস্তাটী একটী সুঁড়ি পথ ছিল, এদিকে হয় তো একটা ছোট ডোবা এড়াইতে গিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, ওদিকে হয় তো কতকগুলি বাঁশের ঝাড় বা গাছপালা এড়াইতে গিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে—প্রত্যেক পথিক, যে ঐ পথে চলিয়াছে, সে-ই ঐ পথটীকে অধিকতর স্পষ্ট ও সহজ-গম্য করিবার সহায়তা করিয়াছে; তাহার ফলে এখন পথটী স্থির-নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহাতে উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারি, তাহার জন্য উহার উভয় পার্শ্বে কাঁটাগাছ ও নানাবিধ বেড়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেকার সেই বক্রগতি, অনেকস্থলে বিরক্তিজনক হইলেও রহিয়া গেল এবং নিজের উৎপত্তি-বলিতে লাগিল।

ভাল, ছোট ছেলেরা এখন তাহাদের বাঁ হাতে লিখিতে চেষ্টা করুক। তাহারা পারিবে না, তার জন্য তাহাদিগকে হাসি-টিটকিরি সহ্য করিতে হইবে। যদি সেই টিটকিরি উপযুক্ত সীমা মধ্যে বদ্ধ থাকে তাহাতে বড় একটা কিছু আসিবে না যাইবে না। এই অক্ষমতা হইতে ছেলেদিগকে বোঝান সহজ হইবে যে, ডানহাতে লেখাটা একটা অর্জ্জিত অভ্যাস মাত্র। এখন দেখা গিয়াছে, যাহাদের ডান হাত কোন কারণে কার্য্যে অক্ষম হইয়াছে, তাহারা অল্পবিস্তর অভ্যাসের ফলে বাঁহাতে সুন্দর লিখিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু আমরা লিখিতেই বা পারি কি প্রকারে? ছেলেদের মনে থাকিতে পারে যে, তাহাদিগকে সোজা সোজা আঁক কাটিয়া এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সহজে ও ভালরূপে সেই আঁক কাটিতে না পারিয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বারম্বার সেই আঁক কাটিয়া লেখা আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার পর তাহাদিগকে কঠিনতর লেখার হাত দিতে হইয়াছিল। বলিতে কি, যাহা কিছু করি সকলই, এমন কি, চলার মত সহজ কার্য্যও আমাদিগকে ঐ ভাবে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, একটী শিশু কিরূপে চলিতে শিক্ষা করে। এই শিক্ষা করিবার সময় বড়দের দেখা উচিত যাহাতে বিশ্রী রকমে পা ফেলা, আঁকাবাঁকা ভাবে চলা তাহার অভ্যস্ত না হয়। বাইশিকল চড়া, সাঁতার দেওয়া, এ সমস্তই অভ্যাস অর্জ্জন করিবার প্রণালীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। কুকুরবিড়াল প্রভৃতি জীব-জন্তুদিগেরও মধ্যে অভ্যাসের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এমন কি, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বন্য অবস্থায় ছিল, তখন শিকার করিয়া আহারসংগ্রহের জন্য বা অপরের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য বা শত্রুগণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের যে সকল অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, এখনও গৃহপালিত কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তুর মধ্যে পৈতৃক ধারারূপে সেই সকল অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়।

অনেক সময়ে ইচ্ছা না করিলেও অভ্যাস আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া পড়ে। অনেক সময়ে আমরা জানিতেও পারি না যে, অভ্যাস অর্জ্জন করিতেছি। শিক্ষকেরা বা গুরুজনেরা অনেক সময়ে ছেলেদের অনেকগুলি কদভ্যাস দেখিতে পান—দাঁতের দ্বারা নখ কাটা, পা নাচান, চৌকিগুলি লইয়া বৃথা নাড়াচাড়া, উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাস্য, এবং "ছোটলোকী" ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি। এগুলি দেখিতে পাইলেই অভিভাবকদের নিষেধ করা কর্ত্তব্য। অভিভাবকদিগের বোঝা উচিত—ঠিক কোন্ কার্য্যগুলি নিষেধের যোগ্য। সকল মন্দ অভ্যাসই যে একই মানদণ্ডে পরিমাপ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ছেলেদের এমন কতকগুলি অভ্যাস দেখা যায়, সেগুলি নিষেধ অপেক্ষা উপেক্ষার যোগ্য—যেমন, তাহারা যে সর্ব্বক্ষণই চড়ুই পাখীর মত চক্‌বক্ করিতে ভালবাসে।

অভ্যাস একবার দাঁড়াইয়া গেলে পরিবর্ত্তন করা বড় সহজ নয়। গাছপালা খুব ছোট অবস্থায় একদিকে বাঁধিয়া রাখ, বড় হইলে তাহার বিপরীত দিকে তাহাদের হেলিবার শক্তি থাকে না। অনেক বৃদ্ধ লোক দেখা যায়, যাহারা বাল্যকাল অবধি মদ্যপান অভ্যাস করিবার ফলে পরিণত বয়সে তাহার অপকারিতা পদে পদে উপলব্ধি করিলেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। পণ্ডিতেরা বলেন যে আমাদের মুখের ভাব ও ভঙ্গী অনেকটা অভ্যাসের পরিণতি। মুখের উপর যে সমস্ত রেখাপাত হয়, বা যে আকারপ্রকারের ছাপ পড়ে, সেগুলি অভ্যাসেরই ফল, সেগুলি বদলানো অসম্ভব। সেই কারণে আমাদের উচিত, যতদূর সম্ভব অসন্তুষ্ট ও খিটখিটে না হওয়া—প্রত্যুত তাহার বিপরীতে ভগবানের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সকল বিষয়ে সামঞ্জস্যের উপর চলা।

অল্প বয়সে বা বাল্যকালেই কদভ্যাসের পরিবর্ত্তে ভাল বিষয়ের অভ্যাস অর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই ইহার সার্থকতা বোঝা যাইবে। ছেলেদের এইটী খুব জোরের সঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, মন্দ অভ্যাসের মত ভাল অভ্যাসগুলিও ক্রমশ দৃঢ় ও সহজ হইয়া আসে। অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, ছেলেদের প্রত্যেক অভ্যাসের ফলে চরিত্রের সাধুতা ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায়। কেবল কথায় কথায় কদভ্যাসের অনিষ্টকারিতার বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেই চলিবে না। ছেলেদের বুঝিতে দেওয়া উচিত যে, তাহাদের শৈশব ও বাল্যের ভিতরেও আমোদ ও আনন্দলাভের অনেক জিনিষ আছে—এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলি করিতে থাকিলে তাহারা আনন্দ পাইবে, একটা সরল স্বাধীনতার ভাব লাভ করিবে।

অভ্যাসগুলিই আবার চরিত্রের আকারে পরিণতি লাভ করে। ধাতুর উপর যে খোদাই কাজ হয়, তাহা আলোচনা করিলেই এই বিষয়টা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। চরিত্র আমরা কাহাকে বলি? বলিতে গেলে, মানুষের প্রকৃতিকেই আমরা চরিত্র বলি। যে ব্যবহার যাহার জীবনের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহার প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যবহারকেই আমরা তাহার চরিত্র বা প্রকৃতি বলি। আমরা যখন মাটির প্রকৃতি, প্রস্তরের প্রকৃতি, কাঠের প্রকৃতি বলি, তখন বুঝিতে হইবে, সেই সকল অবস্থায় যাহার মধ্যে যে সকল গুণ অপরিহার্য্যরূপে দাঁড়াইয়া আছে, সেই সকল গুণই তাহার প্রকৃতি—অর্থাৎ সেই সকল গুণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জোরের সঙ্গে দুটো কথা বলিতে পারি। এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই ছুতারমিস্ত্রি তাহার কাঠ বাছিয়া লয়, রাজমিস্ত্রি তাহার পাথর বাছিয়া লয়। এই প্রকৃতির মর্ম্ম বুঝিলেই আমরা বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিব যে, মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতেছে তাহার প্রকৃতি বা চরিত্র। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে, তাহার অর্থ এই যে, "একটা কাজ রোপণ কর, তাহার ফলে অভ্যাস অর্জ্জন হইবে। একটী অভ্যাস রোপণ কর, তাহার ফলে চরিত্র গঠিত হইবে।" এইটীর ভাব ছোট ছেলেদিগকে খুব ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কোন অভ্যাসের ভালমন্দ বিষয়ে যদি তাহাদের সংশয় উপস্থিত হয়, তবে সেটী তাহাদের চরিত্রের অংশরূপে দাঁড় করাইতে চায় কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সহজেই সেই সংশয়ের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আমরা যে কোন কাজ করি, সেটা অভ্যাসে দাঁড়াইলে ভাল বা মন্দ হইবে, তাহা বিচার করিলেই সেই কাজটী ভাল কি মন্দ, তাহা সহজেই বিবেচনা করিতে পারিব। বালকগণকে এইটী বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, আজ অভ্যাস সম্বন্ধে "এই একবার মাত্র করিলাম" ইহা বলিয়া মনকে কিছুতেই প্রবোধ দেওয়া উচিত নয়, কারণ ইহার পরিণামফল বড়ই মন্দ। ভাল বিষয়ের অভ্যাসের দৃষ্টান্তস্বরূপে রবিনসন ক্রুশের অজানত কতকগুলি শস্যবীজ থলি হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার ফলে যথাসময়ে একরাশ শস্যলাভের কথা উল্লিখিত হইতে পারে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

জৌনপুরী—একতালা।

রিক্ত করিয়া লবে গো আমায়
তোমার সুধায় ভরিবে
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে
সকল হৃদয় হরিবে।
তাই তো গো তুমি, ধন জন মান
সব হতে কাড়ি' লইলে এ প্রাণ
অশ্রু-সলিলে ধুলে দুনয়ান
আপন যে মোরে করিবে।

তাই ভাল মোর তাই ভাল
নয়নের জল এই ভাল
তব সনে যদি দরশন মিলে
ব্যথারাশি আরো আরো ঢালো॥
দাও দাও মোরে বেদনার দান
বেদনার রঙে রাঙা হোক্ প্রাণ
বক্ষ-শোণিতে বাহিরাক্ গান
সে হার কণ্ঠে পরিবে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি. এল্।

	০				১				২´				৩			
II	মা	-া	পা	I	পা	ণা	দপা	I	মপা	জ্ঞা	জ্ঞা	I	ঋা	সা	-া	I
	রি	ক্	ত		ক	রি	য়া		ল	বে	গো		আ	মা	য়	

I দা সা রা। মা পনদাঃ পঃ। মা পা মজ্ঞা। মরা -া -া I
তো মা র সু ধা॰ য় ভ রি বে • • •

I পা পা দা। মা পদা নর্সা। র্সা ণা দা। দা পা পা I
বা রে বা রে এ॰ •ই ব্য থা দি য়ে দি য়ে

I মা পা -া। পা ণদাঃ পঃ। মা পা মজ্ঞা। -মরা -া -া II
স ক ল্ হৃ দ॰ য় হ রি বে • • •

II পা -া দা। মা পদা র্সা। র্সা র্সা র্রা। ণা র্সা -া I
তা ই তো গো তু॰ মি ধ ন জ ন মা ন্

I ণর্সা র্রজ্ঞা জ্ঞা। র্রা র্সা র্সা। ণা ণদা পদা। দা পা -া I
স॰ •ব হ তে কা ড়ি ল ই॰ লে এ প্রা ণ

I পা -দা মা। পা দা র্সা। ণা পদা ণা। দা পা -া I
অ • শ্রু স লি লে ধু লে হৃ ন য়া ন্

I মা পা -ণা। দা দা পা। মা পা মজ্ঞা। -মরা -া -া II
আ প ন যে মো রে ক রি বে • • •

II মা -া মা। মা জ্ঞমা -পদা। পা -দা মা। পা -া -া I
তা ই ভা ন মো॰ •র্ তা ই ভা ন • •

I পা দা র্রা। -া র্সা -া। ণধা ণা দা। পা -া -া I
ন য় নে র জ ন এ॰ ই ভা ন • •;

I মা পা ণা। দা দা পা। মা পা জ্ঞা। জ্ঞরা রা সা I
ত ব স নে য দি দ র শ ন॰ মি লে

I দা সা রা। মা পা ণা। পদা দা মা। পা -া -া II
ব্য থা র শি আ রো আ রো ঢা লো • •

II পা মা ণা। -দা ণা র্সা। র্সা র্রা র্জ্ঞর্রা। -ণা র্সা -া I
দা ও দা ও মো রে বে দ না॰ র দা ন

I ণা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্রা র্রা র্সা। ণা পদা ণা। -দা পা -া I
বে দ না র র ভে রা ঙা॰ হো ক্ প্রা ণ

॰	১	২´	৩
I পা -দা মা |	পা দা র্সা |	ণা র্দা র্দা |	-া পা -া I
ব ॰ ক্ষ	শো ণি তে	ধা হি রা	ক্ গা ন

॰	১	২´	৩
I পা পা -পা |	র্দা -া পা |	মা পা জ্ঞা |	-র্রা -া -া II
সে হা র্	ক ন্ ঠে	প রি বে	॰ ॰ ॰

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভূমিকা।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার রাস্তাঘাট যে প্রকার ছিল এবং রাস্তাঘাটে চলাফেরার ব্যবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহা দেখিয়া সেকালের কোন লোক একালের রাস্তাঘাট এবং একালের চলাফেরার ব্যবস্থা কল্পনাও করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আবার এখনকার কালে, তিন বেলা ধুলোকাদারহিত আলকাতরা-ঢালা পাথরেমোড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট দেখিয়া; এবং কনষ্টেবলদিগের এক ইঙ্গিতে সমস্ত গাড়ীঘোড়ার সারি মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া যাওয়া, বামদিক ছাড়িয়া ডানদিকে গেলেই ধরপাকড়ের ব্যবস্থা, এই সমস্ত দেখিয়া, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ধুলোকাদায় পরিপূর্ণ, চারিদিকে আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালে পূর্ণ রাস্তাঘাট, এবং মহামহা ধনীদিগের কথায় কথায় চৌঘুড়ি আটঘুড়ি গাড়ী স্বেচ্ছামত ডাইনে বামে হাঁকাইয়া গিয়া বাবুয়ানি দেখানো, আর মো-সাহেবগণের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গাড়ীর সম্মুখে পথিক বা কনষ্টেবল যে কেহ পড়িবে তাহাকেই চাবুকের দ্বারা বেদম প্রহার করিয়া অকুতোভয়ে গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়া, আজকালকার ছেলেপিলেরা এসমস্ত কিছুতেই কল্পনাতেই আনিতেও পারে না, ইহাও আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

আবর্জ্জনা অপসারণ—সেকালে।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, সেকালে জিনিসপত্র আজকালকার মত এত দুর্মূল্য ছিল না। তখন নিতান্ত দরিদ্র না হইলে ধনী ও মধ্যবিত্ত প্রায় সকল গৃহস্থেরই বাড়ীতে অন্তত একটী গাভী ও একটা গাড়ীঘোড়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। তখন অনেকেই প্রকৃতিপ্রদত্ত পদযুগলের সদ্ব্যবহার করিয়া "হাঁটিয়া পাড়ি মারিতেন" বটে, কিন্তু অনেকেই ভদ্রস্থতার উপকরণ স্বরূপেও অন্তত একটা গাড়ী ঘোড়া রাখিতেন। আর গরু রাখা ও গোসেবা তো সেকালে হিন্দুসাধারণের অন্তরে, আজকালকার মত মুখে নয়, একটা বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া ধারণা ছিল। এই গরু রাখা ও গাড়ীঘোড়া রাখার কারণে, সেকালে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাড়ীতে অন্যান্য শতবিধ আবর্জ্জনার সঙ্গে গোয়াল ও আস্তাবল হইতেও যথেষ্ট আবর্জ্জনা সংগৃহীত হইত। কিন্তু সেই সমস্ত আবর্জ্জনা বাড়ীর বাহিরে কোথায় যে ফেলা হইবে, তাহার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। কাজেই সাধারণত বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনাই তাহার ফটকের সম্মুখে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত। অনেক স্থলে গোময় প্রভৃতি গোয়ালঘরের আবর্জ্জনা গোয়ালেরই এক কোণে পচিতে দেওয়া হইত। মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীর গোয়ালের এক কোণে এই প্রকার পচা গোবরে সাদাসাদা পোকা বিজবিজ করিতেছে—পাখীওয়ালারা সেই সমস্ত পোকা পাখীর খাদ্যরূপে সংগ্রহ করিত। তখন আবর্জ্জনা সরাইবার জন্য ময়লাগাড়ীর সংখ্যাও আজকালকার মত এত বেশী ছিল না, আর মোটর লরীরও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ময়লাগাড়ী যাহা ছিল, সেইগুলিরই মধ্যে কোনও রকমে ভাগাভাগি করিয়া আবর্জ্জনা যথাসম্ভব সরাইবার ব্যবস্থা করা হইত। বাকী-পড়া আবর্জ্জনার জ্বালায় গৃহবাসীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন, কর্পোরেষণের (সেকালে বোধ হয় মিউনিসিপালিটি ছিল) কর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন নিবেদনের থালি উপস্থিত করিয়া মনকে আশ্বাস দিতেন যে, এইবারে নিশ্চয়ই তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে—আবর্জ্জনা নিঃশেষে অপসারিত হইবে। কিন্তু দিনের পর দিন গেল—কা কস্য পরিবেদনা—কোথায় বা কে—যথা পূর্ব্বং তথা পরং—আবর্জ্জনা আর নিঃশেষে অপসারিত হয় না। নিঃশেষে উঠাইয়া লইতে যত গাড়ী আবশ্যক হইত তত গাড়ীই যে ছিল না, কর্ম্মচারীরা করিবেন কি?—তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল অপবাদ লাভ হইত।

আবর্জ্জনা অপসারণ—একালে।

আজকাল আইনের দ্বারাই আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানও নির্দ্দিষ্ট হয়, ফেলিবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হয়। বাড়ীর কর্ম্মচারীরা সকলেই জানে যে অমুক সময়ে ময়লাগাড়ী আসিয়া আবর্জ্জনা উঠাইয়া লইবে—তাহারা তাহার পূর্ব্বেই বাড়ীর আবর্জ্জনা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া আসে, যথাসময়ে ময়লাগাড়ী আসিয়া তাহা নিঃশেষে উঠাইয়া লইয়া যায়। রাস্তায় অসময়ে আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকিলে কর্ম্মচারীদিগের বড়ই বিপদ—পদে পদে কৈফিয়ৎ দিতে হয় অথবা শাস্তি পাইতে হয়। একবার সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আমার বাড়ীর নক্সা মঞ্জুর করিবেন বলিয়া কর্পোরেষণের তদানীন্তন চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সি, এফ, পেন সাহেব আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সম্মুখে একটি আস্তাবলের সম্মুখে এক ঝুড়ি পরিমিত আবর্জ্জনা পড়িয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি overseer বা উপরদ্রষ্টা কে আনিয়া লইয়া তাহাকে সসপেণ্ড করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আজকাল আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য কেবল স্থান ও কাল যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলেই খাঁজকাটা (corrugated) লৌহের গোল বা চতুষ্কোণ মাথাখোলা বাক্স রাখা থাকে, যাহাতে আবর্জ্জনা-রাশি তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকে—চতুর্দ্দিকে না ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতেও স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মন সুস্থির হইল না। সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলির পাদপথের ধারে তাঁহারা গর্ত্ত করিয়া তাহা পাকা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে ঐ সকল আবর্জ্জনাবাক্স রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; সেই সমস্ত গর্ত্তের উপরে লৌহনির্ম্মিত ঢাকারও ব্যবস্থা থাকে, যাহাতে তাহার ভিতরে জল প্রবেশ করিতে না পারে। যথাসময়ে আবর্জ্জনাবাহী মোটর-লরি আসিয়া উত্তোলকযন্ত্রের সাহায্যে আবর্জ্জনা বাক্সগুলি গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া লয় এবং লরির লোকেরা তাহা লরিতে ঢালিয়া লইলে আবার সেই বাক্স ঐ যন্ত্রের সাহায্যে যথাস্থানে রক্ষিত হয়। সমস্ত কাজটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়। লরি পূর্ণ হইলে হু-হু শব্দে চলিয়া আবর্জ্জনাবাহী রেলগাড়ীতে ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট গলি হইতে আবর্জ্জনা সরাইবার উপযুক্ত-সংখ্যক ঘোড়ার গাড়ী, হাতগাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত আছে—যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহ হইতে সেই সমস্তের দ্বারা আবর্জ্জনা উঠাইয়া লইয়া আবর্জ্জনাবাহী রেলগাড়ী পূর্ণ করা হয়।

আবর্জ্জনার রেলগাড়ী।

সেকালে আবর্জ্জনাবাহী রেলগাড়ীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। অপার (upper) সার্কুলার রোডের এক ধারে এই রেলগাড়ী যাইবার লাইন পাতা ছিল। আর সেই লাইনের মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে কতকগুলি করিয়া ময়লাবাহী রেলগাড়ী দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারই পাশে পাশে ইটের খিলানের মত গাঁথুনি থাকিত। সেই গাঁথুনির উপর দিয়া আবর্জ্জনাবাহী ঘোড়াগাড়ী এবং গরুর গাড়ী লইয়া গিয়া রেলগাড়ীর পাশে এক-একটী করিয়া দাঁড় করানো হইত। তখন এক একটী গাড়ী হইতে কোদালের দ্বারা রেলগাড়ী পূর্ণ করা হইত, আর এক একটী গাড়ীকে ঐ পিগান বাহিয়া নামিয়া যাইতে দেওয়া হইত। খুব বাল্যকালের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে যখন পড়িতাম, তখন অবধিই শুনিতাম যে রেলগাড়ী করিয়া আবর্জ্জনারাশি ধাপাতে লইয়া যাওয়া হইত। রেলগাড়ী পূর্ণ করিবার সময় কাক-চিলের কি উপদ্রব, আর কি দুর্গন্ধ! ঐ রাস্তার পশ্চিম ধারে যে সকল ভদ্রলোকের বাসগৃহ ছিল, সে সমস্ত গৃহ ঐ আবর্জ্জনাভোজী কাক-চিল, এমন কি শকুনির উপদ্রবে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সমস্ত গৃহের সার্সি তো দিনরাত্রি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত। আবার যখন রেলগাড়ী লইয়া যাইতে যাইতে পরস্পরের মধ্যে ঢকাঢক ধাক্কা লাগিত, তখন সেই সমস্ত আবর্জ্জনারাশির অনেক অংশ মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং তাহার ফলে সমস্ত অপার সার্কুলার রোডটী দুর্গন্ধে অগম্য হইয়া উঠিত।

আজকাল আবর্জ্জনাবাহী রেললাইন অনেক স্থান হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে; সরাইয়া লইয়া পূর্ব্ব-দিকে অনেকটা বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সেখানেও রেলগাড়ী বোঝাই করিবার জন্য রেললাইনের পাশে একটানা সুদীর্ঘ খিলানের গাঁথুনি করা হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ী ত নয়ই, ঘোড়া গাড়ী লইয়া গিয়া সেই গাড়ীর লেজটা একেবারে রেলগাড়ীর ভিতরে নামাইয়া দেওয়া হয় এবং লরিরও লেজ সেই রকম নামাইয়া দেওয়া হয়। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ঢালাঢালির কাজ শেষ হইয়া যায়। তার পর সেই সমস্ত বোঝাই গাড়ীর উপর কেম্বিস ঢাকা দেওয়া হয়, যাহাতে কাকচিল না বসিতে পারে এবং বাতাসে যাহাতে আবর্জ্জনা না উড়িতে পারে। এখন পশ্চিম ধারের বাসগৃহগুলির বাসের অনুপযোগিতা অনেকটা দূর হইয়াছে।

বাকী আবর্জ্জনা - সেকালে।

যাই হোক, ঘোড়ার গাড়ী বলদ-গাড়ী সাধ্যমত আবর্জ্জনা তুলিয়া লইবার পর যে সমস্ত আবর্জ্জনা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া থাকিত, ভিস্তির জল পাইয়া অথবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির জল পাইয়া যখন তাহা কর্দ্দমে পরিণত

হইত, অথবা যখন তাহা রৌদ্রদগ্ধ হইয়া শুষ্ক ধূলিরাশিতে পরিণত হইত, তখন এক অপূর্ব্ব ব্যাপারের সৃষ্টি হইত। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সেকালে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাস্তা ভিস্তির মশকের দ্বারা বারিসিঞ্চনে যথাকথঞ্চিৎরূপে সিক্ত করা হইত; তাহার পরে বলদগাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে জলসিঞ্চন সম্পন্ন করা হইত; তাহার অনেক কাল পরে গঙ্গাজলের পাইপ বসাইয়া রীতিমত রাস্তা ধুইবার ব্যবস্থা করা হইল। যখন ঐ অবশিষ্ট আবর্জ্জনা ছিটে ফোঁটা জল পাইয়া কর্দ্দমে পরিণত হইত, তখন তাহা পথিকদিগের জুতার তলায় বা পদতলে গুপ্তশত্রু মৌখিক বন্ধুর মত অথবা টিকটিকি কর্ম্মচারীর মত সংলগ্ন থাকিয়া গৃহ পর্য্যন্ত আসিয়া বিষবায়ু বিকীর্ণ করিতে উদ্যত হইত।

আবার গ্রীষ্মকালে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে—সে আবার আর এক মহা ব্যাপার! কবিপ্রসিদ্ধ মলয়বায়ু যখন দক্ষিণদিক মাড়াইয়া নাসিকাগ্রে আসিয়া পৌঁছিত, তখন তাহা লবঙ্গাদি পুষ্পের সুরভি-পরাগ বহন করিয়া আনিবার পরিবর্ত্তে, নিদাঘের কঠোর রৌদ্রতাপে ধূলি-পরিণত সেই সমস্ত আবর্জ্জনার গুঁড়া বহিয়া আনিয়া চক্ষুকর্ণ ভরিয়া দিত। মলয়বায়ু উপভোগের পরিবর্ত্তে প্রায় সমস্ত পথ নাকে কাপড় দিয়া চলিতে হইত। আবার শরৎকালে সেই সমস্ত আবর্জ্জনা ক্ষণেক জলে ভিজিয়া, পরক্ষণে রৌদ্রে শুকাইয়া দিবানিশি যে দুর্গন্ধ বাহির করিত, তাহা বোধ হয় নরককেও হার মানাইত। সেই দুর্গন্ধের ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে নীলমাছির আমদানি হইয়া টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রোগসমূহের সৃষ্টি ও বিস্তার করিত। তদ্ব্যতীত, ভালরকম এক পসলা বৃষ্টি হইতে না হইতে কথায় কথায় ড্রেন নর্দ্দামা সমস্ত বন্ধ হইয়া যাইত এবং তাহার ফলে বাড়ীর ড্রেন নর্দ্দামা-গুলিও ময়লা জলে একদিন দুইদিন করিয়া ভরা থাকিত। রাস্তাগুলিও এবিষয়ে বড় বাদ যাইত না। একটা জোর পসলা বৃষ্টি হইলেই রাস্তার উপর প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া যাইত। সেই জলে কত মানুষ, কত জীব-জন্তুর ময়লা যে ভাসিত তাহা বলা যায় না; অথচ সেই জল ভেদ করিয়াই লোকজনকে চলাফেরা করিতে হইত। জল শুকাইয়া গেলে, সেই সমস্ত ময়লা প্রায় দুই একদিন রাস্তায় পড়িয়া থাকিয়া লোকজনের পায়ে পায়েই অনেকটা ভরিয়া যাইত; বাকী যাহা নামে মাত্র থাকিত, তাহা অবশ্য মিউনিসিপাল ঝাড়ুদারের ঝাড়ুর অনুগ্রহস্পর্শ লাভে বঞ্চিত হইত না। তবে সে সময়ে আহার্য্যদ্রব্য বেশ একটু সস্তা ছিল এবং আগন্তুক ব্যবসাদার বন্ধুদিগের অনুগ্রহে বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থলে যে প্রকার ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে, সে সময়ে আহার্য্য দ্রব্যে এপ্রকার ভেজাল প্রবেশলাভ করে নাই, তাই লোকজনের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, দেহে বল ছিল এবং সহজে মারাত্মক রোগে পাড়িতে পারিত না।

শরীর-চর্চ্চা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা।

[ডাক্তার কাপ্তেন শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, আই. এম্., এস, (অবসর-প্রাপ্ত)।]

বাঙ্গালীর মত নির্জীব জাতি বোধ হয় জগতে আর নাই। আমি ১২ বৎসর ধরিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি; এত দুর্ব্বল ও এত পরনির্ভরশীল জীব আমার নজরে অতি অল্পই পড়িয়াছে।

বাঙ্গালার মাটী তুলার মত নরম। জমিতে ধান ছড়াইলেই গাছ হয়; একটু কষ্ট করিয়া পাকা ধান কাটিয়া গোলাজাত করা সাপেক্ষ। পল্লীগ্রামের লোক এইটুকু পরিশ্রম করিয়াই নিশ্চিন্ত। দিবসের অধিকাংশ সময় পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও মোকদ্দমা-মামলা করিয়াই কাটাইয়া দেয়।

ইহার উপর আবার প্রলয়রূপী মহামারী যথা ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুএঞ্জা প্রভৃতি দয়াময়গণের কোপদৃষ্টিতে বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক যমরাজের দপ্তর-খানায় সরাসর যাইয়া হাজিরা দিতেছে।

অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলির সম্যক্ পরিবৃদ্ধি পায় না; তাহাদের রোগ-বালাই হইতে বাঁচিবার ক্ষমতা জন্মে না; অতি সহজেই নানা প্রকার ভীষণ রোগ দুর্ব্বল দেহটাকে দখল করিয়া বসে, ও মানব অকালে কাল-কবলে পতিত হয়।

মনুষ্য মাত্রেরই যথেষ্ট পরিশ্রম করা প্রয়োজন। মোটবাহী মজুর প্রভৃতি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আপ-নাপন উদরান্নের সংস্থান করে। সহরের শিক্ষিত বাঙ্গালী-বাবু সমস্ত দিন চেয়ারে বসিয়া কলমের অগ্রভাগটী টানিয়া হেঁচড়াইয়া ও টিফিনের সময় দুই এক আনার পচা বাদামতেলে ভাজা কচুরি-সিঙ্গাড়া গিলিয়া, পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘোর অম্ল-রোগে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বাড়ী ফিরেন। দিনের পর দিন যায়, ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টি-প্লাবিত সংসারের গুরু ভার ও দৈন্য-দুর্ব্বল দেহ অধিক দিন বহিতে পারে না, ৪০ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই পরলোকে গিয়া চিত্রগুপ্তের পেন্সন ভোগ করেন।

বড়লোকের ছেলের তো কথাই নাই। তাঁহারা মোটরে চড়িয়া প্রাতঃকৃত্য সারেন, ল্যাণ্ডোয় চড়িয়া হাওয়া খান, নিশ্চিন্ত সুখে নানা চর্ব্ব-চোষ্য আহার করেন—

হাত-পা-মনের কোন পরিশ্রমই তাঁহাদের অদৃষ্টলক্ষ্মীর কৃপায় করিতে হয় না। এরূপ অলস হইয়া আপনাপন দেহের উন্নতিকল্পে অমনোযোগী থাকিলে, আর অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই বৃহৎ মস্তিষ্কধারী ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী জাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যাইবে।

বাঙ্গালী মাত্রেরই এখন দৈহিক উন্নতিসাধনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। দেহের উন্নতিসাধন ও তাহাতে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া মত নিয়মিত-রূপ ব্যায়াম-চর্চ্চা করাই বিধেয়।

শরীর চর্চ্চা (Physical Culture) অর্থে দেহের উন্নতিকল্পে ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ প্রণালীর নিয়মিত অভ্যাস বুঝায়। Physical Culture কথাটা বিলাতী। আমরা (ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী) বিলাতী জিনিষটা অতি সুন্দর দেখি। দেখি বটে, কিন্তু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখি না। উপরের চাকচিক্য দেখিয়াই ভুলিয়া যাই ও তাহার অনুকরণ করিতে ব্যস্ত হই। বিলাতী ব্যায়াম—যথা জিম্‌নাষ্টিক (Gymnastic), ডাম্বেল-ভাঁজা (Dum-bell Exercise), ফুটবল (Foot Ball), হকি (Hockey) প্রভৃতি প্রত্যেক খেলার আড়ম্বরটাই শিখিতে চেষ্টা করি। ফলে জিম্‌ন্যাষ্টিক খেলোয়াড় বাঙ্গালীকে দেখি, কেহবা খুব বুক চিতাইয়া চলেন, কিন্তু বাহুমূলের উপর 'অংশকূট প্রবর্দ্ধন' (কাঁধের হাড়—Acromion process) স্পষ্টভাবে জাগিয়া আছে; গলাটী সরু, বাহুদ্বয় দুটী গরাণ কাঠের মত......ইত্যাদি নানাপ্রকার অসম্পূর্ণভাবে মাংসপেশীর বৃদ্ধি ও অপরিপুষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

খেলোয়াড়গণের অধিক লক্ষ্য—কিরূপে ভাল খেলা দেখাইয়া হাততালি পাইব; সঙ্গে সঙ্গে যে আপনার পূর্ণাঙ্গ সৌষ্ঠবের যথাযথ অনুশীলনের (all round development) কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে—একথা তাহাদের মনেই আসে না। শিক্ষকগণ (Trainers) সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। ফল কথা, তাঁহারা উক্ত সার্ব্বাঙ্গিক সমুন্নতির সকল উপায় জানেন না। অনেক ক্ষণ-উৎসাহী যুবক দিন-কতক বিলাতী নানাপ্রকার প্রণালী-প্রবর্ত্তক ব্যায়াম-বীরগণের ছাপা প্রণালীর (Printed Charts) অনুকরণে ডাম্বেল ভাঁজিয়া বিশেষ উপকার কিছু না পাওয়ায় উক্ত প্রণালী-প্রবর্ত্তকের নামে দোষারোপ করিয়াই ব্যায়াম-চর্চ্চা জন্মের মত ছাড়িয়া দেন। ইঁহারাই আবার ২৭।২৮ বৎসর বয়সকালে বলেন যে, "আর আমরা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি, ছোট বয়সে ভাল ভাল ব্যায়াম (Exercise) করিতাম; ওতে কিছু হয় না।"

দোষী হইলেন—বিলাতী ব্যায়াম-প্রণেতা, তাঁহার অপরাধ—তাঁহার প্রণালীতে কিছু হয় না। আরও অপরাধ—তিনি ইংরাজ বা আমেরিকান, বাংলা দেশ হইতে ৭০০০ বা ১০০০০ হাজার মাইল দূরে তাঁহার বাস, তাঁহার ঊর্দ্ধতন ছাপ্পান্ন পুরুষ আমাদের কাহাকেও চক্ষে দেখেন নাই, আমাদের সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক রীতি-নীতি অথবা জাতি-সুলভ দৈহিক অবস্থার এক আনা সংবাদ জানেন না বা রাখেন না। এ ক্ষেত্রে একজন আর এক জনের (উপরন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে, অনুপস্থিতিতে ও ব্যক্তিগত অভাব-পূরণোপযোগী উপদেশ-ব্যতিরেকে) প্রণালীটি আট-দশ আনা আন্দাজ অনুকৃতিতে দিন-কতক মাত্র হস্তপদ চালনা করিয়াই কার্য্যে বিতৃষ্ণ হইয়া, "ব্যায়াম-ট্যায়াম সব বুজরুকী" বলিয়া নিশ্চিন্ত!

ফুটবল-(Foot ball) খেলোয়াড়গণ, আমাদের বাঙ্গলা দেশের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের প্রখর পশ্চিমে রৌদ্র-মাথায় ঘণ্টাখানেক দমফাটা দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা-ভঙ্গের পর, তৃষ্ণানিবারণার্থ ২।৩ ঘটী জল খাইয়া বাড়ী ফিরিলেন; দেহের কোন্ কোন্ মাংসপেশীর চালনা (Exercise) হইল—তৎপ্রতি তাঁহার কোন লক্ষ্যই রহিল না। প্রথম যৌবনে ৩।৪ বৎসর এইরূপ খেলায় নিজের শক্তির অতিরিক্ত প্রাণান্তকর ব্যায়াম করিয়া, হৃদ্‌রোগ (Heart disease) বা হাঁপানি রোগের আসামী সাজিয়া চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া, ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে বৃদ্ধের আকার ধারণ করেন ও ৩৫এর কোঠা পার হইতে না হইতেই জীবনের পরপারে চলিয়া যান।

ফল কথা, সুধু ভুল প্রক্রিয়া অনুসারে বা প্রত্যক্ষভাবে গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে কিছুদিন বিদেশের আমদানী ব্যায়াম না করিয়া, দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালীসকল যথাযথরূপে হাতে-কলমে শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিলেই শরীর সুস্থ থাকে এবং বলবান হওয়া যায়; আড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন হয় না। ফুটবল খেলুন হকি খেলুন জিম্‌ন্যাষ্টিক করুন—যাহাই করুন, আপনার দেহের মাংসপেশীগুলির উপর নজর রাখিয়া তাহাদের রীতিমত চালনা করিতে হইবে এবং মন একাগ্র করিয়া এই চিন্তাকে সজাগ রাখিতে হইবে যে,—এই খেলার দ্বারা আপনার সমস্ত অঙ্গগুলিতে অমিত শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে! দৈনিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে আধ ঘণ্টা কাল যোগ-সাধনার মত ব্যায়াম করা চাই। ইহার সহিত আহার-বিহারের স্থূল নিয়মগুলি পালন করিলেই সুস্থভাবে কিছুকাল জীবনধারণ করিবার আশা থাকিবে।

নিম্নে কতকগুলি ব্যায়ামপ্রক্রিয়া দেওয়া গেল।

(চিত্র-ক)
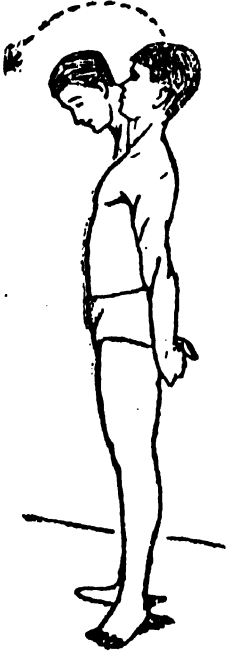
ব্যায়াম নং ১।

(১) ক-চিত্রের মত সোজা হইয়া দাঁড়াও, চিবুক বক্ষে সংলগ্ন কর; ঘাড়ের মাংসপেশীর দিকে মন রাখ ও তাহা একটু বেশ শক্ত করিয়া মাথা পশ্চাদ্ভাগে ফিরাও; সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ নিশ্বাস লও। আবার গলার সম্মুখভাগের মাংসপেশীগুলির দিকে মনঃসংযোগ কর ও উহাদিগকে শক্ত রাখিয়া মাথা সম্মুখদিকে নামাও ও চিবুক বক্ষে স্পর্শ করাও; এই ক্রিয়ার সময় নিশ্বাস ছাড়িয়া দাও।

সময়:—সম্মুখ ও পশ্চাৎ একবার আনিতে দুই সেকেণ্ড সময় লাগিবে।

বার:—১০ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহে একটি করিয়া বাড়াইয়া পরিশেষে ৫০ পর্য্যন্ত।

(চিত্র-খ)
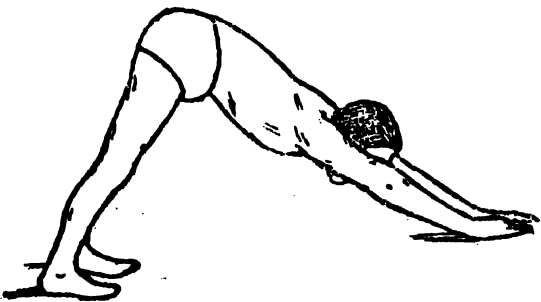
(২) খ-চিত্রটীর মত মাটিতে হাত ও পা এক এক হাত অন্তর রাখ, পুরা নিশ্বাস লও, দম বন্ধ রাখ এবং গ-চিত্রটীর মত অবস্থান কর। পরে ঘ-চিত্রটীর মত বুক নীচে নামাও, ও ঙ-চিত্রটীর মত অবস্থা লও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ছাড়িয়া দাও। এখন আবার পূর্ণ নিশ্বাস লইতে লইতে খ-চিত্রটীর অবস্থা লও—আবার পূর্ব্ব মত একটি চালনা আরম্ভ কর।

সময়:—প্রত্যেক চালনা ৪ সেকেণ্ড।

বার:—৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ পর্য্যন্ত।

(চিত্র-গ)
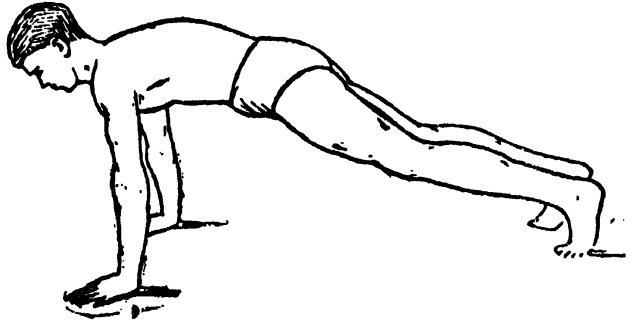
(চিত্র-ঘ)

(চিত্র-ঙ)
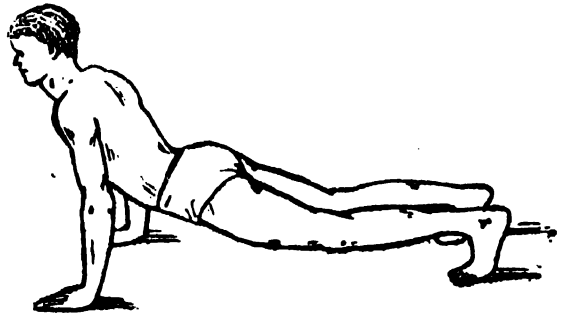
ব্যায়াম নং—২। দেশী "ডন"।

(৩) চ-চিত্রের মত সোজাভাবে দাঁড়াও, পূর্ণ নিশ্বাস লও, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের মুঠা বাঁধ; দম বন্ধ রাখ ও ছ-চিত্রের মত হাত মুড়িয়া স্কন্ধ-প্রান্তের দিকে লও; হাতের গুলির প্রতি বিশেষ মন রাখিয়া উহাকে শক্ত কর। এইরূপ ডাইনের পর বাম হাত মুড়িতে থাক ও নিশ্বাসক্রিয়াটিকমত চালাও।

সময়:—প্রত্যেক হাতের চালনা ২ সেকেণ্ডের অধিক লাগিবে না।

বার:—১০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত।

(চিত্র-চ)
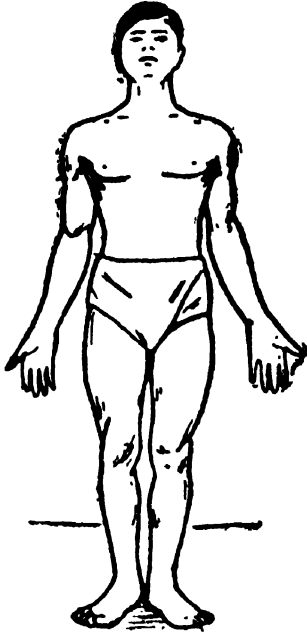
(চিত্র-ছ)

ব্যায়াম নং—৩।

(৪) জ-চিত্রের মত দাঁড়াও, দুই হাতে জোর মুঠা বাঁধ; পুরোবাহু (fore arm) কঠিন রাখিয়া দুই হাতের মুঠা একসঙ্গে দেহের দিকে ও বিপরীত দিকে মুড়িতে থাক।

সময়:—যতক্ষণ স্নায়বিক ক্লান্তি না আইসে।

বার:—১০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০পর্য্যন্ত যথেষ্ট।

(৫) ঝ-চিত্রের মত সোজা হইয়া দাঁড়াও, দুই পায়ের মধ্যে ১ হাত ফাঁক রাখ, কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত সোজা রাখ ও পূর্ণ নিশ্বাস লও। কোমরের উপর ধড়টী খিলানের ভাবে চিত্রের মত নামাও, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ছাড়িয়া দাও। আবার নিশ্বাস লইতে আরম্ভ কর ও সঙ্গে সঙ্গে দেহটী সোজা কর ও নিশ্বাস লওয়া শেষ কর; আবার নীচু হও ও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ছাড়িয়া দাও।

সময়:—প্রত্যেক চালনা ৩ সেকেণ্ড।

বার:—১০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত।
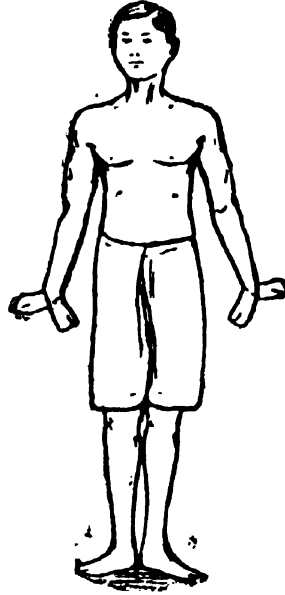
(চিত্র-জ) (চিত্র-ঝ)
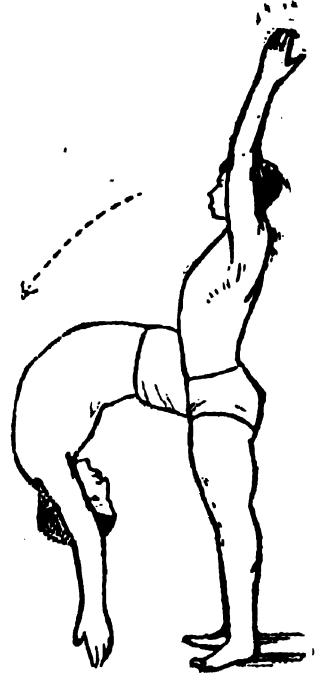
ব্যায়াম নং—৪। ব্যায়াম নং—৫।

(৬) দুই পা পরস্পর ১ ফুট তফাৎ রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও, সামনের দিকে দেখ, ও সোজাভাবে উবু হইয়া উপবেশন কর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ছাড়িয়া দাও; আবার সোজাভাবে উঠিয়া দাঁড়াও সঙ্গে সঙ্গে পুরা নিশ্বাস লও। উপর্য্যুপরি ঐরূপ করিতে থাক।

সময়:—প্রত্যেক বৈঠক ২ সেকেণ্ড।

বার:—১০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত।

উপরে যে সকল ব্যায়াম-প্রক্রিয়া দেখান হইল, সেগুলি অতি সহজসাধ্য এবং ডাম্বেল, মুগুর বা কোনও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নাই; শূন্য হস্তে হাতের মুঠা বাঁধিয়া মাংসপেশীগুলির উপর দৃঢ় মনঃসংযোগ করিয়া অঙ্গচালনা করিলেই পেশীগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও দেহে যথেষ্ট বল সঞ্চার হয়। যন্ত্রপাতি নাই বলিয়া কোনও প্রকার বাজে খরচ নাই।

আমার মতে, সাধারণ লোকের ও স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে এইরূপ শূন্যহস্তে ব্যায়ামই (free-hand exercise) প্রশস্ত। ইহা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। যে অবস্থায় যেখানে থাকা যায়, অর্থাৎ যে কেহ রাত্রে আপনার মাথা গুঁজিবার জন্য যদি একটু স্থান পায়, প্রাতে সেই স্থানটীতেই সে আপনার প্রাত্যহিক ব্যায়াম অভ্যাস

করিতে পারে। ইহার জন্য আখড়া, হলঘর, প্রকাণ্ড আয়না, দামী সাজসরঞ্জাম কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যে-কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তিই ইহা অভ্যাস করিতে পারেন। ইহা পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বৃদ্ধও চর্চ্চা করিতে পারেন। প্রত্যেক মাংসপেশীগুলির উপর মনঃসংযোগ অভ্যাস করায় যথেষ্ট একাগ্রতা লাভ করা যায়।

ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার সময় :—ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের ১ দণ্ড পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিবে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পারতপক্ষে একটী লেঙ্গট পরিয়া খোলা জায়গা অসম্ভব হইলে ঘরের মধ্যে জানালা খোলা রাখিয়া ব্যায়াম সুরু করিবে। প্রবল শীত ও বর্ষার বেশী ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা থাকিলে, গায়ে একটু ঢিলা গেঞ্জী বা ফতুয়া পরিধান করিয়া লইতে পার। প্রত্যেক ব্যায়ামের মধ্যে অন্ততঃ ৩. সেকেণ্ড অবসর (Interval) দিবে।

স্নান—শীতকালে অগ্রে দেহে ভাল করিয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া ব্যায়াম করিবে ও ব্যায়াম শেষ হইলে নিশ্বাস সরল হওয়া পর্য্যন্ত (১০-১৫ মিনিট কাল) অপেক্ষা করিয়া স্নান করিবে, স্নানের অব্যবহিত পরেই গাত্র জামা ও কাপড় দিয়া ঢাকিবে।

আহার—সহমত সকল খাদ্যই প্রশস্ত, যাহার যাহা জুটিবে। গুরুপাক খাদ্য ও সহর-বাজারে তথাকথিত ঘিয়ের খাবার সদাই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে! বলবান হইলেই বা পালোয়ান হইলেই যে তাহাকে গুরুপাক ও অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে হইবে—একথাটী সম্পূর্ণ ভুল। একজন মহাবলশালী পাঞ্জাবী মুসলমান পালোয়ান—যে পরিমিত-ভাবে মাছ, মাংস সবই ভক্ষণ করে, তাহাকে যদি এক-পাত্র খুব ঘি-গরম-মসলা দেওয়া "গল্দা" চিংড়ি খাইতে দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ ভয়ে আসন ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। মনে রাখিবে, সহজপাচ্য সাদাসিধা খাদ্যই দেহের পক্ষে উপকারী—বাদাম-পেস্তা-ঘি-মাখন-পোলাও-কালিয়া খাইলেই দেহে বল হয় না, পরন্তু পরিণামে ঘোর অপকার করে। ক্ষুধা অনুযায়ী শাক-পাতা, মাছ-দুধ, ভাত-ডাল খাইলেই আমাদের দেহের যথেষ্ট পুষ্টি হইতে পারে।

ব্যায়ামের অব্যবহিত পরেই পেট ভরিয়া ভাত বা রুটি খাইবে না। শীতকালে একটু আদা-ছোলা, একটু গরম দুধ, সুজি-সিদ্ধ বা সামান্য নারিকেল-মুড়ি খাইতে পার। যাঁহারা দশটায় আফিসে যান, তাঁহাদের প্রাতঃ-কালে কিছু খাওয়ার দরকার নাই। গ্রীষ্মকালে লেবু দিয়া চিনির সরবৎ বা বার্লির জল (সিদ্ধ বার্লি) অথবা ভাতের মাড় ও তাহাতে একটু চিনি দিয়া পান করিলে দেহ স্নিগ্ধ হয়। আহারের সঙ্গে জলপান করা পারতপক্ষে পরিত্যাগ করিবে; অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে জলপান প্রশস্ত। রাত্রে আহার অপেক্ষাকৃত লঘু করিবে।

নিদ্রা—পারতপক্ষে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬ ঘণ্টার কম নিদ্রা যাওয়া বিধেয় নহে। তবে ৮ ঘণ্টার অধিক হইলে দেহের পক্ষে অনিষ্টকর। রাত্রে দশটায় সময় শয়ন বিহিত; তবে কার্য্যগতিকে ঐ সময় উত্তীর্ণ হইলে ১১টার বেশী করা উচিত নহে।*

* ১৩৩৪ সালের স্বাস্থ্যধর্ম্ম পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

জীবনপ্রভাতে।

(শ্রী—)

বৈশাখের এক পুণ্য দিনে
বসন্তের এই আকুল সমীরণে—
প্রথম যেদিন মেলেছিলাম চোখ,
দেখেছিনু ধরণীর এই অপূর্ব্ব আলোক,
সেদিন যেমন লেগেছিল
আকাশ বাতাস আলো
আজও ধরা তেম্‌নি মধুর
তেমনি লাগে ভালো।
আজও তেম্‌নি প্রভাত-বেলায়
শুনি পাখীর গান—
সূর্য্য করায় কিরণধারায়
সকল ধরা স্নান,
সাঁঝের বেলা আলায় তারা
লক্ষ হীরার আলো
আজও ধরা তেম্‌নি নবীন
তেম্‌নি মধুর ভালো॥
এই কথাটি বল্‌তে যে চাই
বর্ষে বর্ষে গানে
কালের চাকা ঘুর্‌চে বটে
দাগ পড়েনি প্রাণে,
তেম্‌নি সহজ সরল মধুর
আছে নবীন প্রাণ
দুঃখ-সুখের ঝঙ্কারে সে
গাইছে নিতি গান।

* * *

এম্‌নি করে চল্‌তে পথে
হঠাৎ যেদিন বাতি
নিভে যাবে পথের বাঁকে
আস্‌বে নেমে রাতি.
সেদিন যেন অন্ধকারে
শঙ্কিত না হই—
অন্তরেতে জানি যেন
একলা আমি নই।
সাথের সাথী আছেন সাথে
কিসের আমার ভয়—
অন্ধকারে থাক্‌লে বাতি
আঁধার—আঁধার নয়।
এই কথাটি বর্ষে বর্ষে
গেয়ে যেন যাই—.
মধুর মধুর সকল মধুর
—ধরা মধুর ঠাঁই॥

গ্রন্থ-পরিচয়।

১। প্রার্থনা সমাজাচা ইতিহাস।—লেখক ও সম্পাদক—শ্রীদ্বারকানাথ বৈদ্য। প্রকাশক প্রার্থনাসমাজ মুম্বই।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, বোম্বাইতে প্রার্থনাসমাজ বলিতে তাহাই বুঝায়। সেই প্রার্থনা

সমাজের ইতিহাস আমরা একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে প্রার্থনাসমাজ-স্থাপনের ইতিহাস, তাহার মুখমন্ত্র ও মুখপত্রের কথা, প্রার্থনাসমাজের কর্ম্মিগণের সচিত্র জীবনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থটী সরল মারাঠী ভাষায় লিখিত—বাঙ্গালীদের বুঝিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না।

২। বৈদ্যজাতির বর্ণ ও গৌরব।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা প্রণীত ও ১২৪।৪ মানিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থলিখিত বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকারকে খাটিতে হইয়াছে। বিষয়টির মীমাংসা আলোচনাসাপেক্ষ। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই পথ দেখাইয়া দিতেছে। গ্রন্থকারের প্রমাণপ্রয়োগকৌশল অনুধাবনযোগ্য।

৩। হোমিওপ্যাথি পরিচারক।—সম্পাদক ডাঃ কে, কে, রায় এম-ডি। পরিচালক—ডাঃ অজিত শঙ্কর দে এইচ্. এম-বি। প্রকাশক—হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটি (ইণ্ডিয়া) ৮নং ভিক্টোরিয়া রোড। পোঃ বরাহনগর—কলিকাতা। সডাক বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

এই মাসিক পত্রটির প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। "প্রতিষ্ঠাতার নিবেদনে" পরিচালক যে সকল উদ্দেশ্য "নিবেদন" করিয়াছেন তাহা সফল করিতে পারিলে এই পত্রটি বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথি প্রচারের যে একটি সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার হোমিওপ্যাথিক নাটক প্রভৃতি বিষয়গুলি কৌতুহলোদ্দীপক ও উপাদেয়। আমরা এই নবজাত সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

৪। সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায় অনূদিত ও শ্রীষ্টতত্ত্বপ্রচারসমিতি এস্. পি. সি. কে হইতে রেভাঃ ফাদার টইলের কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা।

সোলেমানের নাম খৃষ্টীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। গ্রন্থকার সেই সোলেমানের চিন্তাগুলি এই গ্রন্থে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মোটের উপর মন্দ হয় নাই, তবে কয়েকটি স্থানের ভাষা ঠিক্ প্রচলিত বাংলা হয় নাই। ভূমিকাটি উপাদেয় হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি আরও একটু স্বাধীনভাবে অনুবাদ করিতেন ত' ভাল হইত বলিয়া বোধ হয়। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে এই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইবে।

৫। স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ" হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ পাঁচ আনা; ভিঃ পিঃ ডাকমাশুল ।৹ চারি আনা।

এবারে এই পঞ্জিকাখানি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রই ইহা আপন যোগ্যতার সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; সুতরাং পঞ্চম বর্ষের এই প্রবৃদ্ধ সংস্করণটী যে অধিকতর যোগ্য হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার সহিত ধর্ম্ম যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত, স্বাস্থ্যও তদ্রূপ; তাই একক ছাড়িয়া অপরের সেবা চলিতে পারে না। কিন্তু ইদানীং আমরা ইহা ভুলিয়া গিয়াছি; তাই একপক্ষ পক্ষীর ন্যায় বাঙ্গালী জাতির দ্রুত অধঃপতন ঘটিতেছে। আমাদের এই অধঃপতন যে কিরূপ ভয়াবহ এবং উহার প্রতীকারই বা কোন্ পথে তাহা যদি কতকটা জানিতে চাই—বুঝিতে চাই, তবে এই পঞ্জিকাখানির নিকট আমরা সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইব। ইহার শিক্ষাপ্রদ সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের জ্ঞানগর্ভ রচনাসম্ভার, সহজেই সকলের শিক্ষা ও আনন্দ বিধান করিবে। ইহা ছাড়া, অপরাপর পঞ্জিকার ন্যায় ইহার গণনা ও ব্যবস্থাদি বিশদ ও বিশুদ্ধ এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-অনুমোদিত।

ইহার স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী যে কতদূর শিক্ষাপ্রদ ও সুন্দর তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কাপ্তেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীরচর্চ্চা" স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিলাম।

সংবাদ।

বালিকা-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।—কলিকাতার অনতিদূরে উত্তরপাড়ার সন্নিহিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী 'ভদ্রকালী' পল্লীতে এই আশ্রমটী মাত্র চারি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার 'আশ্রম'-কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অধ্যাপক স্বামী প্রেমানন্দ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম হিতৈষী বন্ধু শ্রীসুশীলকুমার গুপ্তের সমভিব্যাহারী হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। আশ্রম-পতি ও আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া বালিকাগণের আশ্রমজীবনের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দেন। বর্ত্তমানে এই আশ্রমে বাইশটী বালিকা ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী বিধি-ব্যবস্থাগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া জ্ঞানে ও ধর্ম্মে পুষ্টিলাভ করিতেছে; এখানে তাহারা বিবিধ জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে শিল্পশিক্ষাও করিতেছে। এখানকার আর একটী ব্যবস্থা বড় ভাল; বালিকাগণের আশ্রমজীবনের মধ্যে জাতি বা বর্ণগত কোনরূপ বৈষম্য রাখা হয় নাই। মোটের উপর আশ্রমটীর বিধি-ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাংশেই সুন্দর। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্মযোগে শরীরে ও মনে বাঙ্গালার মাতৃজাতিকে গড়িয়া তুলিবার এই যে সাধু প্রচেষ্টা—ভগবানের আশীর্ব্বাদে ইহা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুক, এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিয়া জয়যুক্ত হউক।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

ফাল্গুন মাস—১৮৪৮ শক।

আয়	৩৮৫৻৴৩
পূর্ব্বস্থিত	২৭০৻৶৯
সমষ্টি	৬৫৬৻৴০
ব্যয়	৪৪২৻৴৩
স্থিত	২১৩৻.৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

হাওলাত আদায়	১০৭৲
ঋণগ্রহণ	৯৯॥৩
সমষ্টি	২০৬॥৩

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৫৭৲
হাল	১৫৲
মাশুল	৪৵০
বিজ্ঞাপন	৬৲
সমষ্টি	৮৩৵০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তকমুদ্রণ	১॥৶০
কাগজের মূল্য	।৴০
সমষ্টি	২৲

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৩।০
মাশুল	॥৶০
গচ্ছিত	৪৲
গীতা	৮৪৲
ঐ মাশুল	২।০
সমষ্টি	৯৪৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

গায়ক বেতন	৩০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ "	৩৻০
হিসাবরক্ষক "	১৭৲
বেহারা "	৮৲
মেথর "	২৲
সরঞ্জামী	॥৴৬
মাশুল	১।৴৬
ইলেকট্রিক	৫৻০
কেরোসিন	॥৶০
মাঘোৎসব	৫৲
ঋণশোধ	৩৩৻৵০
হাওলাতপ্রদান	৭৮৲
বারবরদারী	২২৶৯
বিবিধ	॥৴৬
সমষ্টি	২০৮৻৴৩

তত্ত্ববোধিনী।

মাশুল	৮৻৯
কর্ম্মাধ্যক্ষ বেতন	৩৻০
হিসাবরক্ষক "	১০৲
বেহারা "	৮৲
কমিশন	১০॥০
বিবিধ	১।০
সমষ্টি	৪২'৯

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার বেতন	৩৫॥০
কাম্পোজিটর "	৪২৲
প্রেসম্যান "	২৯॥০
ইঙ্কম্যান "	১০।৬
কর্ম্মাধ্যক্ষ "	৩৻০
হিসাবরক্ষক "	১০৲
বেহারা "	৮৲
কাগজ	।৴০
তৈল	॥৵০
ফুলঢালা	॥৬
তামাক	।৶৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১২॥৵৯
ময়দা	৴৬
বিবিধ	।৵০
সমষ্টি	১৫৩/৯

পুস্তকালয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ বেতন	৩৻০
মাশুল	॥৵৬
গীতার মূল্য শোধ	৬৲
ঐ মাশুল	১।৵০
ঐ অন্যান্য	॥৴০
ঐ বান্ধান	২০৲
ঐ কমিশন	৬.০
সমষ্টি	৩৮॥৴৬

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সতীশ কবিরাজের
ভুবন বিখ্যাত
১দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য
শ্বাসারি
মূল্য
১শিশি ১॥০
ডজন
১৫৲
মাশুল স্বতন্ত্র
হাঁপ কাশের যম
সাহাপুর, বেহালা পোঃ, ২৪ পরগণা।
ব্রাঞ্চ—রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

Tattwabodhini Patrika   Reg. No. C. 462.

দ্বাবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৬ সংখ্যা   ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। জ্যৈষ্ঠ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

দ্বাবিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৬ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

নববর্ষের উদ্বোধন। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ বৎসরের প্রথম দিনে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। গত বৎসরের প্রথম অবধি, স্মরণ করিয়া দেখ, কি ভয়াবহ অমঙ্গল-বায়ু দেশের উপর বহিয়া গিয়াছে। পরস্পরের প্রতি কি অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি কি ভীষণ হিংসাদ্বেষ, দেশের মধ্যে কি ভীষণ অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু এ সমস্তেরই কারণ, স্বার্থের জন্য, নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমরা মঙ্গলবিধাতা ভগবান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবান আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি দূরে সরিয়া দাঁড়ান নাই। তাঁহার সন্তানেরা পরস্পর পরস্পরের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাতে কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? দেখ—অন্তরে বাহিরে চক্ষু খুলিয়া দেখ, দেখিবে—তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টি নিত্য জাগ্রত থাকিয়া শত অমঙ্গলের ভিতর হইতেও নিত্য মঙ্গলের উৎস খুলিয়া দিতেছে। প্রত্যক্ষ কর—পরস্পরের মধ্যে বিরোধবিবাদ ও বিচ্ছেদের ভিতরেই তিনি ঐক্যের বীজ নবতরভাবে রোপণ করিতেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া তাঁহারই চরণতলে সবলে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই আমাদের পিতা, তিনিই আমাদের মাতা—ঐ যে এক-একটী আঘাত পাই এবং যতই গুরুতর আঘাত পাই, ততই তো দীন দুঃখী সন্তান আমরা তাঁহার চরণ-তলে বেগে ছুটিয়া যাই এবং ততই তো তাঁহার চরণ অভয়শরণ বলিয়া জোরে আঁকড়াইয়া ধরি।

বটে; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যেন থাকে, যাহাতে আমাদের ঐ প্রকার আঘাতের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে না হয়; নিজেদের অন্যায় আচরণের ফলে, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের ফলে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি সম্মুখে ডাকিয়া আনিও না, সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে প্রীতিযোগে যুক্ত থাকিবে; তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে তোমার ইচ্ছা নিত্যযুক্ত রাখিবে। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তিনি মঙ্গলবিধাতা মূর্ত্তিতে আমাদের বন্ধুরূপে নিত্যই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের বন্ধু—তিনি আমাদের বন্ধু। তোমরা আপনাদিগকে তাঁহার অনুচর করিয়া তোল; সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবে—তিনি কখন্ কোন্ উপদেশ দেন; তিনি অন্তরে যে উপদেশ দিবেন, তাহাই শুনিয়া চল, তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন কখনই অমঙ্গল হইতে পারিবে না। তাঁহার অভয়বাণী গগন ভেদ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে নিনাদিত হইতেছে—

* গত ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত।

নির্ভয় হও—নির্ভয় হও—নির্ভয় হও। তাঁহাকে সহায় জানিয়া নিশ্চিন্ত হও—ভয়ভাবনা বিদূরিত হৌক। প্রাণের মাঝে তাঁহার বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠুক—ভাল করিয়া বাজিয়া উঠুক।

ভগবান আমাদের শুধু বন্ধু নন। তিনি আমাদের জননী—তাঁহার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতম যোগ—তিনি আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, আমরাও তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে এই সত্যটী প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি কর—তাঁহাকে জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ বলিয়া উপলব্ধি কর। মনে রাখো যে, তাঁহারই তো দান হিসাবে তুমি তোমার দেহ মন ও আত্মা সকলই লাভ করিয়াছ। তিনি আমাদিগকে মৃত্যুমুখে পাঠাইবার জন্য এই সমস্ত দিয়া সংসারে পাঠান নাই। জীবন যতই পাই, ততই জীবনলাভের জন্য আরও আকুল হই। আজ এই নূতন বৎসরের প্রথম দিবসে পুরাতন বৎসরের অতীত কথা, ভুলভ্রান্তির কথা দূরে ফেলিয়া জীবনলাভের পথে অগ্রসর হও—ভগবানকে পিতামাতা জানিয়া তাঁহারই আদেশ শুনিয়া চল—সুখদুঃখ, সম্পদবিপদ যাহা কিছু পাইবে, তাহারই মধ্যে ভগবানের হাত খুঁজিয়া বাহির কর—দেখিবে নববর্ষে নববলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে; দুঃখশোক তোমাকে আঘাত দিবার অবসর পাইবে না—হৃদয়ে এক নবতর আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইবে, ভয়-ভাবনা অন্তর্হিত হইবে।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮০ অঞ্জলি—কর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। হে বিধাতা পুরুষ! তুমি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছ। তোমার যশ দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছে। তুমিই সংসারে কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তুমিই রক্ষকদিগের রক্ষক। তোমারই মঙ্গলবার্ত্তা ইহলোক ও পরলোককে একসূত্রে বন্ধন করিতেছে। তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে নিরন্তর প্রকাশিত রাখ। পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাকে যেমন তাঁহাদের সখা ও সুহৃৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তোমাকে তেমনই ভাবে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের অন্তরে প্রেরণ কর।

২। দেবমনুষ্য যে যেখানে আছে, সকলে তোমারই শাসন নতমস্তকে বহন করিতেছে। আমাদের সকল কামনা, সকল পূজা তোমাতেই পরিসমাপ্ত হউক। তুমিই আমাদের একমাত্র সম্ভজনীয়। তুমিই এই জগতের পালক ও রক্ষক। পাপ করিলে তুমিই তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর এবং পুণ্য করিলে তুমিই তাহার যথাযুক্ত পুরস্কার বিধান কর। প্রভাতের অরুণোদয়ে আমরা প্রতিদিন তোমাকেই জাগ্রত দেখিয়া মুগ্ধ হই।

৩। আমরা কিপ্রকারে তোমার স্তবস্তুতি করিব জানি না। তুমি আমাদের অন্তরে তোমার মধুময় নাম জাগাইয়া তোল; তোমার নামে আমরা যে কোন গান সংরচিত করিব, সকলই যেন মধুময় হয়। আমরা তোমারই নাম লইয়া যেন সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি এবং সেই সকল কর্ম্ম যেন সুসম্পন্ন হয়। ধর্ম্মের জন্য, তোমার মহিমা ঘোষণার জন্য আমাদিগকে যদি ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহাতেও যেন পশ্চাৎপদ না হই। সেই সকল ধর্ম্মযুদ্ধে তোমারই অজেয় পতাকা যেন আমাদিগকে বিজয়ী করিয়া ফিরাইয়া আনে।

৪। অগ্নি যেমন বায়ুর বিশুদ্ধি সাধন করে এবং আমাদের সুখসম্পাদনে সহায়তা করে, সেইরূপ তোমার জ্ঞানজ্যোতি আমাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়া তোমার সহিত অচ্ছেদ্য যোগসাধনের সহায়তা করুক। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি ওতপ্রোত হইয়া আছ। তুমিই কেবল বরণীয়। তুমি আমাদিগকে নিত্যই তোমার চরণাভিমুখে আহ্বান করিতেছ। আমাদের সকল অনুষ্ঠানে যেন তোমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের শত্রুগণ তোমার মঙ্গল ভাব বুঝিতে না পারিয়া মোহবিমূঢ় হইয়া থাকে; এবং আমরা তোমার অনুগত বলিয়া তাহারা আমাদেরও অনিষ্ট সাধনে নিরন্তর চেষ্টিত থাকে। তুমি তাহাদিগকে পরাজয় প্রদান কর এবং তোমারই পথে তাহা-

দিগকে ফিরাইয়া আন। তুমিই আমাদের গৃহ-দেবতা। তুমি আমাদের প্রত্যেককে তোমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান কর। তুমি আমাদের গৃহকে ধন-ধান্যে নিয়ত পরিপূর্ণ রাখ, যাহাতে আমাদের গৃহ তোমার নামে প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানসমূহের আনন্দধ্বনিতে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে।

৫। হে মহান পুরুষ! আমাদের দেশকে গো অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রদান করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর, তুমিই ধনদাতা, তুমিই সকল ঐশ্বর্য্যের মূল আকর। তুমিই আমাদের দৈন্যদুঃখ দূর করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা তোমার শরণাগত। তুমিই আমাদের যোগক্ষেম বহন কর। আমরা শতকণ্ঠে তোমার যে স্তুতিগান করিব, সেই গান গগন ভেদ করিয়া তোমারই সিংহাসনতলে সমুত্থিত হইবে।

৮৪ অঞ্জলি—সর্ব্বাধীশ্বর দেবতা।

১। হে ঈশ্বর! তোমার বল অপ্রতিহত। তোমার বাহু যখন তুমি বিস্তৃত কর, কেহই তাহা প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না। তুমি মন অপেক্ষাও বেগবান। তুমি মহান। তোমার স্নেহ প্রেম দয়া বর্ণনা করিতে গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়। তোমার গতি সর্ব্বত্র। তুমি সকল স্থান সমানভাবে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তুমিই আমাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল প্রদান করিতেছ। তোমার প্রসাদে আমরা যাহা কিছু সুখসম্পদ লাভ করিয়াছি, তাহা তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছি। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

২। আমাদের যাহা কিছু আছে, তোমাকে সমস্তই নিবেদন করিয়া দিতেছি। আমাদের নিজস্ব বলিয়া আমরা কিছুই রাখিব না। তোমার বলে আমাদিগকে বলীয়ান কর এবং আমাদের শত্রুদিগকে অপসারিত কর। আমরা তোমার জয়গান করি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রকার সত্য জ্ঞানগর্ভ স্তুতি দ্বারা সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমরাও তোমাকে হৃদয়স্বামী জানিয়া সরল স্তুতিগানে তোমার পূজা করিতেছি।

৩। তুমি অপ্রতিম। তোমার উপমা একমাত্র তুমিই। তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়। তুমিই আমাদিগকে যথাযুক্ত সুখসম্পদ বিধান করিতেছ। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি মহদ্‌যশ। তোমার যশ কীর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল স্তুতিগীত সমুত্থিত হইতেছে, তাহাই আজ আমরা জগদ্বাসীর সম্মুখে প্রকাশ করিতেছি।

৪। সারথি যেরূপ রথস্বামীর নিকট রথ উপনীত করে, আমিও সেইরূপ তোমার চরণতলে আমাদের স্তুতিগীতসকল উপনীত করিতেছি। তুমিই ইন্দ্র, সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তুমিই আমাদের মনের নিয়ন্তা। আমরা তোমাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করি।

৫। হে ভগবান! আমার দৈন্য বিদূরিত কর। আমার গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়া নিত্য উৎসবের আনন্দে মুখরিত কর। তুমিই সকল দাতার পরম দাতা। তুমিই সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর। আমরা তোমাকে বন্দনা করি।

৬। তুমিই বিশ্বকর্ম্মা। সকল কর্ম্মের তুমিই একমাত্র প্রবর্ত্তক। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমিই রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হও। আবার গৃহের অনুষ্ঠানাদি কর্ম্মে তুমিই প্রসন্নমূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ হও। আমরা তোমার সন্তান। আমাদের শত্রুরা ঐশ্বর্য্যবান, বলবান ও পরাক্রান্ত। তাহারা আমাদিগকে শতবিধ অস্ত্রের প্রহারে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। তুমি তাহাদের শত্রুতা পরাহত করিয়া দাও এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

৭। তুমিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা। তুমি আমাদের অন্তরে যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছ, তাহারই প্রেরণায় আমরা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রতিদিন তিন সুবৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। তোমারই নামে আমরা সেই তিনটী কর্ম্মযজ্ঞ প্রতিদিনই নিবেদন করি। তুমিই একমাত্র সমস্ত বিশ্বজগতকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তুমিই সমগ্র জগতের একমাত্র অধীশ্বর। তোমার প্রতি অশ্রদ্ধাবান লোকেরা যখন অতিমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুদিগকে যখন

সর্ব্বদাই পরাভূত করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে তুমি তোমার বজ্রদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পরাভব প্রদান কর। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি ঘোর সংশয়ালোড়িত অন্তরে আতঙ্ক আনয়ন করে।

৮। হে ঈশ্বর! শত্রুরা সর্পের ন্যায় অগ্রসর হইয়া তাহাদের শতবিধ পাশে আমাদিগকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু। তুমি সেই সকল নাগপাশ শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে পাশমুক্ত কর। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই তোমার নিত্য স্তুতিগান করিবে। তোমার প্রভাব এই দ্যুলোক ও ভূলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া এবং ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে, কিন্তু ইহারা তোমার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না।

৯। সমস্ত দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ তোমার মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় মহিমায় বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার তেজে অগণিত সূর্য্য তেজোময় আকারে প্রকাশ পাইতেছে। তোমার শক্তি অপ্রতিহত। আমরা আমাদের শত্রুদিগের প্রতাপে জর্জ্জরিত হইতেছি। শত্রুরা আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার নানাবিধ কলকৌশল অবগত আছে। তুমি তোমার অপ্রতিহত শক্তি দ্বারা সেই সকল কলকৌশল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দাও এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। শত্রুগণের পীড়নে আমরা বড়ই পীড়িত হইতেছি। আমরা বড়ই দুর্ব্বল। আমরা তাহাদের পীড়ন সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি তোমার বজ্রদণ্ড প্রেরণ করিয়া সেই পীড়নকে প্রতিহত কর। তোমার করুণাধারা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া রাখ এবং আমাদের মঙ্গলবিধান কর। হে প্রভু! হে নাথ! আমাদিগকে প্রভূত অন্ন জল দিয়া আমাদের দৈন্যদুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত কর।

১১। তোমার ক্ষমতা অসীম। তোমারই শাসনে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে নদীসকল প্রবাহিত হইয়া ধরণীকে শস্যশ্যামল করিতেছে। তুমিই একমাত্র সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, আমরা তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে যথাযোগ্য ধনসম্পদ প্রদান করিয়া জগতের মহাসভায় নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার দাও।

১২। তোমার কার্য্য তোমার এক-এক ইঙ্গিতে তড়িতবেগে সম্পন্ন হয়। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা। তোমার জ্ঞান-বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। তুমি আমাদের নির্ম্মম শত্রুদিগকে তোমার বজ্রদণ্ডে শাসন কর। তোমার বজ্রদণ্ডে তাহাদের পাপ গ্রন্থিসকল শতখণ্ডে কর্ত্তন কর; জগতে শান্তি সংস্থাপিত হৌক। আমরা যেন সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারি।

১২। হে পরম দেবতা! তোমাকে আমরা আমাদের মধ্যে আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। সৃষ্টির আদি অবধি আজ পর্য্যন্ত তুমি যে প্রকারে জগতকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃত্ত হয়। সংশয়বাদীগণ তোমার করুণা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তোমার বিরোধী হইয়া উঠে ও বিপথে চলে। তখন তোমার রুদ্রমূর্ত্তি তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। তাহারা তোমার সেই অগ্নিময় তেজে অভিভূত হইয়া আবার তোমার পথে ফিরিয়া আসে।

১৪। তোমার শাসনে ধ্রুবনক্ষত্র ভূলোকবাসীকে দিক্‌নির্ণয়ে সহায়তা করিতেছে। তোমার শাসনে পর্ব্বতসকল মস্তক উত্তোলন করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং নদীসকলের জলদান করিয়া জীবনের রক্ষাবিধান করিতেছে। তোমার শাসনে সময়ে সময়ে ভূমিকম্প সঞ্জাত হইয়া পৃথিবীকে নবতর গঠন প্রদান করিতেছে। তোমার শাসনে জগতের উন্নতি ও মঙ্গল বিধান হইতেছে জানিয়া আমরা নির্ভয় হইয়া আছি।

১৫। তুমি আমাদের বন্ধু। তুমি আমাদের শত্রুদিগেরও বন্ধু। তুমি সকলেরই হৃদয় হইতে অধর্ম্ম বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মকে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত করিতেছ। এমন কেহই নাই, যে তোমার সেই মঙ্গলবিধান প্রতিহত করিতে পারে। তুমিই সকল ঐশ্বর্য্যের ও সকল সুখসম্পদের মূল ও অধীশ্বর। আমাদিগকে তুমি তোমার মহিমা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার অধিকার ও শক্তি প্রদান কর। বিপদ

আমাদিগকে যতবার ঘিরিয়া ছিল, ততবারই তুমি তোমার স্নেহপ্রেমে ঘিরিয়া সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ।

১৬। হে অন্তর্যামী ভগবান! তুমিই আমাদের সকল অবস্থায় কর্ণধার। তুমিই আমাদের গুরুরূপে অন্তরে অবস্থিতি কর এবং প্রতিপদে আমাদিগকে শ্রেয়ের পথ দেখাও। তুমি আমাদের অন্তরে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমার স্তবগান করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতে পারি। তুমি আমাদের পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং আমাদের সর্ব্ববিধ দৈন্যদারিদ্র্য দূর কর। তোমার প্রতি আমাদের প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখ এবং তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনের ক্ষমতা ও শক্তি প্রদান কর। আমাদের বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে তোমার চরণস্পর্শ-লাভে অধিকার প্রদান করুক।

কে ও কি? *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

যে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি, এবং যে সত্যধর্ম্মের কল্যাণে আমরা সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের অধিকার লাভ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র—সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এই মূলমন্ত্র অবলম্বনে সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইলে স্বভাবতই আমাদের সমস্ত ব্যবহার মৈত্রী দ্বারা নিয়মিত হইবে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ অন্তর্হিত হইবে।

সত্যধর্ম্মের বক্তব্য।

এই মূলমন্ত্র আলোচনা করিলে স্বতই প্রকাশ পাইবে যে, সত্যধর্ম্মে মহাপুরুষ মানিতেও বাধা নাই বা গুরু স্বীকারেও বাধা নাই। যাহা দ্বারা মানব ভগবানের চরণতলে সহজে পৌঁছিতে পারিবে, এমন কোন পথ অবলম্বনেই সত্যধর্ম্ম বাধা দিবে না। সত্যধর্ম্মের বক্তব্য এই যে, মহাপুরুষ বল, প্রেরিত পুরুষ বল, গুরু বল বা দেবতা বল, কাহাকেও ভগবানের আসনে বসাইয়া সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করিও না, বিরোধ-বিবাদের মূলপত্তন করিও না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিও না; বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি কোন পদার্থ অথবা কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে—এক কথায়, প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুকেই প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরের আসন প্রদান করিও না।

অভয়বাণী।

এই সত্যধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক সংসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান প্রতি মানবের অন্তরে সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি যে, আজ হৌক বা কাল হৌক, দুইদিন বাদে হৌক বা দশদিন বাদে হৌক, একদিন না একদিন এই সত্যধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিবেই। আমাদের নিরাশার কোনই অবসর নাই। যে বিশ্বাধিপতির শাসনে এই অসীম আকাশে ব্রহ্মচক্র সুনিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে, তিনিই অধর্ম্মের বিনাশসাধনপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য এই জগতসংসারে তাঁহার সত্যধর্ম্মের আগ্নচক্র ঘুরাইয়া দিয়াছেন। নিরাশা নিরানন্দের কথা দূরে থাক, আমাদের হৃদয় আশার সমুজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া উঠিতেছে। ভগবান দক্ষিণ-হস্তে আমাদের সম্মুখে তাঁহার বরাভয় ধারণ করিয়া ক্রমাগত বজ্রনির্ঘোষে অভয়বাণী শুনাইতেছেন—নির্ভয় হও—নির্ভয় হও।

নাস্তিকতা কোথায়?

প্রকৃতই, চারিদিক হইতেই এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের বিজয়লাভের লক্ষণসকল আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞান প্রকৃতিরাজ্যের বিভাগের পর বিভাগ স্বীয় করায়ত্ত করিতেছিল এবং নাস্তিকতাকে নিজের চিরসহচররূপে ঘোষণা করিয়া সদম্ভে ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের সে দম্ভ কোথায়? সেই নাস্তিকতা কোথায় কোন্ পথে যে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহই তাহা জানিতেও

* গত ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার সায়ং উপাসনায় আদিব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে বিবৃত।

পারিল না। এখন আর বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে তাহার সহচররূপে ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহে; প্রত্যুত, তাহার বিপরীতে, বিজ্ঞান এখন সত্যধর্ম্মের সহিত প্রীতির একটা যোগসূত্র খুঁজিয়া লইয়া বন্ধুত্বস্থাপনে সমুদ্যত।

সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা।

আবার, বিগত শতাব্দীর শেষভাগে সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা সত্যধর্ম্মের উপর মিথ্যার একটা সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য আবরণ নিক্ষেপ করিয়া দেশবিদেশকে মোহান্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল এবং তাহার সহচর গুরুবাদ প্রভৃতি শতবিধ সাম্প্রদায়িক মতবাদকে ধর্ম্মের আসনে বসাইতে উদ্যত হইয়াছিল। সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতার প্রথম আবির্ভাবের সময়ে যখন লোকেরা তাহাকেই ধর্ম্ম ভাবিয়া দলে দলে তাহার আশ্রয়গ্রহণে ছুটিয়াছিল, তখন তাহা কত না গর্ব্বের সহিত মস্তক উত্তোলন করিয়া সংসারে বিচরণ করিত। কিন্তু আজ তাহারই বা সে প্রভাব কোথায়? সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে বলিতে না পারিলেও, ইহা বলিতে কোনই বাধা নাই যে, তাহার পূর্ব্ব গর্ব্ব বর্ত্তমানে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত জ্ঞানহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই বুঝিয়াছে যে সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা সত্যধর্ম্মের আসন অধিকার করিতে পারে না।

সরল ও সবল ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

এখন জনসাধারণের অন্তরে এমন একটা সরল ও সবল ধর্ম্ম লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, যে ধর্ম্ম প্রত্যেক মানবকে সেই অভয়দাতা ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। সাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম্ম বা মতবাদ জনসাধারণের প্রাণে স্থায়ী শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছে না। তাই না আজ খৃষ্টীয় সমাজের প্রার্থনাপুস্তককে নূতন ভাবে অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর সংগঠিত করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। যে সত্যধর্ম্মের কেন্দ্র হইলেন ভগবান এবং যাহার প্রাণপ্রদ মন্ত্র হইল, ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, সেই সত্যধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্ম যে ঐ সরল ও সবল ধর্ম্মের জন্য জনসাধারণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে পারে, তাহা আমরা জানি না।

সত্যধর্ম্মই মিলনের ভিত্তিভূমি।

সত্যধর্ম্ম কেবল যে তাহাদের প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে পারে, তাহা নহে। আমরা ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্যতীত জগতে এমন কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নাই, যাহার আশ্রয়ে দেশ কাল অবস্থা এবং জাতি ও ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকল মানব একত্র মিলিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে শতবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর এক কোণ হইতে অপর কোণ ক্রমাগত পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে। তাই অন্যোন্যসাহচর্য্য ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে গত্যন্তর নাই; তাই মৈত্রীই বর্ত্তমান যুগের বিশেষভাবে যুগধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগধর্ম্মের স্বাভাবিক কার্য্যকারিতার ফলেই জনসাধারণ এমন এক সরল ও সবল ধর্ম্মের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, যে ধর্ম্ম ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল মানবকে মিলনের পথে, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিবারও পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। জনসাধারণ যে সরল ও সবল ধর্ম্ম, যে মিলনের ধর্ম্ম চাহিতেছে, আমরা সেই সত্যধর্ম্ম তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এই সত্যধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শমাত্র নাই। মৈত্রীই হইল এই সত্যধর্ম্মের প্রাণ।

জানিতে হইবে—ভগবান কে ও কি?

ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই হইল সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র। প্রীতি করিতে হইবে বলিলেই তো প্রীতি করা যায় না। যাহাকেই প্রীতি করিব, তাহার বিষয় কিছু না কিছু জানিতেই হইবে। প্রীতির পাত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলে তাহাতে প্রীতিস্থাপন যে নিতান্তই অসম্ভব, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। তাই ইহা খুব জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ভগবানকে প্রীতি করিতে গেলে এবং প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বিষয় জানিতে হইবে—জানিতে হইবে, ভগবান কে, তাঁহার স্বরূপই বা কি।

তাঁহাকে নিঃশেষে জানা সম্ভব নয়।

ভগবানকে প্রীতি করিবার জন্য তাঁহাকে জানিতে হইবে। তাঁহার স্বরূপ কি জানিতে হইবে বলিয়া এমন কোন কথা নাই যে, তাঁহার স্বরূপ নিঃশেষে না জানিলে তাঁহাকে প্রীতি করা যাইবে না। তাঁহার স্বরূপ যদি আমরা নিঃশেষে জানিতে পারিতাম, তবে তো আমরাই এক এক-জন ভগবান হইতাম—তাহা হইলে তো সৃষ্টির অস্তিত্বই থাকিত না। তাঁহার স্বরূপ পরিমিত মানবের পক্ষে জানাও অসম্ভব, বলাও অসম্ভব। সেই আদিকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার স্বরূপ নিঃশেষে বর্ণন করিতে সক্ষম হয় নাই; কেহই তাঁহার স্বরূপের অন্ত পায় নাই। ঋষিরা তাই এই একটী গভীর সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, বাক্য তাঁহাকে বর্ণন করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই সত্য কথার প্রতিধ্বনিতে আমাদেরও অন্তরে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—অন্ত কোথা তাঁর—অন্ত কোথা তাঁর? কোটী কোটী গ্রহনক্ষত্র, অযুতকোটী রবিশশী-সমন্বিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার এক ইঙ্গিতে মহাশূন্যে সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে, প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির অতীত সেই ভগবানকে নিঃশেষে জানিয়াছে, কোনও মানবই এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। একটী বালুকণারও সমস্ত তত্ত্ব নিঃশেষে যে মানব উদ্ঘাটিত করিতে পারে না, সে মানব, দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরীক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে যে নিঃশেষে জানিবে, এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।

তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।

নিঃশেষে তাঁহার স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না বলিয়া, তাঁহার বিষয়ে কিছুই যে জানা যায় না, তাহা নহে। ঐ যে আমাদের অন্তরে প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—অন্ত কোথা তাঁর,—এবং আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে ব্যাকুল পিপাসায় আলোড়িত করিয়া তোলে—ঐ প্রশ্নই তো আমাদিগকে তাঁহার চরণতলে উপস্থিত করে। ঐ প্রশ্ন ধরিয়া তাঁহার সন্ধানে চলিতে চলিতেই তো দেখি যে, ভগবান এই প্রকৃতিতেই তাঁহার সুন্দর ছাপ রাখিয়া দিয়াছেন; এই প্রকৃতি হইতেই আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কত না বিষয় জানিতে পারি।

প্রকৃতিতে তাঁহার ইচ্ছার পরিচয়।

সর্ব্বপ্রথমেই প্রকৃতির চতুর্দ্দিকে এক বিরাট ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে প্রকৃতিতে কতশত ভাঙ্গা গড়া নিত্যই চলিতেছে—একদিকে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ও ভীষণ ভূমিকম্পে কত গ্রামপল্লী কত জনসঙ্ঘ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত ও অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, অপরদিকে কত দ্বীপ মহাদ্বীপ সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া শত-সহস্র নরনারীর আনন্দের কলকলধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে—এ সমস্ত আপনাআপনি সংঘটিত হইতে পারে না; এই সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে এক মহান পুরুষের বিরাট ইচ্ছা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এই যে প্রতিদিন যথানিয়মে বিভাবসু সমুদিত হইয়া আবার অস্তাচলে নামিয়া পড়ে; এই যে চন্দ্রতারকা যথানিয়মে সমুদিত হইয়া অন্ধকার আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে—এ সমস্তই কি আপনাআপনি হইতেছে? কখনই নয়। তোমার নিজের প্রকৃতি, তোমার নিজের কার্য্য-ধারাই যে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আলোচনা করিয়া দেখ—দেখিবে, প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনার অন্তরালে সেই মহান পুরুষের, ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছাশক্তি অবিশ্রাম কার্য্য করিতেছে।

অন্তরে তাঁহার ইচ্ছার পরিচয়।

কেবল কি বহিঃপ্রকৃতিতে তাঁহার ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়? তাহা নহে। বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তঃপ্রকৃতিতেও, প্রতিমানবের অন্তরেও যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে, যে ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে, উন্নতি-অবনতির যে খেলা নিত্য সংঘটিত হইতেছে; বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির যে যোগাযোগ চলিতেছে; সুবিমল প্রভাতে অরুণ তপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অন্তরে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; সন্ধ্যায় অস্তমিত তপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে ফিরিয়া মানবের হৃদয়ে নীরব শান্তিলাভের যে ব্যাকুল পিপাসা জাগিয়া উঠে, এই সমস্তের মধ্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

এক মহান ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে। এই ইচ্ছা তোমার আমার ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না; এই ইচ্ছা তোমার আমার ইচ্ছার নিয়ন্তা প্রভুরূপে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করিতেছে।

তাঁর ইচ্ছাতে নিয়মের ভাব।

প্রকৃতির মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত যে ইচ্ছার পরিচয় পাই, সে ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা নয়, সে ইচ্ছার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা সুনিয়ম বিকশিত দেখি। এই সুনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত জ্ঞানের যোগ অবিচ্ছিন্ন। এই ইচ্ছার প্রতি বিকাশে জ্ঞানের এক আশ্চর্য্য জ্যোতি নিত্য উদ্ভাসিত দেখা যায়—সমস্তের ভিতর হইতে এক মহান উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ইহা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়। একটী জীবজন্তু কীটপতঙ্গও বিনা উদ্দেশ্যে কোনও কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না, বিনা উদ্দেশ্যে একটী পদও সম্মুখে নিক্ষেপ করে না। তখন, যে ইচ্ছার কার্য্যফলে পৃথিবী ওলটপালট হইয়া যায়, যে ইচ্ছার বলে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনাসকল মুহূর্ত্তমাত্রেরও অব্যতিক্রমে সংঘটিত হইতেছে, সে ইচ্ছা যে বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছে, সে ইচ্ছার যে কোন লক্ষ্য নাই, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া মনেই করা যাইতে পারে না—নিজের অন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রকৃতিই তোমাকে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিবে। নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও জ্ঞান, এ সমস্তই এক অবিচ্ছিন্ন যোগে পরস্পর-সম্বদ্ধ। কিন্তু যে ইচ্ছার বলে, যে উদ্দেশ্য লইয়া, যে জ্ঞানের ক্রিয়াফলে এই ব্রহ্মচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রকৃতির অতীত ভগবান ব্যতীত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বৃক্ষলতা জীবজন্তু প্রভৃতি পরিমিত বস্তু পক্ষে সম্ভবপর নয়।

মঙ্গলভাবের পরিচয়।

আলোচনা করিলে এই উদ্দেশ্যের ভিতর একটা স্থায়ী মঙ্গলভাবের অস্তিত্ব দেখা যায়। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে, সাগরে মেঘে কোলাকুলি হইলে যেমন জলস্তম্ভ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভগবানের জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্গে বিশ্বজগতের কোলাকুলির ফলে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি অণুপরমাণু হইতে এক-একটী মঙ্গলস্তম্ভ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার প্রেম প্রতি মুহূর্ত্তে নীরবে নামিয়া আসিয়া বিশ্বজগতের প্রত্যেক অংশকে আলিঙ্গন করিতেছে।

ইনি কে?

এই ইচ্ছাময় জ্ঞানময় প্রেমময় ভগবানকে উপলব্ধি করিতে গিয়া বাক্য তো দূরে কথা, যে মন শতকোটী দূরবর্ত্তী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র-সমূহের কত তত্ত্ব অকুতোভয়ে আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হয়, সেই মনও হাঁপাইয়া উঠে। তখন, আঘাত পাইলে কূর্ম্ম যেমন নিজের অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া লয়, সেইরূপ অন্তর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এবং নীরবে আপনাকে প্রশ্ন করিতে থাকে—যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া বারম্বার ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছি, ইনি কে?

ফলপাতা ঝরে সব কাহার বা ইচ্ছায়?
মনপ্রাণ কর্ম্মে লাগে কাহার বা ইচ্ছায়?
কত কথা কহি মোরা কাহার বা কে তাহা?
চক্ষু-কর্ণে স্ববিষয়ে লাগায় বা কে আহা?

মন যখন আকুলপ্রাণে এই প্রশ্ন করে, তখন তাহার উত্তরে সে এই সাড়া পায়—

ইনি ইহা নন, উহা নন।

নেদং যদিদমুপাসতে নেদং যদিদমুপাসতে—না—না—তুমি যে জড়পদার্থকে যে জীবজন্তুকে, যে প্রাকৃতিক শক্তিকে এই সকল কার্য্যের কারণ ভাবিয়া পূজা করিতে উদ্যত হইয়াছ—না—না ইহাদের কেহই তিনি নন।

ইনি রসস্বরূপ।

মন এই প্রকার 'তন্ন' ভাবে সন্তুষ্ট না হইয়া গভীর হইতে গভীরে প্রবেশ করিল। আলোচনার পর সহসা তাহার জ্ঞানদ্বার খুলিয়া গেল; মন তখন আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—পাইয়াছি—পাইয়াছি—যাঁহার ইচ্ছায় এই ফলপাতা ঝরিতেছে, মনপ্রাণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে; যাঁহার ইচ্ছায় আমাদের বাক্য বিনির্গত হইতেছে এবং যিনি চক্ষুকর্ণকে স্ববিষয়ে নিযুক্ত করিতেছেন, তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। তিনি রসস্বরূপ।

তিনি আনন্দঘন। তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া এই বিশ্বজগত ধারণ করিতেছেন—ধারণ না করিলে কেহই জীবিত থাকিত না, সমস্ত বিশ্বজগত মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত।

যে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীবসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন করে ও প্রবেশ করে, আজ নববর্ষের প্রথম দিনে সেই আনন্দের উৎস পরমাত্মাকে কোটী কোটী প্রণাম করি।

গান।

সিন্ধু—একতালা।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

শাশ্বত শিব সুন্দর তুমি শান্তিদ মধুময়
মম প্রাণ-মন যেন অনুখন চরণে শরণ লয়।
হেথা শত ভীতি শত ভ্রান্তি
প্রাণে এনে দেয় সদা শ্রান্তি
মুগ্ধ আমার অবশ পরাণ উদাসী বসিয়া রয়।
তোমার মোহন প্রেরণা
প্রাণে ভরে দেয় নব চেতনা
ডুবিয়া সে সুধা-সরসে, মম চিত্ত পাগল হয়।
আমি ভালবাসি তব মাধুরী
শুধু বুঝিনা তোমার চাতুরী
ক্ষণিক বিরহে দগ্ধ পরাণে জাগে শত ভয়॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

[গত আষাঢ়-সংখ্যার অনুবৃত্তি]

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

"সঙ্গীত-প্রকাশিকা"। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে 'বীণাবাদিনী' নাম্নী সঙ্গীতবিষয়িণী মাসিকপত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতসমাজের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগের সময়ে কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী বন্ধুর অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "সঙ্গীত-প্রকাশিকা" নাম্নী একটী বৃহদাকারের সঙ্গীতবিষয়িণী মাসিক-পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। সন ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরাধিপতি এই মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০৲ টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। বহুবৎসর এই মাসিক-পত্রিকাখানি সুযোগ্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। একদিন মাননীয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিতে দেন। যে সংস্কৃত নাটকের স্যার উইলিয়ম জোন্স-কৃত ইংরাজী অনুবাদের ফষ্টর-কৃত জার্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করিয়া জার্ম্মাণীর বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ও কবি গেটে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

"চাহ কি দেখিতে তুমি অভিনব বয়সের
ফুল, আর পরিণত বয়সের ফল,
আর সেই সব যাহে, চিত্ত হয় বিমোহিত,
উল্লসিত, ভোগতৃপ্ত, সম্ভোগ-বিহ্বল;
দেখিতে চাহগো যদি, একটি নামের মাঝে
স্বর্গ-মর্ত্ত সম্মিলিত দোঁহে একাধারে,
শকুন্তলে! তোর নাম করি আমি উচ্চারণ
তা হলেই সব বলা হয় একেবারে।"—

সেই নাটকের মূল পাঠ করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম অনুরাগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সময় হইতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি একে একে প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকগুলি অধ্যয়ন করেন এবং সাধারণকে তাঁহার আনন্দের অংশী করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাঁহার অনুদিত গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ মাত্র সম্ভব :—

অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশের তারিখ
অভিজ্ঞানশকুন্তলা	১৩০৬
উত্তর-চরিত	১৩০৭
রত্নাবলী	,,
মালতীমাধব	,,
মুদ্রারাক্ষস	,,
মৃচ্ছকটিক	১৩০৮
মালবিকাগ্নিমিত্র	,,
বিক্রমোর্ব্বশী	,,
মহাবীরচরিত	,,
চণ্ডকৌশিক	,,
বেণীসংহার	,,
প্রবোধচন্দ্রোদয়	,,
নাগানন্দ	১৩০৯

বিদ্ধশালভঞ্জিকা ১৩১০
ধনঞ্জয়বিজয় ,,
প্রিয়দর্শিকা ১৩১১
কর্পূরমঞ্জরী ,,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৮ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখের 'রঙ্গালয়' পত্রে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ;—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালার একজন কৃতকর্ম্মা লেখক ; বাঙ্গালীর সাহিত্য-পুষ্টির হিসাবেও তিনি কৃতকর্ম্মা, নাট্যকলার গৌরব-সাধন হিসাবেও তিনি কৃতকর্ম্মা। তাঁহার অশ্রুমতী, তাঁহার সরোজিনী নাটক, তাঁহার পুরুবিক্রম, তাঁহার অলীক বাবু বাঙালার কে না জানে, কে না দেখিয়াছে ? সাহিত্যক্ষেত্রের এ সকল কীর্ত্তি তাঁহার অক্ষয় থাকিবে আমরা জানি ; কিন্তু তিনি সম্প্রতি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যাহার উদ্‌যাপন তিনি শীঘ্র করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ,—অথচ তিনি ব্যতীত এ মহাব্রতের উদ্‌যাপন বাঙ্গালায় আর কেহ করিতে পারে না বলিয়া আমাদের এই বিশ্বাস—সেই কার্য্যই তাঁহার স্মৃতির, তাঁহার যোগ্যতার, তাঁহার মেধার, তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার কবিত্বের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে। সংস্কৃতভাষা বাঙালা ভাষার মাতৃস্বরূপিণী ; সংস্কৃত-নাট্যশাস্ত্র বাঙালার নাট্যরঙ্গের আধার-ভূমি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সকল নাটক-নাটিকা ও সম্পূর্ণ কাব্যের বাঙলায় ভাষান্তরিত করিতেছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলা হইতে বেণীসংহার পর্য্যন্ত প্রায় বারখানা সংস্কৃত নাটকের বাঙলা অনুবাদ তিনি করিয়াছেন। অতি বড় বিদ্বেষীও জ্যোতিবাবুর এই কয়খানি অনূদিত গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিবাবু কেবল প্রতিভাবলেই বলীয়ান নহেন, অসাধারণ পরিশ্রমসামর্থ্যে ও ঐশ্বর্য্যবান। কেরি-কৃত দান্তের অনুবাদ পড়িয়াছি, জাওয়েটের হোরেস পড়িয়াছি; বৈদেশিক কবির কাব্য-গাথা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া যে সকল পণ্ডিত যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের গুণপনার পরিচয় পাইয়াছি ; তাই সাহসভরে বলিতে পারি যে আমাদের জ্যোতিবাবু এ কার্য্যে এই সকল পাশ্চাত্য বুধগণের অপেক্ষা গুণপনায় কোন অংশে ন্যূন নহেন। আমাদের একথা অত্যুক্তি নহে, স্তুতি-বচনও নহে, যাঁহারা জ্যোতিবাবুর এই কয়খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কথা সমর্থন করিবেন।

"অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তরচরিত, মালতী-মাধব, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, চণ্ডকৌশিক—এই কয়খানি সংস্কৃত নাটক ও নাটিকা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। উহাদের যেমন সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ, সুন্দর বাঁধাই, তেমনি অনুবাদ-ভঙ্গীও অতি সুন্দর। সংস্কৃত ভাষার প্রসাদগুণ রক্ষা করিয়া কবির ভাব ও লিপিচাতুর্য্য রক্ষা করিয়া এমন ভাবে অনুবাদ করিতে আমরা অন্য কোন বাঙালীকে দেখি নাই। বাঙালী লেখকগণের দোষই এই যে, তাঁহারা মূল গ্রন্থের উপর নিজেদের ওস্তাদি ফলাইতে চেষ্টা করেন।

"জ্যোতিবাবু ওস্তাদ কবি, কিন্তু তাঁহার এমনই সংযম যে তিনি অনূদিত গ্রন্থসকলের কোন খানেই ওস্তাদি করেন নাই, ঠিক যেমনটি আছে, তেমনটিই বাঙ্গালায় দেখাইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এমনই ঐশ্বর্য্যশালিনী ; তাঁহার ছন্দ এমনই মধুর ও এতই কোমল যে, অনূদিত গ্রন্থসকল পাঠ করিলে মনে হয় না যে উহা অনুবাদ মাত্র। এ বড় কম গুণ নহে, এ বড় কম সামর্থ্যের পরিচয় নহে। এই সকল নাটক-নাটিকা ভাষান্তরিত করিয়া জ্যোতিবাবু যে বাঙ্গালা ভাষার কতটা পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝা যাইবে না। আগামিগণ জ্যোতিবাবুর নিকট চিরঋণী থাকিবেন। ইহাই জ্যোতিবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি। এই সকল পুস্তক লিখিয়া দুই মুষ্টি অন্ন করিয়া খাওয়ার ভাগ্য জ্যোতিবাবুর নাই। প্রথমতঃ তিনি ধনী-পুত্র, সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরন্যস্ত মহদ্বংশজাত, সুতরাং তাঁহার অর্থাভাব নাই, কেতাব বেচিয়া তাঁহাকে খাইতে হইবে না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার একাদশখানি গ্রন্থের যথোপযুক্ত আদর বাঙালী এখনও করিতে শিখে নাই—এখনও করিতে পারিবে না। বটবীজ বপন করিয়া বটের শ্যাম শীতল ছায়ার উপভোগ রোপণকারীর ভাগ্যে ঘটে না, তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া সুপক্ব তাল-ফলের আস্বাদ রোপণকারীর ভাগ্যে ঘটে না। জ্যোতিবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে ন্যগ্রোধ-শিশু স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার 'অক্ষয় বট' পল্লবযুক্ত বিশাল কাণ্ডসকল বিস্তীর্ণ করিয়া এখনই শীতল ছায়া প্রদান করিবে না। তাঁহার তাল-শিশু কাব্যরসে সুপক্ব তাল-ফল এখনই দান করিবে না। তবে তিনি ভাগ্যবান, তাঁহার অক্ষয় বট চিরকাল 'অক্ষয় বট' হইয়া থাকিবে, তাঁহার কাব্যের তালবৃক্ষ অনন্ত গগন ভেদ করিয়া উচ্চ শীর্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া চিরকাল লোকলোচনের গোচরীভূত থাকিবে।"

য়ুরোপীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ। ফরাসী লেখক

মলিয়র-বিরচিত প্রহসন অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'হঠাৎ নবাব' রচনা করেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইংরাজী ও ফরাসী নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে এই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ইংরাজী হইতে অনূদিত

জুলিয়াস সিজার ১৩১৪
এপিক্‌টেটসের উপদেশ ,,
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা ,,

ফরাশী হইতে অনূদিত

হঠাৎ নবাব (মোলিয়র-কৃত 'ল-বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' হইতে) ১২৯১
দায়ে পড়ে দারগ্রহ (মোলিয়র-কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে) ১৩০৯
ভারতবর্ষে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ১৩১০
ফরাসীপ্রসূন (গল্প ও কবিতা-সংগ্রহ) ১৩১১
শোণিতসোপান (উপন্যাস) ১৩২৭
ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ
সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (ভিক্টর কুঁজ্যা প্রণীত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)
অবতার (থিয়োফিল গতিয়ে হইতে) ১৩২৯
মিলিতোনা (ঐ) ১৩৩০

এতদ্ব্যতীত বহু ফরাসী গল্প ও কবিতার অনুবাদ বহু মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেহ-ত্যাগের পরেও তাঁহার এইরূপ অনেক গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল অনুবাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এস্থলে সম্ভব নহে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী-দিগের বিখ্যাত রাষ্ট্রসঙ্গীত "লা মার্সাইয়েজে"র মূল সুরের অনুগত বঙ্গানুবাদ ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বঙ্গানুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

আয়রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রী-পুত্রসংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ-সংগঠন;
চলো—চলো—মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক্‌ সিঞ্চন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য যে মৌলিক জাতীয় সঙ্গীত কিছুকাল পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন, স্বদেশ-প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে ও উদ্দীপনায় উহা উপরি-ধৃত বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতের নিকট নিষ্প্রভ দেখাইবে না,—

শঙ্করী-কাওয়ালী

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে, সাধরে সাধ সবে দেশেরি কল্যাণ,
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগো সবে বল মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আন্‌তে নব নব জ্ঞান,
নবভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান॥
লোক-রঞ্জন লোক গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল উড়াইয়ে একতা-নিশান।

নিয়ম ও সময়ে কর্ম্মশীলতা।

(জনৈক শিক্ষক)

ভারত-সমুদ্রে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি ওয়ারেন হেষ্টিংস নামক একটী জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল। রাত্রি ২টা বাজিয়া ২০ মিনিটের সময় জাহাজটা চড়ায় ঠেকিয়াছিল। জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯৫ জন লোক ছিল—কর্ম্মচারী, খালাসি, সৈন্য, স্ত্রীলোক ও বালক। হুকুম দেওয়া হইল—"প্রত্যেক ব্যক্তি জাহাজের ছাদে যাও"; সৈন্যগণ যেমন কুচকাওয়াজের সময় হুকুম মানিয়া চলে, এসময়েও সেইরূপ হুকুম মানিয়া কার্য্য করিল। তাহার পর খালাসিরা জাহাজের অগ্রভাগ হইতে দড়ির সিঁড়ি নামাইয়া দিল। পুরুষদিগকে সিঁড়ি ধরিয়া প্রথমে নামিয়া কোনপ্রকারে ঢেউ ভেদ করিয়া ডেঙ্গায় বা উপকূলে উঠিতে বলা হইল, যাহাতে তাহারা স্ত্রীলোক ও বালক এবং রোগী ও অসুস্থদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। ৪টা বাজিয়া কুড়ি মিনিটের সময় দেখা গেল, জাহাজ আর কিছুতেই রক্ষা পায় না; কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালকেরা নামিয়া গিয়াছে দেখিয়া পুরুষেরা ছাতের উপর যে যাহার স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ৫টা বাজিতে যখন পাঁচ মিনিট বাকী, তখন জাহাজ এত বেশী একপেশে হইয়া

চলিয়া পড়িল যে, যাহারা সাঁতার জানে তাহাদের সকলকে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বলা হইল। তথাপি বাকী মানুষদের মধ্যে কোনও রকম হুজুগে ভয় হয় নাই; যাহারা বাকী পড়িয়াছিল, তাহারা নিয়ম রক্ষা করিল, এবং তাহার ফলে, দুইজন ব্যতীত আর সকলেই নিরাপদে উপকূলে পৌঁছিল। এই এতগুলি মানুষ নিয়ম রক্ষা করিতে শিখিয়াছিল এবং তাহারই অভ্যাসগুণে প্রাণ লাভ করিয়াছিল।

নিয়মের গুণে স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য ও সুখ সকলই পাওয়া যায়। অনেক সময়ে নিয়ম রক্ষা করা বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হয়; কিন্তু জানা উচিত যে নিয়মের খুব মূল্য আছে। আমরা যদি আমাদের নাড়ীর গতি পরীক্ষা করি তো দেখিব যে, ভগবান নাড়ীর গতি বড়ই নিয়মিত করিয়া দিয়াছেন। যদি দেখা যায় যে, ঠিক নিয়মিতভাবে নাড়ী চলিতেছে না, তবেই বুঝিতে হইবে শরীরের কোন কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। দেহের কোন কিছু খারাপ দেখিলেই আমরা বলি যে, দেহটা "বে-নিয়মী" হইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ মনে কর, "পাণিপথের যুদ্ধ" একটী কথা আছে। সোজা ভাবে যথানিয়মে অক্ষরগুলি লিখিলে ঐ শব্দটী পাওয়া যায়; কিন্তু যদি বে-নিয়মে অক্ষরগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লেখা যায়—"যু র দ্ধ প পা থে ণি" তাহা হইলে উহার অর্থ বোধগম্য হইবার অভাবে উহা দ্বারা জ্ঞানলাভ হওয়া অসম্ভব হয়।

সৌন্দর্য্যরক্ষার জন্যও নিয়ম রক্ষা আবশ্যক। সুনিয়মিত বর্ণসমাবেশ প্রভৃতির ফলেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়। তদ্বিপরীতে বে-নিয়মে শত স্থানে শতবিধ বর্ণের ছাপ দিলে কিছুতেই সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে পারে না। এই যে কত বড় বড় চিত্রকর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের চিত্রে যথাস্থানে যথারীতি বর্ণ প্রভৃতি ফলাইতে সক্ষমতার কারণেই বড় চিত্রকর বলিয়া নাম পাইয়াছেন।

অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও নিজের সুখের জন্যও ছেলেদের নিয়মে চলা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অনেক ছেলে মনে করে, নিয়মে চলা যদি অভ্যাস করিতে না হইত, তবে জীবনটা না জানি কতই সুখের হইত। কিন্তু সেটা একটা মস্ত ভুল। ডাক-পেয়াদার কথা ভাবিয়া দেখ। যদি সে সর্ব্বাগ্রে চিঠিগুলি ঠিকমত সাজাইয়া না লইয়া একগোছা চিঠি লইয়া বিলি করিতে বাহির হইত, তাহা হইলে তাহাকে কতবার একই রাস্তায় ঘুরিতে ফিরিতে হইত এবং কত লোককে চিঠির জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই যে এতগুলি রেলগাড়ী যাইতেছে আসিতেছে, ইহাদের যাওয়া আসা নিয়মের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে তো কথায় কথায় পরস্পরের সহিত ধাক্কা লাগিয়া কত গাড়ী, কত মানুষ বিনষ্ট হইত এবং এক কথায়, রেলগাড়ী চলাই অসম্ভব হইত। দুই বিপরীত মুখের গাড়ী পরস্পরের বামদিকে চলিবে, এই যে একটী নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে, ইহার ফলে কত জীবন যে রক্ষা পাইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। ছেলেরা যদি তাহাদের বাক্সে বা দেরাজে যথাস্থানে জিনিসগুলি রাখিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলেই নিয়মের মূল্য সহজেই বুঝিতে পারিবে—তাহারা দেখিবে প্রয়োজন মত জিনিস বাহির করিতে কত সময় বাঁচিয়া যায়, মেজাজ খিঁচড়াইয়া যাইবার হাত হইতে কত পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কথায় কথায় যদি এক-একটী জিনিস পাইবার জন্য চারিদিকে হাতড়াইতে হয় এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয়, তবে ভাবিয়া দেখ, মেজাজ কিছুতেই ঠিক রাখিতে পারা যায় না।

পোষাক-পরিচ্ছদে সাজসজ্জাতেও নিয়মরক্ষা আবশ্যক। চুল পরিপাটী ভাবে আঁচড়ানো উচিত; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কামিজ ধুতি প্রভৃতি পরা আবশ্যক। দেখা উচিত যে, পোষাক-পরিচ্ছদ না শতচ্ছিন্ন কাঁথায় পরিণত হয়; জুতা ঠিকমত "কালিবুরুষ" করা হয়, তাহার ফিতা-জোড়াটী ঠিকমত বাঁধা হয় এবং মোজাজোড়া যেন জুতার উপরে না নামিয়া পড়ে। কাপড়-চোপড় যখন খুলিবে, তখন সেগুলি খুলিয়া যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখা অভ্যাস করা আবশ্যক। উহার ফলে কত সময় বাঁচিয়া যায়, কত পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়, কত অনর্থক ব্যয় বাঁচিয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ছেলেদের কাজকর্ম্মেও নিয়ম রক্ষা করা আবশ্যক। তাহাদের কাজকর্ম্ম প্রধানত বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যা-শিক্ষাতেই আবদ্ধ থাকে। পুস্তক কালি কলম—এই সকল জিনিস লইয়াই বিদ্যালয়ে তাহাদের কাজকর্ম্ম চলিতে থাকে। ছেলেদের উচিত, সেই সমস্ত জিনিস যথাস্থানে রাখা; বইগুলির পাতার কোণ দুমড়াইয়া বইগুলি নষ্ট করা উচিত নয় বা পাতায় পাতায় ঘিচিমিচি দাগ করা উচিত নয়। বইগুলিতে কালি ফেলা বা তাহা খসিয়া উঠাইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বেশ সুনিয়মে লেখাপড়া অভ্যাস করা উচিত—খেয়ালমত একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিতে যাওয়া ঠিক নয়। যে সমস্ত ছেলে বিদ্যালয়ে খুব ভাল দাঁড়াইয়াছে, দেখা গিয়াছে, তাহারা ঠিক সময়ে যথানিয়মে নির্দ্দিষ্টভাবে লেখাপড়া করে, এবং যথানিয়মে খেলাধুলা করে। খাম-

খেয়ালীভাবে তাহারা কিছুই করে না। অনেক বড় লোকের জীবনী পড়িয়া ছেলেরা একটা ভুল করিয়া বসে যে, তাঁহারা বুঝি খামখেয়ালীভাবে ইচ্ছামত কাজকর্ম করিয়াই বড়লোক হইয়াছেন এবং সেইভাবে কাজ করিতে গিয়া পতনের মুখে অগ্রসর হয়। আসল কথা, সেই সমস্ত বড়লোক খামখেয়ালীভাবে কাজ করিতেছেন ভাবিলেও আসলে আপনাদিগকে যথেষ্ট নিয়মের দ্বারা সুশাসিত করেন—সেটা তাঁহাদের জীবনী পড়িবার পরিবর্তে তাঁহাদের মজ্জাকার জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

পথে চলাফেরার সময়েও ছেলেদের আপনাদিগকে সুনিয়মে শাসিত রাখা কর্ত্তব্য। রাস্তায় চলিতে চলিতে কাহারও প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা অথবা দুর্ব্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। আমোদ-প্রমোদ কর, আপত্তি নাই; কিন্তু আমাদের দেখা উচিত যে, আমোদ-প্রমোদের ফলে অপরের দেহে বা মনে কোনপ্রকার আঘাত না লাগে। অনেক ছেলের রোগ আছে, পথিকদের গায়ে গুপ্তভাবে পানের পিক প্রভৃতি ফেলিয়া আমোদ উপভোগ করা; রাস্তায় কলার খোসা প্রভৃতি ফেলিয়া তাহাতে লোকেরা পা দিবার ফলে পিছলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমোদ উপভোগ করা ইত্যাদি। ইহার ফলে চলাফেরার অনিয়ম হওয়ায় কত লোকের কত যে অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত যাহারা এইরূপে আমোদ পায়, সেই সমস্ত ছেলেদের মনের অত্যন্ত নীচভাব ও কাপুরুষতা প্রকাশ পায়।

গৃহের মধ্যেও সুনিয়ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। চৌকি প্রভৃতি বসিবার আসনগুলি যেখানকার যেটী, সেইখানে সেটী রাখা উচিত; খেলনার জিনিসগুলি খেলনার আলমারিতে রাখা উচিত; দরজা-জানালাগুলি ধপাস্ ধপাস্ আওয়াজ না করিয়া নিঃশব্দভাবে বন্ধ করা ও খোলা উচিত; শুইতে যাইবার পূর্ব্বে কাপড়-চোপড় খুলিয়া যথাস্থানে রাখা উচিত। এই প্রকার সুনিয়মের ফলে গৃহে কত যে সুখশান্তি আসে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যদি গৃহকর্ত্তা দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলে মিলিয়া গৃহকে সুনিয়মের দ্বারা সৌন্দর্য্য ও সুখশান্তির আধার করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইলে তিনি কখনই সহজে সুখের আশায় বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে চাহিবেন না। দেশ-বিদেশে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, গৃহে সুনিয়মের অভাবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সুখশান্তির অভাবে, অনেক গৃহের বাপ ছেলে মেয়ে ভ্রান্ত সুখের আশায় মদিরার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কাজকর্ম্মের মধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে চাহিলে, যথাসময়েও কাজকর্ম্ম করিতে হইবে। একটা ঘড়ি দেখ, কি নিয়মে টিক্-টিক্ শব্দ করিতেছে; আবার নাড়ীর গতিও পরীক্ষা কর—কি নিয়মে ঢুব্-ঢুব্ করিয়া চলিতেছে। ঠিক নিয়মে। ঠিক সময় মত ঘড়ির কাঁটা না চলিলে, নাড়ী না চলিলে—ঘড়িও বন্ধ হইয়া যাইবে, দেহের কার্য্যও স্তব্ধ হইয়া আসিবে। রেল গাড়ীর চলাফেরা যদি সময়ের দ্বারা নিয়মিত না করা হইত, তাহা হইলে কথায় কথায় ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কাধাক্কি লাগিত, আর রেলগাড়ী চলা অসম্ভব হইত। অধিকাংশ বড় লোকই যথানিয়মে ও যথাসময়ে কার্য্য করিবার ফলেই বড়লোক হইয়াছেন। নেলসন বলিতেন যে, তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূলে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দুই-চারি মিনিট পূর্ব্বে আসা। নেপোলিয়নের জয়লাভের মূল কারণ হইতেছে—এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট কালে তাঁহার বিভিন্ন স্থানের সেনাদলকে একত্র সংগৃহীত করিয়া বিপক্ষসেনাকে প্রবল বেগে আঘাত করিবার ব্যবস্থা করা। আমেরিকার স্বাধীনতাসংস্থাপক জর্জ্জ ওয়াসিংটন সম্বন্ধে সময়ে কর্ম্মশীলতা বিষয়ক একটী আখ্যায়িকা আছে—"সালেম হইতে ওয়াসিংটনের বাহির হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইল প্রাতে ৮ ঘটিকা। যেই ৮টা বাজিল, প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটন তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন। কয়েক মিনিট পরেই যে অশ্বারোহী সৈন্য-দল তাঁহার সঙ্গে যাইবার কথা ছিল, সেই সৈন্যদল আসিয়া প্রেসিডেণ্টকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া অনেক দূরে চার্লস্ নদীর নিকট তাঁহার নাগাল ধরিল।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ না করিলে কেবল নিজেদের সময় নষ্ট হয় না, অপরেরও যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়। তুমি এক জনের সঙ্গে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিলে, তাহার পর এছুতা সেছুতা করিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলে না। ফলে সে লোকটী তোমার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল; আর সে লোক তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া অপর যাহার সঙ্গে অন্য কাজের জন্য সময় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সে লোকটীও উহার জন্য নিজের কাজের ক্ষতি করিয়া অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল। অনেক ছেলে বিদ্যালয়ে অনেক বিলম্বে আসে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, ইহার ফলে শিক্ষকদের এবং অন্যান্য ছাত্রদের কত ক্ষতি হয়।

দীর্ঘসূত্রিতা পরিত্যাগ কর। দীর্ঘসূত্রী হওয়া মূর্খতা। আজ যে কাজ করা উচিত, সে কাজ যদি আজ না করিয়া কাল করিতে যাই, তাহার ফলে কাজটা নিশ্চয়ই সহজ-সাধ্য হয় না, কিন্তু বিপরীতে কষ্টসাধ্যই হয়, কারণ আমাদের ভিতরের ইচ্ছাটা ঐ প্রকার টালবাহানা করিবার

ফলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একবার কয়েকজন লোক আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের অন্যতর শিখরে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু নামিবার সময় তাঁহাদের মধ্যে একজনের পা পিছলাইয়া গেল, এবং তাহার ফলে যে দড়ার দ্বারা পরস্পরকে বাঁধা হইয়াছিল, সেই দড়াটী ছিঁড়িয়া গেল। চারিটী লোক পাহাড় হইতে পড়িয়া মরিয়া গেলেন। কয়েকটী লোক বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে যাঁহারা বাঁচিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন এই বিপদের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, ঐ প্রথম লোকটীর এক পাটী জুতার তলার পেরেকগুলি এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো থাকিবার পরিবর্ত্তে সমান হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে ঐ পেরেকগুলির বদলে পাহাড়ে উঠিবার উপযুক্ত পেরেক মারাইয়া লওয়া উচিত ছিল, সে সময়ে তাহা করানো হয় নাই।

ঠিক সময়ে যে কাজ করে, তাহাকে বিশ্বাস করা যায়। সচ্চরিত্র ব্যক্তির, সময়ে কর্ম্মশীলতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয়। শুধু কর্ম্মশীলতাই চরিত্রের নির্ভরস্থল নয়, কিন্তু নির্ভর করিতে পারাও তাহার চরিত্রের পরিচয়।

সূর্য্য যথাসময়ে উঠিতেছে, অস্ত যাইতেছে; তাহার ফলে জীবজন্তু যথাসময়ে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয় এবং যথাসময়ে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে। চন্দ্র যথাসময়ে উদয়াস্ত হইয়া সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা নিয়মিত করিতেছে। গ্রহতারা যথাসময়ে উদিত হইয়া নাবিকদিগের জাহাজ পরিচালনে সহায়তা করিতেছে। এই সমস্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নিয়ম ভগবানের সর্ব্বপ্রথম বিধান। সুতরাং নিয়মের দ্বারা আমাদেরও কাজকর্ম্ম নিয়মিত ও সুশাসিত করা উচিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুংগ্রীভ্রমণ।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

আত্মজীবনীর পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুংগ্রী পর্ব্বত ভ্রমণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐ গ্রন্থের একটি অতি পবিত্র ও অতি মধুর অংশ। ঐ ভ্রমণের সময়ে নির্জ্জন অরণ্যে বনফুল দেখিতে দেখিতে তিনি যে একদিন ঈশ্বরের করুণার অনুভবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, ও পথে পথে হাফিজের কবিতা গান করিয়াছিলেন, সে বর্ণনাটি বড়ই প্রাণস্পর্শী। তাঁহার নিকটে যাঁহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গের জন্য উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার নিজ মুখ হইতে ঐ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছেন। ঐ বনফুল দর্শনের দিনটি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি চিহ্নিত দিন হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার এই সুংগ্রীভ্রমণের সময়টি, যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে নিরূপণ করিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়।

সেদিন বনফুল দেখিয়া পথে পথে মহর্ষিদেব হাফিজের যে কয় পংক্তি কবিতা গান করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

হর্‌গেজ্‌ম্ মেহ্‌রে তো অজ্‌. লওহে দিল্‌-ও-জাঁ ন রবদ্।
আঁচুনাঁ মেহ্‌রে তো অম্ দর্ দিল্‌-ও-জাঁ জায়ে গিরফ্‌ৎ,
কে গর্‌অম্ সর্ বে-রবদ্. মেহ্‌রে তো অজ্. জাঁ ন রবদ্।

অর্থাৎ, "তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণের ফলক হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণে এরূপ ভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, (অর্থাৎ জীবন যায়,) তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেম মুছিয়া যাইবে না।" বোধ হয় ঐ দিনের পবিত্র স্মৃতি জড়িত হওয়াতে মহর্ষির নিকটে তাঁহার প্রিয় হাফিজের রচনাবলীর মধ্যে ঐ কয় পংক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়াছিল। মহর্ষির সমগ্র জীবনের ভাবটিকে ঐ কয় পংক্তি যেমন সম্যক্ রূপে প্রকাশ করে, আর বোধ হয় কোনও ভাষার কোনও উক্তিই তেমন প্রকাশ করে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পঞ্জাবনিবাসী স্বর্গীয় ভাই প্রকাশদেবজী যেমন হাফিজ-ভক্ত ছিলেন, তেমনি আবার দেবেন্দ্রনাথেরও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, একদিন তাঁহাদের কয়েকজনের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতে করিতে মহর্ষি এরূপ ভাব-গদগদ-কণ্ঠে ও অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে হাফিজের ঐ কয় পংক্তি আবৃত্তি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকটে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, সকলের হৃদয়ে সে সময়ে এক স্বর্গীয় ভাবের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছিল। ভাই প্রকাশদেবজী সেই দিন হইতে হাফিজের ঐ উক্তিটিকে স্বীয় জীবন-সম্বলরূপে গ্রহণ করিলেন। জীবনের সকল অবস্থায় তিনি হাফিজের ঐ শ্লোক গান করিয়া ও মহর্ষিকৃত সেই দিনের আবৃত্তি স্মরণ ও বর্ণনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

এখন, এই সুংগ্রীভ্রমণের বৎসরনিরূপণ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। সিমলা হইতে দেবেন্দ্রনাথ একবার (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে) সুংগ্রী পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে ও একবার (মাঘ মাসে) তন্দী ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। তন্দীভ্রমণ ১৭৭৯ শকের মাঘ মাসে হইয়াছিল। কিন্তু সুংগ্রীভ্রমণ যে জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়, তাহা এই মাঘের পূর্ব্বের জ্যৈষ্ঠ, কিংবা পর বৎসরের জ্যৈষ্ঠ, এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

এই দুই ভ্রমণের বিবরণ দেবেন্দ্রনাথ সেই সময়ে সিমলা হইতে এক পত্রে (পত্রাবলী, ৫০ সংখ্যক পত্র) রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের তারিখ ১লা শ্রাবণ ১৭৮০ শক। আত্মজীবনীতে এই ভ্রমণের বিবরণে দেবেন্দ্রনাথ ঐ পত্রের ভাষাই বহুল-

পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও অব্দের উল্লেখ করেন নাই, মধ্যে মধ্যে বাংলা তারিখমাত্র দিয়াছেন।

আত্মজীবনীর ১৬৮ ও ১৬৯ পৃষ্ঠায় (প্রথম সংস্করণের পত্রাঙ্ক) দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ডগ্‌শাহী হইতে প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ পরে (১৭৭৯ শকের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে), তিনি সুংরিভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন। ১৭৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, ১৩ই আষাঢ় সেই ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদের আরম্ভে, ১৮১ পৃষ্ঠায়, বর্ষা ঋতুর বর্ণনা করিয়া, এই পরিচ্ছেদের মধ্যেই ক্রমশঃ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ (১৮৬পৃষ্ঠা) মাঘ মাসের উল্লেখ করিয়া আরম্ভ হইয়াছে; এবং মাঘ মাসে দেবেন্দ্রনাথ যে ভজ্জীর রাণার নিমন্ত্রণে তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে ও এই মাসের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৯ পৃষ্ঠায় ফাল্গুন মাসের ও ১৯০ পৃষ্ঠায় চৈত্র মাসের এবং নূতন বৎসরের বৈশাখ মাসের উল্লেখ আছে। এই নূতন বৎসরই (১৭৮০ শক=১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) দেবেন্দ্রনাথের সিমলায় অবস্থিতির শেষ বৎসর। ইহার পর অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদের আরম্ভে (১৯২ পৃষ্ঠা) রহিয়াছে, 'আবার সেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মেঘ-বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল'। এখানে 'আবার' কথাটি স্পষ্টতঃ দ্বিতীয় বৎসরের (১৭৮০ শকের) বর্ষার সূচনা করিতেছে। সুতরাং আত্মজীবনীর এই বর্ণনাতে অব্দের উল্লেখ না থাকিলেও, ইহা অতিশয় ধারাবাহিক বলিয়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আসে না যে, সুংরি ভ্রমণ ১৭৭৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়, এবং ভজ্জীভ্রমণ তাহার পরে, ঐ বৎসরের মাঘ মাসে হয়।

পত্রখানিতেও এই দুই ভ্রমণের বর্ণনা আছে, এবং পত্রের বর্ণনাতেও তারিখ আছে, অব্দের উল্লেখ নাই। কিন্তু পত্রখানি এমনভাবে লিখিত যে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন পত্র লিখিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে (অর্থাৎ ১৭৮০ শকের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে) সুংরীভ্রমণ করা হইয়াছিল।* পত্রখানিতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সুংরীভ্রমণের বর্ণনা করিতে করিতে সেই বর্ণনা ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া "গত মাঘ মাসে" ভজ্জীর রাণার নিমন্ত্রণে তথায় গিয়াছিলেন, এই বলিয়া ভজ্জীভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন; এবং ভজ্জীভ্রমণের বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া সুংরীভ্রমণের বর্ণনা পুনরারম্ভ করিয়াছেন। অতএব এই পত্র অনুসরণ করিলে মনে হয় যে, ভজ্জীভ্রমণ ১৭৭৯ শকের মাঘে, এবং সুংরীভ্রমণ ১৭৮০ শকের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে হইয়াছিল।

এই উভয় বর্ণনার মধ্যে পত্রখানি তৎকালে লিখিত বলিয়া, এবং পরে তাহার ভাষাই আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, উভয়ের মধ্যে তুলনায় পত্রখানিই অধিক প্রামাণ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই; এবং দেবেন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী মুখে মুখে বিবৃত করিবার সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও তাহার কাল যে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। তথাপি, এই ক্ষেত্রে ঐ পত্রখানির বিবরণ হইতে অনুমান করিয়া সুংরীভ্রমণের অব্দকে ১৭৮০ শক বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দেশ করিতে পারিতেছি না। কারণ ইহাও অসম্ভব নয় যে, দেবেন্দ্রনাথ ১৭৭৯ শকের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সুংরী ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবুকে এই ভ্রমণবৃত্তান্তসংবলিত একখানি দীর্ঘ পত্র শীঘ্র লিখিতে পারিলেন না; মাঘ মাসে ভজ্জী ভ্রমণ করিয়া আসিবার কয়েক মাস পরে পুনরায় যখন (১৭৮০ শকের) শ্রাবণ মাস আসিল, তখন তিনি এক বৎসরের পুরাতন ঘটনা সুংরীভ্রমণ ও কয়েক মাসের পুরাতন ঘটনা ভজ্জীভ্রমণ, দুইই এক সঙ্গে এক পত্রে লিখিতে বসিলেন। পত্রের ভাষা কোথাও এরূপ অনুমানের বিরোধী নহে; এবং 'পত্রাবলীতে' ঐ পত্রের শেষাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এইরূপ অনুমানকে অগ্রাহ্য করা আরও কঠিন হইতেছে।

এই কারণে, এবং আত্মজীবনীর ৩৫—৩৮ পরিচ্ছেদের বর্ণনাসকল অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ধারাবাহিক বলিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্টতর অন্য কোনও উল্লেখ আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন সুংরীভ্রমণের আত্মজীবনী হইতে অনুমিত অব্দই (১৭৭৯ শক=১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রহণ করা উচিত বলিয়া মনে হয়।

স্বপ্নদর্শন।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল)

অপরূপ রূপ এক দেখিনু স্বপনে,—
হেন রূপ পূর্ব্বে কভু পড়েনি নয়নে!
বিমল কনক ছটা চম্পক-বরণ,
সুবিমল হাস্যময় প্রসন্ন বদন,
দেখিলেই যেন মনে হয় সেই ক্ষণ,
চরণের তলে দেই ঢালিয়া জীবন!
অপরূপ মূর্ত্তি মোরে কহিলা সম্ভাষি,
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে মৃদু মন্দ হাসি,—
"দেখ বৎস! কবিতার প্রেরণার মূলে,
আমার আসন নিত্য এই মহীতলে।
জগতে সকল সুখ মোর করুণায়,
ভব দায় হ'তে লোক আশু মুক্তি পায়।

"দুঃখ দৈন্য অবসাদ শোক, লোক-ভয়—
মুহূর্ত্তে বিলয় হয় পাইলে অভয়।
ভক্তের হৃদয়ে ফোটে আনন্দ অপার,
বলবীর্য্য শক্তি হয় সহায় তাহার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, গ্রহ, সূর্য্য দলে দলে,
যে আনন্দ লভি বিধি রচিলা কৌশলে,
সে আনন্দ উথলিত অনন্ত হিল্লোলে—
অকূলন্ত মহাসিন্ধু মোর পদতলে!"

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬। পুকুরভরাট—সেকালে।

রাস্তার ধারে কাহারও বাড়ীতে যদি একটা পুকুর থাকিল, তবে তো মহা সর্ব্বনাশ! সেকালে আবর্জ্জনা সরাইবার জন্য ময়লাগাড়ী ছিল বটে, কিন্তু সেই সমস্ত আবর্জ্জনা যে ভাগাড়ে লইয়া গিয়া পুঁতিয়া ফেলা হইত, তাহা শুনি নাই; অথবা সমস্ত আবর্জ্জনা যে ধাপার খালে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল তাহাও জানা নাই। বেশ মনে পড়ে, সেকালের মিউনিসিপালিটি হইতে আদেশ হইল শুনিলাম যে, সহরের যত পঙ্কিল পুকুর আছে, সমস্তই যথাসত্বর ভরাট করিতে হইবে। কিন্তু পুকুরগুলির মালিকেরা এক একটা প্রকাণ্ড দীঘির মত প্রাচীন পুকুর ভরাট করিবার উপযুক্ত মাল-মসলা পাইবেন কোথায়? মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটীসমূহের বর্ত্তমানে ঠিক ঐ অবস্থা। হাবড়ার কথা বলিলেই বুঝা যাইবে। সেখানে সহস্রাধিক পুষ্করিণী ছিল। আইন অনুসারে তাহাদের মালিকদের উপর যথোচিত পুকুর-ভরাটী হুকুম নোটিশ যাহা কিছু দিবার সকলই দেওয়া হয়। কিন্তু নোটিশ দিলে কি হইবে? মালিকেরা ভরাটের জন্য মাল-মসলা পাইবেন কোথায়? এক-একটী মালিকের নামে আট দশবার নালিশও হইতে লাগিল। বিচারকেরা প্রথম প্রথম বেশ কড়া রকমের অর্থদণ্ড করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহারা বুঝিলেন যে, মালিকেরা যথার্থই ভরাটের রাবিষ টাকা দিয়াও পাইতে পারেন না। সেই অবধি তাঁহারা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নামে মাত্র জরিমানা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, এক-একটা পুকুরের জন্য নোটিশ দেওয়া হইলেই মালিকেরা এষ্টিমেট চান এবং সেই এষ্টিমেট অনুসারে তাঁহারা টাকা দিলেই সকল দিকে খালাস—মিউনিসিপালিটি ধারাক্রমে একটীর পর একটী ধরিয়া সহরের জঞ্জাল দিয়া পুকুরগুলি ভর্ত্তি করিতে থাকে। ইহার ফলে মিউনিসিপালিটি সহরের জঞ্জাল ফেলিবার যায়গা পায় এবং রোগের আধার ডোবাপুকুরগুলিও ভরাট হইয়া ক্রমে বাসের উপযুক্ত হয়, অস্বাস্থ্যের কারণও বিদূরিত হয়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিরও ঠিক এই অবস্থা ছিল। মালিকদের উপর নোটিস জারি হইবামাত্রই মালিকেরা মিউনিসিপালিটিকে ভরাট করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া তাহার জন্য অবধারিত মূল্য দিতে প্রস্তুত হইলেন। মালিক এবং মিউনিসিপালিটি, উভয়েরই পক্ষে এক সঙ্গেই কলা বেচা এবং রথ দেখা হইল—আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান লাভ হইল, এবং তাহার সঙ্গে একটা আয়ের পথও উন্মুক্ত হইল। এই প্রকার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না যে মালিকদের নিকট পুকুর ভরাটের মূল্য চাওয়া বা লওয়া হইত কি না।

আবর্জ্জনা দ্বারা পুকুর ভরাটের একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের বাড়ীর গায়ের কাছেই "সিংহবাগানে" একটা প্রকাণ্ড পুকুর ছিল। এই সিংহবাগান স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দরলাল মিশ্রের অধিকারভুক্ত এবং এখন বাগানের পরিবর্ত্তে সেখানে একটা প্রকাণ্ড বস্তি জমিয়া উঠিয়াছে। পুকুরটী বর্ত্তমান রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীটের ঠিক পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত ছিল। উহা আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকস্থ খিড়কী দরজা হইতে দুই পা দূরে ছিল বলিলেই চলে। আমার বয়স যখন আন্দাজ পাঁচ বৎসর, তখন মিউনিসিপালিটি এই পুকুরটী আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদের তেতলার শয়নগৃহের বারাণ্ডা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইত যে, ময়লাগাড়ীগুলি গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় একে একে আসিয়া কি প্রকার সোরগোল সহকারে আবর্জ্জনারাশি ঢালিয়া ফেলিত। সেই ভরাটের মহা-ব্যাপার বর্ত্তমান যুগে—শববাহী মোটর লরি, আবর্জ্জনা-বাহী মোটর লরি প্রভৃতির যুগে—আমাদের ছেলেপিলেরা কল্পনা করা দূরে থাক, চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে পারে কি না সন্দেহ। কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত হাবড়া প্রভৃতি সহরে এখনও এইভাবে ভরাটকার্য্য চলে। সেখানেও ঐ সমস্ত আবর্জ্জনারাশি যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তাহার জন্য উহার কতক অংশ দগ্ধ করা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেকালে কলিকাতায় সে প্রকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের ঐ মহা সোরগোলে মজা লাগিত বটে, কিন্তু উহার ভিতর যে কি বিষ, কি অমঙ্গল লুক্কায়িত ছিল, পিতৃদেব তাহা খুবই অনুভব করিতে লাগিলেন। পুকুরের ধারে

১´ • ২ • ৩
I মা -া পা। মা -ণা। ণা -া। ণা ণা জ্ঞা। জ্ঞা -া জ্ঞা -া I
দুঃ • খ ও • সু খ বে দ ন্ ব্য • থা •

১´ • ২ • ৩
I মা মাঃ -পঃ। রা া। -জ্ঞরা -জ্ঞরা। সা -া -া। -া -া -া -া I
ব্যা কু • ল • • • • • তা • • • • • •

১´ • ২ • ৩
I মা -া মা। মা -া। জ্ঞমা -জ্ঞমপা। পা পা -া। পাঃ -মঃ পা -া I
ব ল্ চে আ • মা • • • র ও রে • অ • বো ধ

১´ • ২ • ৩
I ণদা -া -া। -া -া। -দদা -ণা। পা -া -া। -া -া -া -া II
আ • • • • • • • গো • • • • • •

১´ • ২ • ৩
II মা মা -া। মা -া। জ্ঞমা -জ্ঞমপা। পা পা -া। পাঃ -মঃ পা -া I
আ ন ন্ দ্যা • নে • • • • ছি লে ম্ আ • মি •

১´ • ২ • ৩
I ণা দা -া। দা -া। -দদা -ণা। পা -া -া। -া -া -া -া I
অ • • চে • • • • তন্ • • • • • •

১´ • ২ • ৩
I পা পরা র্রা। র্জ্ঞা -র্সা। র্সা -া। ণর্সা -র্রা ণর্সা। ণদা -ণা পা -া I
স হ • ল না • তা র্ বা• জ্ লো বু • • কে •

১´ • ২ • ৩
I সা -রা -া। মজ্ঞা -া। -মা। রা -া -জ্ঞা। -সা -া -া -া II
অ • • ব • • • • ত • • • • • ন্

১´ • ২ • ৩
II মা পা -া। ণদা -া। দা -ণা। ণদা -র্সা র্সা। র্সা -া র্সা -া I
এ লে ন্ তি • নি • দুঃ • খ রা • জে •

১´ • ২ • ৩
I র্রা -া -া। -া -া। -র্জ্ঞরা র্জ্ঞরা। -ণা -া -া র্সা। র্সা -া -া -া
ঘা • • • • • • • • • • • • রে • •

১´ • ২ • ৩
I মা পা -া। ণা -া। র্সা -র্রা। র্রা -া র্রা। র্রাঃ -র্সঃ র্রাঃ -ঃ
হৃ দ য় আ • মা র্ সু ই রে ব্য • থা

১´ • ২ • ৩
I -র্সা। -র্রা -া। -র্জ্ঞরা -র্জ্ঞরা। র্সা -া -া। -া -া -া
• • • • • • • রে • • • • •

১´ • • • ৩
I মা । পা। মা -ণা। -ণা -া। ণা ণা -জ্ঞা। জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা I
অ • শ্র ধো • য়া • ছ দ • য়ে • মো র্

১´ • ২ • ৩
I মা মা পা। মা -া। -জ্ঞরা -জ্ঞরা। সা । -া। -া -া -া -া I
ফু টি য়ে ক • • • • • ম • • • • ল্ •

১´ • ২ • ৩
I মা মা -া। মা -া। জ্ঞমা -জ্ঞমপা। পা পা -া। পাঃ -মঃ পা -া I
কা ণে • কা • ণে • • • ক রে • গে • লে ন্

১´ • ২ • ৩
I দা -া -া। -া -া। -দদা -ণা। পা -া -া। -া -া -া -া II II
জা • • • • • • • গো • • • • • •

বেদ ও পুরাণ।

(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি)

১। বেদের চতুঃসংহিতায় বিভাগ।

ব্রহ্মা চাতুর্হোত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্যাহৃতি ওঙ্কারের সহিত বেদচতুষ্টয় উৎপাদন করিলেন এবং বেদোচ্চারণ-নিপুণ স্বীয় পুত্র মরীচাদি মহর্ষিগণকে সেই বেদসকল অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া উহা আবার স্ব স্ব পুত্রদিগকে শিক্ষা দিলেন। পরে তাঁহাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যসকল পরম্পরা-ক্রমে ঐ বেদ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে মহর্ষিসকল বেদসকলকে ক্রমশ বিভাগ করিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মরক্ষণার্থ • • • (বেদ-ব্যাস) বেদসকলকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন; এবং সামান্য মণির খনি হইতে পদ্মরাগাদি মণি উদ্ধারের ন্যায় ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বের রাশি হইতে বর্গক্রমে মন্ত্রসকলের উদ্ধার করিয়া উহাদিগকে চারিখানি প্রসিদ্ধ সংহিতাতে ভাগ করিলেন। পরে মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চারিজন শিষ্যকে আহ্বান করিয়া এক-একজনকে এক একখানি সংহিতা প্রদান করি-লেন। প্রথমত বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদসংহিতা পৈলকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদসংহিতা বৈশ-ম্পায়নকে উপদেশ দিলেন। ছন্দোগ নামক সাম-বেদসংহিতা জৈমিনিকে বলিলেন এবং আঙ্গিরসী নামধেয় অথর্ব্বসংহিতা সুমন্তুকে অধ্যয়ন করাইলেন।

২। ঋগ্বেদীয় সংহিতা।

পরে পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একভাগ ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং অপর ভাগ বাস্কলকে কহিলেন। বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্রপ্রমতিও নিজ বেদ স্বীয় পুত্র মাণ্ডূকেয় ঋষিকে ও তৎশিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাই-লেন। পরে মাণ্ডূকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন। সাক-ল্যের শিষ্য জাতূকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে তিন ভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজ এই চারি জনকে শিক্ষা দিলেন। বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্ব-শাখা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া বালিখিল্য একখানি স্বতন্ত্র সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এবং বানারসি, ভাজ ও কাশায় নামক তিন জন দৈত্য উহা অধ্যয়ন করিল। এইরূপে ব্রহ্মর্ষিগণ ঋগ্বেদীয় সংহিতাসকল ধারণ করিলেন।

৩। যজুর্বেদীয় সংহিতা।

যজুর্ব্বেদ-সংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অধ্বর্যু। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়সাধন স্বগুরুর অনু-ষ্ঠিত ব্রতের আচরণ করাতে (অর্থাৎ একদা 'মহামেরু' নামক স্থানে সমুদয় মহর্ষিগণের একটী মহাসভাধিবেশনের প্রয়োজন হওয়াতে সকলেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া-ছিলেন যে, যে ঋষি যথাসময়ে ঐ সভায় উপস্থিত না
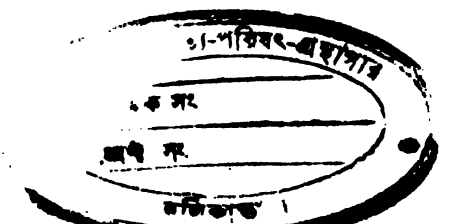
ওধারে চারিদিকে সহরের ধুলো, ময়লা, কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তুর অসংখ্য শবদেহ নির্ব্বিচারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমাদের মনে আছে, ফাল্গুন-চৈত্র মাস ধরিয়া ঐ প্রকার আবর্জ্জনা পড়িতে লাগিল। তাহার ফলে সময়ে সময়ে কি যে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইত, তাহা বর্ণনার অতীত। আবার সেই সঙ্গে আবর্জ্জনাভুক্ নীলাভ মাছি (blue bottle) একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে পুকুরের চতুর্দিকে বোধ হয় আধ মাইল ধরিয়া লোকদের গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহবাসীদিগকে উত্যক্ত করিয়া মারিত। আহার্য্যদ্রব্যের উপর ঐ সমস্ত মক্ষিকাসৈন্যের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধ্য! কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী সহরের কাঁচা নর্দ্দমার ধারে বসিয়া যে সমস্ত মিঠাই প্রভৃতি বিক্রয় হয়, যদি কেহ দেখিয়া থাকেন যে, সেই সমস্ত মিষ্টদ্রব্যের উপর এই সমস্ত মক্ষিকার কি প্রকার আচ্ছাদন পড়ে, তবে তিনিই সেই পুকুরভরাটকালে মক্ষিকার উৎপাত কল্পনাচক্ষে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অবশেষে যখন সেই দুর্গন্ধের বেগ ও মাছির আক্রমণ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল এবং নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন আমরাই রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বেশ মনে পড়ে, পাখা টাঙ্গাইবার দড়ি প্রভৃতি যেখানে যত দড়ি ঝোলান ছিল, সে সমস্ত দড়ি মাছিতে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যাইত—দড়ি আর দেখা যাইত না। আমরা পরবৎসরের মুখে ঠিক ১লা বৈশাখে জলযাত্রায় কাশীযাত্রা করিলাম, এবং প্রায় তিন মাস পরে আষাঢ় মাসের শেষাশেষি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, পুকুরভরাটও এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে এবং মাছির উৎপাতও অনেক কমিয়াছে।

৮। রাস্তার পার্শ্বের নর্দ্দামা।

চার বৎসর বয়সে পড়িবামাত্রই আমাকে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের ষ্টেটের খাজাঞ্চি ৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসে। ৩৲ টাকা করিয়া মাহিনা স্থির হইল। স্কুলটী চিৎপুর রোডের উপর এবং মল্লিকের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল—তাঁহার নাম, আমার যতদূর মনে পড়ে, শ্যাম মল্লিক—শুনিয়াছি তিনি সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ধনী বীরু (বীর নৃসিংহ) মল্লিকের অন্যতম পুত্র ছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়ীটী পাইয়াছিলেন। বীরু মল্লিক নাকি তাঁহার একাধিক (শুনিয়াছি সাত) পুত্রকে এইরূপে এক-একটী বাড়ী দিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীটী প্রকাণ্ড; সম্মুখের থামগুলো যেমন প্রকাণ্ড ও সুকায়, সিঁড়িগুলোও তেমনই লম্বা চৌড়া। বাড়ীর ভিতরের উঠানটীও খুব প্রশস্ত। বাড়ীটী দেখিলেই বীরুমল্লিকের হৃদয়ের উদার ও প্রশস্তভাব কতকটা বোঝা যাইতে পারে। ঐ মূল প্রাসাদের গাত্রে সংলগ্ন একটী ছোট "জলখাবারের" ঘর ছিল। সেইখানে একটী লোক বহুকাল ধরিয়া লজেঞ্জুস বিক্রয় করিয়া বেশ দুই-পয়সা রোজগার করিত। পশ্চাদ্দিকে একটা খিড়কীর সিঁড়ি ছিল—সেই সিঁড়ি দিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার পথের দুই ধারে আমাদের "জলখাবারের" স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সবই ভাল ছিল। কিন্তু চিৎপুর রোডের যে অংশ ধরিয়া আমাদের বাড়ী হইতে নর্ম্মাল স্কুলে যাইতে হইত, সেই রাস্তাটুকুর বিষয় মনে করিলে আজও অন্নগ্রহণে রুচি চলিয়া যায়। রাস্তার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড, প্রায় ছয় ফুট প্রশস্ত একটী কাঁচা ড্রেণ বা নর্দ্দামা ছিল। এই নর্দ্দামা দিয়াই উভয় পার্শ্বের বাড়ীগুলির পায়খানা রান্নাঘর প্রভৃতির জল বহিয়া যাইত। পূর্ব্বদিকে উত্তর পার্শ্বের বাড়ীগুলিতে জল সরবরাহ করিবার জন্য (মনে হইতেছে কতক কতক আচ্ছাদিত) একটা "নহর" (নর্দ্দামা) ছিল। তখন কলের জল ছিল কি না মনে নাই। কিন্তু নহর দেখিয়াছি বেশ মনে পড়ে। যে রাস্তা দিয়া স্কুলে যাইতে হইত, সেই রাস্তার পশ্চিম দিকের নর্দ্দামাটী লোকেরা পায়খানারূপে ব্যবহার করিয়াছে দেখিতাম। সাড়ে দশটার সময় স্কুল বসিত—আমরা বাড়ী হইতে দশটার সময় পাল্কী চড়িয়া স্কুলে আসিতাম; তখন পর্য্যন্ত সে সমস্ত পরিষ্কার করিবার অবসর কাহারও হয় নাই। তাহার উপর ড্রেণটী নিজেই তো পাকা ছিল না, কাঁচা ছিল। সুতরাং জল, ময়লা প্রভৃতি মাটির সঙ্গে মিশিয়া পচিয়া যে অপূর্ব্ব ভ্যাটভেটে ও কীটসমাকুল আকার ও শ্রী ধারণ করিত, তাহা বর্ত্তমানে একমাত্র কল্পনাচক্ষেই দেখা যাইতে পারে।

৯। গ্যাসের আলো।

আমার যতদূর মনে পড়ে, চিৎপুর রোডে দুই এক বৎসর তেলের আলো জ্বলিতে দেখিয়াছি। কিম্বা শুনিয়া শুনিয়া কল্পনাচক্ষেই দেখিতেছি, তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার পর, চারিদিকে যে খোঁড়াখুঁড়ি চলিয়াছিল, এবং সেই খোঁড়াখুঁড়ির কিছু পরেই যে গ্যাসের আলো জ্বলিতে লাগিল, তাহা বেশ মনে পড়ে। ঠিক যে কি ভাবে ও কবে দুই পার্শ্বের নর্দ্দামা ও নহরগুলি বন্ধ করা হইল এবং তেলের বদলে গ্যাসের আলো দেওয়া হইল, তাহা সবিস্তার বলিতে পারি বলিয়া মনে করি না। তাহার পর, এখন তো বৈদ্যুতিক আলো একেবারে ঝকঝক করিয়া ঘরে বাহিরে রাস্তায় সর্ব্বত্র জ্বলিতেছে—রাত্রিকে দিন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার নিকট এখন গ্যাসের আলোই অন্ধকার বলিয়া মনে হয়, তেলের আলো তো দূরের কথা! বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্ত্তনের ফলে আমাদের ছেলেপিলের চক্ষের যে কি দশা হইতেছে, সে বিষয়ে ভাবিবার চিন্তিবার অবসরই পাই না।
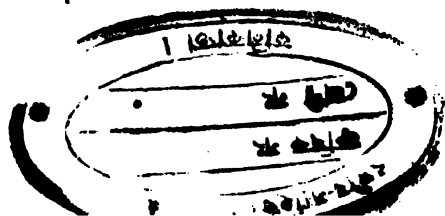
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

দরবারী কানাড়া—ধামার

আষাঢ় তাঁহার বলচে আমায় 'জাগো' মাধুরী তাঁর বলচে আমায় 'জাগো'।
এই রবির আলোয় দীপ্ত উজল ধরা গন্ধে শোভায় শ্যামল সুধায় ভরা
এই দুঃখ ও সুখ বেদন-ব্যথা ব্যাকুলতা, বলচে আমায় ওরে অবোধ 'জাগো'।
আপন ধ্যানে ছিলেম আমি অচেতন সইলো না তাঁর বাজলো বুকে অযতন।
এলেন তিনি দুঃখ-রাতে দ্বারে হৃদয় আমার নুইয়ে ব্যথার ভারে
অশ্রু-ধোওয়া হৃদয়ে মোর ফুটিয়ে কমল কানে কানে কয়ে গেলেন 'জাগো'॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ০ ২ ০ ৩
II সা সা -া। সা -া। ণ্সা -ণ্সরা। রা -া রা। রাঃ -সঃ রা -া I
আ ষাঢ়্ তাঁ ০ হা০ ০০র্ ব ল্ চে আ ০ মা য়

১ ০ ২ ০ ৩
I পসা -া -পা। া -া। -ধধা -ধপা। -মপা মা -া। -জ্ঞা -া -া -া I
জা ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ গো ০ ০ ০ ০ ০

১ ০ ২ ০ ৩
I জ্ঞা রজ্ঞা -া। মা -া। পা -া। রা -া রা। সা -া সা -া I
মা ধু০ ০ রী ০ তাঁ র্ ব ল্ চে আ ০ মা য়

১´ ০ ২ ০ ৩
I পদা -া -া। -ণা -া। -রা -া। সা -া -া। -া -া -া -া II
জা ০ ০ ০ ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
মা -া II মা পা -া। পদা -া। দা -ণা। পদা -র্সা র্সা। র্সা -া র্সা -া I
এ ই র বি র আ ০ লো য় দী ০ প্ত উ ০ জ ল্

১´ ০ ২ ০ ৩
I র্রা -া -া। -া -া। -র্জ্ঞর্রা -র্জ্ঞর্রা। -ণা -া -র্সা। র্সা -া -া -া I
ধ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ রা ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
I মা -া পা। ণা -া। র্সা র্রা। র্রা র্রা -া। র্রাঃ -র্সঃ র্রাঃ -র্সঃ I
গ ন্ ধে শো ০ ভা য় শ্যা ম ল্ সু ০ ধা য়

১ ০ ২ ০ ৩
I র্জ্ঞা -া -র্মা। -র্রা -া। র্জ্ঞর্রা -র্জ্ঞর্রা। র্সা -া -া। -া -া র্সা -া I
ভ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ রা ০ ০ ০ ০ এ ই

হইবেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপাতক স্পর্শ করিবে। বৈশম্পায়ন যথাকালে ঐ সভায় সমুপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত শাপবশত দৈবগত্যা নিজ শিশু-ভাগিনেয়কে মাড়াইয়া মারিয়া ফেলেন। এইরূপে তিনি ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিজ সপ্তবিংশতি শিষ্যকে ঐ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। তাহাতে—) তাঁহাদিগের অপর এক নাম 'চরক' হইয়াছিল। উক্ত ব্রতের আচরণ কালে যাজ্ঞবল্ক্য নামক একজন শিষ্য গুরুকে বলিলেন, "ভগবন্! এই আপনার শিষ্যগণের আচরিত দ্বারা আপনার কি ফল হইবে? আমি সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় করিব।" তৎশ্রবণে গুরু বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া শিষ্যকে বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অপমান কর। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে অধীত বেদশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এস্থল হইতে দূরীভূত হও"। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুর্গণ বমন করিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উদগীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরি-রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই যজুর্গণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই বমনীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। এদিকে, যাজ্ঞবল্ক্য, যে সকল যজুর্গণ বৈশম্পায়নের নিকট নাই, অর্থাৎ ব্যাস যাহা তাঁহাকে বিভাগ করিয়া দেন নাই, তাহা অন্বেষণ করিয়া লইয়া ঈশ্বররূপে সূর্য্যের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান আদিত্য যাজ্ঞবল্ক্যের উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া বাজিরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্যের অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ প্রদান করিলেন। বিভু যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে পঞ্চদশ যজুঃশাখা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অপরিমিত শাখায় বিভক্ত করিলেন। এবং কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিরা সেই অশ্বের বাজস্ অর্থাৎ কেশর হইতে নিঃসৃত শাখাসকল গ্রহণ করিলেন। বাজস্ হইতে নিঃসৃত বলিয়া ঐ সকল শাখার নাম বাজসনী হইল।

৪। সামবেদীয় সংহিতা।

সামগ জৈমিনির পুত্রের নাম সুমন্ত এবং সুমন্তর পুত্রের নাম সুত্বান্। জৈমিনি মুনি সেই পুত্র-পৌত্র উভয়কে স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া অধ্যয়ন করাইলেন। জৈমিনির অপর শিষ্য অতি মেধাবী সুকর্ম্মা সামবেদ-বৃক্ষকে স্বতন্ত্র শাখায় বিভিন্ন করিলেন। সুকর্ম্মার শিষ্য কুশলের পুত্র হিরণ্যনাভ, পৌষ্পিঞ্জি ও ব্রহ্মবিৎ আবন্ত্য, ইঁহারা তিনজনে সেই সমুদয় সামবেদসংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। উক্ত পৌষ্পিঞ্জি, আবন্ত্য ও হিরণ্যনাভের উত্তরদেশীয় পঞ্চশত শিষ্য তৎসমুদয় শিক্ষা করেন এবং তাঁহারা আবার অন্য উত্তরদেশীয় ও পূর্ব্বদেশীয়গণকে তাহা অধ্যয়ন করান। পরে লোগাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষি নামক পৌষ্পিঞ্জির পঞ্চ শিষ্য এক এক জন শত শত সংহিতা কণ্ঠস্থ করিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত নামক ঋষি স্বীয় সংহিতাকে চতুর্বিংশতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন ও তাঁহার শিষ্যেরা স্বীয় শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল, সে সকল আবন্ত্য শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন।

৫। অথর্ব্ববেদীয় সংহিতা।

অথর্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন এবং কবন্ধ তাহাকে দুই ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শ নামক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য—শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য—কুমুদ, শুনক ও জাজলি; ইঁহারা সকলেই অথর্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিও পরে তাহা শ্রবণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।

৬। ইতিহাস ও পুরাণ।

অনন্তর মহামতি বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদচতুষ্টয় বিভাগ করিয়া উহারই অবশেষভূত মূলত বর্ণনীয় আখ্যান, প্রসঙ্গত বর্ণনীয় উপাখ্যান, যমগীতা ও পিতৃগীতাদি গাথা এবং বারাহাদি কল্পশুদ্ধি এই কয় অংশ দ্বারা একখানি ইতিহাস ও একখানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। উহা শূদ্রাদির অধ্যয়নযোগ্য* বেদার্থনির্ণায়ক গ্রন্থ হইল। রোমহর্ষণসূত ঐ ইতিহাস ও সংহিতাখানি ব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয়জনকে প্রদান করিলেন। অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শিংশপায়ন এই তিনজন আবার নিজ নিজ অধীত সংহিতা হইতে একাদশখানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। এইরূপে প্রণীত তিনখানি ও মূল একখানি এই চারিখানি মূলভূত পুরাণসংহিতা। প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ ঐ মূল সংহিতাচতুষ্টয় হইতেই আবির্ভূত। ব্যাসপ্রোক্ত সংহিতাখানি অষ্টাদশ মহাপুরাণের আকার ধারণ করিল এবং তৎশিষ্যত্রয়প্রোক্ত সংহিতাত্রয় হইতেই অষ্টাদশ উপপুরাণ প্রকাশিত হইল। মহাপুরাণ সৃষ্টি, অবান্তর সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্বন্তর,

* আজকাল এই কথার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। তৎ সং

বংশকথন, বংশানুচরিতকথন, প্রলয়কথন, বন্ধনমোক্ষ ও ভগবত্তত্ত্ব এই দশটী বিষয়ে পরিপূর্ণ। আর আর উপপুরাণ সকল সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণ-সমাযুক্ত।"

মহাভারতের

নীতি-বাক্য।

বনপর্ব্ব।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

ভীম।—মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্যই সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব সুখনাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত।

(আজগর পর্ব্বাধ্যায়—৬২৫

হনুমান।—বালক বৃদ্ধ লঘুচেতা ও উন্মাদলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচ গূঢ় মন্ত্রণা করিবে না।

ঐ।—মূর্খগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ঐ।—ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের নিকট ক্লীব ও ক্রূর কর্ম্মে ক্রূরগকে নিয়োগ করিবে।

(তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়—৫৩০

ভীম।—যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্য্যবসিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানিতে পারে না।

(অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—১১৯

যুধিষ্ঠির—যে ব্যক্তিতে সত্য দান ক্ষমা শীল অনৃশংস্য তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক-দুঃখ থাকে না, সেই সুখদুঃখবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য।

(আজগর পর্ব্বাধ্যায়—৬৩০

অজগর।—অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়।

(আজগর পর্ব্বাধ্যায়—৬৩২

মার্কণ্ডেয়।—বর্ত্তমান ক্লেশে অভিভূত হইও না। পণ্ডিতগণ কালযোগে কষ্টভোগ করিয়াও দুঃখবিমুগ্ধ হয়েন না।

মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়—৬৮৭

ঐ।—ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উভয় লোকেই সুখসম্ভোগ করে।

সর্ব্বভূতে দয়াবান, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়াশূন্য সত্যবাদী মৃদু দান্ত ও প্রজারঞ্জনতৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। দেব ও পিতৃগণের পূজা কর। যদিও প্রমাদবশতঃ কোন মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে দান দ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর। গর্ব্বিত হইও না, সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর।

(ঐ—৬৮৬

বক (মুনি)।—যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে?

আপন গৃহে ফল-মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর, তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাও সুখকর নহে।

যে ব্যক্তি অতিথি অভ্যাগত প্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সে-ই পরম সুখী; এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট।

(ঐ—১০০১

নারদ।—যিনি দেবগণের অনির্ণীত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্মনাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর ব্যক্তিকে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সাধু ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন তিনিই সাধুশীল।

ঐ—১০২

আকাশবাণী।—মনুষ্যের অনন্ত লোকলাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র হওয়া এবং পাপ সঙ্কল্পসকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃকর।

(ঐ—৭১৬

মার্কণ্ডেয়।—অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিষ্কৃতের জন্ম, পরান্নভোজীর জন্ম এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে তাহার জন্ম, এই চারি প্রকার জন্ম নিষ্ফল।

যে বস্তু অন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

(মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়—৭১৭

ঐ।—দান অপেক্ষা শাশ্বত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই।

(ঐ—৭২৯

যুধিষ্ঠির।—গুরু ও পতিব্রতা স্ত্রীগণ অবশ্য মান্য।

(ঐ—৭৩৯

ঐ।—দুরাত্মা নৃশংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

(ঐ—৭৪০

মার্কণ্ডেয়।—যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ কি শ্রাদ্ধ কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়।

(ঐ—৭৪১

ঐ।—ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। যিনি ক্রোধ-মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন; যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন; যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্বধর্ম্মে রত হন; যিনি যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন; যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

ঐ—৭৪৪

ঐ।—রমণীগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য।

(ঐ—৭৪৫

ব্যাধ—পার্থিবগণের অধর্ম্মই প্রজাগণের বিনাশের মূল।

(ঐ—৭৪৯

ধর্ম্মব্যাধ।—ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান ধর্ম্ম। মিথ্যা-বাক্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে। অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কাম ক্রোধ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না; অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না। অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে। পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না। প্রত্যুত: সর্ব্বদা সাধুই হইবে। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে সে স্বতই বিনষ্ট হয়। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(ঐ—৭৪৯

ঐ।—অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। মূর্খ ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট হইলেও শোভমান হন। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করত কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ।—ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন; কারণ প্রমাদ বশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার নাশ হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণ-পথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘ-বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

(ঐ—৭৫০

ঐ।—লোভই সমুদায় পাপের আশ্রয়। যজ্ঞ দান তপস্যা বেদ ও সত্য এই পাঁচটী পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ। গুরুশুশ্রূষা সত্য অক্রোধ দান—এই চারিটিও শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ।

(ঐ—৭৫১

ঐ।—যাঁহারা সুসংযত লোভমুক্ত দানপরায়ণ ধর্ম্মপথের পান্থ ও সত্য ধর্ম্মে সংসক্ত, তাঁহারাই শিষ্ট।

(ঐ—৭৫২

যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শান্তস্বভাব; যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় অভিজ্ঞ শুদ্ধাচার মনস্বী গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত ও দমপরায়ণ তাঁহারাই শিষ্টাচারসম্পন্ন।

ঐ—৭৫৩

সংগ্রহ।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসক-দিগের মত।—(১) লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সাদারলাণ্ড আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিয়া Indian Medical Gazetteএ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ চিকিৎসার মূলে অন্ধ কুসংস্কার দণ্ডায়মান। কবিরাজ-দিগের রোগনির্ণয়পদ্ধতি তাঁহার আক্রমণের প্রধান বিষয়।

(২) আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত ফিলাডেল্‌-ফিয়ার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্ক বলেন—"যদি চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে আধুনিক সমস্ত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালীমতে চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য্য কমিয়া যাইবে এবং পৃথিবীর পুরাতন ব্যাধিপীড়িতদিগের সংখ্যা অতি সামান্যই থাকিবে।"

(৩) সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক Sir Purdis Lukis বলেন—"যত অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি, এই দেশের সহিত আমার পরিচয় যত বৃদ্ধি হইতেছে, এই দেশের বৈদ্য ও হাকিমদিগের চিকিৎসার মূল্য আমি তত হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।"

স্বাস্থ্যসমাচার, বৈশাখ ১৩২৬।

ব্যবসায়ের মূল নীতি।—Keep accurate and conscientious accounts; conduct business economically; do not loaf; do not steal; maintain strict discipline at work.

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

বাহাই ধর্ম্মে নারীর স্থান।—বাহাউল্লা বলেন—পরিবারের ছেলে ও মেয়ে একই শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, কারণ শিক্ষার একতায় একপ্রাণতা আসে। কি ধাতব, কি উদ্ভিদ, কি পশুজগতে নারী ও পুরুষ জীবনধারণের সকল উপকরণ সমভাবে ভোগ করিতেছে। মানবজগতে কেন তাহার বিপরীত হইবে? ভগবানের চক্ষে তাঁহারা সমান, কারণ তিনি তুল্য করিয়াই দুই জনকে গড়িয়াছেন। জীবনের হাত হইতে সকল অমৃত ফলগুলি লইতে নারী কেন পারিবে না? যে যত অখণ্ড মানবজাতির সেবা করে সে ততই ভগবানের সন্নিহিত, কারণ পুরুষ বা নারী বলিয়া তাঁহার কাছে কোন পক্ষপাতিতা নাই। নারী ও পুরুষ পাখীর দুইটী পাখা; সুতরাং সেই যুগল ডানা যদি একই ইচ্ছার প্রেরণা পায়, তবেই তাহা মানবজাতিকে উন্নতির স্বর্গের পথে লইয়া যাইতে পারে।

শিশুর শিক্ষা বাধ্যতামূলক হউক। যদি কোন পরিবারে অর্থের অনটন ঘটে, তাহা হইলে যাহা আছে তাহা দ্বারা মেয়েকেই প্রথমে শিক্ষা দিয়া গড়িতে হইবে, কারণ মেয়ের মধ্যে শিশুর মা সুপ্ত আছে। দৈব ঘটনায় শিশু যদি পিতৃমাতৃহীন হয়, তাহা হইলে সমাজ তাহার শিক্ষার ভার স্বয়ং লইবে।

পূর্ব্বে নারীর শিক্ষা অনাবশ্যক ছিল, কারণ নারী ছিল পরিবারের দাসী। কিন্তু যথার্থত নারীর শিক্ষা পুরুষের অপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়। মাতা যদি অজ্ঞ হয়, আর পিতা যদি হয় জ্ঞানের আধার, তাহা হইলে শিশুর শিক্ষা অঙ্গহীন হইবে, কারণ মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুর জ্ঞান আরম্ভ হয়। মাতৃবক্ষে ঐ কোমল শিশু যে ভাবী বৃক্ষের কোমল তন্তু বা কাণ্ড।

মায়ের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে শিশুর জীবনপথ সরল হইবে; আর তাহা অসম্পূর্ণ হইলে সেই কোমল জীবনে অর্পিত অসম্পূর্ণ শিক্ষার সেই বিকৃত চিহ্ন ইহজীবনে মুছিবে না। এই জন্য ইহা পুনঃপুনঃ স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, পরিবারে কন্যা অশিক্ষিতা ও বিকৃতভাবে গঠিত হইলে, মা হইয়া বসিবার সময়ে সেই কন্যা সন্তানের অনেক অজ্ঞান, অযত্ন, কুশিক্ষা ও দীনতার কারণ হইবে।

অগ্রসর হইয়া জগতে সুনীতি প্রচার করাই আজ নারীর অতিবড় কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, বিজ্ঞান ও কলাশিক্ষার বল যে তাহাদের আছে, এবং তাহারা যে জীবনের সকল পথে পুরুষের সমতুল্য, ইহা জগতে নারীদিগেরই প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। বাহাই-নারী যে নৈতিক জীবনের সর্ব্ববিধ গুণগ্রামে, শুদ্ধভাবে ও পুণ্যকর্ম্মে পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহে, ইহা সর্ব্বাগ্রে নারীরই দেখান আবশ্যক।

নারীর ইচ্ছাশক্তি পুরুষের ইচ্ছাশক্তির তুলনায় অনেক বড়। সুনীতি, বিবেক ও অপরোক্ষ অনুভূতিতেও নারীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে ও ধর্ম্মে তোমার সহধর্ম্মিণী খুঁজিয়া লইও। সে যেন পূর্ণতার পথের পথিক হয়। তোমার জীবনের সকল ধারা সে যেন বোঝে এবং আপনার বুকে খুঁজিয়া পায়। তাহার জীবনকে যেন দয়া, সহানুভূতি, প্রসন্নতা ও তুষ্টি উজ্জ্বল করিয়া রাখে। তুমিও তাহার জীবনে সুখ আনিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিবে এবং ভগবৎপ্রেমের ভিতর দিয়া তাহাকে ভালবাসিবে। স্ত্রীপুরুষের প্রেমবন্ধনে ভগবান যে মহামিলন যে সামঞ্জস্য নিহিত রাখিয়াছেন, সৃষ্টির কোনও স্তরে তদপেক্ষা মহত্তর সামঞ্জস্য মানবের কল্পনারও অতীত। ভগবান তোমাদিগকে যদি সন্তানপ্রদান করেন, তাহাদিগকেও এই আনন্দপুরীর মধুগর্ভ পুষ্প করিয়া ফুটাইয়া তুলিও।

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

গ্রন্থপরিচয়।

ভিখারিণী।—শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভাদুড়ী—মেসার্স জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং। ৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার তত্ত্বোধিনী পত্রিকার পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর হইল, তিনি নিয়মিতরূপে পত্রিকাতে তাঁহার কবিতা প্রকাশ করিতেন। সেই সকল কবিতার ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। অনেক দিন নীরব থাকিয়া নলিনীবাবু এবার যে পুস্তকাকারে তাঁহার কয়েকটী কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে আমরা বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। আজকালকার দিনে লঘু সাহিত্যেরই আদর। এই অবস্থায় তিনি যে অধিক পাঠক লাভ করিবেন সে আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁহার মত কবি যদি ঐরূপ নিতান্ত লঘু সাহিত্যের বিরুদ্ধে আঘাত না দেন, তবে আমাদের হতাশ হইতে হয়। এই গ্রন্থের সকল কবিতারই মধ্যে গ্রন্থকার সেই পূর্ব্বেকার ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্যের ধারা সুন্দর বজায় রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বাজারের কবিতাগ্রন্থ বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। ইহার পত্রে পত্রে গ্রন্থকারের প্রাণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহার প্রতি কবিতা পাঠকের হৃদয়ে এক উন্নত ভাব আনিয়া দিবে। শুনিলাম, গ্রন্থকার এই পুস্তকের লভ্যাংশ কোন সৎকার্য্যে দান করিবেন। এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিলে কবিতার সৌন্দর্য্য উপভোগ এবং সৎকার্য্যে সাহায্য, উভয় কার্য্য একসঙ্গেই হইবে। গ্রন্থের মলাটখানি সুচিত্রিত হইয়াছে—মনে হয়, যেন কোন্ অন্তরাল হইতে কে প্রসাদভিক্ষা করিতেছে এবং যেন কোন্ অন্তরাল হইতে কোন্ অদৃশ্য দেবতা প্রসাদবিতরণে অগ্রসর হইতেছেন। মূল্য দরিদ্র বঙ্গবাসীর পক্ষে কিছু অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

পাততাড়ি।—সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়। বৈশাখ ১৩৩৪—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। কার্য্যালয়—বেহালা, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা।

পত্রিকাখানির নামকরণ হইতে বুঝা যাইতেছে ইহা ছেলেমেয়েদের মাসিক, সুতরাং সচিত্র। 'কৈফিয়তে' সম্পাদকমহাশয় জানাইয়াছেন, ইহা ছেলেদের স্বয়ংপরিচালিত পত্রিকা; এবং তাঁহারা আপন ভাই-বোনদের রূপকথার ক্ষেত্র হইতে দেশের চারিদিকে যে নূতন হাওয়া বহিতেছে, তাহার সংস্রবে আনিতে চান। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহার নিদর্শনও পাওয়া গেল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে কিশোর সাহিত্যিকদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

সংবাদ।

সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তি।—যাঁহাদের অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়া ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সংরচিত হইতেছে, বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাদের অন্যতম। দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কার্য্য ইহাঁর দ্বারা কতকটা সুসম্পন্ন হইবে, ইহা আমরা আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ। ইতিপূর্ব্বে কারা হইতে মুক্ত হইবার প্রলোভন তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু দেশের ও স্বজাতির কল্যাণসাধনের ব্রত লইয়া যাঁহারা আবির্ভূত, কোন প্রলোভনেই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্নদেহ লইয়া তিনি এক্ষণে কারার বাহিরে। কিন্তু জীবনে যে মহান লক্ষ্য সাধনের কঠিন বন্ধন তিনি সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন, উহা এখনও শিথিল হয় নাই। এই বাঁধন বহিবার শক্তি ও সামর্থ্য তিনি লাভ করুন, তাঁহার শরীর নিরাময় হউক, ইহাই ঈশ্বরের নিকট সমগ্র দেশবাসীর প্রার্থনা।

দানপ্রাপ্তি।—৭।১ লভলক প্রেস—বালিগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল মহাশয় তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার আদিব্রাহ্মসমাজে এককালীন যে ২৫৲ পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন, আমরা উহা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ম ঘটিকার সময় ৺তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস যথাসময়ে পুষ্পমাল্য ও গন্ধধূপাদির পবিত্র সৌরভে শ্রাদ্ধসভাটী পূর্ণ হইলে সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে যথাশাস্ত্র 'শয্যাসন' প্রভৃতি ষোড়শ দানসামগ্রী উৎসর্গীকৃত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা ও শ্রাদ্ধকর্ম্ম সুসম্পাদন করিলেন। বালিকা-কণ্ঠে কয়েকটী সময়োচিত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সভার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধসভায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রমথবাবু আদিব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

৺তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।—পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পৌত্র স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈবাহিক তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ৭-৪০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতা চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীটের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র ব্যারিষ্টরপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হিতেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ইনি একজন স্বাধীনচেতা আত্মনির্ভরশীল স্বাস্থ্যবান্ ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ জীবনে ইঁহাকে যেমন কখনও রোগগ্রস্ত বা শয্যাগত হইতে দেখা যায় নাই, তেমনই কাহারও—এমন কি, উপার্জ্জনক্ষম সুযোগ্য পুত্রগণেরও মুখাপেক্ষী হইতে কেহ দেখে নাই। এই রোগহীন আত্মনির্ভরশীল কর্ম্মক্ষম দীর্ঘ জীবনই ইঁহার আত্মার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি বেশ জ্ঞান ছিল। আমরা ইঁহার বিয়োগব্যথা-কাতর পুত্রপরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

বিগত চৈত্র ও বৈশাখ-সংখ্যার কয়েকটি অশুদ্ধি-শোধন।

মাস	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চৈত্র ১৮৪৮	৩৩১	১ম	১৩	পাঠকস্মত্রে	History of Philosophy পাঠ সূত্রে
"	"	"	২৪	1723—1749	1723—1789
"	"	"	২৪	Systene	Systeme
"	"	"	৪১	Systemetic materialissm	Systematic [materialism
"	"	"	৪২	Gassaudi	Gassendi
"	"	২য়	১	Disquigition	Disquisition
"	"	২য়	২	Causes	Causes of
বৈশাখ ১৮৪৯	৭	২য়	৩	পত্র	পত্রে
"	"	"	১৭	আমাদিগের	আমারদিগের
"	৮	১ম	৫	নিবারণার্থ	নিরাকরণার্থ
"	৮	"	৪০	কয়েক দিন	কয়েক পল
"	৯	"	২	খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩১—১৮৫১	খ্রীষ্টাব্দ ১৭৮৫—১৮৬৯
"	"	"	?৩	১৮৫২—১৮৮৭	১৮৩২—১৮৮৭
"	"	২য়	৩৫	অদ্য	...অদ্য
"	"	"	৩৬	কেহই	...কেহই
"	১০	১ম	১৩	এমন	এমত

বিজ্ঞাপনী।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমানে ৮৫ বৎসরে চলিতেছে)

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৶৹ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৶৹।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।০ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণ এবং জীবনীসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রকাশের জন্য রচনাদি ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৫ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	৬৲	প্রতিমাসে।
"	½ "	৪৲	"
"	¼ "	২৲	"

মলাটের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনসংগ্রহকারিগণকে উপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়।

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেণ্ট হইলে টাকায় ।০ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 4 2

দ্বাবিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৭ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। আষাঢ়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

'অশ্বান'

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সৌদামিনী দেবী

দ্বাবিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৭ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮৫। অঞ্জলি—পরমাত্মা দেবতা।

১। তুমি মহাবলী। তোমার বল জগতের কোন কিছুই সম্যক ধারণ করিতে পারে না। তুমিই আমাদের একমাত্র সম্ভজনীয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ শাণ্ডিল্য ঋষি তোমার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়া তোমাকে আত্মার আত্মারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ তোমার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়া তোমার সম্বন্ধে এক নবতর সত্য প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার প্রদান কর। আমরা যেন নিত্য নূতন স্তবে তোমাকে অর্চ্চনা করিতে পারি। তুমিই আমাদের একমাত্র গুরু ও নেতা। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

২। তুমি মহান্। তুমি পরম পুরুষ। আমরা মিলিতকণ্ঠে তারস্বরে তোমার জয়গান করিতেছি। তুমি আমাদের সহায় হও, যাহাতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যশ ও কীর্ত্তির সম্যক অধিকারী হইতে পারি।

৩। আমরা বহু চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু প্রচুর ধনসম্পদ লাভের সন্ধান আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। তুমি আমাদিগকে সেই সন্ধান বলিয়া দাও। তুমি আমাদের অন্তরের গুরু, তুমি আমাদের বাহিরের গুরু। তুমি আমাদের শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য বস্তুসকল উদ্ধার করিয়া দাও। আমাদের অশান্ত হৃদয় শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক।

৪। তোমার নামে আমরা যে সকল শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সমাপ্ত করিতে পারিয়াছি এবং যাহা সমাপ্ত করিতে পারি নাই, তুমি সেই সমস্ত কর্ম্মেরই ভিতর দিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান কর, আমাদিগকে ইহলোকে সুমতি এবং পরলোকে সদ্গতি প্রদান কর। তোমার শক্তিতে আমাদিগকে শক্তিমান কর। তুমি আমাদিগকে মেধা ও বীর্য্য প্রদান কর। আমরা তোমার বিজয় ঘোষণা করি। তোমার শাসনে ভূধর-সাগর বিকম্পিত হয়; তোমার শাসনে মেঘ বারি বর্ষণ করে; এবং তোমারই শাসনে মৃত্যুও সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকে।

৫। হে পরম পুরুষ! তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর। প্রভাতের উদিত মহিমায় গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া তোমারই সুন্দর বিমল মূর্ত্তি প্রকাশ পায়; পৌর্ণমাসীর সুধাধবলিত আকাশে তোমারই অনিন্দনীয় বিশুদ্ধ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। তোমারই ইঙ্গিতে ধরাপৃষ্ঠ সমতল ও শস্যশ্যামল হইয়া

জীবগণের আবাসভূমি হইয়াছে। তোমারই ইঙ্গিতে অন্তরীক্ষে লক্ষ লক্ষ সূর্য্যচন্দ্র এবং কোটী কোটী গ্রহনক্ষত্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

৬। জীবগণ যাহাতে জীবন ধারণ করিয়া উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তুমি এই ধরণীকে সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ এবং এই ধরাপৃষ্ঠকে শত সহস্র উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমবাহিনী নদীসকলের দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়াছ।

৭। তোমাকে প্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা বা তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা লাভ করা যায় না; প্রভূত ধনরত্নের দ্বারাও তোমাকে পাওয়া যায় না। যাহার প্রাণে তোমাকে লাভ করিবার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সে-ই তোমাকে লাভ করে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করিয়াও উভয়কে তোমার প্রেমে কেমন একসঙ্গে আবদ্ধ রাখিয়াছ, এবং শোভনকর্ম্মা তুমি তোমার প্রেমে এই মহাশূন্যে কি আশ্চর্য্যরূপে দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তোমার ভক্ত তাহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করেন।

৮। তোমার শাসনে ঊষা প্রতিদিন নিত্য নবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোককে নিত্য নূতন সাজে সুসজ্জিত করিয়া দেয়। তোমারই শাসনে রাত্রিও প্রতিদিন নিত্য-নব কমনীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষকে শতবিধ রত্নখচিত নিত্যনব সুশোভন পরিচ্ছদে সমাবৃত করে।

৯। তোমার জ্ঞানবলক্রিয়া যেমন স্বাভাবিক, তোমার কর্ম্মসকলও তেমনই আশ্চর্য্য। তোমার জ্ঞান ও বল উভয়ই অপ্রতিহত। তুমি তোমার ভক্ত ও সেবকদিগের যোগ-ক্ষেম নিত্যই বহন কর। তুমিই একমাত্র দীনজনের বন্ধু। তুমি মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিয়া জীবগণের রক্ষার বিধান করিয়াছ। তুমি যেমন শুভ্র ও নির্ম্মল, তোমার করুণাধারাও সেইরূপ চিত্তে নির্ম্মল শান্তি বহন করিয়া আনে।

১০। তুমি পদরহিত, কিন্তু ব্যোম অপেক্ষাও বেগবান। তুমি হস্তরহিত, কিন্তু তোমার কর্ম্মের বিরাম নাই। তোমার কোনই কামনা নাই, কারণ ইচ্ছামাত্রেই তোমার সকল কামনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র তোমার সদাব্রত উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমরা ভ্রাতা ও ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া তোমার চরণপূজার জন্য এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি এবং তোমার চরণে আমাদের প্রাণ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। তুমি দীপ্তদীপ হইয়া আমাদের আঁধার প্রাণকে আলোকিত কর।

১১। হে সকল সৌন্দর্য্যের আকর! তোমারই সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়া এই জগতসংসার সুন্দরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যাহারা কেবলমাত্র জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া তোমাকে লাভ করিতে চায়, তাহারা তোমাকে পাইবার সুগম পথ দেখিতে পায় নাই। যাহারা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিধারার সঙ্গমক্ষেত্র শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া তোমাকে লাভ করিতে চায়, তাহারাই তোমাকে পাইবার সুগম পথ দেখিয়াছে; পবিত্র প্রেমের সাহায্যে পতি ও পত্নী যেরূপ একাত্মীভূত হয়, শ্রদ্ধার সাহায্যে সেইরূপ মানব তোমার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়।

১২। হে সুন্দরতম পুরুষ! তোমার যে সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়া জগতসংসার সুন্দর হইয়াছে, সে সৌন্দর্য্যের ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই। জগতে যে ঐশ্বর্য্য তুমি বিস্তীর্ণ রাখিয়াছ, তাহাও যেমন ক্ষয়রহিত, জগতে যে সৌন্দর্য্য তুমি বিকীর্ণ রাখিয়াছ, তাহাও সেইরূপ নাশরহিত ও অক্ষয়। হে পরমেশ্বর! তুমি সকল জ্ঞানের পরম জ্ঞান; সকল তেজের মূল তুমি; এবং সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও তুমিই। তোমারই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকে আমরা অবলম্বন করিয়াছি, তুমি সেই কর্ম্মসাগরের ভিতর হইতে আমাদিগকে ধনরত্ন ও সুখসম্পদ আনিয়া দাও, যাহাতে আমরা তোমার সন্তান বলিয়া গৌরব করিতে পারি।

১৩। তুমি সকলের আদি, তুমি অনাদি মহেশ। তুমি সহস্রনেত্র; বিশ্বভুবনে এমন স্থান নাই, যেখানে তোমার অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টি পৌঁছায় নাই। সপ্ত অশ্বে রথযোজনা করিয়া সূর্য্য যেরূপ অমিত বেগে স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, তুমি তাহারও অগ্রে চলিয়া, মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছ। হেমেন্দ্রপুত্র ক্ষিতীন্দ্র তোমার অর্চ্চনার জন্য এই যে সকল নবতর স্তোত্র রচনা

করিয়াছেন, তুমি এই পবিত্র মুহূর্ত্তে এই পবিত্র স্থানে আসিয়া সেই সকল স্তোত্র শ্রবণ কর ও তৃপ্তিলাভ কর।

৮৬। অঞ্জলি—পরব্রহ্ম দেবতা।

১। হে পরম পুরুষ! তুমিই আমাদের সেনাপতি ও অগ্রণী। শত্রুগণ যখন আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া নিহত করিবার চেষ্ট করিয়াছিল, তখন আমরা ভয়ে ত্রাসে তোমারই শরণাগত হইয়াছিলাম। তুমি আমাদিগকে কি আশ্চর্য্য কৌশলে শত্রুদিগের বিস্তৃত বিপদজাল হইতে সহজেই মুক্ত করিলে। তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের দ্বারা ত্রিভুবন ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

২। তুমি যখন জগত সংসারে বিধাতারূপে অবতীর্ণ হও, তখন তোমার এক হস্তে বজ্রদণ্ড উত্তোলিত থাকে, অপর হস্তে তোমার অভয়বর জাগ্রত থাকিয়া লোকদিগকে শান্ত করিতে থাকে। তোমার সেই বজ্রদণ্ডের দ্বারা তোমার প্রতি অশ্রদ্ধাবান শত্রুগণ সহজেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

৩। তুমিই ঈশ, তুমিই মহেশ। তুমিই মহাসত্য। সংশয়াত্মাগণ তোমার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেও সহজেই পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তুমিই আমাদের বন্ধু, তুমিই আমাদের অধিপতি। তুমিই আমাদের পাপতাপসকল বিদূরিত কর। পাষণ্ডেরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অধর্ম্ম্য কঠিন সংগ্রাম ঘোষণা করে, তখন তুমিই তাহাদিগকে তোমার এক ইঙ্গিতে, পশ্চিমে ঝড়ের সম্মুখে ধূলিরাশির ন্যায়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া উড়াইয়া দাও।

৪। তোমার প্রতি সংশয়াত্মা ও অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণকে বজ্রদণ্ডে শাসন করিয়া যেমন তুমি তোমার মঙ্গলপথে ফিরাইয়া আন, তেমনি তুমি তোমার ভক্তগণকে অভয়দান করিয়া তোমার মঙ্গলপথে সুরক্ষিত রাখ। তোমার অগ্নিবৃষ্টি দ্বারা শত্রুগণ দগ্ধ হইয়া পরাভব স্বীকার করে। তোমার করুণাবারি অবিরলধারে ভক্তগণের মস্তকে ঝরিয়া অনির্ব্বচনীয় সুনির্ম্মল শান্তি প্রদান করে।

৫। তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দাও। আমরা যখন শত্রুগণকর্ত্তৃক বিপদজালে পরিবেষ্টিত হইব, তখন তুমি তোমার করুণাধারার উৎস আমাদের চারিদিকে খুলিয়া দিও। তোমার স্নেহপ্রেম কোমল ও অচ্ছেদ্য আকারে আমাদিগকে ঘিরিয়া থাক ও রক্ষা করুক; কিন্তু তাহা কঠিন ও শাণিত বজ্রের আকারে আমাদের শত্রুগণকে পরাভব প্রদান করুক।

৬। হে বিশ্ববিধাতা! সংসারে প্রতিপদে আমাদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তুমি সেই সকল সংগ্রামে আমাদিগকে বিজয়ী কর এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ধনধান্যে লাভবান কর। তুমি আমাদের সর্ব্বথা সহায় হও। তুমি মহাবল। তোমার বল কেহই প্রতিহত করিতে পারে না। তুমিই রক্ষকদিগেরও রক্ষক। তোমার বল আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুক; আমরা তোমার শরণাগত।

৭। তুমি ভয়ানকের ভয়ানক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বিপদের ঘনজালে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন তুমিই তাঁহাদের সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে সেই বিপদজাল হইতে মুক্ত করিয়াছিলে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া তোমারই পক্ষে চলিবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শতবিধ উপায়ে যন্ত্রণা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ধনে ও মানে যথেষ্ট উন্নত করিয়া তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলে। আজ পর্য্যন্ত আমরা তোমার প্রদত্ত সেই ধন ও মানের অধিকারী হইয়া জগতের মাঝে উন্নতশিরে চলিতে পারিতেছি।

৮। তুমি আমাদের ভগবান, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। আমাদের অধিকৃত ভূমিতে যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিয়া শস্যপূর্ণ করিয়া দাও। সেই শস্যের দ্বারা আমরা যেন আপনাদিগকে ও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে সর্ব্বতোভাবে পরিপোষণ করিতে পারি। তোমার প্রদত্ত শস্যরাজি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আমরা যেন সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে তোমার বিজয় ঘোষণা করিতে বিরত না হই।

৯। হে পরমেশ্বর! তুমি মন হইতেও বেগবান। আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ কর। তুমি আমাদের মনকে জ্ঞানের ভাণ্ডার করিয়া তোল এবং আমাদের আত্মাকে সর্ব্বদা তোমার চরণে সংযুক্ত রাখ। আমরা তোমাকে ভক্তিভরে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের মধ্যে এসো এবং আমাদিগকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে তৎপর কর।

সুখশান্তি কোথায়?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভাই, বন্ধু! তোমরা তো এখানে উপদেশ, ওখানে বক্তৃতা দিবার জন্য আমাকে কত-না অনুরোধ কর। কিন্তু উপদেশ-বক্তৃতা দিব কি? আমি যখন আমার অন্তরে প্রবেশ করি, তখন সত্যই আমার নিজের অজ্ঞতায় আমি নিজেই স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। এই অজ্ঞতার ভিতর দিয়া জ্ঞানের পথে চলিতে গিয়া সময়ে সময়ে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি। আমার এই অজ্ঞতার জন্য আমি নিজেকে সকলেরই চরণের দাস বলিয়া মনে করি—মনে হয় সকলেরই কাছে আমার শিখিবার বিষয় আছে; সুতরাং সকলেই আমার গুরুস্থানীয়। এই অবস্থায় আমি জানি না, কাহাকে আমি চোর-বদমায়েস বলিব এবং কাহাকেই বা সাধুসন্ত বলিয়া ডাকিব।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় তো অনেক ভোগ করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখসম্পদের ভিতর দিয়া শান্তির মূলের সন্ধান পাইব—কিন্তু না; পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে শান্তি তো নাই, সুখও নাই। তাহা রক্ষা করিতে প্রাণের ভিতর আশঙ্কা সংশয় প্রভৃতির আগুন যে রকম ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠে—তাহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য প্রাণের ভিতর আকুল ক্রন্দন জাগিয়া উঠে—রক্ষা কর দয়াময়—কে তুমি তাহা জানি না, কিন্তু রক্ষা কর, রক্ষা কর দয়াময়—এই আগুনের জ্বালা হইতে আমাকে রক্ষা কর। এই সকলের জন্য যে, দুর্লভ মানবজন্ম যিনি দিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া যাই—কি আর বলিব, লজ্জায় ও ধিক্কারে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

দূরেতে বনে জঙ্গলে যে শৃগাল ডাকে, নিমগাছে বটগাছে বসিয়া যে দাঁড়কাক ডাকে—এই সুখসম্পদের নিকট তাহাও যে সুধামাখা, শান্তির মধুবাণী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের আনন্দে আমারও হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। তখন সত্যই মনে সেই আনন্দস্বরূপের কণামাত্র আনন্দে জীব আনন্দিত হয়। তখন তোমরা আমার কাছে আসিলে সত্যকার দুইচারিটা প্রাণের কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই রাজধানীতে বেড়াইবার জন্য বাহির হও, কি গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, পথিকদের কি অমানুষিক নিষ্ঠুর ঠেলাঠেলি—কাহারও কষ্টে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—ইহাই তো তোমাদের সংসার, আর এইখানে তুমি আমাকে শান্তস্বরূপের বিষয়ে উপদেশ দিতে বল?—এখানে প্রাণ হইতে সে উপদেশ বাহির হয় না।

সমুদ্রের ধারে গিয়া পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার সময় দাঁড়াও—পূর্ণচন্দ্রের সুধাধবলিত জ্যোৎস্না যখন ঝিকিমিকি করিয়া তোমার নয়নে প্রতিভাত হয়, তখন তোমার চক্ষু স্বতই অন্তরে গিয়া জাগ্রত হয় এবং তোমার বহির্দৃষ্টি নিমীলিত হইয়া আসে। কিন্তু শত শত লোক তোমার সেই নিমীলিত চক্ষুর ভিতরে যে বক্তৃতা শোনে ও যে উপদেশ লাভ করে, সহরে বসিয়া তুমি যে অনর্গলভাবে শত শত বক্তৃতা ও উপদেশ দাও, তাহার মধ্যে সেই নীরব কিন্তু সবল উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমি যাহা বক্তৃতা দিব, পরক্ষণেই তাহা শত সহস্র খণ্ডে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে—কিন্তু ইহার ফল কি? দুই চারি পয়সায় তোমরা তাহা কিনিলে এবং নিজের মেজাজের অবস্থা অনুসারে হয় তাহা পড়িলে অথবা তাহা না পড়িয়া পথের ধারে ফেলিয়া দিলে। তাহা অপেক্ষা মনে হয় না কি যে, আমি নীরব থাকি, যাঁহার প্রয়োজন হইবে, এবং যাঁহাকে ভগবান প্রকৃত আকাঙ্ক্ষী বলিয়া আমার কাছে পাঠাইবেন, তাঁহারই সঙ্গে একটী সুবৃহৎ বক্তৃতা

বা উপদেশের সংক্ষিপ্ত আকারে দুই চারিটী কথা বলিব—আমিও বুঝিলাম, তিনিও বুঝিলেন এবং পরক্ষণেই আমরা উভয়ে চক্ষু বুজিয়া পরস্পরের হৃদয়ের সমস্ত বক্তব্যটী নীরব ভাষায় কাড়িয়া লইব—এই পন্থাই ভাল ?

সংসারের ক্ষুদ্র কাণাকাণি—অমুক অমুককে মারিল, অমুকের কথা অমুক বুঝিল না, অমুক এই বক্তৃতা করিলেন, এই প্রকার যে সকল সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হয়, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের কি কোন লাভ হয় ? সেই সমস্ত পাঠ করিবার ফলে সত্যই কি আমরা সংসারকে ঠিকমত বুঝিতে পারি ? ইহার ঠিক উত্তর তুমি কখনই দিতে পারিবে না। সংসারকে ঠিকমত না বুঝিলে, তুমি যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিবে, সে সমস্তেরই অপপ্রয়োগ করা তোমার পক্ষে সহজ হইবে। তোমাদের রেলগাড়ী আছে, কলকারখানা আছে, জাহাজ আছে, বি-তারে কথা চালাইবার ব্যবস্থা আছে, বিজ্ঞানের শতবিধ বিভাগ তোমার আয়ত্ত আছে। কিন্তু এই সকলের ভিতরে, সত্য কথা বল, প্রকৃত শান্তি পাইয়াছ কি ? অথবা এই সকলের জন্যই বরঞ্চ অশান্তির হুতাশন তোমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করিতে চাহিতেছে ?

আমি নীরব আছি বলিয়া এবং তোমাদের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা আছে বলিয়া অনেক সময়ে তোমরা আমার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। কিন্তু ইহাও জানিও, আমিও তোমাদের নিজেদের উপর প্রকৃত মায়ামমতার অভাব দেখিয়া দুঃখে করুণায় উদ্বেলিতহৃদয় হইয়া পড়ি। ইহা শুনিয়া তোমরাও আমার ভ্রান্তির জন্য দুঃখিত হইতে পার এবং আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িতে পার, কিন্তু আমি ইহাতে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

তোমরা যে এই সব মোটর গাড়ী, কলকারখানা সহরের প্রত্যেক গলিঘুঁজিতে প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছ—নিছক সত্য কথা বল যে, ইহার ফলে অধিবাসীদের নীতি-চরিত্র অবনত হইতেছে বা উন্নত হইতেছে ? যদি অবনতই হইয়া থাকে, যদি এই সমস্তের ফলে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে এই সমস্ত বস্তুর প্রবর্ত্তনায় লাভ কি ? নীতির কথা থাক, চরিত্রের কথা থাক, এই সকলের দ্বারা কি তোমাদের প্রকৃত আনন্দের এক কণাও বৃদ্ধি হইয়াছে, অথবা তোমাদের দুঃখের এক কণাও হ্রাস হইয়াছে ? বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, তোমাদের অসন্তোষ এবং অশান্তি ও তজ্জনিত দুঃখের মাত্রা বরঞ্চ বাড়িয়াই গিয়াছে এবং তাহার ফলে আনন্দ যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করে, তাহার ঠিকানাই পাওয়া যায় না।

সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তোমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া থাকিলেও তোমরা যে সময়ে সময়ে সাধকের নিকট ছুটিয়া আইস, তাহাতেই বিষয়সুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব সুস্পষ্ট বুঝা যায়। মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া সকল সত্যের মূলকে আশ্রয় কর। তোমাদের সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, সকল সংশয় ও অশান্তি কাটিয়া যাইবে। তোমাদের "পরা শান্তি" লাভ হইবে ; সংসারের ক্ষুদ্রভাব, ক্ষুদ্র কাণাকাণি তোমাদের অসহ্য হইয়া উঠিবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

ব্রহ্মদেশীয় নাটক। ১৩১৩ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "রজতগিরি" নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে অনুবাদ।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও অতিশয় সত্য যে, আমরা ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা ইউরোপীয়দিগের বিষয় যতদূর জ্ঞাত আছি, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমাদের দেশভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে ততদূর অবগত নহি। ইংরাজ লেখকগণের মধ্যবর্ত্তিতায় আমরা তাঁহাদের পরিচয় লইয়া থাকি। কোনও জাতির সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে সে জাতিকে ভাল বুঝা যায় না। কিন্তু অতি অল্প বাঙ্গালীই গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলুগু—এমনকি, হিন্দী সাহিত্যেরও আলোচনা করিয়া থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুদিন সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই প্রদেশে ছিলেন এবং তথায় অবস্থানকালে সযত্নে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি মারাঠী ভাষা হইতেও রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গভাষা-জননীর কিরীট-শোভা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 'সাধনা'য় 'মারাঠী ও বাঙ্গলা'-শীর্ষক

একটি সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। উহার উপসংহারে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেজ বৌ' প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ মারাঠীতে অনূদিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীর অন্যান্য প্রদেশের ভাষাশিক্ষার উপকারিতা প্রদর্শন করেন। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন—"যথন দেখিব আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষার আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক বাঙ্গালার সাহিত্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জানিব বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির উদয় হইয়াছে।"

দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস "ঝাঁশী সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাঁচে চরিত্র" নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে প্রখ্যাত বীরাঙ্গনা মহারাণী লক্ষ্মীবাইএর একটী প্রামাণিক ও আনুপূর্ব্বিক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের একটী জাতীয় অভাব মোচন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই গবেষণাপূর্ণ প্রস্তাবটীর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

কয়েক বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়ের সাধ্বী পত্নী রমাবাই রাণাড়ে তাঁহার অলোকসামান্যচরিত্র স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উহারও একটি সুললিত বঙ্গানুবাদ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশ করেন। আমরা এই প্রস্তাবটী পাঠ করিবার জন্য আগ্রহের সহিত মাসের পর মাস 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতীক্ষা করিতাম। এই প্রস্তাবটী শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রস্তাবের বিষয়ীভূত মহাত্মার, পুণ্যচরিত্রা লেখিকার এবং নিপুণ অনুবাদকের গুণে উহা বঙ্গবাসীর নিকট চিরদিন সমা-দৃত হইবে সন্দেহ নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডার-করেরও কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই অনুবাদ-কার্য্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-বিরচিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্যে"র বঙ্গানুবাদ। মান্দালের কারাগারে অবরুদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা তিলক মূলগ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও শাস্ত্রজ্ঞানের যে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহার পরিচয় না লইলে দরিদ্র থাকিত। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় নয় শত পৃষ্ঠা ডিমাই অক্টেভো সাইজের এই গ্রন্থ অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে (৭ই পৌষ ১৩৩০ ইং ১৯২৪) ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাহায্যে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনু-বাদকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত "গীতা রহস্য" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ-ক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-কল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরু ভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।"

এই গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এস্থলে বলা যাইতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ মহাত্মা তিলকের গীতারহস্যের উপক্রমণিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন এবং লোকমান্য তিলককে অনুবাদ-প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখেন। মহাত্মা তিলক স্বয়ং ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ে উহার হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ প্রকাশ করাইয়াছিলেন এবং তামিল, তেলুগু ও কর্ণাটী সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাতেও উহার অনুবাদ প্রকাশ করাইবেন। সুতরাং তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাইয়া সানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লিখিলেন :—

বোম্বাই

২০শে অক্টোবর ১৯১৭।

মহাশয়,

ইহার বহুপূর্ব্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি

নাই, তজ্জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত ছিলাম। এ ওজর কিছুই নহে তাহা জানি, কিন্তু ইহাই যথার্থ কারণ।

বাঙ্গালা ভাষায় আমার গীতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত আমি ব্যগ্র। কিন্তু বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়বিধ ভাষাতে ব্যুৎপত্তি আছে এতাবৎকাল এরূপ কোনও পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই। গত এপ্রিল মাসে আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং তখন শুনিয়াছিলাম যে আপনার এক ভ্রাতা গীতারহস্যের উপক্রমণিকার একটী বঙ্গানুবাদ একটী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তখন শুনিয়াছিলাম যে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিবেন কি না তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং আমি আর ঐ বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করি নাই; আমি মনে করিতেছিলাম আর কাহাকেও এই কার্য্যের ভার প্রদান করিব। এখন দেখিতেছি আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন, তখন আমার আর কোনও ভাবনা নাই, এবং অনুবাদ যে ঠিক মূলানুযায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত।

আমি যে অনুবাদককে তিন হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিব এ সংবাদ সত্য নহে। তবে প্রয়োজন হইলে অনুবাদের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে এবং অনুবাদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও আমি ইহাই করিয়াছি এবং অধুনা যন্ত্রস্থ তামিল, তেলুগু ও কর্ণাটী সংস্করণের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেছি।

আমার অভিপ্রায় এই যে অনুবাদটী মূল মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় বিষয়ের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বিষয়টীর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে আমাদের মেয়েরাও অনায়াসে সকল কথা বুঝিতে পারেন। অনুবাদটীও এইরূপ হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, আমার ইচ্ছা অনুবাদের ছাপা ও বাঁধাই ঠিক মূলের অনুরূপ হয় এবং উহার মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্য্য হয়।

এই সকল সর্ত্তে কার্য্য করিলে আমি অনুবাদ হইতে কিছুই লাভ করিতে চাহি না, বরঞ্চ অনুবাদককে সমস্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। যদি তিনি অনুবাদ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ না করেন, আমি অনুবাদককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া নিজে অনুবাদ প্রকাশের সমস্ত ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। এ পর্য্যন্ত যতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির করিবার পূর্ব্বে উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। আগামী সপ্তাহে আমি পুণায় থাকিব, সুতরাং পত্রের উত্তর পুণার ঠিকানায় (কেশরী অফিস, পুণা সিটি) পাঠাইবেন।

পত্রোত্তর প্রদানের বিলম্বের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) বাল গঙ্গাধর তিলক।

পরবর্ত্তী ডিসেম্বরে মহাত্মা তিলক পুনরায় সত্যেন্দ্রনাথকে লিখেন :—

পুণা

২০শে ডিসেম্বর ১৯১৭

মহাশয়,

আমি কংগ্রেসের জন্য আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে আমি অবস্থান করিব। কংগ্রেস অনুসন্ধান কার্য্যালয়ে কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে আমার ঠিকানা অবগত হইতে পারিবেন। আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন।

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) বাল গঙ্গাধর তিলক।

অতঃপর সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে লোকমান্য তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের সহিত বাঙ্গানুবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হয়। তিলক মহোদয় ১০০০ খণ্ড বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত কাগজ ক্রয় করিয়া দেন এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ নাম মাত্র মূল্যে আদি ব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে প্রতিশ্রুত হন। সাত আট বৎসর বিপুল পরিশ্রম করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী এই অধ্যবসায়ের মূল্য বুঝিবে কি? ভারততিলক বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব :—

"একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়সাধনের মুখ্য তাৎপর্যটা কি, তাহারই তিলক তাঁহার গীতারহস্যে আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ম্মই গীতার মধ্যবিন্দু, মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্মের পরিপন্থী নহে, পরন্তু কর্ম্মের পরিপোষক ও সহায়; জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মে গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে। এই ভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। কর্ম্মই যে গীতার প্রধান কথা তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা অর্জ্জুনকে যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শুধু "কর্ম্ম করিবে" বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান বলিয়াছেন, যাহা স্বধর্ম্ম-অনুমোদিত সেই কাযই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে কর্ম্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মই শ্রেয়। এইরূপ কথা বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সম্যক্‌রূপে সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথক্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইলেও, জ্ঞান-ভক্তিসমন্বিত কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই যে গূঢ়ভাবে গীতাতে সূচিত হইয়াছে, ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের পোষকতায় সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী শাস্ত্রকেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রের এত কথা আনুসঙ্গিক ক্রমে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, একজন যদি মনোযোগ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই গ্রন্থরচনায় মহাত্মা তিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি কারাগারে থাকিয়া যখন এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হাতের কাছে স্মৃতি-সাহায্যকারী কোন গ্রন্থই ছিল না—তিনি ইহার সমস্ত উপকরণই স্বকীয় পূর্ব্বসঞ্চিত স্মৃতিভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়া রচনাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার স্মৃতিশক্তি! ধন্য তাঁহার প্রতিভা!"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সময়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে (১৩০৯ বঙ্গাব্দে) তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ৺সারদাচরণ মিত্র মহোদয়গণের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তখন ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয়বার পরিষদের সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের সহিত যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংসৃষ্ট ছিলেন সেই সময়ে ১৩১০ বঙ্গাব্দে) তিনি উহার এক অধিবেশনে "ভারতে নাট্যের উৎপত্তি" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি "প্রবন্ধমঞ্জরী"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত।

(শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য)

তীব্রতর পাপবোধ, পারি না করিতে রোধ,
রাবণের চিতা যেন জ্বলে দিবানিশি;
মরমে যাতনা যত, দাবানল বাড়ে তত,
অনুতাপে দগ্ধ প্রাণ ছুটি দশদিশি।
কোথা গেলে শান্তি পাই, যাইব কাহার ঠাঁই,
নয়নে দেখিনা কেহ আছে এ ভুবনে;
চারিদিক শূন্য যেন, প্রাণ ওষ্ঠাগত হেন,
মরি যে গো মনস্তাপে পাপের দহনে।
এমন বিষম দিনে, কে বাঁচাবে প্রভু বিনে,
দীন জনে কৃপা করে দিবে গো শরণ?
কাতর পরাণে তাই, ডাকি—"প্রভু গতি নাই—
দাওহে পাতকী জনে অভয় চরণ;
পাপী বলে দয়া কর, প্রাণের সন্তাপ হর,
আর যে পারি না প্রভু! থাকিতে মলিন;
কঠিন পাষাণ প্রাণ, থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
আমি যে গো হতভাগ্য অতি দীন হীন!"
অগতির গতি নাথ, করে' শুভ দৃষ্টিপাত,
করিলেন সুসময়ে উদ্ধার-সাধন;
পড়ে অশ্রু অবিরল, স্বরগের শান্তি-জল,
নিমেষে ঘুচিল প্রাণে পাপের দহন।
সত্যের পরম জ্যোতি, আলোকিত করে অতি,
তন্ময়-একাগ্র-প্রাণ স্পন্দহীন তনু;
লুপ্ত হ'ল বাহ্যজ্ঞান, করি আত্মসমাধান,
ব্রহ্মের অমৃত হ্রদে মগ্ন প্রতি-অণু।
নিশ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম, কোথা আছি কিবা নাম,
সব লুপ্ত হয়ে গেল চৈতন্য-সাগরে,
নিমীলিত দু'নয়ন, ডুবেছে অদৃশ্যে মন,
চিদানন্দ-রসধারা বহিছে অন্তরে।

দয়াময় দয়া করে, পাপ হ'তে তুলে ধরে,
পরালেন শুভক্ষণে পুণ্যের বসন ;
পেয়ে এই পরিত্রাণ, সকৃতজ্ঞ হ'ল প্রাণ,
ব্রহ্মের অভয় পদে লইনু শরণ।
প্রায়শ্চিত্ত হ'ল আজ, না থাকে কলুষ লাজ,
দ্বিজত্ব লভিয়া পুন আসিনু ধরায় ;
ফিরে আসে লুপ্ত স্মৃতি, জাগিল ভকতি-প্রীতি,
খুলে গেল সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্রহ্মের কৃপায়।
তিনি প্রাণ আমি প্রাণী, তাঁ'তে প্রতিষ্ঠিত আমি,
তিনি ভিন্ন পরিত্রাতা আর কেহ নাই ;
অনন্ত চৈতন্যরূপে, বিরাজিত স্বস্বরূপে,
তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব লভিয়াছি ঠাঁই।
সুর নর জড় জীব, সবেতে আছেন শিব,
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় যত,
ব্রহ্মের গো প্রতিচ্ছায়া, বিশ্ববাসী তাঁর মায়া,
তাঁর মধ্যে ডুবে আছে নিখিল জগত।
এক শক্তি জলে স্থলে, সুবিশাল ভূমণ্ডলে,
তাঁর ইচ্ছা শক্তি বলে চলে ত্রিভুবন ;
ব্রহ্মে প্রাণ সঁপে দিলে, সত্যই দেবত্ব মিলে,
প্রেম-ফুল ফুটে উঠে হৃদে সুশোভন।
পুণ্যের সুগন্ধে প্রাণ, হয় স্বর্গ মূর্ত্তিমান,
থাকি যে গো সবে মোরা ব্রহ্মের সদন ;
চিন্ময় আনন্দ-ধাম, কি মধুর প্রাণারাম,
পরিপূর্ণ জ্ঞানময় বিশ্বের কারণ।
তাঁর প্রেম-স্পর্শ পেয়ে, আনন্দে উঠিনু গেয়ে,—
"জয় অগতির গতি পাতকীতারণ !
তোমার অভয় পদে, রেখো মন-কোকনদে,
চিরদিন তরে মুক্ত করেছ যখন।"

পরিচ্ছন্নতা।

(জনৈক শিক্ষক)

স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে গেলে সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। একবার এক শোভাযাত্রায় একটী বালককে সর্ব্বাঙ্গে সোনার পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোকেরা বলিতে লাগিল—"কি চমৎকার!" কিন্তু যখন তাহার মাতা শোভাযাত্রার পর দিন বিছানা হইতে ঘুমন্ত ছেলেকে উঠাইবার জন্য দেখিতে গেল, তখন দেখিল যে বালকটী মরিয়া গিয়াছে। বালকটী মরিয়া গেল কেন? ভগবান আমাদের দেহের পরিত্যাজ্য অংশ এবং আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বিভিন্ন উপায়ে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই যে আমাদের শরীর চর্ম্মে ঢাকা, আশ্চর্য্য, এই চর্ম্মে অসংখ্য গর্ত্ত বা ফুটো আছে, সেই সমস্ত ফুটো ভেদ করিয়া ঘর্ম্মের আকারে দেহস্থিত মল ও উত্তাপ বাহির হইয়া দেহকে সুস্থ রাখে। সম্ভবত ঐ ছেলের দেহের ফুটোগুলি সোনার পাতে বন্ধ হইয়া গিয়া ভিতরের উত্তাপ বাহির হইতে না পারায় ছেলেটী মরিয়া গিয়াছিল।

দেহের চর্ম্ম একটু ঘসিয়া দেখ—দেখিবে তাহা হইতে ময়লা উঠে। শরীর ভাল রাখিতে গেলে শরীরকে যথাসম্ভব ধুইয়া মুছিয়া ঐ ময়লা উঠাইয়া চামড়ার ফুটোগুলিকে খোলা রাখিতে হয়—ধুলোকাদায় সেগুলি বুজিয়া গেলে ঘাম হইতে পারে না, শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই জন্য কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়। কাপড় পরিলে ধুলোর হাত হইতে অনেকটা বাঁচিয়া যাওয়া যায়। আমাদের দেশ গরম বলিয়া ধুলার পরিমাণও বোধ হয় কিছু বেশী, এবং সেই কারণে বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রেও অন্তত দুইবার স্নানের বিধি আছে এবং সদাসর্ব্বদা ভিজা গামছা দিয়া গা মুছিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। দেহের মধ্যে হাত-পা ও মুখ খোলা থাকে বলিয়া শীঘ্র বেশী ময়লা হয়, তাই হাত-পা-মুখ সদাসর্ব্বদা ধুইয়া ফেলা আবশ্যক। আবার, হাত-ধোয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ নোংরা হাতে খাবার খাইলে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। বস্তুত, প্রতি বৎসর যে সকল লোকের মৃত্যু হয়, তাহাদের মৃত্যুর মূল খুঁজিতে গিয়া দেখা যায় যে, হাত না ধুইয়া খাওয়াই অনেক স্থানে মৃত্যুর কারণ। বিশেষত, যাহারা চুণের বা সীসার কারখানায় কাজ করে, তাহাদের অনেকেই এই স্বাস্থ্যনীতি অবহেলা করিবার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যবাসীদের অপেক্ষা প্রাচ্যবাসীরা অনেক ভাল, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে জলের দ্বারা ধৌতি বলিতে গেলে প্রত্যেক কার্য্যের আরম্ভে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধরা হয়। ভারতের, বলিতে গেলে প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই, প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বোধ হয় এই কারণেই, আচমন করিবার বিধান প্রচলিত। আমাদের দেশে, সকল কার্য্যেই স্রোতের জলই ব্যবহার করা প্রশস্ত বলিয়া গৃহীত হয়, কারণ স্রোতের জল সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত থাকে। আর একটী কথা বলিতে চাই। আজকাল বড় বড় অট্টালিকার মেজে মার্ব্বল প্রস্তরে নির্ম্মিত হইবার কারণে ঘরে কোন প্রকার গোময়-লেপ দিবার প্রয়োজন হয় না। তাহার ফলে ছোট ছোট কুচে ঘরে যে

ঐ প্রকার লেপ দেওয়া খুব ভাল ও দরকার, তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। এখনও পল্লীগ্রামে ঐপ্রকার লেপ দিয়া মেজেগুলি এমন তকতকে পরিষ্কার রাখা হয় যে, সেই মেজেতে খাওয়া বসা প্রভৃতি সকল কাজই করা যায়। কেবল তাহাই নয়, গোময়ের লেপ disinfectant বা দোষনাশকও বটে। আমি জানি, যে সময়ে কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্লেগ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারী অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গোময় যথেষ্ট disinfectant।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান দেশে অপরিষ্কৃত থাকিতে সহজেই ইচ্ছা হয়। কিন্তু শীতের ভয়ে অপরিষ্কৃত থাকার অভ্যাস করা কিছুতেই ভাল নয়। প্রতিদিবস সমস্ত কাপড় খুলিয়া দেহ মার্জ্জিত করিতে অভ্যাস করিলে শীতের ভয় আপনিই কাটিয়া যাইবে। আজকাল পাশ্চাত্যবাসীরা গা খুলিয়া শরীরে হাওয়া লাগানো এবং সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিবার সুফল বুঝিয়াছে, এবং সেই কারণে আজকাল "স্বাস্থ্য-সাধক" অনেকগুলি স্থান বা sanatorium সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে গরমজলের বাষ্প প্রভৃতির সাহায্যে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিয়া পরে নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা তোয়ালে বা গামছার সাহায্যে ঘর্ম্ম মুছাইয়া দেওয়া হয়। আবার যথাসময়ে গা খুলিয়া পাহাড়ের উপরে বেড়াইতে বেড়াইতে খেলিতে খেলিতে পাহাড়ে শীতল হাওয়া লাগাইতে হয়। আমাদের দেশে সাধারণত যে প্রকার কাপড় পরিবার ব্যবস্থা এবং স্নানবিধি প্রচলিত আছে, তাহাতে ঐ প্রকার আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থার প্রয়োজনই অনুভূত হয় না। কিন্তু সেই সকল বিধিবিধান না মানিয়া চলিলে তো কোনই ফল নাই।

ছেলে মেয়ে সকলেরই উচিত প্রতিদিন চুল ধুইয়া পাট করা এবং আঁচড়ানো। ইহার ফলে চুলে উকুন হইতে পারে না। আমাদের দেশে সাধারণত তিলের তেল, নারিকেল তেল বা সর্ষের তেল মাথায় ভাল করিয়া মাখিয়া স্নান করা প্রচলিত আছে। ইহা বড়ই কল্যাণকর প্রথা। ইহাতে মাথায় উকুন হওয়া দূরের কথা, মাথা শীতল থাকে, কেশ শীঘ্র পাকিয়া যায় না এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। অনেক বিলাসী ব্যক্তি শুধু সুগন্ধের কারণে নানাবিধ বিলাতী তৈলকল্প দ্রব্য ব্যবহার করিয়া বড়ই ভুল করেন। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশের উপকরণ হইতেছে spirit বা সুরাসার। এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের ফলে কাজেই মাথার চুল বড়ই শীঘ্র পাকিয়া যায়, চক্ষের জ্যোতি নষ্ট হয় এবং শীঘ্রই মাথায় টাক পড়ে। অনেকে আবার সুগন্ধি রেড়ীর তেল ব্যবহার করেন। আমরা ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, মাথা বড়ই গরম হয় এবং তাহার হাত এড়াইতে বহু দিন ধরিয়া অনেক প্রকার "শীতলাই"য়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়।

প্রতিদিন সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইবে। আমরা সমস্ত দিনে যাহা কিছু আহার করি, তাহার খুব সামান্য অংশ মুখে থাকিয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণে কুল্লী বা কুলকুচি করিলেও তাহা নিঃশেষে বাহির হয় না। মুখের ভিতর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমস্ত রাত্রি বন্ধ মুখে থাকিয়া দেহের নিজেরই উত্তাপে পচিয়া উঠে। তখন পরদিন সকালে পুনরায় কুল্লী করিলে সেগুলি বাহির করিবার সুবিধা হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে "দাঁতন" করা উচিত অর্থাৎ কোন একটী দাঁতন কাঠি লইয়া দাঁতগুলি উপর-নীচে ও পাশাপাশি এবং ভিতরদিকে ঘসিয়া মাজা উচিত। আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে আম, নিম, আশসেওড়া প্রভৃতি কয়েকজাতীয় গাছের নরম কাঠিই এবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ আছে। দাঁত মাজিবার জন্য যে সমস্ত বুরুষ এদেশে আমদানী হয়, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে নির্ম্মিত বুরুষই প্রশস্ত। একবার কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, জাপানে প্রস্তুত ঐ প্রকার বুরুষ ব্যবহারে অনেক লোক anthrax রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল। বুরুষগুলির কাঁটা অধিকাংশই শূকরের লোম হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া পড়িয়াছিলাম মনে হয়। বিষ্ঠাভোজী শূকরের লোম যে খুব ভালরূপে disinfected না হইলে ভয়াবহ রোগবাহী হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গাছগাছড়ার কাঠি না পাইলে, বিলাতী বুরুষ ব্যবহার করিতে পারা যায়। দাঁত মাজিবার সময় লবণ বা ঐ জাতীয় দ্রব্য (ছাই প্রভৃতি) ব্যবহার করা ভাল।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবিধায়ক একটী প্রবাদ আছে—"পাতে তিত, দাঁতে লুন, ভাত খায় তিন কুন, চোখে জল, কাণে তেল, বৈদ্য চায় ভেল ভেল"। এই প্রবাদের ভিতর স্বাস্থ্যনীতি কত সংক্ষেপে সমাবেশিত হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভাত খাইবার প্রথমে তিক্ত বা bitter কিছু খাইতে হইবে। চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে যে, ইহা একটী সুন্দর liver tonic। মুখ ধুইবার সময় দাঁতে লবণজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করিবে। অম্লজাতীয় দ্রব্যের দ্বারা দাঁত ধুইলে যে দাঁত শীঘ্র নষ্ট হয়, তাহা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু বর্ত্তমানে দাঁত মাজিবার জন্য যে সকল জিনিস বিলাত হইতে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই অম্লজাতীয় উপকরণে প্রস্তুত এবং উহা আপাতত দাঁত চকচকে করিবার সহায়তা করিলেও

পরিণামে দাঁতের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। খাইবার সময় পেট একটু খালি রাখিয়া খাওয়া উচিত। অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগী মাত্রেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। মাঝে মাঝে জল দিয়া চক্ষু ধোওয়া চক্ষের পক্ষে বড়ই হিতজনক। সেই প্রকার কাণে তেল দিয়া স্নান করিলেও অনেক কর্ণরোগ ও শিরোরোগের হাত হইতে বাঁচা যায়। এইভাবে শরীর রক্ষা করিলে বৈদ্য চায় 'ভেল ভেল' অর্থাৎ কথায় কথায় চিকিৎসক ডাকা আবশ্যক হয় না। দাঁতের সঙ্গে কাণের ও মাথার খুব যোগ আছে জানিয়া দাঁত ভাল রাখিতে অবহেলা করিবে না।

চুল ও দাঁতের মত কাণও পরিষ্কার রাখিতে হয়। গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি জীব-জন্তুদের কাণগুলি বড় এবং তাহারা সেগুলি সহজে নাড়িতে পারে। তাহার ফলে তাহাদের কাণের ভিতর মশামাছি কীটপতঙ্গ ঢুকিতে পারে না। কিন্তু মানুষ সে প্রকার কাণ নাড়িতে পারে না। তাহার কাণে কীট-পতঙ্গ ঢুকিতে গেলে তাহাকে হাতের দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে কাণ হইতে কর্ণমল বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ নানাবিধ কাণের পীড়া এবং তাহার ফলে মস্তক সম্বন্ধীয় নানা পীড়ারও সম্ভাবনা থাকে।

হাতের নখগুলিও পরিষ্কার রাখা উচিত। সেগুলি বেশী বড় রাখা উচিত নয়। পশুরা অবশ্য নখ কাটে না, কিন্তু তাহারা গাছে পাথরে মাটিতে সময়ে অসময়ে যে রকম নখ ঘসে, তাহাতেই তাহাদের নখ কাটার কাজ হইয়া যায়। মানুষের সে রকম কোন সুবিধা নাই বলিয়া মধ্যে মধ্যে নখ কাটিয়া ফেলা উচিত। অনেক ছেলের দাঁতে নখ কাটা অভ্যাস আছে। তাহা বড়ই মন্দ অভ্যাস। নখের খুব ছোট ছোট টুকরা পেটের মধ্যে যাইয়া অনেক সময়ে স্থায়ী অনিষ্ট করে—সেগুলি হজম হয় না; তাই উদরাময়ের সাহায্যে সেগুলি বাহির হইয়া গেল তো চুকিয়া গেল, নচেৎ দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগের সূত্রপাত করে।

ছেলেমেয়েদের মনে রাখা দরকার যে, পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়। আপনাকে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা ছোট ছেলেদের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই, যদি তাহাদিগকে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দিয়া পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সেই উপদেশ সহজেই মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিতে পারে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, সুন্দর হইবার কেবলমাত্র ইচ্ছা লইয়া থাকিলেই চলিবে না—ইচ্ছার সঙ্গে তাহার উপায়বিধানও করিতে হইবে। তোমার খাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু হাতে করিয়া মুখের মধ্যে আহার তুলিয়া না লইলে খাওয়া হইবে কি প্রকারে? সুন্দর হইবার ইচ্ছা সফলতা লাভ করিবার অন্যতর প্রধান উপায় হইতেছে পরিচ্ছন্নতা। দেহচর্য্য, মনের ভাব প্রভৃতির উপর সৌন্দর্য্য খুবই নির্ভর করে। চামড়ার উপর ধুলাকাদা পড়িয়া যদি খারাপ হইয়া যায়, তবে শরীর খারাপ হয়, কাজেই সৌন্দর্য্যও নষ্ট হইয়া যায়। মনে করিও না যে, শুধু দেহের মুখ হাত পা প্রভৃতি যে অংশগুলি খোলা থাকে, কেবল সেইগুলির প্রতি যত্ন করিলেই তুমি সুন্দর হইবে। সমস্ত শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং মনকে বিশুদ্ধ পবিত্র ও শুচি রাখিলে তবে তোমার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইবে। মুখে হাতে রং মাখিয়া সং সাজিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে না, হ্রাসই হইবে জানিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কখনও রং মাখা উচিত নয়। মুখে মাখিবার জন্য যে সমস্ত বিলাতী রংয়ের আমদানি হয় তাহার অনেকগুলিই সীসকের মিশ্রণে প্রস্তুত। সুতরাং সেই সমস্ত রং মাখিলে অজ্ঞাতসারেই শরীর সীসকের বিষ গ্রহণ করিতে করিতে বিষময় ও রোগগ্রস্ত হইয়া উঠে। আবার অনেকগুলি রং পারামিশ্রিত থাকে। সেদিন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, এক মহিলা এইরূপ পারা-মিশ্রিত রং মাখিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার কি এক রোগ প্রকাশ পাইল। চিকিৎসকেরা কেহই রোগ নির্ণয় করিতেও পারিতেছেন না, কাজেই তাহার ঔষধেরও ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে interesting case হিসাবে কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক উহা হস্তে লইয়া বহু অনুসন্ধানের পর ধরিয়া ফেলিলেন যে পারামিশ্রিত রং মাখিবার ফলেই উক্ত রোগ হইয়াছে। তখন অবশ্য তাহার যথাযথ ব্যবস্থা হইল।

দেহেরও সম্বন্ধে যেমন পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই রকম আহারাদি সম্বন্ধেও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা আবশ্যক। লঘুপাক, সুপরিষ্কৃত খাদ্যই আহার করা আবশ্যক। আচার, চাট্‌নি, টিনের জিনিস, ভিনিগারে ডোবান জিনিস প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়—ভগবৎপ্রদত্ত ক্ষুধারই উপযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইউরোপে মধ্যযুগে লোকেরা নোনা মাছ-মাংস বড় বেশী পরিমাণে খাইত, কারণ শীতের সময়ে গরু প্রভৃতিকে খাওয়াইবার উপযুক্ত শস্যাদি উৎপাদন করিতে জানিত না। তাহারা অনেক স্থলে পচা মাছ খাইতে দ্বিধা করিত না। তদ্ব্যতীত শাকসব্‌জিরও বড়ই অভাব ছিল। সেকালে তো রেলগাড়ীও ছিল না, ষ্টীমারও ছিল না। তাহার ফলে কুষ্ঠ এবং যক্ষ্মা রোগের বড়ই প্রাবল্য হইয়াছিল এবং ভীষণ চর্ম্মরোগ সকল খুব সাধারণ রোগ হইয়া পড়িয়াছিল। শরীরকে নীরোগ করিতে গেলে যেমন

স্নানাদি বিষয়ে শুচিতা অবলম্বন করিতে হয়, তেমনি আহারাদি বিষয়ে, এবং তেমনি পাক করিবার বিষয়েও শুচি হইতে হয়।

পরিধেয় সম্বন্ধেও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিতে হইবে পরিধেয় বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন আবশ্যক, সৌন্দর্য্যবিকাশের জন্যও তেমনই আবশ্যক। কেবল উপরের বস্ত্রখানি পরিষ্কৃত হইলেই চলিবে না। ভিতরে পরিবার কাপড়গুলিও প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। কেবল বাহিরের চাকচিক্য থাকিলেই হইবে না, সেগুলি নিত্য কাচিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। নতুব ঐ অপরিষ্কৃত কাপড় পরিলে উপরের শত পরিষ্কৃত কাপড়া ভেদ করিয়াও দুর্গন্ধ বাহির হইবে, এবং নিজেরও দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

নিজের বাসগৃহটীও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বাসগৃহের ড্রেণ, নর্দ্দামা প্রভৃতির দিকে নিত্যনিয়ত দৃষ্টি রাখা দরকার। দেখা উচিত, কোথাও যেন পচাজল জমিয়া না থাকে। বাহিরের ধূলোতে যাহাতে গৃহ ভরিয়া না যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার হইলেও সমস্তক্ষণ ঘর বন্ধ রাখিয়া তাহাকে "গুমট" করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতর মুক্ত বাতাস চলাচল হইতে দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে গেলে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে খোলা বাতাস প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা রাখা কর্ত্তব্য।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে হৃদয়-মনের পবিত্রতার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্য্যের অন্যতর কারণ। কাহাকে কাহাকে দেখিলে খুব ভাল লাগে; ইহাকে ব্যক্তিগত আকর্ষণ বলিয়া ধরা যায়, এই আকর্ষণ ও সৌন্দর্য্য দেহযষ্টির সুন্দর কাঠামোর উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা মুখের ভিতর দিয়া মন বা প্রাণের যে সদ্ভাব বিকশিত হয় তাহার উপর নির্ভর করে। অন্তরে সদ্ভাব আনিতে গেলেই শারীরিক পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিতে হইবে; কারণ বিশুদ্ধ চিন্তা ও সদ্ভাব শরীরের অন্যতর অংশ মুখের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া বাহির হইয়া মুখটীকে সুন্দর করিয়া তুলিবে। আমরা বাহিরের শুচিতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অন্তরে শুচি থাকা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। সুপ্রসিদ্ধ কবি টেনিসন অন্তরের শুচিতা লাভের জন্য প্রাণের ভিতর হইতে কি সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছেন—

"আকাশের মত অথবা আমার বক্ষের উপরে এই যে বৎসরের প্রথম বরফবিন্দু দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই মত তুমি আমার প্রাণকে বিশুদ্ধ ও শুচি করিয়া দাও।"

বাইবেলে আছে,— "যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহারাই ধন্য; যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারাই সকল বস্তুর প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন।" প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, উভয় দেশেরই অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান দেখা যায়, যেগুলির মূল মন্ত্র হইতেছে শুচিতা রক্ষা। বিশুদ্ধ দেহ ও বিশুদ্ধ চিন্তা যে একসঙ্গে যায়, তাহাই বুঝাইবার জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল আমাদের নিজের জন্যই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা আবশ্যক নহে, অপর পাঁচজনের জন্যও আবশ্যক। ইহাকে আমরা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়াও অভিহিত করিতে পারি। অপর পাঁচজনের নিকট আমার বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইবার অধিকার নাই। যাহারা পরিচ্ছন্ন ও শুচি, তাহাদের নিকটে মলিন ও নোংরা কাপড় পরিয়া বসিলে অনেক রোগ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। একসময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেড্‌ষ্টোন নামক নগরে জ্বরের একটা বাতাস বহিয়া গিয়াছিল; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে, যে সকল উৎস হইতে সহরের জলসরবরাহ হইয়া থাকে, কয়েকজন "খটিক" বা hop-pickerএর দ্বারা সেই সকল উৎসের একটী উৎস সংস্পৃষ্ট হইয়া অপবিত্র হইবার ফলেই এই সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দের যে মহামারী (Black Death) ইংলণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, পড়া যায় যে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ তদানীন্তন ইংলণ্ডবাসীদের অপরিচ্ছন্নতা ও নিতান্ত নোংরাভাবে থাকা। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে ভীষণ প্লেগ দেখা দিয়াছিল, এবং এই সেদিন আমাদের দেশেও যে সুদীর্ঘ কালব্যাপী প্লেগ দেখা দিয়াছিল, এ সমস্তেরই সর্ব্বপ্রধান কারণ দেখা গিয়াছে, অপরিচ্ছন্ন গৃহ, অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি এবং অশুচিভাবে দেহমন রাখা। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও সাধারণতঃ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া অন্তত মুখধৌতি ও স্নানাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্ত্তমানে অনেকে স্নানাদি প্রথার পক্ষপাতী হইলেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে ইহা প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। সেই কারণে সাধারণত পাশ্চাত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে "সুবৃহৎ অধৌত" বা "The Great Unwashed" শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যতদিন মানুষের মধ্যে এই প্রকার পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্নের ভেদ থাকিবে, ততদিন মানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে না।

গায়ত্রী ও ব্রহ্মোপাসনা।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

গায়ত্রী, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ।

'তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এটি ঋগ্বেদের ৩। ৬২। ১০ সংখ্যক মন্ত্র। ইহার দেবতা সবিতৃদেব। ঋক্‌মন্ত্রসকল রচিত হইবার পর যে যুগে পুরোহিতগণ নানাবিধ যজ্ঞ ও তাহার সংসৃষ্ট নানা জটিল অনুষ্ঠান সকল উদ্ভাবন করেন, তখন এই মন্ত্রটীর পুরোভাগে ওঁ, এবং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত মন্ত্র) যোজনা করা হয়, এবং সমগ্র মন্ত্রটীকে ব্রাহ্মণদিগের দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনার কেন্দ্র স্থানে স্থাপন করা হয়। এই গৌরবময় স্থান লাভ করিবার পর হইতে এই ঋক্ 'সাবিত্রী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহাকে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় বেদের সার বলিয়া বর্ণনা করেন। কোনও কারণে তাঁহারা সমগ্র সন্ধ্যাপূজা সমাপন করিতে অশক্ত হইলে কেবল এই মন্ত্রটী জপ করিবেন, এইরূপ বিধি আছে।

এই মন্ত্রটীর ছন্দ, গায়ত্রী। গায়ত্রীতে আট অক্ষরের তিন চরণ থাকে। এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'বরেণ্যং' শব্দটি 'বরেণিঅং' এইরূপ পড়িতে হইবে; তাহা হইলে আট অক্ষর ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। লৌকিক সংস্কৃতে গায়ত্রী ছন্দের ব্যবহার নাই। বহুযুগ হইতে একমাত্র এই মন্ত্রটী ব্রাহ্মণগণের নিকট গায়ত্রী ছন্দের পরিচয় দিতেছে; তাই এই মন্ত্রের প্রকৃত নাম 'সাবিত্রী ঋক্' প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়া, ইহা 'গায়ত্রী' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

গায়ত্রীর বৈদিক অর্থ এইরূপ ছিল,—"আমরা সেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ (অথবা তেজোময় রূপ) ধ্যান করি; যেন (তাহার ফলে) তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।"

ঋগ্বেদের ঋষিগণ যখন সূর্য্যকে জগতের তাবং জীবনশক্তির ও জীবনক্রিয়ার প্রেরয়িতারূপে অনুভব করিতেন, তখন 'সবিতৃদেব' এই নামে তাঁহার অর্চনা করিতেন। গায়ত্রী বা সাবিত্রীমন্ত্র আদিতে এই সবিতৃদেবের উদ্দেশেই রচিত হইয়াছিল। অথচ, এই মন্ত্র যে ইহার উপাসকগণকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সূর্য্যপূজার নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া এক চৈতন্যময় পরম সত্তার অনুভূতিতে উঠিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষিদিগের মুখে যুগের পর যুগ ধরিয়া এই মন্ত্রে সেই পুরাতন সবিত্রীদেবের নামই উচ্চারিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেই কালের মধ্যেই ক্রমে এই নাম হইতে জড়সূর্য্যের দ্যোতনা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালে, উপনিষদের মধ্য দিয়া, জড় জীব ও মানবাত্মার একত্বের যে অনুভূতিটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রথম আভাস যেন এই মন্ত্রে দেখিতে পাই। তরুলতা ও জীবগণের জীবনে যে দেবতার জীবনশক্তির প্রেরণা, মানবের অন্তর্জীবনেও যে সেই দেবতারই জীবনশক্তির প্রেরণা, উভয় রাজ্যের প্রাণভূত যে একই তেজ ও একই দেবতা, এই মহাসত্যের অরুণ উন্মেষ এই মহিমময় মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে। এই মহাসত্য ভারতের সকল তত্ত্ববিদ্যার শিরোভূষণ।

রামমোহন রায় তাঁহার যে পুস্তকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে ওঁ অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ত্রিলোকপ্রকাশক ব্রহ্মকে, সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের প্রেরয়িতা, এই উভয়রূপে দেখিতে হইবে, এই উপদেশ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ এই গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা আজীবন ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। গায়ত্রীর সাহায্যেই তিনি এই উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবল জগতের নিয়ন্তা নহেন; ঈশ্বর মানবের অন্তরে থাকিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে, বিশেষতঃ ধর্ম্মবুদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করেন; (আত্মজীবনী, একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এজন্য দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনে গায়ত্রীর স্থান অতি উচ্চে। তিনি স্বরচিত ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালীতেও (ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের পুরোভাগে যাহা মুদ্রিত হয়), ইহাকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, উপাসক প্রথমতঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রাংশের সাহায্যে ঈশ্বর আছেন, ইহা তিন ভাবে অনুভব করিবেন। তৎপরে, স পর্য্যগাৎ প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রের সাহায্যে, ঈশ্বর ক্রিয়াবান্ ও জগতের নিয়ন্তা, ইহা অনুভব করিবেন। এবং এই ঈশ্বরানুভূতি ঘনীভূত হইয়া যখন উপাসক ঈশ্বরকে স্বীয় জীবনের নিয়ন্তা ও প্রভু বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, তখন গায়ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিবেন, মহর্ষি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনা ও শব্দের অবলম্বন।

রামমোহন রায় ১৮১৭ সালে মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকাতে এরূপ লিখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে বেদান্তবাক্য পাঠ ও তাহার অর্থচিন্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি ব্রহ্মোপাসনাকে সম্পূর্ণরূপে মননের ব্যাপার বলিয়াছিলেন। অর্থচিন্তনটিই উপাসনা; কোন বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উপাসনা করিতে হইবে, এমন নহে, এবং উপাসনার বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান, কাল বা

পদ্ধতি নাই। যে স্থানে ও যে সময়ে চিত্ত একাগ্র হয়, তাহাই উপাসনার স্থান ও কাল। তাঁহার মতে নীরব মননই শ্রেষ্ঠ উপাসনা; কিন্তু দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে, ওঙ্কার একটী অবলম্বন হইতে পারে। অর্থাৎ সে যদি ব্রহ্মচিন্তা করিতে গিয়া দেখে যে নীরব হইলে তাহার মন স্থির থাকিতেছে না, তবে সে ক্রমাগত 'ওঁ' মন্ত্র জপ করিতে পারে।

১৮২৭ সালে 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্' পুস্তকে রামমোহন বেদান্তবাক্যের পরিবর্ত্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এ পুস্তকেও বুঝিতে হইবে যে তিনি নীরব মননকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা মনে করেন। অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থচিন্তন দ্বারাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইবে, গায়ত্রীকে শুধু মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করিয়া বা জপ করিয়া নয়।

অর্থ না বুঝিয়া এবং মনন না করিয়া কেবল শব্দ উচ্চারণ অথবা মন্ত্রজপের দ্বারা সাধারণতঃ লোকে পরিমিত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসনাও সেই প্রণালীতে করা অসম্ভব নহে; কিন্তু সেরূপ করিলে তাহা যে অশ্রেষ্ঠ উপাসনা হইবে, রামমোহন রায় তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, শব্দের অবলম্বন দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য। কিন্তু দেখিতে পাই দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উপাসনাতেও শব্দের অবলম্বন অন্বেষণ করিয়াছেন ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

ইহার একটী কারণ এই যে, মহর্ষির প্রকৃতি শিথিলতা ও বিশৃঙ্খলতার অতিশয় বিরোধী ছিল। একদিন হয়তো সম্পূর্ণরূপে, একদিন হয়তো আংশিকরূপে উপাসনা করা গেল, এবং এক দিন হয়তো একেবারেই করা হইল না, এরূপ শিথিলতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আবার, একদিন একটি বিশেষ প্রণালী দিয়া উপাসকের চিন্তা প্রবাহিত হইল, অপর দিন একেবারে তদ্বিপরীত প্রণালী দিয়া চলিল, এরূপ বিশৃঙ্খলাও তিনি ভাল বাসিতেন না।

সংস্কারক রামমোহন প্রথমে আসিয়া উপাসনাকে সকল বাহ্য অবলম্বন হইতে মুক্ত করিয়া আন্তরিক ও স্বাধীন করিয়া দিলেন। তৎপরে সাধক দেবেন্দ্রনাথ সেই চিন্তাগত আন্তরিক উপাসনাকে বিশৃঙ্খলা ও শিথিলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুনির্ব্বাচিত বাক্যের সাহায্যে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার দান করিলেন।

Brahma Dharma.

Translated by Prof. U. N. Ball m. a.

CHAP. IX

73. দ্বা সুপর্ণা সযুজা—The individual soul and the Universal Soul are like unto two beautiful birds (perching on the same tree, the human body); the human soul is so lovely, because it reflects the beauty of the Divine. The individual is ever in the closest relation with the indwelling Universal, not even space intervenes between them. Both of them dwell in this body, and both are friends. God is as witness in the soul of man, awarding him the fruits of his works which man enjoys. The Universal Self sustains the individual self in love, and the individual, living in this world, loves the Universal in return and does work dear unto the universal. The Universal Soul is the creator, the individual is the created; the one rules, the other obeys; the one is the giver and the other the beneficiary. God is our only support; by His Grace we enjoy worldly comforts, self-satisfaction and the divine bliss. The human soul, living in the tenement of the body, is nurtured in the lap of the Universal Mother. When it has reached its development, it will be released from the body, to follow God for ever as a companion.

74. সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নো—When we forget God and sink in worldly pleasures, we meet with sorrow at every step; but when we behold with love the adorable God of all and His glory, and perform with devotion the duties enjoined by Him, sorrow ceases and great happiness wells up.

75. যদা পশ্যঃ পশ্যতে—When the enlightened and devoted worshipper of God sees God direct with the eye of knowledge, he then attains Him, and becomes free from sin;

he dose no good works with a view to earn merit. In a spirit of detachment does He perform deeds dear unto the Lord that these may bring benefit to man, and that God may be well pleased With the Lord on this throne in us, the mind is controlled and the heart becomes calm and pure. Knowing Him, the wise man no longer feels helpless and aggrieved.

76. পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে—God is present everywhere at all times. To attain Him one has to be pure in heart, and to know Him.

77. অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম্—God who is infinite knowledge cannot be seen by the eye. He cannot either be touched by the hand, or conceived by the mind, or comprehended by the intellect, like a finite object. He is manifest only to the clear common sense and with the help of self-intuition alone we believe in the existence of that Person who is at once the true, the good and the beautiful. Knowledge reveals that uncreated, immortal and infinite Being, and the soul belives in His existence. Knowledge uncovers the truth, and the soul accepts it. This spontaneous self-intuition is, therefore, the only means of proving His existence. When that infinite Being reveals Himself to our unsophisticated knowledge through intuition, the intellect sees His designs in Nature and bears witness to the divine system which makes for the good of the world showing that the Ruler of the universe is good. Although the limited intellect cannot comprehend the ways of the infinite Being, still by the support it gives to the intuitive faculty, the intellect greatly strengthens intuition. Therefore, the seeker of God who desires salvation will never neglect to sharpen the intellect by a close enquiry into the ins and outs of the workings of Nature. The intellect, when it is clear, points out to us the province and the purpose of simple knowledge and intuition.

He Who has created the world and is regulating it, is above all that is. He has neither attachment, nor hate nor such other affections, and therefore is He Stillness itself. He is Goodness itself and is ever sustaining this world for the good of all beings. There is no one equal to Him or greater than He. He is peerless, the one only.

78. তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ—We have none more friendly and, therefore, dearer to us than God.

79. স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং—Son, wife, wealth and influence,—all these abide not. Some day or other, we must part with these dear things of the world but there can be no separation now or hereafter from the dear indwelling God. It is undoubtedly true for him who holds anybody else dear, not God, that his dear one shall die. The wise worshippers of God have the right to give this advice to worldly-minded and deluded men ; those who do not accept their advice come to grief. God, the inmost soul of all and the source of all good, is dearer than all things else. To love Him is to love all dear unto Him, and particularly those whom he has singled out to you for your love and tenderness for the good of this world. But to love a thing more than God and be engrossed in it is what pure and legitimate love will not tolerate.

80. আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত—Cultivate with care the love yet in the bud in your heart. and with the flower fully blown worship Him who placed it there. He to whom the imperishable God is dear, knows that his Beloved shall for ever exist and at no time shall there be any chance of separation from Him,

81. আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—See God; mark His wisdom, power and glory, in the manifold activities of the world, and realise His presence everywhere as the life-process in all; and listen with respect to the instructive discourses of your preceptor, explaining the glory of God. As you see His glory in the universe, and hear of it from the preceptor, turn these things again and again over in your mind, and afterwards deeply meditate upon them, and when all your doubts about His existence have disappeared, let your whole self concentrate upon Him.

82. স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং—He keeps all within His law and always dispenses punishment and reward according to their deserts.

83. তদ্‌যথা রথনাভৌ চ—Water, air, fire and other elements, beings higher than men, inhabiting other spheres of existence, planets like the earth, the sun, the moon, and the stars; the life-processes of the living beings, and the souls of the myriads of beings in countless worlds—all depend upon God for their existence.

84. যুঞ্জে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং—The preceptor who preaches Brahman says to his disciples—"I bow down before God and concentrate my mind on Him who is for ever yours and mine; follow me to concentrate yours also.

85. ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং—What a marvel! We have known Him even while we are yet on this earth; though immersed in, and shrouded by, this darksome world, we receive the light of truth, and our heart becomes free from sin and sorrow as it offers its love to God. What can be more marvellous than this! Blessed are we. The other creatures which He has created have not been given the same powers and privileges as He has graciously bestowed on us; our heart overflows with gratitude for this grace. This has secured to us all that is of value. If we had not known Him in this world, and had not established an unalterable and enduring relationship with him, we should have been in a miserable plight. Where else could we find the haven of rest, when the trials and tribulations of the world came surging on us? Where could we turn for solace, smitten with the cruel blows from men? Who else could save us from sin and sorrow, and from fear of death?

86. ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্—Every effect in the world has its cause, and again all these causes have their cause in God, the Cause of the causes which produce all the phenomena of the world. He is formless and above all ills. Those who cultivate an enduring relationship with Him, attain immortality. It is they, and none else, who can rise above the pain and sorrow of the world.

87. ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং—The whole world has originated from God; He who has caused it to be, is great. In all places, within and without, and at all times does He exist, yet no eyes can see Him, for Wisdom that He is can alone be known by knowledge. Those who know Him, for ever abide in Him.

88. সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—With a view to bestow knowledge, comfort and capacity upon us, He has endowed our senses with corresponding virtues. That the wondrous splendour of God's universe captivates the eye, that enchanting warbles, sweet music and psalms in praise of God pour honey into the ear, that a variety of things chewed, sucked, licked and drunk please the palate, that the fragrance of the endless varieties of flowers greet our sense of smell and that the gentle breeze fills our cup of pleasure when it touches the tactile organ all over the body—all these are due to the one cause and that is God, the source of

all good. The pleasures we enjoy in abundance arise from the fact that God created the objects of the senses fully adapted to the powers inherent in these senses. With the hands He has given us, we can hold things, with the legs we can walk about in all places. We are happy to express our ideas, but this has been possible only with the help of the God-given organ of speech. He has made each of our senses an approach to the store-house of joy. Our sense-organs and our motor-organs are like so many beneficent fountains whence good is welling up in a ceaseless stream exhibiting the great mercy and glory of God who is the one only source of all good.

He has created these wonderful senses for the good of His creatures, and they function as He exists in them; but He himself is without any senses. He needs no organ for knowing, nor does He require any for action; He has no eyes or ears, yet He sees everything and hears everything; He has no legs or hands, yet He goes everywhere, and holds everything. He is the lord of all and is their ruler, friend and stay.

89. মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ—The great and good God has not left us, like animals, in bondage to the world, by giving us the pleasures of the senses alone, but He has made us free inasmuch as he has granted us the privilege of a religious life. He has himself been he inspirer of this life that we may have contentment and peace which is a thousand times better than the pleasures of the senses. He is constantly instiling into our souls good counsels, and the strength necessary for righteous living. Through His grace it is that religion has made us free and brought liberation within our reach.

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আলোকের অভিব্যক্তি।

রাস্তায় ক্রমে ক্রমে ইলেক্ট্রিক আলো কেমন করিয়া আবির্ভূত হইল, তাহা আমি বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই সঙ্গে ঘরে ঘরে ইলেক্ট্রিক আলোকের অভিব্যক্তি বর্ণনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। সেকালে দীপগুলি বদ্ধ থাকিত, মুক্ত থাকিত না। শুনিয়াছি, এই প্রকার মুক্ত দীপের কল্যাণে আমি একবার দেহ হইতে মুক্তিলাভের পথে চলিয়াছিলাম। তখন আমার তিন বৎসর বয়স। বলা বাহুল্য সেকালের প্রথা অনুসারে আমি এক প্রৌঢ় পরিচারিকার অধীনে সর্ব্বদা থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দাসী যেখানে বসিবে, আমিও সেইখানে বসিব, দাসী যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার সেই মানুষ-করা দাসী উজ্জ্বলা আমাকে লইয়া একটী ঘরে বসিয়া আছে—অনতিদূরে গৃহের কোণে একটী আলো জ্বলিতেছে। একটী "শ্যামাদানে" একটী গেলাস বসানো; তাহাতে তিনভাগ জল, আর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু রেড়ীর তেল থাকিত। কেবল পড়িবার ঘরের "বাতি" বা দীপগুলিতে রেড়ীর তেলের পরিবর্ত্তে নারিকেল তেল দেওয়া হইত—আলো একটু পরিষ্কার হইত। যাক, রেড়ীর তেলের আলো জ্বলিতেছে, এমন সময়ে কি এক প্রয়োজনে উজ্জ্বলা দুই-এক মিনিটের জন্য অন্য ঘরে গিয়াছে। আমাকে আর পায় কে? আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া আলোর নিকটে উপস্থিত, এবং সম্ভবত আলোকের গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য আমার পায়জামার ফিতাটী আলোতে দিয়াছি—দেখিতে দেখিতে মহাতত্ত্বের সন্ধান পাইলাম যে, অগ্নির সহিত খেলা করিতে গেলে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে হয়। আমার দেহ পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় উজ্জ্বলা আসিয়া উপস্থিত! আমার কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার ধ্বনিতে সকলকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। আমার পিতামাতা আসিয়া ঔষধাদি প্রদানে আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। সেই সময় যদি আলোকের তত্ত্বানুসন্ধানে আমার নিজেকে বলিদান করিতে হইত, তবে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, আজ আমাকে এই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য একটুও ব্যস্ত হইতে হইত না।

ঐ টিমটিমে আলোর সাহায্যে সেকালের লোকদিগের, অন্তত কলিকাতাবাসীদিগের মনও কিভাবে সংগঠিত হইত, তাহা এযুগের ছেলেদের ধারণাতেও

আসিতে পারে না। একটা সুবৃহৎ ঘরের এক কোণে একটী তেলের "গেলাস" অথবা পিতলের "পিলসুজের" উপর একটী চতুষ্কোণ বা ঝিনুক আকারের পিতলের প্রদীপ বসানো আছে। "গেলাসের" আলো সমস্ত ক্ষণই হেলিয়া দুলিয়া মিটমিট করিতেছে। যেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সেখানে মাঝে মাঝে তাহাতে তেল ঢালিতে হইতেছে এবং সলিতা উসকাইয়া দিতে হইতেছে। গেলাসের ভিতর সাধারণত একটী খড়কে-কাঠি বসাইবার উপযুক্ত টিনের ছোট পাতে সরু ছোট নলাকৃতি আধার থাকিত। সেই আধারে একটী খড়কে-কাঠির মুখে একটুখানি তুলা জড়াইয়া তেলে ভিজাইয়া দেওয়া হইত। যথাসময়ে একটা চকমকি পাথরে একটা লোহার ঘা মারিয়া আগুনের ফিনকি উঠিত, তাহাই একটুকরা সোলাতে ফেলা হইত। ক্রমে সেই অনন্ত সোলা হইতে একটা আলো জ্বালিয়া তাহা হইতে অন্যান্য আলো জ্বালা হইত দেখিয়াছি। প্রদীপের বেলায় খড়কে-কাঠির দরকার হইত না—একটুকরা ন্যাকড়াকে পাকাইয়া সলিতা করা হইত এবং তাহাই তেলে ভিজাইয়া যথাসময়ে জ্বালা হইত, আর মাঝে মাঝে সেই সলিতাটুকু সরাইয়া দিয়া আলোটুকুকে সজীব রাখা হইত।

এখন, ঘরের কোণে যেখানে আলোটুকু থাকিত, সেইখানেই সামান্য স্থান জুড়িয়া যা-কিছু দেখা যাইত. বাকী স্থানটুকু আলো-আঁধারে হইয়া শিশু ও বালকদিগের মনে স্বভাবতই একটু অজ্ঞাত-ভীতির সঞ্চার করিত। তাহার উপর, আলো হইতে একটু দূরবর্ত্তী স্থানে সার্সিতে যখন ঐ মিটমিটে আলোর ছায়া পড়িত, তখন দাসী-চাকর, এমন কি বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নিরাও, শিশু ও বালকদিগকে সেই ছায়া দেখাইয়া কখনও বা উহাকে রাজার বাড়ীর আলো, আর কখনও বা ভূতের বাড়ীর আলো প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে দেখিয়াছি রাজার বাড়ীর কথা ছেলেদের যত মনে থাক বা নাই থাক, ভূতের বাড়ীর কথা সহজে তাহাদের মন হইতে দূর হইত না। প্রকাণ্ড বাড়ীতে স্থানে স্থানে ঐ প্রকার মিটমিটে আলো দিবার ফলে আঁধারটা যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিত এবং সেই কারণে সেকালে ভূতের উপদ্রবটাও যেন বেশী হইতে চাহিত।

তেলের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিরও কতকটা ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ স্থলে তাহা গ্রন্থাদি পড়িবার কালে ব্যবহৃত হইত। তেলের আলোর তুলনায় মোমবাতির আলোতে চক্ষু যেন জুড়াইয়া যাইত। পূজনীয় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বহুকাল যাবৎ দুই দিকে দুইটী মোমবাতি রাখিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। বাতাসে পাছে নিভিয়া যায়, সেই কারণে শামাদানে একটা কাচের "ফানুস" দেওয়া হইত এবং তাহার উপরে টিনের পাতে ফুটো করা একটা ঢাকা দেওয়া হইত।

ক্রমে হারিকেন লণ্ঠনের এবং সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন তেলের ব্যবহার প্রচলিত হইল। পাঁচ বৎসর বয়সে যখন ষ্টীমারে কাশীযাত্রা করি, সেই প্রথম দেখি ষ্টীমারে হারিকেন লণ্ঠন রাত্রে ঝোলানো হইত। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিবার পর দুই তিন বৎসরের মধ্যেই দেখি, তেলের আলোর সঙ্গে কেরোসিনের আলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগাইয়াছে। ক্রমে কাংস্যপাত্র ও মৃণ্ময় পাত্রে বিবাদ লাগিলে যাহা হয় তাহাই হইল—কেরোসিনের আলোরই জয় হইল। তখন এ ঘরে সে ঘরে কেরোসিন জ্বলিতে লাগিল এবং পড়িবার জন্য অধিকাংশ স্থলেই বাতির বদলে কেরোসিনের "ডুম" ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই সকল "ডুমে" একটা পীঠের উপর কেরোসিন দিবার তৈলাধার থাকিত; তাহারই সঙ্গে একটা কাচের চিমনি লাগানো থাকিত, এবং সেই সঙ্গে একটা কাচের গোল "ফানুস"ও সংলগ্ন থাকিত। এই ফানুসকে ইংরাজীতে সাধারণত "dome" বা "ডোম" বলা হইত—তাহা হইতেই "ডুম" শব্দ উৎপন্ন হইল।

কেরোসিনের আলোর রকমারি বেশী বাহির হইতে না হইতে, যখন রাস্তাঘাটে গ্যাসের আলো দেওয়া হইল, তখন কলিকাতার ধনীদিগের অনেকে নিজ নিজ প্রাসাদেও গ্যাসের আলো লইতে লাগিলেন। গ্যাসের দেওয়ালগিরি, গ্যাসের ঝাড় প্রভৃতি খুবই প্রচলিত হইল। কিন্তু গ্যাসের আলো তো সর্ব্বত্র টানিয়া লইয়া যাওয়া চলে না, কাজেই উহার সঙ্গে মোমবাতি ও হারিকেন লণ্ঠনের ব্যবহারও অনেকটা থাকিয়া গেল। গ্যাসের আলো প্রচলিত হওয়া অবধি আলোর খুবই সুবিধা হইয়াছিল।

গ্যাসের আলোতেও রাস্তাঘাট তেমন আলোকিত হইত না—দুইটা আলোর মধ্যস্থলে বেশ একটু আলো-আঁধার থাকিত এবং তাহাতে চোর ও দুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগের পুলিশের হাত এড়াইবার মন্দ সুবিধা হইত না। ওদিকে জর্ম্মণি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে গ্যাসের আলোর উন্নতির চেষ্টা হইতে হইতে ছাইনির্ম্মিত এক প্রকার আচ্ছাদন আবিষ্কৃত হইল, যাহার দ্বারা আলো আবৃত করিলে উহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গ্যাস-কোম্পানি সঙ্গে সঙ্গে উহা এদেশেও প্রচলিত করিলেন। তখন রাস্তাঘাটে এবং ধনীদিগের গৃহে ঐ আচ্ছাদন ব্যবহৃত

হইল—তখন মনে হইত যেন ঐ আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে।

কিছুকাল পরে এসিটিলীন গ্যাসের আলোর প্রচলন আরম্ভ হইল। ব্যবসায়িগণ দেখিল, বিবাহাদিকালে শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত খাসগেলাসগুলি ব্যবহারের পর কুলীরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করে; তৎপরিবর্ত্তে টিনের ও কাচের নির্ম্মিত আলোকপাত্র এবং সেই সঙ্গে এসিটিলীন গ্যাস ব্যবহার করিলে প্রচুর পরিমাণে আলোকেরও ব্যবস্থা হইবে এবং ঐ পাকা আলোকপাত্রগুলিও কুলীরা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে সাহস পাইবে না। এখন শোভাযাত্রা হইতে খাসগেলাস উঠিয়া গিয়া ঐ এসিটিলীন গ্যাসের আলোর ব্যবহারই চলিয়াছে।

তাহার পর এখন তো ইলেক্‌ট্রিক আলো প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—রাস্তাঘাটে, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই উহারই প্রচলন। তবে, শোভাযাত্রায় উহা লইয়া যাইবার সুবিধা নাই বলিয়া এখনও এসিটিলীন আলো নিজের আসন দৃঢ় রাখিতে পারিয়াছে। তদ্ব্যতীত, প্রায় অন্য সকল বিষয়েই ইলেক্‌ট্রিক আলো গ্যাসের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক আলোর কত রকমারিই না বাহির হইয়াছে—ঝাড়, পড়িবার বাতি, বাড়ী সাজাইবার উপযুক্ত অল্প শক্তির বাতি ইত্যাদি। সময়ে সময়ে তার কাটিয়া গেলে বা অন্য কোন কারণে আলো নিভিয়া গেলে একেবারে সারি সারি নিভিয়া যায়—তখন বাড়ীর কর্ত্তা চক্ষে একেবারে অন্ধকার দেখেন। হয়তো বিবাহ-সভা বসিয়াছে বা লোকেরা আহারে বসিয়াছে, সহসা আলো নিভিয়া গেল। তখনই দোকান হইতে বাতি বা লণ্ঠন যাহা হোক কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। প্রায় অনেক স্থলেই যখন অনেকগুলি ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাইবার প্রয়োজন হয়, তখন তার কাটিয়া গেলে একজন মেরমেত করিবার লোকও হাজির রাখা হয়। প্রথম প্রথম যখন রাস্তাঘাটে ইলেক্‌ট্রিক আলো বসানো হইয়াছিল, তখন কথায় কথায় তার কাটিয়া যাইত এবং মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সহরটাই এক আধ ঘণ্টার জন্য অন্ধকার হইয়া থাকিত। এখন সহরের স্থানে স্থানে শাখা শক্তিস্থান (Sub-power Station) স্থাপিত হওয়ায় এবং তার প্রভৃতি সকল বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হওয়ায় ঐ প্রকার তার কাটিয়া যাইবার আশঙ্কা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে—বিদূরিত হইয়াছে বলিলেও চলে।

কালবৈশাখী ঝড়।

সেকালে গ্রীষ্মকালের কালবৈশাখী ঝড় ছেলেপিলেদের নিকট যেমন একটা আমোদের বিষয় ছিল, সেই রকম বাড়ীর কর্ত্তাদের নিকট ভয়েরও বিষয় ছিল। অনেকবারই দেখিয়াছি, ঠিক ১লা বৈশাখে ঝড় আরম্ভ হইল। বেলা তিনটা চারটার সময় উত্তর-পশ্চিম কোণে একটুখানি মেঘ দেখা দিল। ক্রমে যত বেলা যাইতে লাগিল, পশ্চিমে যতই সূর্য্য চলিয়া পড়িতে লাগিল, সন্ধ্যা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই মেঘটাও একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সূর্য্যের উপরে কাল মেঘের একটা ছায়া পড়িয়া বেলা থাকিতেও অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, গুরু গুরু গর্জ্জন শুরু হইল; দেখিতে দেখিতে মেঘের উপর মেঘ আসিতে লাগিল, মেঘেতে মেঘেতে খেলাখেলি চলিতে লাগিল। আধাআধি আকাশ যখন মেঘে ঢাকিয়া গেল, তখন, ইতিপূর্ব্বে যে দক্ষিণে বাতাস বহিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল—এইবার ঝড় আসিবে বোঝা গেল। উত্তর ও পশ্চিম দিকের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করা হইল। সকলেই দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের ঘরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা ঐ কাল মেঘ হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আগুনের হল্কার মত বিদ্যুৎ ঝলকিতে লাগিল। ক্রমে উত্তরপশ্চিম দিক হইতে মেঘ খাঁজকাটা আকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা সেই উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটা মহা কোলাহলের বদ্ধমুখ আওয়াজ উঠিল, এবং সেই সঙ্গে ঐ দিকটা ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া আগুন-লাগার মত রাঙ্গা-পাংশুলবর্ণ ধারণ করিল। সে বর্ণ সূর্য্যের কিরণপাতে হয় নাই—উহা ঘন-উত্থিত ধূলিরাশির নিজের বর্ণে সঞ্জাত। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বাতাস উঠিল—কোথায় কোন্ দরজা জানালা ঠিকমত বন্ধ করা হয় নাই—সেইগুলি ধড়াস ধড়াস করিয়া পড়িতে লাগিল, গৃহস্থেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া সেইগুলি বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তটস্থ হইয়া ছেলেপিলেকে একত্র করিয়া ভয়ত্রস্তচিত্তে বসিয়া রহিল। গল্পের মধ্যে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের (১২৭২ সালের) সেই ভীষণ আশ্বিনের ঝড়ের গল্প চলিতে লাগিল—কত জাহাজ শিকল ছিঁড়িয়া নদীবক্ষ হইতে রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল, কত লোক মরিয়া পড়িয়াছিল, কত বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছিল, এই সমস্ত গল্প ঝড়ের ভীষণতাকে ভীষণতর করিয়া তুলিত।

এই ঝড়ের সঙ্গে সেকালের রাস্তায় চলাফেরারও সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। এখনকার মত সেকালের বাড়ী প্রস্তুতের কড়াকড় আইনকানুন (Building Regulations) প্রচলিত ছিল না, অথবা প্রচলিত থাকিলেও সেগুলির বলবৎ-প্রয়োগ ছিল না। তাই, আজকাল যেমন দেখি যে, নূতন নূতন রাস্তার ধারে প্রাসাদের মত বড় বড় অট্টালিকা, সেকালে সেরূপ দেখা যাইত

না; সেকালে রাস্তার ধারে কোথাও বা একটা ভাঙ্গা বাড়ী, পার্শ্বেই হয় তো একটা খোলার ঘর, আবার তাহার পার্শ্বে হয় তো একটা মিঠাইয়ের দোকান—এই রকম হরেক রকমের বাড়ীঘরদুয়ারের একত্র অবস্থান দেখা যাইত। আর সেই সঙ্গে দেখা যাইত—হয়তো কোন একটা বাড়ী হইতে একটা সাত জন্মের ধূলিপরিপূর্ণ ত্রিরপলের পরদা পথিকদিগকে প্রতিপদে আঘাত দিবার জন্য ফুটপাথের উপর দশ হাত বাহির হইয়া আছে; কোন খোলার ঘর বা দোকান হইতে হয় তো ঐ ভাবে একটা করগেট লোহার চাদর বাহির হইয়া আছে; উত্তর-পশ্চিমে ঝড়ের সময় এই পরদা বা করগেট চাদরের বাতাসের সঙ্গে খেলা যে কিপ্রকার বিপজ্জনক, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আজকাল ঐ প্রকার চাদর বা পরদার অবস্থান সাধারণত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। একবার ঐ প্রকার ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া ইহার জীবন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম—ঐ ওখান হইতে একটা পরদা উড়িয়া আসিয়া রাস্তায় পড়িল, ঐ আর একস্থান হইতে লোহার চাদর উড়িয়া আসিয়া একজন পথিকের ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল—পথিকেরা সকলে শশব্যস্ত।

উত্তর-পশ্চিমে ঝড় অপেক্ষা দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝড় বড় বেশী ভয়াবহ হইত। উত্তর-পশ্চিমে ঝড় উঠিল; দুই এক ঘণ্টার মধ্যে জল-ঝড় হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল; কয়েকটা গাছ বা ডাল পড়িয়া গেল; দুই এক ঘণ্টার পরেই সমস্তই শান্ত, যেন ইতিপূর্ব্বে এত বড় ঝড় হয়ই নাই। তাহার পরেই ছেলেপিলেরা বাগানে গেল—আম কুড়াইতে লাগিল, নিচু কুড়াইতে লাগিল—তাহাদের আনন্দধ্বনিতে আর এক রকমে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝড় উঠিলে যেন আর সহজে ছাড়িতে চাহে না। ঐ যে দুধে মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিল—তাহার পর— বাপ্‌রে বাপ্‌—কি ঝড়, কি বৃষ্টি—তার পর ঝড় গেল তো, বৃষ্টির জের আর থামে না। হয়তো সমস্ত রাত কাটিয়া যাইবার পর, পরদিন সকালে আকাশ পরিষ্কার হইল। সেই ঝড়ের ধাক্কায় সমস্ত রাত্রি যে কি ভয়ে কাটাইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে না।

একালে অনেক দিন যাবৎ সেপ্রকার উত্তর পশ্চিমে বা দক্ষিণপশ্চিমে ঝড় দেখি নাই। কাগজে অবশ্য ঘূর্ণাবায়ুর ধ্বংসলীলার অনেক বর্ণনা পড়ি বটে, কিন্তু জানিনা কেন,—হয়তো বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির জন্য লৌহস্তম্ভ প্রভৃতি খাটাইবার কারণেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আজকাল পূর্ব্বের মত খরবেগ কালবৈশাখী ঝড়ের আবির্ভাব বড় একটা দেখা যায় না।

বাঙ্গালা ভাষায় গণনার সংখ্যা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বঙ্গভাষায় গণনার সংখ্যা হইতেছে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই কয়েকটি লইয়া। কিন্তু ইহাদের রূপ কি ভাবে আবিষ্কৃত হইল, তাহা একটু ভাবিবার কথা। আমরা পাঠশালায় যখন প্রথম শিক্ষা লাভ করি, তখন কড়াকে লিখিবার সময়, এক কড়ায় এক দাঁড়ি, দুই কড়ায় দুই দাঁড়ি, তিন লিখিবার সময় তিন দাঁড়ি লিখিতাম। এখনও অশিক্ষিত স্ত্রী বা পুরুষ দাঁড়ি কাটিয়া তাহার সাহায্যে সংখ্যা গণনা করিয়া লয়। পর পর দশটি দাঁড়ি কাটিয়া, তাহারা দশ গণনা করে। কুড়িটি পর পর দাঁড়ি কাটিয়া কুড়ির হিসাব রাখে ইত্যাদি। কেহ বা তালপত্রে, কেহ বা দেওয়ালের গায়ে পাশাপাশি দাঁড়ি কাটিয়া দুগ্ধের হিসাব রাখে। ধাঙ্গড় বা সাঁওতালগণ একগাছি সরু দড়িতে পর পর গেরো বাঁধিয়া কয়দিন তাহারা কার্য্য করিয়াছে, তাহার মোটামুটি হিসাব রাখে। তাহাদের মধ্যে অনেকে একশত পর্য্যন্তও গুণিতে জানে না, কিন্তু তাহারা ৪টায় যে এক গণ্ডা হয় তাহা বুঝিতে পারে এবং কয়গণ্ডা 'রোজ' যে কার্য্য হইল, তাহা তাহারা সঠিক বলিতে পারে।

বঙ্গভাষায় যে সংখ্যা লিখিবার নিয়ম আছে, তাহা সংস্কৃত, দেবনাগরী বা হিন্দীর অনুরূপ নহে। বঙ্গভাষায় উহার স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার একটি চিন্তাশীল বন্ধুর সহিত আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলেন, বঙ্গভাষায় শব্দের আকার হইতে উহার উৎপত্তি। তাঁহার কথা সমীচীন বোধ হইল। এ সম্বন্ধে বাহির হইতে একটু আলোচনার আবশ্যক আছে বুঝিয়া তাঁহার মত এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি বলেন, আমরা ১ যে-ভাবে লিখি, তাহা এক এই শব্দের ক বাদ দিয়া এ এই অক্ষরের রূপান্তর মাত্র। তাড়াতাড়ি এ লিখিতে গিয়া উহা ১ এ দাঁড়াইয়াছে। দুই শব্দের উকার ও ইকার বাদ দিয়া দ তাড়াতাড়ি লিখিয়া ২এর উৎপত্তি। ২ আর কিছুই নহে, দএর বিকৃতি। তিন হইতে ি ও ন বাদ দিলে ত অবশিষ্ট থাকে, উহাই ৩ তিন। এইরূপে চ হইতে ৪এর উৎপত্তি, উপরে একটি পুঁটুলি বাড়ান হইয়াছে। পাঁচের প হইতে ৫এর উৎপত্তি। ছাপা অক্ষরে ৫এর মাথায় টিকি বা বোঁটা নাই, কিন্তু জমিদারী কাগজে ও সাবেক হস্তলিপিতে ৫এর মাথায় বোঁটা আজও পরিলক্ষিত হয়। আজকাল ৫এর বোঁটা নাই। প অক্ষরের পুঁটুলিই পাঁচ, তাহার পার্শ্বের দীর্ঘ সরল রেখাটা অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ছয়এর ছ অক্ষরের রূপান্তর ৬। ছএর নিম্নের টান বাঁদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে।

সাতের স হইতে ৭এর উৎপত্তি। তাড়াতাড়ি লিখনের ফলে স, ৭এ পরিণত। আটের ট হইতে ৮এর উৎপত্তি। আমরা যখন গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠশালায় পড়ি, তখন ট লিখিতাম ৮ এইরূপে মাত্রায় একটা শৃঙ্গ ছিল। আজকাল ডানদিকে মাত্রা না গিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। নয়এর ন হইতে ৯এর উৎপত্তি। ন একটানে তাড়াতাড়ি লিখিতে গিয়া ৯এ পরিণত। এইরূপে সংখ্যা লিখনে বঙ্গভাষার মৌলিকতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা পড়িয়া পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ মীমাংসা একেবারে অশ্রদ্ধেয় নহে। এখানে একথা স্মরণে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন হস্তাক্ষরের বর্ণের সহিত ও প্রথম অবস্থার ছাপার অক্ষরের সহিত বর্ত্তমানের ছাপা হরফের বা অক্ষরের একটু রূপান্তর ঘটিয়াছে।

জাতীয় সমস্যা।

(কথক শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ)

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ দেখছি কিছুতেই থামছে না! অনেক দিন থেকেই এই দুই সম্প্রদায় এক দেশেই আছে; কোথায় তাদের ভিতরে ক্রমে বেশী করে সৌহার্দ্দ্য বাড়বে, তা না হয়ে কেবল ঝগড়াই বেড়ে চলছে।

এ বিরোধটা আজকাল বিশেষভাবেই আত্মপ্রকাশ করছে ধর্ম্মগত অনৈক্যের ভিতর দিয়ে। মাঝখানে কিছুদিন রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে এটা একটু চাপা ছিল। এখানে সেখানে যখন তখন একটু আধটু গোলমাল হলেও এরূপ দেশব্যাপী বিরোধ ঘটে ওঠেনি।

এত দিনেও এই দুই সম্প্রদায়ের মনের মিল হয়নি। মনোবিজ্ঞানের ধারা অনুসারে এ বিরোধ যেন একটা নিরোধের (suppression) ফল। দেশের নেতৃগণ এটাকে কোন রকমে ঢাকা-চাপা দিয়ে রাখতেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন না হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে আমরা একেবারে পিছিয়ে যাব, এটা বুঝলেও এই ভেদের মূল কারণের উচ্ছেদ করবার তেমন চেষ্টা করেন নি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল ভিতরের চেয়ে বাইরের দিকেই বেশী। মূল কারণের উচ্ছেদ না করে আপাততঃ অসুবিধা দূর করবার জন্য তখনকার মত একটা কিছু করতে গেলে যা ফল হয়, এখন তাই হয়েছে। আমাদের দেশে যাঁরা আজকাল জনসাধারণকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা নেতা হতে পারেন—কিন্তু ঋষি নন। নেতা মানে যিনি নিয়ে যান—তা যে দিকেই হোক। কিন্তু কারণের দ্রষ্টা ছাড়া কেউ ঋষি হতে পারেন না।

আমি আপাত-উপসর্গগুলো দূর করবার বিরোধী কথা একেবারেই বলছিনে। সুদক্ষ চিকিৎসকের দুটোই আবশ্যক। এখানে চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রণালী অবলম্বন করলে ভাল হয়। এও একটা ব্যাধি,—জাতির দেহের ব্যাধি। এটা দূর করতে না পারলে রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক কোন উন্নতিই হতে পারবে না। আর এগুলো সব বাদ দিয়ে ধর্ম্ম জিনিসটে যে হাওয়ার উপরে টিঁকে থাকবে তা কখন সম্ভবপর নয়। যাতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয়, জীবন সার্থক হয়, এক কথায়, যা কারণের দিকে বা ভগবানের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় সেই তো ধর্ম্ম। সেখানে তো কোন কিছুকে বাদ দিলে বা ঢাকা-চাপা দিয়ে রাখলে চলবে না। গোড়াতেই জগৎটাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। জগতের দুটো দিক—পরিবর্ত্তনীয় সৎ আর অপরিবর্ত্তনীয় সৎ। আসলে দুটোই সৎ। তাই জগৎ, জীবন, অন্তর, বাহির সবই "অস্তি" সুতরাং সৎ। এই সত্য মেনে নিয়ে পরিণতির দিকে গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আবার বাধা ছাড়া গতি কথাটার কোন মানে নেই; তাই এই বাধা ও দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে হবে।

এক ভাবে দেখতে গেলে, যেন প্রতি পলে মৃত্যু আমাদের গ্রাস করতে আসছে। তাকে অতিক্রম করে থাকাই তো জীবন। তাই জীবনকে সার্থক করার একটা সর্ব্বোচ্চ কৌশল আছে।

একটা ব্যাধির চিকিৎসা করতে হলে চিকিৎসকের এই সব বিষয়ে লক্ষ্য থাকা চাই—রোগীর প্রকৃতি, রোগ তাহার ভিতরে কি রূপ ধারণ করেছে, রোগের মূল কারণ কি? তার পর আপাততঃ রোগীর যে সমস্ত অসুবিধা আছে তাহার জন্য সাময়িক অনতিতীব্র প্রতীকারের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ক্রমে রোগের মূল কারণের ধ্বংস করতে হবে। এই কারণের দিকে দৃষ্টি থাকাই ঋষিত্ব। ইহাই দর্শন। জগতকারণকে জানার পরিমাণ দিয়েই ঋষিত্বের পরিমাণ। কি চিকিৎসক, কি নেতা সকলেরই এই কারণের দিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

বুদ্ধদেব জগতে জরা-মরণ দুঃখ-দারিদ্র্য দেখে কেবল চালের দোকান আর ঔষধের দোকান বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। তা হলে একটা লোকহিতৈষী হতে পারতেন—কিন্তু বুদ্ধ হতেন না। তিনি মূল কারণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'চতুরার্য্য-সত্য' আবিষ্কার করলেন। দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখনিবৃত্তি আছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে। চিকিৎসাশাস্ত্র ও পাতঞ্জল দর্শনেও এরূপ কথা এই প্রণালীতে আছে।

সকল দেশেই দেখা যায়, ঋষি ব্যতীত কেহ প্রকৃত নেতা হতে পারে না। যিনি যত বেশী দূর কার-

পের অনুসন্ধান করে দুঃখ দূর করবার যথার্থ ব্যবস্থা করতে পারেন তিনিই ঋষি। এ ঋষিত্ব জীবনে কতকগুলো অনুষ্ঠানের সমষ্টিতে নয়, কতকগুলো উপবাস, যাগযজ্ঞ বা তথাকথিত সংযমাদিতে নয়; এ অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা ঋষির জীবনে নিতান্তই বাহিরের জিনিস—সর্ব্বসাধারণের ভিতরে ঋষিত্বের প্রভাব সংক্রামিত ও সঞ্চারিত করে দেওয়ার উপায় মাত্র। ঐগুলিই ঋষির লক্ষণ বা তাঁর জীবনের বড় জিনিস নয়। পতিত জীবকে হরিনাম দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাকে বলতে হয়েছিল—

"সন্ন্যাস করিনু যবে ছন্ন হইল মন,
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।"

আমাদের দেশে আজকাল বাহ্য অনুষ্ঠানের দিকে বড় বেশী দৃষ্টি পড়েছে। এর হেতুই এই যে আমাদের মূলে দৃষ্টি নেই।

কেবল সত্য প্রচার করলেই মানুষ তা গ্রহণ করে না। মানুষ দেখে—কে বলে, কি বলে, আর কেমন করে বলে। আমরা "কে বলে" সে দিকে বড় লক্ষ্য করিনে। বাইরের সাজসজ্জার দিকেই লক্ষ্য পড়ছে বেশী। যদি কেউ কতকগুলো বাইরের অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, যথা উপবাস ক'রে বা গেরুয়া প'রে কিছু একটা করতে বলে, তবে আর রক্ষা নেই, সবাই মিলে অমনি তাই করতে থাকি।

জাতীয় উন্নতিকল্পে কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গেল আবার গেল, কিন্তু কৈ? আমরা তো "যে তিমিরে সেই তিমিরে"! অবশ্য কিছুই হয়নি, এ কথা বলা যায় না।

মানুষ যা কিছু করে, ছোট হোক আর বড়ই হোক, যদি তার মূলে নিছক অহঙ্কার না থেকে কোন একটা লক্ষ্য থাকে, তবে সেরূপ করার ফলে হয় কিছু জানা; এই জানাকেই বলে অভিজ্ঞতা। এ ভাবে দেখতে গেলে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সব কাজেরই একটা মূল্য আছে। সবটার ভিতর দিয়েই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। আগের অনুষ্ঠানগুলির লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি। কিন্তু তা করতে হলে তো একজন নেতা পেলেই সুবিধা হয়, তার মধ্য দিয়েই তো উপায়টাকে জানা সহজ হয়। আগে সকলের চাহিদা এক জনের ভিতরে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে; তাঁর ভিতর দিয়ে সকলের ইচ্ছা বিকসিত হইয়া উঠে। এইরূপেই যুগে যুগে Foreman এসে থাকেন। তিনিই পন্থানির্দ্দেশ করে' দিয়ে যান।

এইরূপ বিকাশের ভিতর দিয়েই জীবনে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, একত্রে যাওয়া হয়; সে দিক থেকে আজ হিন্দুজাতি ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছেন। তাই তাঁরা দুর্ব্বল; বিচ্ছিন্ন বলেই সহায়হীন। তাই বৈষ্ণবকে যখন কেউ মারে, তখন শাক্ত এসে সাহায্য করে না, শৈবের প্রতি অত্যাচার করলে গাণপত্য এসে পাশে দাঁড়ায় না! কিন্তু মুসলমানদের ভিতরে এরূপ নয়। তাঁরা একমাত্র হজরত মহম্মদের নামে সবাই একত্র হন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা একের প্রকৃত উপাসনা নেই বলেই ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদ প্রভৃতি বেড়ে গেছে।

এক ভাবে বলতে গেলে, দেখছি হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধের মধ্যেও ভালোই ফুটে উঠেছে। না হলে আমাদের সামাজিক জীবনের দিকে নজর পড়ত না। প্রথম কথা এই যে, চেপে রাখার চেয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া ভালো। ওতে গলদ বেরিয়ে যায়। রাজনৈতিক ব্যাপারটা মাঝখানে পড়ে এটা ঠিক হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মত কাজ করছে। কোনো ব্যারাম সারবার আগে নাকি aggravation হয়। এটাও হয়েছে তেমনি। এই দেবাসুর-যুদ্ধের পরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। দেবতাদের মিলিত আকাঙ্ক্ষা যেমন ব্রহ্মশক্তিরূপা ভগবতীর ভিতরে মূর্ত্তি ধারণ করে উঠেছিল, এবারেও তেমনি সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও শিক্ষায় আমাদের যে দুর্ব্বলতা আছে, তার প্রতীকারের আকাঙ্ক্ষা আশা করি কোনো ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত্তি ধারণ করে উঠবে।

আমাদের দুর্ব্বলতা রয়েছে সামাজিক জীবনে। কোথায় সে দুর্ব্বলতার বীজ তা পরে দেখা যাবে।

কেউ বলছেন, হিন্দুদের এখন আত্মরক্ষার উপযোগী হওয়ার জন্য দৈহিক বলশালী হওয়া দরকার। এই চাহিদা পূরণের জন্য কেউ বলছেন গ্রামে গ্রামে লাঠিখেলার আখড়া বসাও; কেউ বলছেন ক্ষাত্র বংশ বৃদ্ধি করবার জন্য পাহাড়িয়া, খাসিয়া, গারো প্রভৃতিকে হিন্দু করে নেও; এরা এসে আমাদের রক্ষা করুক! এই রকম পাহাড়ে জাতিকে হিন্দু করার জন্য একদল খুব লেগেছেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আবার খৃষ্টানদের সঙ্গে যাহাতে একটা বিরোধের সৃষ্টি না হয় সে সম্বন্ধে সতর্কতা লওয়া প্রয়োজন। জোর করে কৌশল করে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করানো কখন ঠিক হবে না। আর লাঠিবাজী করে বিরোধ করতে গেলে অনেক স্থলেই মুসলমানের হাতে হিন্দুর পরাজয় অভাবনীয় নহে। সুদূর অতীত যুগে আর্য্যেরাও যে কেবল অস্ত্রবলেই অনার্য্যদের পরাজিত করেছিলেন এমন নয়, অন্যপ্রকারের চেষ্টাও ছিল।

মুসলমানের নানাবিধ আচার-ব্যবহার, চাল-চলন আমাদের নেহাৎ অনুরোধে বা চোখ-রাঙানিতে বদলে যাবে এরূপ প্রত্যাশা করতেই পারিনে। আমাদের নিজেদের বরং তৈরী হওয়া, সবল হওয়া দরকার।

ব্যায়াম না হতে পারে, এজন্য কেবল বাহিরটাকে প্রস্তুত না করে নিজের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করাও আবশ্যক। এ দুটোই চাই। এই দুটো দিকে যোগ্য হতে পারলেই বিরোধের কারণের ধ্বংস হবে।

দেখতে হবে আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়, দুর্ব্বলতার মূল কারণ কি? কি জন্য আমরা সব বিষয়ে এরূপ খাটো হতে চলেছি? কোন্ একটা দিকে দৃষ্টি পড়লে আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা সব সার্থক হয়ে উঠবে?

প্রথমেই দেখতে পাই, আমরা ঋষিদের শিক্ষা ভুলে গেছি; শাস্ত্রের কদর্থ করেছি। যুগোপযোগী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিনি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, সংহিতা প্রভৃতির অবমাননা করেছি। তাই আজ দেশের এ দুর্দ্দিন। আজ স্থানে স্থানে নারীর লাঞ্ছনা, দেবমন্দির বিধ্বস্ত। এখনো সাবধান না হলে অচিরে হিন্দুজাতি জগৎ থেকে লুপ্ত হবে।

সর্ব্বপ্রথম দেশে মানুষ গড়ে তোলার আবশ্যক হয়েছে। আমাদের দুর্ব্বলতা ঢুকেছে বিবাহপ্রথার ভিতরে। ঠিক বিবাহ হচ্চে না বলে যোগ্য সন্তান জন্মাচ্ছে না, ভালো সন্তান হচ্ছে না বলেই উচ্চ শ্রেণীর মানুষ গড়ে উঠচে না, আর মানুষ হচ্চে না বলেই সব উন্নতি সুদূরপরাহত হয়ে আছে। এই বিবাহপ্রথার সংশোধন হলেই সমাজসংস্কার হবে, এবং সমাজসংস্কার হলেই রাজনৈতিক উন্নতি আপনা আপনি হবে।

ব্যস্তবাগীশের ব্যায়াম।

[জনৈক ব্যস্তবাগীশ ডাক্তার-লিখিত]

ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে সেই ১৯০৫ সাল থেকে অনেকেই অনুভব করেন; কিন্তু কাজের বেলায় এই ব্যাপারটার অনুশীলন কর্ত্তে বড় একটা কাউকে দেখি না। অনেকেরই মস্ত অছিলা—"মশাই, ব্যায়াম কর্ত্তে ত খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সময় পাই না!"

সময়ের অছিলায় লোকের কিন্তু নিয়মিত দাড়ী কামানো, চুল ছাঁটা, টেরী বাগানো, কোঁচা দিয়ে ফর্সা কাপড় পরা, জুতো-ক্রস্ করিয়ে নেওয়া, তাস খেলা, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে বড় বড় রাজনীতির শ্রাদ্ধ করা—কিছুই বাদ যায় না। যেটা এসব গুলোর চেয়ে বেশী দরকারী, যেটার অভাবে চিনির পুতুল—দেহখানা একটু রোগের বারিপাতে গলে যেতে পারে, যেটার চর্চ্চায় চুলকাটা বা টেরী কাটার চেয়ে কম সময় লাগতে পারে, সেইটার বেলায় 'সময় পাই না'!

বস্তুত, একটু চিন্তা করে' দেখ্‌লেই আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি যে, প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য একনিষ্ঠভাবে

[চিত্র নং ১]

[এই ব্যায়ামটি কাঠুরিয়াদের কাঠ কাটার সর্ব্বপ্রাথমিক অবস্থার ন্যায়। দুই হস্তের অঙ্গুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিবে। ক্রমান্বয়ে একদিকের পা ও বিপরীত দিকের বাহু অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।]

ব্যায়াম করায় শরীরে যে লাবণ্য ফুটে উঠে, ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে ফ্যাকাসে চাম্‌ড়া-ঢাকা তোব্‌ড়া গাল কানিগে

[চিত্র নং ২]

[এই ব্যায়ামটি প্রথম ব্যায়ামটিরই বিপরীত দিক্। এই দুইটি ব্যায়ামে দেহকাণ্ডের সব বড় বড় পেশীগুলিই পুষ্ট হয়; পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের পেশীরও রীতিমত ব্যায়াম হয়।]

তার চেয়ে অনেক কম লাবণ্যের বিকাশ হয়। শিখেদের একগাল দাড়ী, অথচ দেখ্‌তে—কি জ্যোতির্ম্ময় মনোহর!
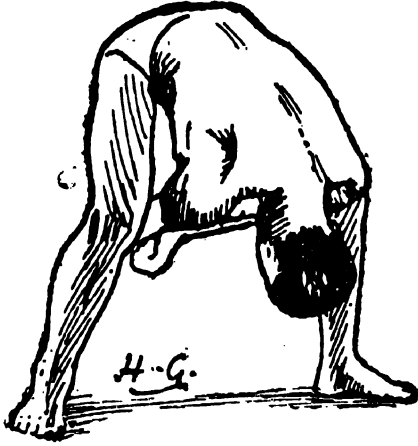
[চিত্র নং ৩]

[এই ব্যায়ামটি অনেকটা কাঠুরিয়াদিগের কাঠ-কাটার দ্বিতীয় অবস্থার মত; তবে পরস্পর বদ্ধ করাঙ্গুলি সমেত বাহুদ্বয় টান্ টান্ করিয়া উরুদ্বয় মধ্যবর্ত্তী ফাঁক্ দিয়া প্রসারিত হইবে। ইহাতে মেরুদণ্ড শক্ত হয়, যকৃৎ ও পাকস্থলী প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যায়াম হয় এবং সহজে কোষ্ঠপরিষ্কারেও সাহায্য করে।]

আর অনেক বাঙালী বাবু গোঁফ্‌-দাড়ি কামিয়ে "গোবিন্দ অধিকারী" সেজে যেন শ্মশানের প্রেত-মূর্ত্তি!

বাঙালী জাতটা আজ ভীরু, দুর্ব্বল, অলস...আগে

[চিত্র নং ৪]

[চিত্র নং ৪ হইতে ৮ পর্য্যন্ত একটি ব্যায়ামেরই বিভিন্ন অংশ বা অবস্থা মাত্র। পদদ্বয় ফাঁক্ রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাহুদ্বয় প্রসারিত কর। পা দুইটি ঠিক রাখিয়া, হস্তদ্বয় ও মস্তক সমেত দেহকাণ্ডটি ৯০ ডিগ্রী দক্ষিণে বা বামে ঘুরাও। তারপর......]

তাদের পূর্ব্ব পুরুষরা দিগ্বিজয় করে' এসেছে...আজ তাদের শক্তি-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কেন ...ইত্যাকার আলোচনা ও কবিদের উন্মাদনাময়ী উক্তি দিয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের পাতা ভরাবার প্রয়োজন দেখি না; তার উপর আমার সে সময়ও নেই, কারণ আমি একজন ব্যস্তবাগীশ ডাক্তার। ছেলেবেলা থেকে আমারও ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকে মস্ত একটা টান্ ছিল। তখন স্বদেশী আমলের হুজুকে পড়ে' কিছুদিন ডন্-বৈঠক আর লাঠিখেলার কসরৎ প্রবল উৎসাহে মক্স করেছিলুম। তারপর যখন স্বদেশী আন্দোলনের হাওয়া জুড়িয়ে গেল, বাবা বইয়ের বস্তা গলায় বেঁধে কলেজের কুম্ভীপাকে জুড়ে দিলেন, তখন ব্যায়ামের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেলুম। তদবধি ঐ সময়াভাবের ওজরটি সমান্ টানে চ'লে আস্‌ছিল।
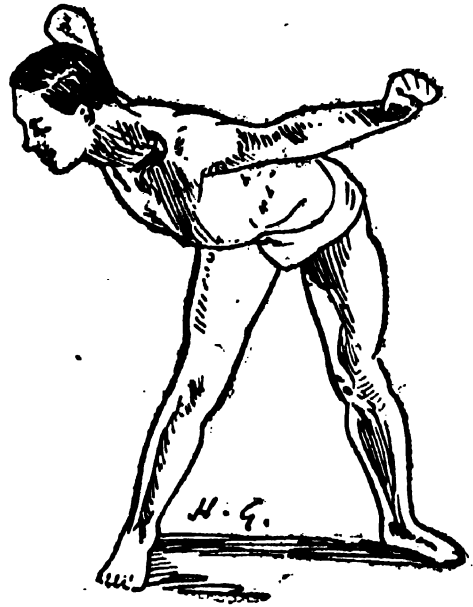
[চিত্র নং ৫]

[...তারপর পাখী উড়িবার সময় যেমন করিয়া ডানা মেলে, ঠিক সেইভাবে হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দেহকাণ্ডটি নীচু করিয়া দাও। এই দুইটি ব্যায়াম বক্ষ পৃষ্ঠদেশ ও বাহুর পশ্চাদ্দিকের পেশীগুলি বর্দ্ধনে সহায়তা করে।]

কিন্তু কিছুদিন আগে যখন যৌবনের মাঝামাঝি, প্রাক্‌টিসের খর-সূর্য্যের দ্রুত উদয়ে, স্বাস্থ্যের পৌরোহিত্য কর্‌তে দিবারাত্র মটরে চড়ে', অসময়ে স্নানাহার করে' ও নিদ্রা গিয়ে, শরীর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হতে লাগ্‌ল—একটু প্রস্রাবের দোষ—একটু বাতের আমেজ—একটু অম্লের উদ্গার উঠ্‌তে লাগল, তখন প্রমাদ গণ্‌লুম—পুরাতন বিস্মৃত ব্যায়ামের কথা মনে পড়ে' গেল। কিন্তু সেই সনাতন 'সময়ের অভাব',—কি করি? এমন একটা পদ্ধতি খুঁজতে লাগ্‌লুম, যাতে ব্যায়ামের ফলটা পুরামাত্রায় পাওয়া যায়, অথচ সময় খুব কম লাগে। আপনারা জানেন বোধ হয় যে, পাঁচ আনার দক্ষিণায়

পুরোহিত পারলৌকিক শ্রাদ্ধ বা শ্যামাপূজা পাঁচ মিনিটে সেরে দেন, আবার পাঁচ টাকা দক্ষিণায় পাঁচ ঘণ্টাও সময় লাগে; পুরোহিতেরা বলেন—ফল কিন্তু প্রত্যেকটাতেই সমান।
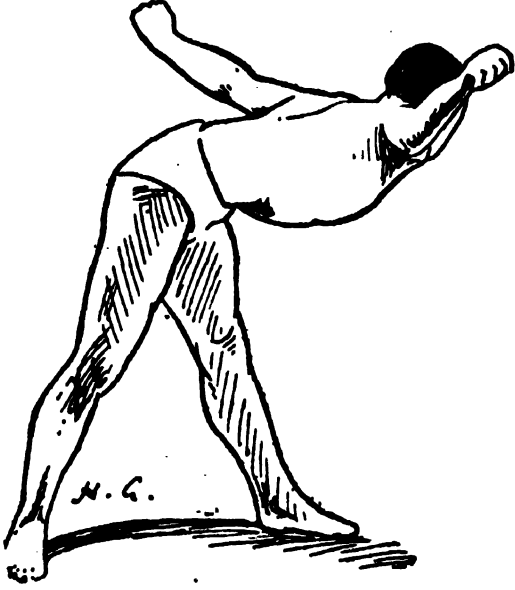
[চিত্র নং ৬]

এই ব্যায়ামটি ৫ নং ব্যায়ামটির বিপরীত দিক।

দেশী-বিদেশী অনেক স্বাস্থ্যার্চ্চকদের সঙ্গে দেখা ও পত্র-বিনিময় করলুম; বিদেশী অনেক স্বাস্থ্য ও শক্তি-বিষয়ক পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লুম। প্রায় সকলেরই কিন্তু লম্বা বৃষোৎসর্গের ফর্দ্দ। তারপর এই সব দর্শন, শ্রবণ ও পঠন থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'ল সেইটুকুকে নিংড়িয়ে একটা ব্যায়ামের সোজা সংক্ষিপ্ত সড়ক বা'র করে' ফেল্লুম। প্রায় আড়াই বৎসরকাল এই ব্যায়ামগুলির চর্চ্চা করে' আমি অনেক উপকার পেয়েছি, আমার শরীর-ভাঙনের উপক্রম থেমে গেছে; স্নানাহারের অনিয়মটা বাধ্য হয়ে প্রায় পূর্ব্বের মতোই বজায় রেখেও এই ব্যায়াম-পদ্ধতি দ্বারা যতটা মঙ্গল পেয়েছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বিষয়ে একটু বেশী নিয়মনিষ্ঠার অনুসরণ কর্‌লে এর দ্বারা অনেক বেশী মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে। সম্প্রতি আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এটা অভ্যাস করে' বেশ একটু সুফল পাচ্ছেন্। উকীল, ব্যারিষ্টার, ছাত্র, কেরানী, ডাক্তার প্রভৃতি আমার মতো ব্যস্তবাগীশ্ যাঁরা—তাঁরা বেশ সুবিধার সঙ্গে নিম্নপ্রদর্শিত ব্যায়ামগুলির অভ্যাস কর্‌তে পারেন।

দুরারোগ্য রোগে দৈব-মাদুলী ধারণ করার মতো এতে তেমন কিছু বাছ-বিচার বা নিয়মের কড়া-কড়ি নেই। প্রভাতে শয্যা থেকে উঠেই এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করে' নেওয়া অভিপ্রেত। প্রদর্শিত আটটি ভঙ্গির এক-একটিতে এক মিনিট নিয়োগ কর্‌লেই যথেষ্ট। এক-একটি অবস্থা নিয়ে পেশীগুলি যথাসম্ভব শক্ত করে' মিনিটখানেক নিঃশ্বাস বন্ধ করে' রাখ্‌তে হয়; এবং তারপর এক মিনিট পরে পেশী শ্লথ করে' প্রশ্বাস

[চিত্র নং ৭]

তারপর ৫ বা ৬নং ব্যায়ামের অবস্থা হইতে দেহকাণ্ডটিকে স্বাভাবিক ভাবে আনিয়া, একদিকের কোমর ভাঙিয়া উরুর সহিত সমান্তরালে ঐ দিকের মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি ঝুলাইয়া, অন্য হাতখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দাও।

[চিত্র নং ৮]

তারপর পুনরায় স্বাভাবিক দাঁড়াইবার অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া, এক-এক পার্শ্বে দেহকাণ্ড বাঁকাইয়া বাহুদ্বয় মেলিয়া বুক চিতাইয়া পশ্চাৎভাগটাকে ধনুকাকারে স্থাপন কর।

নাক দিয়ে ফেলে দিতে ও পুনরায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে আর একটি অবস্থা গ্রহণ কর্ত্তে হয়। ব্যায়ামের সময় মনকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখ্‌তে হবে এবং মনে মনে suggest করতে হবে যে, এতে পেশীসকলও পুষ্ট হচ্ছে, দেহে প্রচুর প্রাণশক্তির সঞ্চার হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বরের দরকার নেই। সব জিনিস ঠিক সময়মত ও সাধ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত। *

গ্রন্থ-পরিচয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—২য় ভাগ (অনুশাসন খণ্ড)—হিন্দী অনুবাদ লাহোর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারসমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আট আনা।

এই হিন্দী অনুবাদ আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। অনুবাদ যেমন সরল, তেমনি অক্ষরশঃ হইয়াছে—একটী কথাও বাদ পড়ে নাই। মহর্ষিকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, বঙ্গবাসী অপেক্ষা পশ্চিম ভারতের অধিবাসীগণ অধিকতর নিষ্ঠাবান। এই অনুবাদে আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি।

বহুপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ অগ্নিহোত্রী মহাশয় (বর্ত্তমানে দেবসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু) সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের (১ম ও ২য় খণ্ডের) হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে হিন্দী অপেক্ষাকৃত উর্দ্দুমিশ্রিত ছিল—অন্তত স্থানে স্থানে আমাদের বুঝিবার পক্ষে কষ্টকর হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সমালোচ্য অনুবাদ এমন সরল হইয়াছে যে, উহা বুঝিতে কোনও বঙ্গবাসীরই কষ্ট হইতে পারে না। ছাপানোর অক্ষরগুলি সহজ ধরণের—পড়িতেও কোনই কষ্ট হইবে না। আমরা এই অনুবাদের জন্য লাহোর ব্রাহ্মসমাজকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা আশা করি, তাঁহারা অবিলম্বে প্রথম খণ্ডও অনুবাদ করুন। এবং সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে তরবারি-রূপে লইয়া কেবল পশ্চিমে কেন, এই বঙ্গদেশেও হিন্দুস্থানীদিগের ভিতরে প্রচার করিলে প্রচুর সুফল-লাভের সম্ভাবনা। আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মনের ভাব এরূপ হইয়াছে যে, শুধু নীতি-কথা প্রচার করিলে কোন ধর্ম্মগ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না—সেই ধর্ম্মের ভিতরে দর্শনভাগ কতটুকু দৃঢ় তাহা দেখিতে চায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের দর্শন এবং নীতি উভয়ই যে বর্ত্তমান যুগের একমাত্র অবলম্বনীয় practical ধর্ম্ম, এইটী বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। বোঝানো দরকার যে ইহার ভিতর অলৌকিক কোন বিষয়ের অবতারণা করিয়া লোককে ধাঁধায় ফেলিবার কোন বিষয় নাই। আমরা অন্তরের সহিত লাহোর ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, ভগবৎকৃপায় তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ করুন।

একটী বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতেছি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয় লাহোরে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে একটা জাগরণ আনিতে পারিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া লাহোর ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের একটা অগ্নিময় কেন্দ্র করিয়া তুলুন।

গোবিন্দদাসের করচা (নব সংস্করণ)— রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ কবিশেখর এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দদাসের করচার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। আমরা সে সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিব না। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে 'করচার' লেখক প্রাচীনই হউন বা নবীনই হউন কাব্যরসে যে রসিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। করচাটী ভক্তিরস-প্রধান এবং মোটের উপর আমাদের ভালই লাগিয়াছে। ইহা যদি কোন আধুনিক কবিরও লিখিত হয় তাহা হইলেও ইহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রান্তবাসী।—কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ তত্ত্বনিধি, বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা।

সুদূর আসামপ্রদেশের ধুবড়ী সহর হইতে এই বাঙ্গালা সাপ্তাহিকখানি কয়েকমাস হইল নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক হইলেও রচনাগুলির বিষয়বৈচিত্র্যে ও সাহিত্যগৌরবে মাসিকের আদর্শেই পরিচালিত। সম্পাদকীয় স্তম্ভে বেশ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে মফঃস্বল হইতে যে কয়খানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে 'প্রান্তবাসী' আপনার অন্তর ও বাহ্য সৌষ্ঠবে বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করিবার দাবী রাখে। আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীগণের মাতৃভাষার চরণকমলে এই অম্লান ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকুক।

সংবাদ।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।—৬৬ বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও অনুরাগে এবং

* 'স্বাস্থ্যসমাচার'—বৈশাখ, ১৩৩৪ হইতে উদ্ধৃত।

স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ উপাসকগণের যত্নে ও চেষ্টায় ১২৬৭ সালে বর্দ্ধমানে আদিব্রাহ্মসমাজের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, ৺শম্ভুনাথ গড়গড়ি, ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আদিব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্যগণ নিয়মিতভাবে ইহার সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। ভগবানের মঙ্গল বিধানে এবার গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ও গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষ্যে গত ২৭শে ও ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যায় সম্পাদকমহাশয়ের আবাস-ভবনে সায়ং-উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল; এবং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালে মহাজনটুলীস্থ সমাজ-মন্দিরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্থানীয় ভদ্র অধিবাসীগণ সকলেই, এমন কি, অন্তঃপুরচারিণী মহিলারাও অবিনাশবাবুর গৃহে অনুষ্ঠিত এই সান্ধ্য উপাসনায় সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন।

অবিনাশবাবু তাঁহার গৃহাগত অতিথিগণের চারি দিন ধরিয়া যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন ও প্রচুর আহারাদির আয়োজন করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানে যাঁহারা মহর্ষিপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র অগ্নিকণায় আপন আপন শক্তি ও প্রীতির আহুতি দিয়া দিন দিন উহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে কেবল দুইজন মাত্র সপ্ততিপর বৃদ্ধ আর অবশিষ্ট আছেন। ইঁহাদের অবর্ত্তমানে আশঙ্কা হয়, বর্দ্ধমানের মত একটী সুসমৃদ্ধ নগরীর বুকের উপর হইতে ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র অগ্নিকণা বুঝি চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। যে কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রহ্মোপাসক এখনও ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরিয়া আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ বালকবালিকাদিগকে ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের এক-একটী অগ্নিময় কেন্দ্র করিয়া তুলুন, তাহা হইলেই ব্রাহ্মসমাজ আবার সজীব হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

শোকসংবাদ।

ডাঃ ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত।—আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার জনৈক বিশিষ্ট সভ্য ও ইহার একজন পরমহিতৈষী বন্ধু আমেরিকা-প্রত্যাগত সুনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত এম্-ডি, গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ব্বাহ্নে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন পরোপকারী একজন সুচিকিৎসকের অকাল মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্য। আদিব্রাহ্মসমাজে যখন একটী 'মেডিক্যাল মিশন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন ইনিই আপন অবসরহীন কর্ম্মময় জীবনেও আমাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ ও সাহায্য দানে এতটুকু কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন উদারহৃদয় হিতৈষী বন্ধুকে হারাইলাম। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত পরিবার পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণসাধন-পূর্ব্বক বিয়োগব্যথিত পত্নী ও পুত্র-কন্যার হৃদয়ে শান্তিদান করুন।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

চৈত্রমাস—১৮৪৮ শক।

আয়	১০৭৬৷৴৩
পূর্ব্বস্থিত	২১৩৸৴৯
সমষ্টি	১২৯০৷৴০
ব্যয়	৯৭৬৲৯
স্থিতি	৩১৪৷৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আনুষ্ঠানিক দান	১০৲
ঋণগ্রহণ	৩৬৯৴৬
সস্‌পেন্স	৪০৩৷৴৬
সমষ্টি	৭৮২৷৵০

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৪১৶০
হাল	৯৷০
বিজ্ঞাপন	৩৮৲
মাশুল	২৸৴০
সমষ্টি	৯১৸০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৭০৸৶০
গচ্ছিত পুস্তক	১৮৸/০
গীতারহস্য	১০৮৲
ঐ মাশুল	৩৲
কমিশন	১৷৵৩
সমষ্টি	২০২৵৩
সমষ্টি	১০৭৬॥/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্য	৫২৲
গায়ক	১৪০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৭॥০
হিসাবরক্ষক	৩০৲
বেহারা	৮৲
মেথর	২৲
সরঞ্জামী	৪॥৶৩
মাশুল	৪৸৶৬
Ellectric	৪৷৶০
কেরোসিন	৷/৬
ঋণশোধ	৪০৪৶
হাওলাত প্রদান	২১৲
বারবরদারী	৩/৬
বিবিধ	২৸/৬
সর্ব্বসমষ্টি	৬৮৫/৩

তত্ত্ববোধিনী।

দপ্তরী	১৯৵০
মাশুল	৬৷৯
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৭॥০
হিসাবরক্ষক	১৫৲
বেহারা	৮৲
মূল্য আদায়ের কমিশন	৯৷০
বিজ্ঞাপনের কমিশন	২৩৷০
বিবিধ	১৲
সমষ্টি	৮৯৷৵৯

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৩৲
কম্পোজিটর	৩৫৸৶০
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	৮৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৭॥০
হিসাবরক্ষক	১৫৲
বেহারা	৮৲
জলপানি	॥৶৬
কাগজ	১৸০
কালি	৸৵০
তৈল	॥/০
দপ্তরী	৯৸/০
মাশুল	৬
তামাক	৷৵০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৫৵০
লেই জন্য ময়দা	/৯
বিবিধ	॥/০
সমষ্টি	১৩৭৷/৯

পুস্তকালয়।

কমিশন	১৭৷৵৬
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৭॥০
বিবিধ	/০
মাশুল	৸৵৬
গীতার মূল্য	৬৲
ঐ মাশুল	৪৵০
ঐ কমিশন	৮৶০
ঐ দপ্তরী	২০৲
সমষ্টি	৬৪৷৶০
সর্ব্বসমষ্টি	৯৭৬৷৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনী।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমানে ৮৫ বৎসরে চলিতেছে)

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৻৷৹ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৻৷৹।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।৹ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমন, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণ এবং জীবনীসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রকাশের জন্য রচনাদি ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৫ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	৬৲	প্রতিমাসে।
„	½ „	৪৲	„
„	¼ „	২৲	„

মলাটের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনসংগ্রহকারিগণকে উপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়।

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেন্ট হইলে টাকায় ।৹ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 4 2.

১০০৮ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। শ্রাবণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ৷/০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। — আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্তী

শান্তিধাম—রাঁচি

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৮ সংখ্যা

১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮৭। অঞ্জলি—পরম পুরুষ দেবতা।

বাহিরে তোমার শাসনে মেঘ বারি বর্ষণ করে, অন্তরে তুমি করুণাবারি বর্ষণ কর। প্রকৃতির শতবিধ কার্য্য তোমারই যশ ও কীর্ত্তি নিয়তই ঘোষণা করিতেছে। মলয় বায়ু তোমারই মঙ্গলবার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। তোমার নামে আমি নতমস্তকে যোড়করে যে সকল স্তবগান করিতেছি, সেই সকল স্তবগানের ফলে জগতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হৌক, অধর্ম্ম বিদূরিত হৌক এবং ন্যায় ও ধর্ম্মের শাসন বিস্তৃত হৌক।

২। ধরাপৃষ্ঠ এবং অন্তরীক্ষ উষ্ণ উষ্মা দ্বারা অতিমাত্র প্রপীড়িত হইলে যেমন প্রভঞ্জন বায়ু আসিয়া সবলে তাহা উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ অধর্ম্মের উত্তাপে যখন মানবসমাজ প্রপীড়িত হয়, তখন তোমার ধর্ম্ম রুদ্রবেশে আবির্ভূত হইয়া অধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। অধর্ম্ম বিদূরিত হইলে মানবসমাজ এক নবতর শ্রী ধারণ করে, মানবমণ্ডলীর মধ্যে এক নবতর বীর্য্য, ওজ ও তেজ আবির্ভূত হয়। তখন শত্রুগণ সহজেই পরাভূত হয়, পাপ তাপ অন্তর্হিত হয়, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান সহস্র সূর্য্যের আলোক ধারণ করিয়া মানবমণ্ডলীকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, মানব-সমাজের বল ও পরাক্রম শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৩। যাঁহারা আপনাদিগকে তোমার সন্তান বলিয়া জানেন, তাঁহারাই জানেন যে, তাঁহারা মরণ-রহিত ও চিরযৌবনে পূর্ণ। তাঁহাদের ইহা বলিবার অধিকার আছে যে, তোমার প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধা-বান, তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তোমার সেই সকল অমরণধর্ম্মা সন্তানগণের তেজের সম্মুখে কেহই স্থিরভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সকলেই পৃথিবীর ন্যায় ধ্রুব ও পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে অভীষ্টবিষয়ে সিদ্ধি-লাভের অধিকারী। তাঁহারা স্বয়ং অটল হইলেও পর্ব্বতসকলকে টলাইতে পারেন; তাঁহাদের আদেশে অনন্ত সমুদ্রও দ্বিধাবিভিন্ন হইয়া ভক্তদিগের গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাঁহাদের শাসনে প্রভঞ্জন বায়ুও স্বীয় প্রবল বেগ প্রতিরুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়।

৪। তোমারই মঙ্গলবাণী বহন করিয়া মলয়-বায়ু বেল যুথিকা প্রভৃতি বিবিধ বিশুভ্র ফুল ফুটাইয়া তুলিতেছে। তোমারই কঠোর শাসন জানাইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে প্রভঞ্জন বায়ু সবেগে প্রবাহিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে শতবিধ

রোগবাহী দুর্গন্ধ বিদূরিত করত আকাশে প্রসন্নতা পুনরানয়ন করিতেছে।

৫। * তোমারই শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইয়া এবং মেঘসকল বারিবর্ষণ করিয়া তোমার প্রজা-বৃন্দকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে। তোমার ভক্তবৃন্দ তোমার প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মসকল অনুসরণ করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে। তোমার প্রতি অশ্রদ্ধাবান লোকেরা তোমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে চলিয়া বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। তোমার করুণা সূর্য্যকিরণের ন্যায় ভক্ত ও অভক্ত সকলেরই উপর সমানরূপে নিপতিত হইতেছে।

৬। হে মহাঋত্বিক! তোমার নামে আমরা যে মহাযজ্ঞ জগতে খুলিয়া বসিয়াছি, তুমি তাহাতে তোমার করুণাঘৃত নিক্ষেপ কর। সেই ঘৃতের গন্ধ পাইয়া মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে ভূলোকে নামিয়া আসিয়া তাহাদের বন্ধু মেঘসমূহের সাহায্যে ধরণীকে জলসিক্ত করিয়া শস্যশ্যামল করিয়া তুলুক। যথাসময়ে মেঘসকল বজ্রধ্বনি করিয়া ধরাবাসীর অন্তরে আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

৭। তুমি মহান, পরম পুরুষ। তুমি প্রজ্ঞানঘন ও তেজঃপূর্ণ। তুমি মহাবলী; তোমার বলক্রিয়া আলোচনা করিতে গিয়া প্রাণ মন স্তম্ভিত হইয়া উঠে। তুমি বায়ু হইতেও বেগবান; মনও তোমার বেগ ধারণ করিতে পারে না। অরুণবর্ণ দাবানলের গগনস্পর্দ্ধী শিখাসকল তোমারই আরতি করিতেছে। পর্ব্বতসকল নবোত্থিত শষ্পতৃণ সাহায্যে তোমারই চরণপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

৮। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়া কত লোক জ্ঞানী বলিয়া জগতবাসীর নিকটে ভক্তিপুষ্প আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনের দ্বারা তোমারই মঙ্গলভাব বিঘোষিত করিতেছেন। তোমার বিরোধী যাহারা, তাহারা তোমার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হয় এবং অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখে। তুমি ভক্তবৎসল। তোমার এক হস্তে অভয়বর, অপর হস্তে উদ্যত বজ্র। তুমি আমাদের শত্রুগণের পরাভব সাধন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, আমরা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।

৯। তোমার প্রকৃত ভক্ত আমরা যে কয়জন তোমাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি ও তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা তোমার উপাসনা করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছি, সেই কয়জনকে একটী প্রবল সংঘে পরিণত কর, যাহাতে আমরা মিলিতভাবে অপ্রতিহত বলে তোমার মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া তোমাকে জয়যুক্ত করিতে পারি। তোমার ইঙ্গিত ও আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া যেন আমরা জগতের মঙ্গলসাধনেই নিযুক্ত থাকি। আমরা যেন দেহ মন ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া শৌর্য্যবীর্য্যে পরিপুষ্ট হই এবং শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ তোমার চরণস্পর্শের অধিকার লাভ করি। সুরনর যে যেথায় আছে, সকলের হৃদয় হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করিয়া তোমার জয়গান সমুত্থিত হোক। তুমিই আমাদের একমাত্র গুরু, তুমিই আমাদের মন-রথের সারথি হইয়া তাহাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত কর।

১০। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সকলই তুমি নিত্য জানিতেছ। তুমিই ভগবান—সকল ঐশ্বর্য্য তোমা হইতেই আসিয়াছে। সকল কর্ম্মের মূল তুমি। তুমিই আমাদের সকল পাপ মোচন করিয়া আমাদিগকে তোমারই দিকে নিত্য আকর্ষণ কর। তোমার জ্ঞান ও বলের সীমা নাই। শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদের নিকট সর্ব্বদাই স্নিগ্ধমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও। তুমি আমাদের নেতা। আমাদের শত্রুগণের নিকট তুমি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও।

১১। আমাদের আত্মাকে দুঃখশোক পাপতাপের জ্বালাযন্ত্রণা যখন অত্যন্ত দগ্ধ করিতে থাকে, তখন তোমার করুণাবারির অমৃতনিস্যন্দ আমাদের চিত্তে অবিরলধারে ঝরিয়া মহাশান্তি আনয়ন করে এবং জ্বালাযন্ত্রণার ঘন মেঘসকল কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আমরা যেখানে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, সেখানে তুমিই প্রসন্ন মুখে আবির্ভূত হইয়া তোমারই প্রসাদ বিতরণ কর। আমাদের শত্রুগণ যখন সেইসকল কর্ম্মযজ্ঞ

পঙ্গু ও বিফল করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তোমারই তেজ তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেয়। অচেতনের ভিতরে তুমিই চেতনাস্বরূপ রহিয়াছ। নিশ্চল পদার্থসমূহের মধ্যে তুমিই সচল তেজরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমিই সকলের সিদ্ধিদাতা। তোমার মঙ্গলসাধক অস্ত্র উজ্জ্বল ও দীপ্তিশীল; শত সূর্য্যের সুতীব্র কিরণও সে দীপ্তি ও উজ্জ্বল কিরণের নিকট লজ্জায় নতমস্তক হইয়া যায়।

১২। তোমার তেজের কণামাত্র লাভ করিয়া আমরা শত্রুগণকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা ধারণ করিয়াছি। তুমি স্বীয় করুণায় আমাদের যাহা কিছু ভুল ভ্রান্তি, সমস্তই মার্জ্জনা কর। তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ করুণাধারার আকারে আমাদের মস্তকে নিত্যই বর্ষিত হইতেছে। তুমি সর্ব্বদর্শী মনের নিয়ন্তা। তোমার মুখে প্রয়োজনমত রুদ্রভাব প্রকাশ পায় এবং ভক্তগণের নিকটে সুপ্রসন্ন ভাব স্বপ্রকাশ হয়। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি। তুমি ইচ্ছা করিলে ধূলিরাশিকেও স্বর্ণে পরিণত করিতে পার। তোমার ক্ষমতার কেহই অন্ত পায় না। তুমিই তোমার প্রজাগণের মধ্যে অন্নবস্ত্র নিরন্তর বিতরণ করিতেছ। তুমিই আমাদের প্রয়োজনমত ধনধান্য বিধান করিতেছ এবং দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিবার ব্যবস্থা করিতেছ। আমাদের প্রার্থনায় তুমি যথাযুক্ত সাড়া দিয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছ।

১৩। হে অনাথের নাথ! হে অমৃতের সাগর! তুমি যাহাকে আশ্রয় দাও, তাহার আশ্রয় কখনও ব্যর্থ হয় না। তুমি যাহার সহায় হও, তাহার গৃহ গো-অশ্বে পরিপূর্ণ হয় এবং তাহার ভাণ্ডার ধনরত্নে ভরিয়া যায়। যে তোমার চরণে শরণ লয়, তাহার কর্ম্মযজ্ঞের কখনও শেষ হয় না এবং সে চির-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়।

১৪। তুমি অমৃত পুরুষ। তোমার অমৃতের বিন্দুমাত্র আস্বাদ পাইলে আমরা অমরণধর্ম্মা হইয়া যাই। তখন আমাদের সকল কর্ম্মই সফল হয়; তখন আমরা সংগ্রামে অজেয় হইয়া যাই। শত্রুরা তখন আমাদের তেজঃপূর্ণ দীপ্তি সহ্য করিতে পারে না। দারিদ্র্যদুঃখ তখন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের যশ ও কীর্ত্তি দিগদিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমাদের বংশানুক্রমে দীর্ঘায়ু, দাতা, বিদ্বান ও তোমার প্রতি ভক্তিমান সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করুক। এইরূপ পুত্রপৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া আমরা যেন আনন্দসহকারে জীবনের শেষভাগে তোমার চরণে উপস্থিত হই।

১৫। তুমি দেবতাদেরও পরম দেবতা। সেই দেবতাদিগের ন্যায় তুমি আমাদিগকে দৃঢ় ও বীর্য্যবান কর, যাহাতে আমরা আমাদের গৃহাদি শত্রুদিগের ধ্বংসসাধক হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি। তোমার আদেশে তাঁহারা বর্ম্মদুর্গরূপে ঘিরিয়া থাকিয়া আমাদের গৃহাদি রক্ষা করুন।

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

মনুষ্যসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জগতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। ধর্ম্ম কি? স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট জীবের সম্বন্ধজ্ঞান, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই ধর্ম্মের মূল। মানব মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠে। সাধুগণ বলেন যে, যতদিন সে মাতৃজঠরে অবস্থান করে, তত দিন স্রষ্টার সহিত তাহার এত নিকট সম্বন্ধ থাকে যে সে সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জগতের আলোক তাহার চক্ষে নিপতিত হয় এবং তাহাতেই তাহার সেই যোগ ভঙ্গ হয়। এই জন্যই শিশু সেই প্রেমময়কে হারাইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। ফল কথা এই যে, ধর্ম্মবীজ হৃদয়ে বহন করিয়াই মানব জগতে অবতীর্ণ হয়।

এই ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাই শিশু চাঁদ দেখিয়া "এই সেই পরম ধন" বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ধরিতে যায়, কিন্তু চাঁদ অনেক দূরে, সূর্য্য অনেক দূরে—আকাশ অনেক দূরে। শিশু হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া পিছাইয়া আইসে। তখন সে নিকটবর্ত্তী দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করে। ক্রমে নিকটতম প্রিয়তম জননীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার সেই ক্ষোভ নিবারণ করে।

তৎপরে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত ধনকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সে হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার জ্ঞান ক্ষুদ্র, তাই তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধন—তাহার পূজার পদার্থ সীমা-বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়।

ঋষিগণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই সকল সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলেন এবং সেই অসীম ব্রহ্মে আত্মসমর্পন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া দেখিলেন যে, জগতের অসংখ্য লোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র পদার্থকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা করিতেছে। ইহাতে ঋষিহৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল।

এই আঘাতে ব্যথিত হইয়াই তাঁহারা নিজ নিজ সাধনের অভিজ্ঞতা বেদ-উপনিষদে বিবৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা অতি অল্প লোকেরই উপকার সাধিত হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ রহিল, সাধারণের কোন উপকার হইল না।

তৎপরে পুরাণকারগণ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা সেই সকল ঋষিপ্রণীত মন্ত্রের মূর্ত্তি গঠন করিয়া তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহার ফল বিষময় হইয়া উঠিল। লোকে ঐ সকল মূর্ত্তি বা Model হইতে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া মূর্ত্তিগুলিকেই দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রগুলির মধ্যে অনেক বিষয় প্রক্ষিপ্ত করিয়া উহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিলেন; আসল উদ্দেশ্যের প্রতি বড় লক্ষ্য রহিল না।

অধুনা Kinder-Garden প্রণালী অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বালক-বালিকাগণ সহজেই অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষকমহাশয় যদি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি দেখাইয়া এইটির নাম আতা, এইটির নাম ঘোড়া, এইটির নাম সন্দেশ বলিয়াই ক্ষান্ত হন তাহা হইলে ফলে কি হয়? শিক্ষার্থী প্রকৃত বস্তু হইতে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ঐ সকল দ্রব্য মাটি হইতে প্রস্তুত হয় এইরূপ ধারণাই হৃদয়ে পোষণ করিবে নাকি? প্রকৃত পক্ষে আতা যে গাছের ফল, ঘোড়া যে একটি চতুষ্পদ জন্তু, সন্দেশ যে ছানা-চিনির সুমিষ্ট খাদ্য, এ সকল কথা তাহাদের মনে হইবে না।

মূর্ত্তি বা model দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালীর ফলও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সেইরূপ হইয়া দাঁড়ায়। লোকে প্রকৃত ব্রহ্মকে ধারণা করিবার চেষ্টা না করিয়া— মৃত্তিকানির্ম্মিত পুত্তলিকাকে দেবতার আসনে বসাইয়া তাহারই পূজা করিতে লাগিল। তাহাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। ঋষিগণের সাধু উদ্দেশ্য বিফল হইল।

অনেকে বলেন যে মূর্ত্তিপূজকগণ প্রকৃত পক্ষে পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। নিরাকার ব্রহ্মের রূপ হৃদয়ে ধারণ করা সুকঠিন বলিয়াই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করত চিত্তসমাধানের সুবিধার জন্য মূর্ত্তি-সকলের প্রয়োজন—মন্ত্রে প্রকৃত ব্রহ্মকেই পূজা করা হয়। কিন্তু আমাদের আপত্তি, মূর্ত্তিকে শিক্ষার অন্যতম উপায়রূপে ব্যবহার না করিয়া ঈশ্বরের প্রতিকৃতি-জ্ঞানে পূজা করা। মাটির হাতীকে ইহাই হাতী ইহাই হাতী বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিলেও যেমন সে হাতী প্রকৃত জীবন্ত হস্তী রূপে পরিণত হয় না, সেইরূপ কোন সৃষ্ট পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া পূজা করিলে প্রকৃত অসীম ব্রহ্মের ধারণা হইতে পারে না।

যাহা হউক, ধর্ম্মের এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের স্রোত ব্রহ্মের প্রতি পরিচালিত করিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রাচ্য দেশের মোজেস, ঈশা, দাউদ, এব্রাহাম, মহম্মদ, ভারতে বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, রামানুজ, তুকারাম, রাজা রামমোহন, প্রভৃতি মনীষিগণ এই মহাস্রোতে যোগদান করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইলেন।

লোকে দেশ-কাল-পাত্র এবং নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি অনুসারে এই সকল মহাপুরুষগণপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিল। অজ্ঞতা ও অহঙ্কার বশতঃ অনেকে নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে অপর ধর্ম্মের গ্লানি ও তৎধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত নানা প্রকার কলহে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিষম বিভ্রাট উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা ক্রমশঃ প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে দূরে যাইতে লাগিল।

ক্রমে সকলে মুক্তির পথ অবলম্বন করিল। সকলে বুঝিতে লাগিল ধর্ম্মের মূল সত্য এক। যিনি যে ভাবেই ধর্ম্মানুসরণ করুন না, প্রকৃত বিশ্বাসী প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর উপাসনা ব্রহ্মেরই দিকে অগ্রসর করে। তখন সকলে বুঝিতে আরম্ভ করে যে, সকল ধর্ম্মের লক্ষ্যই একমাত্র ব্রহ্ম। তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, ভিন্ন ভিন্ন সম্বল এবং সহচরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সেই এক উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান হইতেছে। তাহারা ক্রমে সকলেই এক সন্ধিস্থলে মিলিত হইবে। সেখানে সকলেই যাইয়া দেখিবে যে তাহাদের সম্মুখে এক মহা সমুদ্র সৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সমুদ্রের—এই বৈতরণী নদীর তীরদেশে এক মহান অর্ণবপোত তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই অর্ণবপোতে আরোহণ করিবার সোপানাবলীর নিকট এক বিজ্ঞাপন সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছে

যে, কোন পার্থিব সম্বল লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেই উহা জলমগ্ন হইবে। সুতরাং সমস্ত ছাড়িয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সকলে অগ্রসর হও।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া যাঁহারা সাহসী, যাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তাঁহারা পার্থিব সম্বল, অহঙ্কার মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া সেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিবেন; যাঁহারা অল্পবিশ্বাসী, সংসারের মায়ামোহাদি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা পড়িয়া রহিবেন। কিন্তু ব্রহ্মের কৃপায় ক্রমে তাঁহারাও পার্থিব সকল দ্রব্যে অনিত্যতা দেখিতে পাইবেন এবং ক্রমে পূর্ব্বযাত্রিগণের ন্যায় পার্থিব সম্বল পরিহার করিয়া ঐ অর্ণবপোতে আরোহণ করিবেন।

অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা দেখিবেন যে সকল যাত্রীই সমশ্রেণী-ভুক্ত, সকলেই পার্থিব সম্বলশূন্য। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা সকলেরই লক্ষ্যস্থল এক। তখন সকল কলহ মিটিয়া যাইবে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি জন্মিবে। সকলেই দেখিবেন যে তাঁহারা এক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবক। তখন এক সার্ব্বজনীন ভাব সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে এবং তখন সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মের মধ্যে এই সার্ব্বজনীন ভাব দেখিয়া আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইবেন।

অধুনা জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মব্যাখ্যান ও ধর্ম্ম-প্রচারপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানবগণ ক্রমে এই মহাতীর্থযাত্রার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝাইবার এবং আপনাকে অসীম ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। পরধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সকল ধর্ম্মে শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টি করিতেছে। লোকের ধর্ম্মপিপাসা পরিমিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের প্রতি ধাবিত হইতেছে। ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ ইহার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না।

সেই জন্য আজকাল ধর্ম্মের অনুদার ব্যাখ্যা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, এক নব যুগের অভ্যুত্থান হইতেছে। এই যুগে সকল ধর্ম্মই এক সূত্রে গ্রথিত হইবে। ধর্ম্মবিদ্বেষ একেবারে অন্তর্হিত হইবে। সকলের লক্ষ্যস্থল এক হইবে। অসীম, অনন্ত, ব্রহ্মের পূজা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে। হিন্দু হিন্দু থাকিয়া, বৌদ্ধ বৌদ্ধ থাকিয়া খৃষ্টান খৃষ্টান থাকিয়া, মুসলমান মুসলমান থাকিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মের, প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া সেই পরম পুরুষের দিকে অগ্রসর হইবে।

নির্ব্বেদ।

(শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

এবার আমার মানব জনম বৃথায় গেল ভাই।
করবার কাজ কতই ছিল কিছুই করি নাই॥
ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ এখন শণের নুড়ি।
বুক ফুলা'য়ে চলার স্থলে চলি গুড়ি গুড়ি॥
আকাশভরা তারার মত কতই উচ্চ আশা,
আমার এ হৃদয়ের মাঝে করে ছিল বাসা॥
এখন মেঘে ঢাকা অমানিশা অন্ধকারে ভরা,
তায় চোখের জ্যোতি গেছে কমে জেন্তে যেন মরা॥
এখন এসে পৌছে গে'ছি বৈতরণীর ধারে,
দুই চার দিন পরে আমায় যেতে হবে পারে॥
পিছন ফিরে দেখি আমার চলার দীর্ঘ পথ,
ধূ ধূ করে পড়ে আছে শুষ্ক মরুর মত॥
যাত্রা কালে ইচ্ছা ছিল যখন যাব চলে,
দুই ধারেতে আজ্ঞাব গাছ পূর্ণ ফুলে ফলে॥
মাঝে মাঝে খনিব কূপ পূর্ণ শীতল জলে,
মনের সুখে পান করিবে পিছুর পথিক দলে।
ক্লান্ত হ'লে গাছের তলে লভিয়া বিশ্রাম,
নূতন বলে চলবে আবার লয়ে হরির নাম॥
ইচ্ছা ছিল মাঝে মাঝে রচ্‌ব পান্থালয়,
পিছুর পথিক দলের যেন সুখের লাগি হয়॥
দুই ধারেতে শস্যক্ষেত্র হবে মনের মত।
ফলবে তাহে রকম রকম ফশল কত শত॥
আরও কত ইচ্ছা ছিল বলব কত আর।
কাজত কিছুই নাহি হ'ল ইচ্ছা মাত্র সার॥
এখন অনুতাপের উষ্ণজলে বক্ষ ভেসে যায়,
হিয়ার মাঝে কাতর পরাণ করে হায় হায়॥
এখন কেঁদে কি ফল হ'বে কাঁদাই হ'বে সার,
অশ্রু-ধারে শুষ্ক মরু ভিজবে নাত আর॥
কাঁদার মত কাঁদলে কিন্তু এইটী হবে ফল,
দয়াল হরি হিয়ায় তোমার দিবেন নূতন বল॥
আবার যদি এই পথেতে এস পুনর্ব্বার,
হ'তে পারে মনের বাঞ্ছা সফল তোমার॥
তাই কাতর প্রাণে ভক্তি ভরে লহ হরির নাম,
বাঞ্ছাকল্পতরুর বরে পুরবে মনস্কাম॥
শুষ্ক মরু সরস হ'বে শ্যামল শস্যে ভরা,
তোমার চরণ-চিহ্ন বক্ষে বহন করবে বসুন্ধরা॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

রাঁচিপ্রবাস। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে তদীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বাস করিয়াছিলেন। বাসের জন্য তিনি মোরাবাদী নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর "শান্তিধাম" নামক একটি ভবন নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ঈশ্বরোপাসনার জন্য একটী সুন্দর উপাসনা-মন্দিরও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

এই 'শান্তিধামে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন, সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছেন, চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করিয়াছেন এবং ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন। রাঁচির শান্তিধাম সেইজন্য বাঙ্গালীর নিকট তীর্থস্বরূপ গণ্য হইবে।

'জীবনস্মৃতি।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীরব সাধক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতে ভালবাসিতেন। 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশ করা তিনি আত্মগর্ব্ব পরিতৃপ্তির উপাদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের কাহিনী প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সুহৃদ্বর সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্নেহের অধিকারে বহু যত্নে তাঁহার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে বহু বিস্মৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৈশোরে মাতৃবিয়োগ এবং যৌবনে পত্নীবিয়োগ-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগমনেও তিনি বিষম শোক পাইয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে 'পিতৃস্মৃতি'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাঁহার পুণ্যচরিত্র পিতৃদেব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী এবং বাল্য-সুহৃদ্ অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী সোদরাতুল্যা শরৎকুমারীকে হারাইয়া বিশেষ কাতর হন। এই সময়ে তিনি মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিয়াছিলেন :—

রবিবার
[৯ই ডিসেম্বর ১৯২৩]

ভাই স্বর্ণ

তোমার আন্তরিক শুভ কামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। মেজদাদা গেলেন, দিদি গেলেন, শরৎ গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এবার আমার পালা। বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ—তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাসনা। যতই দিন যাচ্চে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্চে, ততই স্নেহ-ভালবাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালবাসার মর্য্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

স্নেহের
নতুন দাদা।

এই সকল শোক-তাপে কাতর হইলেও, বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চ্চা এবং ভগবানের উপাসনা করিতে একদিনও বিরত হন নাই। ভগ্নদেহে তিনি তিলকের 'গীতারহস্যের' অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, অসংখ্য 'মাসিক পত্র'-সম্পাদকের অনুরোধে তিনি গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বেও রাঁচিতে মহা উৎসাহের সহিত তাঁহার শেষ "মাঘোৎসবের" অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূজনীয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই অনুষ্ঠানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :—

"কাল ১২ই মাঘে আমাদের ১১ই মাঘ হল—গায়িকা মেয়ের দল এখন কেউ রাঁচিতে নেই ; সপ্তাহ খানেক আগে থেকে নতুন ঠাকুরপো প্রবীর মিহিরকে দুটী গান শেখালেন—'আজই আমাদের মহোৎসব'—এটা আমার ছেলেবেলায় ১১ই মাঘে প্রথমেই বিষ্ণু গাইতেন, তাই ওটা শেখাতে বল্লুম, আর 'প্রণমি তোমারে', প্রথমটা প্রথমে দ্বিতীয়টা শেষে। ওদের ছেলেমানুষী গলা, বিশেষতঃ মিহিরের, শুনতে খুব ভাল লাগছিল—ওদের দু' ভাইকে শাদা রেশমী পাঞ্জাবীর উপর, কালো ডুরির কায করা শাদা শালের জোব্বা পরিয়ে দিয়েছিলুম—বেশ দেখাচ্ছিল! কুসুমতলায় সব উপরকার ধাপে কেবলমাত্র জয়কালী বাবু বস্‌লেন, তার নীচের ধাপে নতুন ঠাকুরপো ডাইনে বামে প্রবীর-মিহিরকে নিয়ে বস্‌লেন। আমাদের সংস্কৃত মন্ত্রগুলোও নতুন ঠাকুরপোর সঙ্গে সমস্বরে প্রবীর মিহির বল্লে ; ওরা সবার গলায় মালাও দিলে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকদের জলপান খাওয়ালে—লোক মেয়ে-পুরুষ মিলে ৬০। ৭০ জন হয়েছিল ; জয়কালী বলেছিলেন ৩০। ৩৫শের বেশী হবে না, ভাগ্যিস ৬০ জনের মত খাবার তৈরি রাখা হয়েছিল! তাতেও শেষে কুলল না, গোঁজা মিলন দিয়ে কোনও প্রকারে কায সারা গেল। খাবার বেশ ভাল আর ঢৌঙা ভরা হয়ে-

ছিল—বড় বড় কচুরি সিঙাড়া দরবেশ মিঠাই পান্তোয়া কমলালেবু; আগের দিন চাকররা, ছেলেরাও তাতে যোগ দিয়েছিল, স্ফূর্ত্তির সহিত রঙীন কাগজের ফুল ও মালা অনেক তৈরি করে তা দিয়ে দুই উৎসব-তোরণ আর কুসুমতলার চারিধার খুব সাজিয়েছিল। নতুন ঠাকুরপো এক নহবৎও যোগাড় করেছিলেন। কমলা শান্তি হাবলু এঁরা চার-পাঁচটা গান গাইলেন। আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী রাঁচির পক্ষে আমাদের ১১ই মাঘ নেহাৎ মন্দ হয়নি, কি বল ?"

বৃদ্ধ বয়সে পর্য্যন্ত অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করায় জ্যোতিবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। উপরিবর্ণিত ঘটনার ছয় সপ্তাহের মধ্যে—২০শে ফাল্গুন, ১৩৩১ বুধবার সায়াহ্নে ইহলোকের আত্মীয়-বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচির 'শান্তিধাম' হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া উচ্চতর লোকে চিরশান্তিধামে গমন করেন।

স্মৃতিসভা।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিল্প ও সাহিত্যের অক্লান্ত সেবার জন্য এবং তাঁহার মধুর চরিত্রের জন্য বাঙ্গালায় সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্মৃতি-সভাদির অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটী স্মৃতি-সভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটী বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহার সভাপতি ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সভায় তাদৃশ লোকসমাগম হয় নাই। দ্বিতীয়টী 'আশুতোষ কলেজের' ছাত্রবর্গের দ্বারা ভবানীপুর 'সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে' আহূত হয় (২১শে চৈত্র, ১৩৩১)। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহু মহিলা ও ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস।—যাঁহারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্রবে আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অসাধারণ বিনয়, অমায়িকতা, সৌজন্য ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যেমন সরলপ্রকৃতি ছিলেন, তেমনই উদার ছিলেন। তাঁহার উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান ছিল না। রাঁচিতে অনেকে তাঁহার আবাস-ভবনে বেড়াইতে আসিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে তিনি যেরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন, সমাজের নিম্নতম স্তরের ব্যক্তিগণকেও সেইরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার মানব-প্রীতি অতি গভীর ছিল। তাঁহার চিত্রপুস্তকে তিনি যেমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ও আত্মীয়-বন্ধুগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনই 'পাখাটানা কুলী' মুটে-মজুরদেরও চিত্র যত্নে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার গভীর মানব-প্রীতির ও সমদর্শিতার পরিচয় দেয়। তিনি মানবকে কি ভালই বাসিতেন! শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে, চিত্রকরগণ মানব ব্যতীত কত সুন্দর বিষয় চিত্রে অঙ্কিত করিবার জন্য অন্বেষণ করে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় আর কোথাও দেখেন নাই। তাঁহার চিত্রের বিষয় কেবল মানুষের মুখ।

যিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি যে আত্মীয়স্বজনকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত যে পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকগণ তাঁহার স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' উপলক্ষ্যে স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চন্দন পাঠাইয়া দিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যে ক্ষুদ্র পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহারও কিয়দংশ পাঠ করিলে তাঁহার ভগিনী-স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়:—

> "পাইয়া চন্দন তব হইলাম প্রীত
> নন্দন না পারে দিতে এ হেন অমৃত!
> প্রাণ খুলি করি বোন্ এই আশীর্ব্বাদ
> পূর্ণ হয় যেন তব যত কিছু সাধ।"
>
> তোর
> নতুন দাদা।

তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্য ও স্বদেশ-প্রীতি যে কত গভীর ছিল তাহা তাঁহার রচনাবলীর পরিচয়প্রসঙ্গেই পাঠকগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি তাঁহার অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বহুদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এমনই উদার ছিলেন যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত—দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। রাঁচিতে অবস্থানকালে একদিন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মোরাবাদী পাহাড়ের শৃঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত উপাসনামন্দিরে

বসিয়াছিলেন, এমন সময় দুইজন হিন্দুস্থানী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এখানকার দেবতা কোথায়?' ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলিলেন 'এখানে কোনও দেবতা নাই।' তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। অবশেষে তাহারা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, যিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই দেবতা কোথায়? এমন সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই স্থানে আগমন করিলে সেই হিন্দুস্থানী ব্যক্তিদ্বয় তাঁহাকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। বাস্তবিক শেষ জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি এবং করুণা ও স্নেহপূর্ণ আনন দেখিলে তাঁহার মানসকন্যা স্বপ্নময়ীর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইত:—

"দেখিনি মানব হেন দেবতার মত,
জানিনে দেবতা হেন মানুষের মত।
ললাটে বিকাশ তাঁর স্বরগের জ্যোতি,
নয়নে নিবসে তাঁর মর্ত্তের মমতা।"

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান কোথায় তাহা আলোচনার সময় এখনও আসিয়াছে কি না জানি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের নানা বিভাগে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রীতি-গীতি, প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তিনি ফরাসী আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রথম প্রহসন রচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী একদিন বঙ্গবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাঁহার গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় দেয়। তিনি সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা হইতে নানা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু একথা অনেকেই দুঃখের সহিত স্বীকার করেন যে, তিনি তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার অনুজা স্বর্ণকুমারী স্বয়ং এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন, "এরূপ প্রতিভাশালী সাহিত্য-সেবককে কখনও কোনও সাহিত্যসভার সভাপতি-পদে বৃত হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিনয় ও লজ্জা এবং সর্ব্বদা আত্মগোপন-চেষ্টা মূল কারণ হইতে পারে, কিন্তু আমরাও যে তাঁহার প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি তাহা মনে হয় না। কেন এরূপ হইল? চিন্তা করিলে মনে অনেক কথাই উদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্রের কথা বলিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই বারম্বার আমাদের স্মৃতি-পথে ভাসিয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ-কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখনও ভস্মাচ্ছন্ন, কখনও প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

আমাদের মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জীবিতকালে তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেশবাসীকে যে মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন—

"লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ্র, ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।"

—সেই মন্ত্র তিনি তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে যাহা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল, একদিন তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী, "অনন্ত অসীম কাল আছে আগে অনন্ত জীবিত-মণ্ডলী"—একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদানের মূল্য বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে এবং তিনি আজীবন দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য, লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন উপেক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও অসীম পরিশ্রমের সহিত নানাপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া সৎসাহিত্যের প্রচার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যকে উন্নত করিবার যে প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-কারগণ সুবর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাপ্য উচ্চ ও গৌরবময় আসন একদিন তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

চাকরি ও সেবা।

(জনৈক শিক্ষক)

চাকরি।

একটা পকেটছুরি কত দরকারে লাগে। সীস পেন্সিল সরু করা তো একটা দরকার। এখন যদি আমি আমার নিজের দেহ হইতে একখণ্ড মাংস না

কাটিলে পেন্সিল সরু করিব না বলিয়া গোঁ ধরি বা সর্ত্ত করি, তবে সকলে আমাকে পাগল ঠাওরাইবে কি না? ঐ প্রকার পাগলের মত সর্ত্ত না করিলেও সাধারণতঃ সকলেই নিজ নিজ কৃতকার্য্যের বিনিময়ে কিছু না কিছু প্রতিদান প্রত্যাশা করে। এইরূপ প্রতিদান প্রত্যাশা করা কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু আমার কাছে ছুরি আছে; তুমি যদি আমাকে তোমার পেন্সিল একটুখানি সরু করিয়া দিতে বল, এবং সেইটুকু কাজের জন্য যদি আমি তোমার কাছে কিছু প্রতিদান চাই, তবে তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত নীচজনোচিত কার্য্য হইল বলিয়া সকলেরই নিকটে প্রতীয়মান হইবে। বলা বাহুল্য, জগতে অনেক প্রকার কার্য্য আছে,—কতকগুলি কার্য্যের বিনিময়ে মূল্য পাওয়া যায় এবং কতকগুলির মূল্য পাওয়া যায় না।

এখন যে সকল কার্য্যের জন্য মূল্য দেওয়া যায় অর্থাৎ যেগুলিকে চাকরি বলা যায়, সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

যে সকল কার্য্যের জন্য মূল্য দেওয়া যায়, সেই সকল কার্য্য যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এখন তো দেখি, আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বেতনাদি লইয়া কাজকর্ম্ম করেন। যখন ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন ক্রীতদাসেরা তাহাদের মনিবদের আদেশ অনুসারেই কাজকর্ম্ম করিত। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? ইহা বুঝা বড় কঠিন হইবে না যে, ক্রীতদাস জানিত না যে কে-ই বা তাহার মনিব হইবে এবং কোন্ মনিবেরই বা অধীনে তাহাকে কোন্ কাজ করিতে হইবে। এই কারণে সে তাহার কোনও কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া মন লাগাইতে পারিত না। কোন ক্রীতদাসের মনিবেরা দয়ালু হইলেও সে ভুলিতে পারিত না যে, তাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে এবং তাহাকে আবার বিক্রয় করাও যাইতে পারে। ক্রীতদাসপ্রথায় একটা মহা দোষ ছিল এই যে, অনেক সময়ে দয়ালু মনিবের মৃত্যুতে অথবা ব্যবসায়ের পতনে তাঁহার ক্রীতদাসগুলি বিক্রীত হইয়া নিষ্ঠুর মনিবের কবলেও পড়িতে পারিত। আমেরিকায় তদানীন্তন দাসপ্রথার সম্বন্ধে শ্রীমতী ষ্টৌ (Mrs. Beecher Stowe) তাঁহার "টম কাকার কুটীর" গ্রন্থে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না। সেই গ্রন্থেই ক্রীতদাসপ্রথার দোষগুলি সুব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগকে এই প্রকারে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এদিকে ওদিকে দৌড়াইতে হয় না বা বিনা বেতনে যেখানে সেখানে অন্যের ইচ্ছামত বাধ্য হইয়াও কার্য্য করিতে হয় না। আমরা যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন যাহারা আমাদিগকে কাজ দিবে, তাহাদের সঙ্গে কাজ করিবার সর্ত্ত স্থির করিয়া লই যে, এত ঘণ্টা কাজের জন্য এত বেতন দিতে হইবে।

এখানে ইহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই যে, বর্ত্তমান বেতন দিয়া কাজ লইবার প্রথার সঙ্গে ক্রীতদাস-প্রথার কতটুকু সাদৃশ্য আছে। সত্য, অনেক স্থলেই কর্ম্মনিয়োক্তা ও নিযুক্ত শ্রমিকগণের মধ্যে যে সর্ত্ত স্থির হয়, তাহা একপেশে, অর্থাৎ তাহার মধ্যে কর্ম্মনিয়োক্তা-দের পক্ষে বলপ্রয়োগের একটা প্রবল ভাব রক্ষিত হয়—শ্রমিকেরা অনন্যগতি হইয়া সেই সকল সর্ত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, নচেৎ তাহাদিগকে অর্থাভাবে উপবাসে থাকিতে হয়। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, দায়িত্বশূন্য হইয়া সমস্ত কাজ খারাপ করিলেই শ্রমিকদিগের অবস্থা যে ভাল হইবে তাহা নহে। শ্রমিককে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, সে একজন স্বাধীন পুরুষ, তাহার কর্ত্তব্য আছে, মর্য্যাদা আছে; এইভাবে শিক্ষা দিলে কালে সত্যই কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে দাঁড়াইবার জন্য চেষ্টা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে।

যাক্। এখন কথা হইতেছে এই যে, বেতনের পরিবর্ত্তে চাকরি করিবার সর্ত্তে প্রবেশ করিলে, সেই সর্ত্ত রক্ষা করা উচিত কি না? ইহা সকলেই স্বীকার করি-বেন যে, বেতন লইয়া কার্য্য করিবার সর্ত্ত স্বীকার করিলে তাহার অন্তর্ভুক্ত সময়টুকু বেতনদাতা মনিবেরই সময়। বেতনদাতার সময় বৃথা নষ্ট করা বেতনভুক্‌দিগের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। একটী কোম্পানিই তোমাকে বেতন দিক বা public bodyই দিক অথবা ব্যক্তিবিশেষই দিক, যাহারই অধীনে তুমি চাকরি কর না কেন, তাহারই সময় নষ্ট করা তোমার পক্ষে উচিত নয়। তোমার উপর কেহ দৃষ্টি রাখুক বা নাই রাখুক, তোমার কাজকর্ম্ম সমানভাবে করিয়া যাওয়া উচিত। লোকদেখানো কাজ ঘৃণার যোগ্য এবং দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ মানুষের অযোগ্য। এই কারণে "বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর" এই প্রবাদ উল্লেখে ঐ প্রকার লোকদেখানো কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। যে কাজটী করিতে হইবে সে কাজটী বেশ প্রফুল্লচিত্তে ও অকুণ্ঠিতভাবে করা উচিত। ঐ যেই ঘণ্টা বাজিল, আমার হাতের কাজটুকু শেষ হোক বা নাই হোক, তাহা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম, সেভাবে "দিনগত পাপক্ষয়" হিসাবে কাজ করা ঠিক নয়।

এই সকল নিয়ম বালকেরা প্রথম অবধিই যাহাতে

তাহাদের সকল কাজে প্রতিপালন করে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহাদের কাজ হইল লেখাপড়া—সেই লেখাপড়াতেই যাহাতে তাহারা এই সকল নিয়ম খাটায়, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে। শৈশব অবধি, বাল্যকাল অবধি তাহাদিগের মনে এই সকল ভাব আস্তে আস্তে এমনভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ফাঁকি না দিয়া কাজ করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজভাবে জীবনের অভ্যাসে পরিণত করে।

সেবা।

এমন অনেক কাজ আমাদের করিতে হয়, যাহার বিনিময়ে আমরা কিছুই পাই না; তাই বলিয়া সেই সমস্ত কাজ যে গা-ঢালা ভাবে করিব তাহা নহে—সে প্রকার করা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকার বিনা বিনিময়ে কাজ করাকে সেবা বলা হয়। মনে কর তোমার একটা পেন্সিলকাটা ছুরি আছে। একটী ছেলে তোমাকে তাহার পেন্সিলের মাথাটা কাটিয়া দিতে বলিল, আর তুমি কাটিয়া দিলে, এবং তাহার প্রতিদানে কোন কিছু লইলে না। ইহা কাজ বটে, কিন্তু ইহা চাকরি নহে—ইহা হইল সেবা। এই প্রকার আত্মীয়-স্বজনের জন্য, বন্ধুবান্ধবের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য অনেক বড় বড় কাজও করিতে হয়, যাহার প্রতিদানে পয়সাকড়ি কিছুই পাওয়াও যায় না, প্রত্যাশাও করা উচিত নয়। ছেলেরা যদি কাহারও একটা চিঠি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেয়, যদি কোন অন্ধকে রাস্তা পার করাইয়া দেয়, যদি বিদ্যালয়ের বাগান হইতে আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলে, এই প্রকার শতবিধ কার্য্যের জন্য ছেলেরা টাকা-পয়সা প্রত্যাশা করিলে নীচতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। ছেলেদের কর্ত্তব্য, এই প্রকার সেবাধর্ম্মের অবসর পাইলে তৎপালনে অগ্রসর হওয়া। অভিভাবকদিগেরও কর্ত্তব্য, এই প্রকার সেবাধর্ম্মের অবসরের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ছেলেদিগকে উৎসাহিত করা। আমাদের যুবরাজের মন্ত্র হইতেছে "আমি সেবাব্রতী" (I serve)। ক্রেসির যুদ্ধের পর ব্ল্যাক প্রিন্স (Black Prince) জয়লাভের কারণে সম্ভবত একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিজেই ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি ঐ মন্ত্র ইংলণ্ডের যুবরাজের মন্ত্ররূপে চলিয়া আসিতেছে। ব্ল্যাক প্রিন্সের বয়স তখন সবেমাত্র ষোল বৎসর। তাঁহার পিতা তৃতীয় এডোয়ার্ড তাঁহার উপর ইংরাজ-সৈন্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, "ছেলেটা নিজের যশ নিজেই অর্জ্জন করুক" বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বোহিমিয়া প্রদেশের অন্ধ রাজা ঐ যুদ্ধে প্রাণপাত করিলেন। Ich dien মন্ত্রটী তাঁহারই ছিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া ব্ল্যাক প্রিন্স ঐ মন্ত্র নিজে গ্রহণ করিলেন, যাহাতে রাজার ঘরে জন্মের কারণে এবং নানা কার্য্যে বিজয়লাভের ফলেও সর্ব্বদা উঁহার মনে থাকে যে, পরসেবাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয়।

অভিভাবকদিগের সর্ব্বদাই ছেলেদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া উচিত যে, চাকরির কাজ, যাহার প্রতিদানে আমরা বেতনাদি পাই, তাহাও সুনিপুণভাবে করা আমাদের যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ যে সকল কার্য্যের ভার আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যাহার প্রতিদানে পয়সাকড়ি পাইবার কোনই কথা নাই, সে সকল কাজও তেমনি সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। হয়তো কেহ কোন প্রতিবাসীর কার্য্যের ভার লইয়া বহির্গত হইল—তখন তাহার পক্ষে সেই কার্য্য সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া খেলা করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইবে। যে কার্য্যের ভারটী লইবে, তাহার বিনিময়ে কোন মূল্য পাও আর নাই পাও, তাহা মনপ্রাণ দিয়া সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—"তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথম হইতে চায়, সর্ব্বাগ্রে সে সকলের দাস হউক"। পরস্পরের সেবা করিতে শিক্ষাপ্রদান উপলক্ষেই যিশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণের পা ধুইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—যখন আমি তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু হইয়াও তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও উচিত পরস্পরের পা ধুইয়া দেওয়া। আমি তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলাম, যাহাতে তোমরা আমার অনুকরণ কর।"

ছেলেদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদিগকে অকর্ত্তব্য বিষয়েরও আভাস দিতে হইবে। কিন্তু অকর্ত্তব্য পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপরেই যথাসাধ্য ঝোঁকটা দিতে হইবে। ছেলেদিগকে বুঝাইতে হইবে, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার এবং আলস্য, এই সকল হইল সেবাধর্ম্মের বিরোধী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক 'ব্রাহ্মধর্ম্ম'-গ্রন্থরচনা।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনাবিষয়ে মহর্ষি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্যসকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত

হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম, এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন," (প্রথম সংস্করণের ১০৮ পৃষ্ঠা); "এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ-সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পর পর বলিতে লাগিলাম।...তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া গেল," (১১০ পৃষ্ঠা)। মহর্ষির এই উক্তিগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

আধ্যাত্মতত্ত্বের জন্য প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কি প্রবল ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল, আত্মজীবনীর তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে আমরা তাহার পরিচয় লাভ করি। ইহার দশ এগারো বৎসর পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা করেন। এই দশ এগারো বৎসর তিনি একাগ্র চিন্তায় এবং য়ুরোপীয় দর্শনবিষয়ক গ্রন্থসকলের অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি এই সময়ে তিনি উপনিষদের বাছা বাছা প্রিয় মন্ত্রগুলিকে নিরন্তর পাঠ ও আলোচনা করিতেন, এবং নানা দিক হইতে সে সকলের মর্ম্মে প্রবেশ করিবার জন্য যত্ন করিতেন। এই বৎসরগুলিকে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের 'প্রথম তপস্যার যুগ' বলা যাইতে পারে।

এই ব্যাকুল ও একাগ্র তপস্যার ফলে, প্রথমতঃ তাঁহার চিত্তে তাঁহার চিন্তালব্ধ আধ্যাত্ম তত্ত্বসকল একটি বিশেষ শৃঙ্খলা ধরিয়া সজ্জিত হইয়া গেল। তৎপরে, উপনিষদ্ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রিয় মন্ত্রগুলিও, ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তালব্ধ তত্ত্বের পর্য্যায়ের মধ্যে সজ্জিত হইতে লাগিল।

উপনিষদ্‌কে তিনি এমনই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন যে, নিজ চিন্তালব্ধ কোনও সত্যকে যতক্ষণ তিনি উপনিষদে প্রতিবিম্বিত দেখিতে না পাইতেন, এবং সেই সত্যকে যতক্ষণ তিনি উপনিষদের ভাষায় স্মরণ ও প্রকাশ করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি হইত না। এইজন্য এই সময় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তা ও ভাষা যেন উপনিষদের ছাঁচে ঢালাই হইয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি উপনিষদের রসে অভিষিক্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

এই অবস্থায় তাঁহার অন্তরে স্বভাবতই তাঁহার ভাবের অনুকূল উপনিষদের ছিন্ন বচনাংশ সকলও ক্রমশঃ সজ্জিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। আত্মজীবনীর ৪৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদের একটি ক্ষুদ্র ছিন্ন বাক্যাংশ ('অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ') ও একটি ছিন্ন শব্দ ('সর্ব্বানুভূঃ') একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনার চারি বৎসর পূর্ব্বে) আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে, উপনিষদের নানা স্থান হইতে গৃহীত বহু সমগ্র বচন, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ছিন্ন ও আপন চিন্তায় গ্রথিত বহু বচনাংশ, দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে এই যুগে সঞ্চিত ও সজ্জিত হইয়া বর্ত্তমান ছিল।

তাঁহার চিত্তে উপনিষদ্ বচন সকলের এই ভাবে সঞ্চিত গ্রথিত ও সজ্জিত হওয়ার ব্যাপারটি অতি ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। অতি ধীরে ধীরে, মণিকারের ন্যায় যত্নের ও নিপুণতার সহিত, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের উজ্জ্বলতম রত্নসকল চিনিয়াছেন ও বাছিয়াছেন, এবং ততোধিক নিপুণতার সহিত সে সকল গ্রথিত ও সজ্জিত করিয়াছেন।

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা ঽমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" এই প্রার্থনাটি; "যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, তমেব বিদিত্বা ঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়" এই বচনটি; "ওঁ পিতা নো ঽসি" প্রভৃতি ত্রিমন্ত্রাত্মক অর্চ্চনাটি,—ইহার প্রত্যেকটি এইরূপে নানা স্থান হইতে ছিন্ন বাক্য ও শ্লোকের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক গ্রথিত। কিন্তু এখন ইহার প্রত্যেকটি, আমাদের মনের তারে একটি অখণ্ড বচনের মত, এক ভাবে ও এক সুরে স্পর্শ করে।

এই নব-গ্রথিত পবিত্র বচনগুলি ব্যবহার করিবার সময়ে আমাদের মনে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে মণিকারের তুলনাটিও তুচ্ছ! এই বচনগুলি কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে? একজন ব্যাকুল সাধকের অন্তরে উপনিষদের বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলি পতিত হইয়া, তাঁহার সাধনার অনলে দ্রব হইয়া, তাঁহার চিন্তা-রসে প্রেম-রসে রসিয়া, গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

যে ভূতত্ত্ব-বিদ্যা (Geology) দেবেন্দ্রনাথের পরম প্রিয় ছিল, তাহা হইতে একটি তুলনা সংগ্রহ করিয়া ইহা বুঝাইতে ইচ্ছা হয়। এক খণ্ড গ্রাণাইট প্রস্তর পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণীকৃত প্রস্তরকণায় রচিত। ভূগর্ভের উত্তাপ ও প্রবাহিত জলধারার বেগ, দীর্ঘ যুগে, পৃথিবীর আদিম শৈলমালা হইতে শিলাখণ্ড সকলকে খসাইয়াছে, আলোড়িত ও চূর্ণীকৃত করিয়াছে, আবার তাহাকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়াছে, ও জলমিশ্রিত নানা মসলার সংযোগে একত্র বাঁধিয়াছে। এইরূপে নূতন প্রস্তর রচিত হইয়াছে। এই নব-রচিত প্রস্তর কেমন সুদৃঢ় ও কেমন সুমসৃণ! তেমনই, উপ-

নিষদের আদিম তত্ত্বশৈলের খণ্ডসকল দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার অনলে ও তাঁহার সাধনার ধারায় পতিত হইয়া, দীর্ঘকাল তন্দ্বারা আলোড়িত চূর্ণীকৃত ও সজ্জিত হইয়া, তাঁহার চিন্তার ও ভাবের মসলায় একত্র গ্রথিত হইয়া, প্রস্তরবৎ সুদৃঢ় ও সুমসৃণ নব নব বচনের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন আর সে সকল বচনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করে, কাহার সাধ্য!

দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে উপনিষদ্-বাক্য সকল পূর্ব্ব হইতেই এইরূপে সজ্জিত ও গ্রথিত হইয়া বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তাঁহার রসনা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনার দিনে "তিন ঘণ্টার মধ্যে" ও "নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে" ঐ বচনসকল নিঃসৃত হইতে পারিয়াছিল।

এই জন্য, তিনি উপনিষদের বচনসকলকে স্বস্থান হইতে ছিন্ন করিয়া আপনার মনোমতভাবে পুনর্গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সাহিত্যিক বিচার-পদ্ধতির দ্বারা বিচার করা সম্ভব নহে। এস্থলে দেবেন্দ্রনাথ গ্রন্থরচয়িতা নহেন; তিনি সাধক, তিনি ঋষি। তিনি অগ্রে এইরূপ এক একটি বিমিশ্র বচনকে আপনার চিন্তাধারার মধ্যে এক ও অখণ্ড বচনরূপে দীর্ঘকাল ধারণ করিয়াছেন; এবং সেই দীর্ঘকালের অন্তে তাহাকে আপনার উক্তি বলিয়া (উপনিষৎকার ঋষির উক্তি বলিয়া নয়) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিকে দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য বলিয়া নয়, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া, ধর্ম্মসাধকের দৈনিক পবিত্র পাঠের বস্তু বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের কুত্রাপি কোনও শ্লোকের মূল নির্দ্দেশ করেন নাই। বচনগুলি এই গ্রন্থে ধৃত হইবার পর আর প্রাচীন উপনিষদের মন্ত্ররূপে পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত হইবে না, তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত নূতন 'ব্রাহ্মী উপনিষদের' বচনরূপেই উপস্থিত হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এবং এই কারণে, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বাক্যগুলি উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত হইলেও, এই গ্রন্থকে শুধু একখানি সংগ্রহগ্রন্থ ও দেবেন্দ্রনাথকে শুধু ইহার সঙ্কলয়িতা বলিয়া বিচার করিলে ভুল হইবে। ইহার ভাষা উপনিষদের হইলেও, বক্তব্য বিষয়টি ও তাহার শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে দেবেন্দ্রনাথেরই।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৮৫৪ সালের মার্চ্চ (১৭৭৫ শকের চৈত্র) মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্লোকের সহিত বঙ্গানুবাদ (১) মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সালের মে (১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ) মাসে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে 'তাৎপর্য্য' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

'তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন, "দেবেন্দ্রনাথের এই একটী গুণ ছিল যে, তাঁহার হস্ত দিয়া যে সকল লেখা যাইত, বা তাঁহাকে যাহা কিছু শোনান হইত, তাহা তিনি সংশোধনের পর সংশোধনের দ্বারা নিখুঁত না করিয়া ছাড়িতেন না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতে এই গুণ ছিল; আমরা অনেক বার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যগুলি যে তাঁহার হস্তে কি প্রকার আমূল সংশোধন লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রথম সংস্করণের একখণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম তিনটি মন্ত্রের মূল তাৎপর্য্য অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। অবশিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। যখন দেখি যে তেরো বৎসর বাদে ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের তাৎপর্য্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই কতকটা বুঝিতে পারি যে, কত সাবধানতার সহিত তাৎপর্য্যগুলি লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল।...

দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য প্রধানত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্ত্তৃক লিখিত। অনুশাসন খণ্ডের সংকলনেও অযোধ্যানাথ দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।"—(তত্ত্ববো. ১৮৩৯ শকের কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১৬৩—১৬৫ পৃঃ)।

---

(১) অজিতকুমার (২১৫ পৃঃ) লিখিতেছেন, পত্রিকার ঐ সংখ্যা হইতে 'তাৎপর্য্য' প্রকাশ আরম্ভ হয়; ইহা ভুল। তাৎপর্য্য নয়, বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ঐ সংখ্যায় আরম্ভ হয়।

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রাজপথ ও পাদপথ।

আমরা সেকালে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো, অনেকগুলি ভাই মিলিয়া কখনও বা গাড়ী চড়িয়া, কখনও বা পায়ে হাঁটিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বা সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইতাম। ফুটপাথ বা পাদপথ ধরিয়াই বেশীভাগ আমাদের চলিতে হইত; কখনও বা গাড়ীর পথে বা রাজপথেও চলিতে হইত। এখন যেমন সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ (বর্ত্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ) প্রভৃতি যে সমস্ত নূতন নূতন রাজপথ খোলা হইতেছে, সে সমস্ত রাজপথের দুই ধারেই খুব প্রশস্ত পাদপথ রাখা হইতেছে, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রাজপুরুষদিগের অন্তরে সে ভাবই প্রবেশ করে নাই। এই হ্যারিসন রোড—অত চওড়া একটা নূতন রাস্তা খোলা হইল, কিন্তু তাহার দুই পার্শ্বে তদনুপাতে চওড়া পাদপথ খুলিবার কথা কাহারও মনে আসিল না।

যাই হোক, সেকালে গাড়ীর পথই বল, আর পায়ের পথই বল, ঐ সকালে ও বিকালে রাস্তায় জল ছড়াইবার কারণে দুই পথেরই ধুলো জলের সঙ্গে বেশ একটু মাখামাখি হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইত যে, উহা জুতার তলায় একটা তাল পাকাইয়া প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে উঠিয়া আসিতে চাহিত। দুইদশ পদ অগ্রসর হইয়া সেই তলসংলগ্ন কাদা না ঝাড়িয়া ফেলিলে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইত। পার্শ্ববর্ত্তী নহর হইতে জল লইয়া ভিস্তি মশকের সাহায্যে রাস্তায় জল ছিটাইতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখনও লাট সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে তাহার নমুনা দেখা যায়। ঐ প্রকার জল ছিটাইবার ফলে ধুলো তো নিবারিত হইতই না, প্রত্যুত তাহা কাদার মত এক বিশ্রী পদার্থে পরিণত হইত।

এইভাবে অনেক কাল চলিয়া গেলে ঘোটকবাহিত লৌহ ট্যাঙ্ক (tank)এর সাহায্যে রাস্তায় জল দেওয়া হইত। ইহা দ্বারা জল দেওয়া কিছু উন্নতির দিকে অগ্রসর হইলেও মোটের উপর ভিস্তির জল দেওয়ার উপর বেশী কিছু ইতরবিশেষ হয় নাই। সেই ট্যাঙ্কের পিছন দিকে একটা নল বসানো থাকিত, আর সেই নলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুটো থাকিত। একটা হাতল টানিয়া সেই নলের মুখ খুলিয়া দিলেই জল সেই নলে আসিয়া ঐ সমস্ত ফুটো দিয়া রাস্তায় পড়িত। ঘোড়া যথাসাধ্য জোরে টানিয়া চলিয়াছে, কাজেই রাস্তায় জল ছিড়িক্ ছিড়িক্ করিয়া পড়িতেছে। ক্রমে আরও কিছুকাল পরে রাস্তা খুঁড়িয়া গঙ্গাজলের পাইপ বসিল। স্থানে স্থানে তাহা হইতে জল লইবার ব্যবস্থা হইল। তখন সকালে বিকালে সেই সকল স্থান হইতে রবারের পাইপের সাহায্যে রাস্তায় গঙ্গাজল ভাল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহাতে রাজপথে ধুলোর পরিমাণ কমিল বটে, কিন্তু পাদপথচারী পথিকদিগের দুর্দ্দশার বিশেষ কোন সুবিধা হইল না।

অবশেষে পাদপথের এই দুর্দ্দশা, কি জানি কেন, তীক্ষ্ণদর্শী লর্ড কার্জ্জনের চক্ষে আঘাত করিল। তাই তিনি, মনে হইতেছে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনকে পাদপথগুলি প্রস্তরমণ্ডিত করিবার পক্ষে সম্মত করাইলেন। সেই অবধি রাজপথ ও পাদপথ উভয়েরই উন্নতিসাধনে কর্পোরেশন মনোযোগী হইয়াছেন। এখন যদি আমরা ফুলবাবু সাজিয়া ডসনের বাড়ীর বিশ ত্রিশ টাকার নূতন জুতা পরিয়া কলিকাতা ঘুরিয়া আসি, তাহা হইলে বোধ হয়, ঘরে আসিয়া সেই জুতা এক আধটু ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রাখিলে যেমনটী নূতন আনিয়াছিলাম, তেমনটাই নূতন বেশে তুলিয়া রাখিতে পারিব।

মেছুয়াবাজার ও কাফ্রি।

সেকালে কলিকাতায় কাফ্রিদের অত্যধিক আমদানি দেখিতাম। শুনিতাম, তাহারা জাহাজের খালাশি হইয়া আসিত। মেছুয়াবাজার রাস্তায় যে সমস্ত মদের দোকান বা নামেমাত্র চায়ের দোকান ছিল, সেই সমস্ত দোকানেই তাহাদের বসিবার প্রধান আড্ডা ছিল। মেছুয়াবাজার রাস্তায় যে অংশে মুসলমানদের বসতি ছিল—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে পশ্চিমে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত—সেই অংশে অনেকগুলি সরু সরু গলিঘুঁজি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের সঙ্গে মিলিত ছিল। এই সমস্ত গলিঘুঁজিতেই খোলার বাড়ীর এক একটা ঘর লইয়া কাফ্রিগণ দুই তিন জন মিলিয়া একত্র বাস করিত। ইহারা মদ্য বা তাড়ি প্রভৃতির নেশা করিয়া রাত্রে খুবই মারামারি করিত। প্রায়ই তখনকার সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশে' পড়া যাইত যে, ঐ পাড়ায় ছোরা মারামারি হইয়া খুনোখুনি হইয়া গিয়াছে। এই কারণে মেছুয়াবাজার রাস্তাটাই বদমায়েস বা গুণ্ডাদের আড্ডা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও যে ঐ রাস্তাটী এ বিষয়ের দুর্নাম সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, তাহা মনে হয় না। বাল্যকালে একবার আমি কলিকাতার পথঘাট চিনিবার জন্য প্রাতভ্রমণে বহির্গত হইয়া মেছুয়াবাজার রাস্তা হইতে কলুটোলায় শীঘ্র পৌছিবার জন্য এইরূপ একটী সরু গলি ধরিলাম। তখন দেখি, সেই গলির দুই ধারে বিশ পঞ্চাশ জন কাফ্রি বেঞ্চিতে বসিয়া চা খাইতেছে। আমি ত আগাইতেও পারি না, পিছাইতেও পারি না—পিছাইলেই তাহারা ভাবিবে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। কাজেই মুহূর্ত্তমধ্যে স্থির করিলাম, যখন সম্মুখে ও পশ্চাতে উভয় দিকেই ভয়, বরঞ্চ পশ্চাতেই ভয়ের কারণ অধিক, তখন সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল। ইহা ভাবিয়া, ভূতের ভয়ে যেমন সাধারণ লোকে রাম নাম জপ করিতে করিতে শ্মশানের পাশ কাটাইয়া যায়, আমিও সেইরূপ হে ঈশ্বর রক্ষা কর, এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। আজ সে সব গলিঘুঁজিও নাই, আর সে কাফ্রিদের আড্ডাঘরও নাই। এখন খিদিরপুর অঞ্চলে কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থার আভাস দেখা যায়।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও লটারি।

সেকালের রাস্তাগুলির মধ্যে বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গুণ্ডাবদমায়েসদিগের আড্ডাবিরহিত রাস্তা ছিল, বলিতে গেলে, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। এই দুইটী রাস্তা দুই বড় লাটের নামে (Lord Cornwallis) এবং (Lord Amherst) নাম পাইয়াছে। আমার ঠিক মনে নাই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কি না, কিন্তু কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট তো বটেই, লটারি (lottery) দ্বারা টাকা উঠাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, কোন এক গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম। সেকালে এইরকম একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যে, লটারি দ্বারা আবশ্যকমত টাকা উঠাইয়া সাধারণের উপকারী পূর্ত্তকার্য্যসকল সম্পন্ন করা হইত। ইউরোপের অনেক দেশে আজ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে ইহা ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইবে কি না, জানি না, কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে ইহাতে বিশেষ ক্ষতি দেখিতে পাই না। যে সহরে পূর্ত্ত কার্য্য হইবার কথা, লটারির টিকিট কেনা যদি সেই সহরের লোকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা একপ্রকারে পূর্ত্তকার্য্য সাধনের জন্য আবশ্যক ট্যাক্সের দায় হইতে রক্ষা পায়, পরবর্ত্তী উত্তরপুরুষদিগের স্কন্ধে পূর্ত্তবিভাগের ঋণপরিশোধের ভার পুরুষানুক্রমে নামিয়া আসে না, এবং টিকিটক্রেতাদের মধ্যে অনেকে কিছু টাকাও পাইয়া যান। ইহাতে যদি আপত্তি হয়, তবে অনেক ব্যবসায় সম্বন্ধেও অনুরূপ আপত্তি করা যাইতে পারে। পাঠকদের বিচারের জন্য আমি এবিষয়ে একটু ইঙ্গিত করিলাম মাত্র।

ঠাকুর ভাষাণ।

সেকালের ঠাকুর ভাষাণ একটা দেখিবার জিনিস ছিল। তখন যে রকম জাঁকজমকের সঙ্গে ঠাকুর অর্থাৎ প্রতিমাগুলি সাজানো হইত, আজকাল সে রকম সাজানো দেখাই যায় না। সেকালে ধনীদের মধ্যে কাহার প্রতিমা বেশী সুন্দর সাজানো, ইহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক এক দল মোসাহেব বা তোষামুদে থাকিত, তাহারা নিজনিজ প্রভুকে এই সকল বৃথা কার্য্যে অকাতরে অর্থ ঢালিতে খুবই পরামর্শ দিত। আমরা শুনিয়াছি যে, যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ গন্ধবণিক ৺শিবকৃষ্ণ দাঁ দুর্গাপ্রতিমা সাজাইবার জন্য ফরমাইস দিয়া প্যারিস হইতে অলঙ্কারসকল গড়াইয়া আনিয়াছিলেন—প্রতিমা সাজাইবার "ডাকের" গহনা যেমন প্রায়ই সোণা ও অভ্রে রং লাগাইয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহার পরিবর্ত্তে আসল হীরামুক্তার খাঁটি সোনায় জড়োয়া গহনা করাইয়া আনিয়াছিলেন। ঠাকুর ভাষাণের সময় সেই খাঁটি গহনাগুলি খুলিয়া রাখিয়া গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইত। শুনিয়াছি, যোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতেও প্রতিমা নকল গহনার পরিবর্ত্তে খাঁটি সোনার গহনায় সাজানো হইত, এবং ভাষাণের সময়েও সে গহনা খুলিয়া লওয়া হইত না—সম্ভবত ভাষাণের নৌকার দাঁড়িমাঝিরা বা অন্য কর্ম্মচারীরা তাহা খুলিয়া লইত; কিন্তু প্রতিমার গা-সাজানো গহনা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীতে উঠিত না। অন্তত শেষ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এইরূপ ঘটনার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইতে শুনিয়াছি।

ঠাকুর ভাষাণের দিন বীডনষ্ট্রীটের মোড় হইতে ফৌজদারি বালাখানার মোড় পর্য্যন্ত কি ভিড়! প্রতিমাগুলিকে এরাস্তায় সে-রাস্তায় ঘুরাইয়া লইয়া সচরাচর জগন্নাথ ঘাট বা নিমতলা ঘাটেই লইয়া গিয়া দুইটী পান্সির সাহায্যে মাঝগঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। চিৎপুর রোডের এই অংশের দুই পার্শ্ব সেকালে বড় অতিরিক্ত পরিমাণে বারবনিতাদিগের অধিকৃত থাকিত। সুখের বিষয়, আজকাল ইহাদিগের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আরও মনে হয়, সেকালে একালঅপেক্ষা মদ্যপানের কিছু বেশী প্রাবল্য ছিল। যাঁহাদের গৃহের প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইত, সেই সকল বাবু ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নকল বাবুরাও প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্য করিতে করিতে কানে খড়কে-কাঠি করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে চলিতেন। বাবুদের চুলগুলি সেকালে প্রচলিত অ্যালবার্ট ফ্যাষনে ছাঁটা—সম্মুখে বেশ একটু বড় রাখা, পিছনে একেবারে ছাঁটা। সেই চুল আবার তেল-চুকচুকে করিয়া, কাহারও বা সোজা "টেরি" অর্থাৎ মাথার ঠিক মধ্য দিয়া টেরি বা সিঁথিকাটা, আর কাহারও বা বাঁকা টেরি, অর্থাৎ মাথার এক পাশ দিয়া টেরি কাটিয়া চাপিয়া বসানো আছে। যাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারাই প্রতিমার সম্মুখে বাঁশের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটার নাচ নাচাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকলের মধ্যে যে একটা নিছক নির্লজ্জ বা বেহায়া ভাব আছে, সে কথা বাবুদের মাথায় ঢুকিত না—কারণ তাঁহারা ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই ন্যূনাধিক মদ্যপান করিয়া বাহির হইতেন—কেহ কেহ বা নেশার ঝোঁকে ঢলিয়া পড়িতেন। তাহার উপর, নকল বাবুরা আসল বাবুদের নিত্যসঙ্গী থাকিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বুঝাইতেন যে, এই সকল কার্য্যে এই ভাবে অর্থব্যয়েই ধনবত্তার সার্থকতা।

বাবুরা তো এইরূপে উর্দ্ধনেত্রে নানাবিধ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে চলিতেন। অপরদিকে, যাঁহাদের ঘরে প্রতিমা হয় নাই তাঁহারা এবং অন্যান্য বাবুরা —যাঁহারা যে প্রকার গাড়ী সংগ্রহ করিতে পারিতেন, ল্যাণ্ডো হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকা গাড়ী পর্য্যন্ত সহরের প্রায় সমস্ত গাড়ী ছেলেমেয়েতে পূর্ণ করিয়া দৃশ্য দেখিতে বাহির হইতেন। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমল হৃদয়ে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইতে বিলম্ব হইত না। প্রতিমার সম্মুখে ঢাকীদিগের সেই উৎসাহসহকারে ঢাক পিটানো এবং তাহারই তালে তালে ঢাকীদিগের সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেব নকল বাবুদের নৃত্য যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর তাহা দেখিতে পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বর্ত্তমান যুগে পূজার ছুটীতে বায়ু পরিবর্ত্তনে বাহির হওয়া এবং অর্থের অনাটন প্রভৃতি কারণে সেকালের ঐ দৃশ্য আর ফিরিবার আশা নাই। তদ্ব্যতীত, এখন যাঁহাদের বা বাড়ীতে পূজা হয়, তাঁহাদেরও বাড়ীতে পূর্ব্বের ন্যায় আর মদ্যের স্রোত বহে না —কাজেই যাঁহারা প্রতিমার সঙ্গে যান, তাঁহাদের মধ্যে লজ্জা সরম বজায় থাকে, তাঁহারা আর নির্লজ্জভাবে ভূতের নৃত্য নাচিতে পারেন না। সে বাবুও নাই, সে ঢাকীও নাই, সে উৎসাহও নাই, কাজেই পূজার আর সে রসকস নাই।

পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

পূর্ব্বাভাষ।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন। অন্য কিছুর জন্য না হইলেও তাঁহার রচিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে চিরস্মরণীয় রাখিবে। তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থার বিবরণ সাধারণের অপরিজ্ঞাত। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা নগেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে নগেন্দ্রবাবুর সহিত আমার পিতা স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার হইত। তিনি আমার পিতৃদেবকে গুরু বলিয়া মানিতেন। নগেন্দ্রবাবু আমার পিতাকে যে পত্র লিখিতেন, তাহার কয়েকখানা ছিন্ন অবস্থায় আমার নিকটে আছে, তাহাও বিলয়োন্মুখ; অবশিষ্ট কয়েকখানা প্রায় বিনষ্ট, পাঠোদ্ধার করা কঠিন। নগেন্দ্রবাবুর ভাবী চরিতাখ্যায়কের সুবিধার জন্য আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

নগেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা

টালীগঞ্জে টিপু সুলতান-বংশীয়গণকে আনিবার পরে তাঁহাদিগকে ইংরাজি শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই আনুমানিক ১৮৫০ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক ইংরাজি বিদ্যালয় বর্ত্তমান টালীগঞ্জ ক্লাবের অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এক প্রকাণ্ড তিনতলা গৃহে স্থাপিত হয়। ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকা ও তাহার পার্শ্বস্থ বাগান আমরা দেখিয়াছি। উহার নিকটস্থ ক্লাবের বাটী ও তাহার সম্মুখস্থ সুবিশাল ময়দান—যেখানে অধুনা ঘোড়দৌড় হয়—তাহা টালীগঞ্জের নবাবদের স্বাধিকৃত ছিল। ঐ ইংরাজি বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র নবাববংশীয়গণ পাঠ করিতেন; অন্যের প্রবেশাধিকার ছিল না। কয়েক বৎসর পরে অন্যান্য বালকেরাও ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ভবানীপুরে মিসনরিগণের স্কুল ছিল। কিন্তু খৃষ্টান হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় অভিভাবকগণ নিজ নিজ পুত্রগণকে মিসন স্কুলে না পাঠাইয়া প্রায় দেড় বা দুই মাইল দূরের এই টালীগঞ্জ স্কুলে পাঠাইতেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্কট সাহেব, দ্বিতীয় শিক্ষক কিছুদিনের জন্য শ্রদ্ধেয় রামতনু লাহিড়ী ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন হরিবাবু। আমাদের নগেন্দ্রবাবু এই হরিবাবুর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র। হরিবাবু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা লাভ করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং ঐ স্কুলের সান্নিধ্যে বাসাবাটীতে উভয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। নগেন্দ্র বাবুর সহাধ্যায়ীর মধ্যে জীবিত আছেন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক। ইঁহার বয়স ৮৪ বৎসর অতিক্রম করিতেছে। নগেন্দ্র বাবু জীবিত থাকিলে তাঁহারও বয়স ঐরূপই হইত। শিতিকণ্ঠ বাবু মুন্‌সেফ হইয়া পরে কিছুদিন অস্থায়ী সবজজ থাকিয়া এক্ষণে পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন। অপর উল্লেখযোগ্য সহাধ্যায়ী ছিলেন নন্দলাল বাবু আর ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী। নন্দলাল বাবু অযোধ্যা অঞ্চলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন, আর ব্রজবাবু পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল অফিসে মাসিক ৭।৮ শত টাকা বেতন পাইয়া পরে অবসর গ্রহণ করেন।

ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে করিতে সম্ভবতঃ ১৮৬০ বা ১৮৬১ সালে নগেন্দ্রবাবু এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার পিতৃব্য হরিবাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে নগেন্দ্রবাবু টালীগঞ্জ হইতে বিদায় লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে এল্‌-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। উক্ত কলেজে অধ্যয়নকালে আমার একজন আত্মীয় উকীল তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়

তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে এফ্-এ ক্লাসে পাঠের সময় বঙ্গের লেফ্টনাণ্ট গবর্ণর কৃষ্ণনগর কলেজ একবার পরিদর্শন করিতে যান এবং দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্রগণকে "Aim of human life" (মানবজীবনের উদ্দেশ্য) বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিতে আদেশ করেন। লিখিত রচনাগুলির মধ্যে নগেন্দ্র বাবুর রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি যতদূর জানি নগেন্দ্র বাবু এফ্-এ পরীক্ষা দেন নাই বা উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সময় হইতেই তিনি মৃতকল্প কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রথম পরিচয়।

টালীগঞ্জের বিদ্যালয়ে নগেন্দ্রবাবুর আর একজন সমপাঠী ছিলেন। তাঁহার নাম অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার বাটী বেহালায় ছিল। তিনি আমার পিতার নিকট-আত্মীয় ও সম্বন্ধে ভাগিনেয় ছিলেন। উক্ত অম্বিকাবাবুর মাতা মৃত্যু সময়ে পুত্রের দেখাশুনার ভার আমার পিতার উপর দিয়া যান। অম্বিকাবাবু আজীবন আমার পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। এই অম্বিকাবাবুর সহিত নগেন্দ্রবাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। অম্বিকাবাবু পঠদশায় বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন। উক্ত অম্বিকাবাবুর নিকট নগেন্দ্রবাবু ও শিতিকণ্ঠ বাবু ব্রাহ্মসমাজের সন্ধান পাইয়া অম্বিকাবাবুর আগ্রহাতিশয্যে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে সম্ভবতঃ ১৮৫৮ বা ১৮৫৯ সালে সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হন এবং উপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সেই অবধিই বিশেষভাবে নগেন্দ্রবাবু বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় তাঁহার কাকার টালীগঞ্জের বাটী হইতে আসিতে আরম্ভ করেন এবং অধিক রাত্রি হইলেই আমাদের সে সময়কার পর্ণকুটীরে থাকিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে শিতিকণ্ঠ বাবুও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। আমার পিতার আফিস সে সময়ে চৌরঙ্গী হুমায়ুন প্লেসে (Humaun place) ছিল; এবং তিনি প্রতি বুধবার আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য বৈকালে গাড়ী করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। শিতিকণ্ঠবাবু ও নগেন্দ্রবাবু উভয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আমার পিতার আফিসে প্রতি বুধবার বৈকালে হাঁটিয়া যাইতেন, এবং তথা হইতে সকলে একত্র গাড়ী করিয়া জোড়াসাঁকো যাইতেন। উপাসনা অন্তে পিতা মহর্ষির বাটীতে যাইতেন। নগেন্দ্রবাবু ও শিতিকণ্ঠবাবুও পিতার অনুগামী হইতেন। কথোপকথনশেষে পিতার গাড়ীতে তাঁহারা উভয়ে আসিয়া শিতিকণ্ঠবাবু খিদিরপুর পুলের নিকটে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে তাঁহার ভবানীপুরের বাটী যাইতেন এবং নগেন্দ্রবাবু আমাদের বাটী আসিয়া আহারাদি সমাপনান্তে রাত্রি যাপন করিয়া বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে টালীগঞ্জের বাসা চলিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এমনই জীবন্ত ভাবে তখন যুবকগণের চিত্তকে সমাকৃষ্ট করিত। এতদ্রূপে নগেন্দ্র বাবু ও শিতিকণ্ঠ বাবুর অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের বীজ অঙ্কুরিত ও স্ফুরিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু আমার পিতাকে গুরু ও নিজেকে শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন; এবং পরবর্ত্তী জীবনেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান কালে আমাকে সময়ে সময়ে গুরুপুত্র বলিতেন। শিতিকণ্ঠবাবু এখনও জীবিত। ব্রাহ্মসমাজের উপর সেই তরুণ বয়সে শিতিকণ্ঠবাবুর যে নেশা জন্মিয়াছিল তাহা একদিনের জন্যও কাটে নাই। চিরদিন ধরিয়া তিনি ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই ৮৪ বৎসর বয়সে এখনও তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত উপাসক এবং আমার মত অভাজনের সঙ্গে তিনি উক্ত ব্রাহ্মসমাজের সহঃ সম্পাদক। হায়! ব্রাহ্মসমাজের সেই উপাসনা ও মধুর সঙ্গীত রহিয়াছে, কিন্তু সে সুর ও সে উত্তেজনা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে! তাহা না হইলে ব্রাহ্মসমাজে আজ নগেন্দ্র বাবু ও শিতিকণ্ঠ বাবুর মত শত শত নিষ্ঠাবান সেবকের আবির্ভাব হইত।

টিপু সুলতানের সংক্ষিপ্ত বংশকথা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মহীশূরের যুদ্ধের পর টিপু সুলতান নিহত হইলে তাঁহার কয়েকটি পুত্রকে (বোধ হয় ৯ জন) ইংরাজগণ ভাবী যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কলিকাতার সন্নিকটস্থ টালীগঞ্জে প্রতিভূস্বরূপ আনয়ন করেন এবং ঐখানেই তাঁহাদের বসতিস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। সমগ্র টালীগঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব ইঁহাদিগকে লইয়া। তখন টালীগঞ্জের সান্নিধ্যে গঙ্গার স্রোত প্রবল ছিল এবং ইহার উভয় কূল লইয়া প্রকাণ্ড গঞ্জ ছিল। নৌকাযোগে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল, পাট ও ভুসিমাল আমদানি হইত এবং প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল ও পাট বিক্রয় হইত। বর্ত্তমানে আদিগঙ্গার সে স্রোত নাই, নৌকাপ্রবেশের পথ অবরুদ্ধ, জলস্রোত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। সুলতান টিপুর বংশ একেবারেই অবসন্ন। অনেকের বাস অর্থাভাবে পর্ণকুটীরে।

টিপু সুলতানের জনৈক পুত্র সুবিখ্যাত প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহেবকে আমি দেখিয়াছি। তাঁহার তিরোধান কাল ইং ১৮৭০ সালের কাছাকাছি। প্রকাণ্ড জুড়িতে চড়িয়া তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে গড়ের মাঠে বায়ুসেবনার্থ বাহির হইতেন। তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিলেই রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানদারগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত। গাড়ী নিকটে আসিলে মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিত। গাড়ী চলিয়া গেলে আবার দোকানে উঠিয়া বসিত। সাহাজাদা গোলাম মহম্মদ সাহেবের অপূর্ব্ব দানশক্তি ছিল। দুই পয়সা ও চারি পয়সার স্বতন্ত্র মোড়ক তাঁহার নিকটে থাকিত এবং অন্ধ, খঞ্জ ও আতুর দেখিলেই গাড়ী থামাইয়া তাহাদিগকে পাত্রানুযায়ী এক-একটী মোড়ক দিতেন। পেনসন্ ব্যতীত তাঁহার নিজের কারবারও ছিল। তিনি মূল্যবান ঘোড়া চিনিতে পারিতেন। তাই ঘোড়ার ক্রয়-বিক্রয়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অর্জ্জিত অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া যান। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড মসজিদ, মমিনপুর (খিদিরপুর) ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর বিশাল ভূমিখণ্ডের উপরিস্থ মসজিদ, টালীগঞ্জের বাগানের মধ্যস্থ সুশোভন মসজিদ—এসব তাঁহারই কীর্ত্তি। অন্ধ আতুর ও খঞ্জদিগের মাসিক সাহায্যদান কল্পে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া যান। ঐ টাকার সুদের পরিমাণ মাসিক প্রায় ৮০০৲; উহা হইতে প্রতি মাসে আতুরগণকে হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হয়। উক্ত দানকার্য্য পরিদর্শনজন্য তাঁহার ব্যবস্থা ও উপদেশ মতে আলিপুরের একজন মুন্সেফ ও একজন ডেপুটী পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার পরিত্যক্ত আবাস-নিকেতনে প্রতিমাসে গমন করেন ও অর্থ বণ্টন করিয়া দেন।

উক্ত টিপুসুলতানের বংশে পরে প্রিন্স বক্তিয়ার সাহা, আনোয়ার সাহা ও বেরাম সাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন; আর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন উত্তরকালে মহম্মদ মানোয়ার সুলতান সঙ্গীতবিদ্যায়। তাঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি টিপুসুলতান হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ হইবেন। টিপু-সুলতান পেশোয়ার রাজবংশের যে কন্যাকে বিবাহ করেন, ইনি সেই বংশসম্ভূত। একারণে তিনি হিন্দু-সম্প্রদায়ে অনুরাগী ছিলেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সুরবাহার ও বিনা পর্দায় এস্‌রাজের আলাপে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন।

টিপু সুলতানের মৃত্যুর পরে তাঁহার যে সকল পুত্র টালীগঞ্জে থাকিতেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা সরকার হইতে যথাযোগ্য মাসোহারা পাইতেন। অনেক বৎসর পরে ঐ মাসোহারার পরিবর্ত্তে এককালে অনেক টাকা তাঁহারা সরকার হইতে প্রাপ্ত হন; এবং ঐ টাকা লইয়া তদীয় বংশধরগণ আলিপুর, বালিগঞ্জ ও চৌরঙ্গীতে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি পৃথক্‌ভাবে খরিদ করেন এবং তাহার আয় হইতে তাঁহাদের জীবিকা চলিতে থাকে। কিন্তু অভাবজনিত কষ্টে ঐ সমস্ত সম্পত্তির প্রায় সমস্তই বিক্রয় ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অধুনা আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। মহম্মদ মানোয়ার সুলতান—যিনি সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছেন, বালিগঞ্জে ইঁহার ৪।৫ শত বিঘা জমি ছিল। অর্থাভাবে উহা বন্ধক পড়ে এবং ৺তারকনাথ পালিত তাহার কতক অংশ নিজে খরিদ করিয়া তাঁহার সুপ্রশস্ত ইমারত বাটী ও বাগান প্রস্তুত করেন এবং অবশিষ্ট নিজ বন্ধু-বান্ধবকে বিক্রয় করেন। সুলতান সাহেবের নিকট শুনিয়াছি যে, উহার এক-এক খণ্ডে জষ্টিশ আশুতোষ চৌধুরী ও ৺জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের আবাস-নিকেতন। এই সুলতান-বংশের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে টালীগঞ্জের অধঃপতন।

অরূপের রূপ।

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

কে জানে কোন্ অতীত কালে এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় সৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছিল? কোন্ উপাদানে কি ভাবে এই বিশ্ব রচিত হইয়াছিল তাহা সেই রচয়িতা ভিন্ন আর কেহই জানে না। তুমি আমি যাহাই কেন বলি না, অভ্রান্ত সত্য সেই অভ্রান্ত পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহই বিদিত নহে। তোমার আমার গবেষণা বা অনুমান এখন সত্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু কালে হয় ত তাহা অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, এই সৃষ্টি সেই স্রষ্টারই শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

একদা কিছুই ছিল না, এখন সকলই হইয়াছে। শূন্যের ভিতরে পূর্ণের প্রকাশ, অন্ধকারের গর্ভে আলোকের উদয় বড়ই আশ্চর্য্য! বড়ই চমৎকার! এক এক করিয়া শব্দ ও স্পর্শ দেবতা এই বিশ্বরঙ্গভূমে দর্শন দিলেন। ইঁহাদের নিজ নিজ অংশের যথাসম্ভব অভিনয় শেষ করিলেন। এইবার তৃতীয় দেবতা "রূপ" আসিয়া সৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। এইবার রূপের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। "হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতা ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন" সেই পরম দেবতা এইবার অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া ধীরে ধীরে অনন্ত গগনে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার তেজে ব্রহ্মাণ্ড তেজোময় হইল। ইঁহার রূপে জগতের সকল রূপ

ফুটিয়া উঠিল। শব্দ ও স্পর্শ এই রূপের মধ্যে মিশিয়া গেল। রূপের আবির্ভাবে সৃষ্টি মধুর হইতে মধুরতর রূপ ধারণ করিল। পূর্ব্বে যাহা লুকাইয়া ছিল, এখন রূপের তেজে তাহা নানারূপ ধরিয়া বাহিরে আসিল ও বিশ্ব-নাট-মন্দিরে নিজ নিজ অংশের অভিনয় আরম্ভ করিল। সৃষ্টির এই উন্নতিদর্শনে স্রষ্টা আনন্দিত হইলেন। সৃষ্টিরূপ সুনির্ম্মল দর্পণে সুন্দর স্রষ্টা নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া কতই না সুখী হইলেন! এতদিন তিনি একাকী ছিলেন, আত্মপ্রকাশের সুযোগ ছিল না; এখন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই সৃষ্টি স্রষ্টারই প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই আদি বা অনাদি কারণের অরূপ রূপের বিন্দু বিন্দু অংশ পড়িয়া এই বিশ্বপ্রকৃতির অযুত অসংখ্য পদার্থ হাসিয়া উঠিল।

অন্ধতমসাচ্ছন্ন যামিনীর শেষভাগে আলোকাধার সূর্য্যদেবকে ক্রোড়ে লইয়া উষাদেবী পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হইলেন। তিনি যখন ধীরে ধীরে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে লাগিলেন, তখন সেই আলোকে, সেই পুলকে, সেই হাসিতে, সেই দৃষ্টিতে তেত্রিশকোটী আর্য্যসন্তান ভাবে ও বিস্ময়ে গদগদ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। উষার অনিন্দ্য আলোকরাশি না দেখিলে কি জীবলোকের কোনও আশা থাকিত? না তাহার যন্ত্রণাময়ী বিষাদের কালরাত্রির প্রভাত হইত? উষার আলোকের মত, প্রভাতের বালারুণের মত আশার সামগ্রী ও উৎসাহের পদার্থ আর কি আছে? প্রভাতের আলোকে জীবের রোগযাতনা কমে, শোকের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়, প্রাণের জ্বালার নির্ব্বাণ হয় এবং শত শত ভয় পলায়ন করে। প্রভাতালোকে জীবের ঘুম ভাঙ্গে, স্বপ্ন ফুরায়, শ্রান্তদেহে বলাধান হয়। প্রভাতে বিশ্ব নিত্য নূতন জন্ম প্রাপ্ত হয়। প্রভাতে বিহঙ্গম আকাশে উড়ে, মৃগ বনান্তরে ছুটে, মানব ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়। প্রভাতে প্রবাহিনী কুলুকুলু ধায়, সমীর ধীরে ধীরে বয়, কুসুম সুবাস ছড়ায় এবং ভক্তপ্রাণ ভগবানের নাম গান করে। তাই প্রভাতের ভক্তিকুসুমাঞ্জলি সেই প্রভাতের দেবতার এত প্রিয়। প্রভাতের সূর্য্য অনাদি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন মহাকালের বিস্তৃত বক্ষে একটী ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ অঙ্কিত করে, জীবের কর্ম্মচেষ্টার সময় নিরূপণ করে এবং পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিবার জন্য জীবের কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি করে; তাই প্রভাত আর্য্যদিগের এত প্রিয়। তাই প্রভাতের সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য মানবচক্ষুর এত সানুরাগ দৃষ্টিসম্পাত। প্রভাতের সূর্য্যই তেজের প্রস্রবণ ও রূপের আকর।

এই সূর্য্যের অন্তরাত্মা মহাবিশ্বের মহাকাশের কেন্দ্রস্থল এবং তাঁহার ইচ্ছাই সংখ্যাতীত গ্রহ-উপগ্রহ ও জ্যোতিষ্কের উৎপত্তির মূল। তাঁহার তেজ কখনও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না—ম্লান হয় না—ক্লান্ত হয় না—ইহা বিশ্বের চিরজ্বলন্ত মহাপ্রদীপ। তাঁহার রথ কখনও থামে না—তাঁহার অশ্ব ও সারথি কখনও বিশ্রাম করে না। এই পরম দেবতাকে চক্ষুষ্মান মাত্রেই দেখিতে পায়, অনুভব করিতে পারে। এই দেবতা কল্পিত মূর্ত্তি নয়, গঠিত প্রতিমা নয়। পৃথিবীর কত দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল, কত দেবতার দেবত্ব লোপ পাইল, কত প্রতিমার বিসর্জ্জন হইল; কিন্তু সেই পরম দেবতার মন্দির অসংখ্য সম্বৎসরেও ভাঙ্গিল না,—দেবত্ব শত যুগান্তেও টুটিল না—প্রতিমা আজন্ম পূজার পরেও বিসর্জ্জিত হইল না। সাগরাম্বরা ধরণী প্রতি প্রভাতে এই পরমদেবতাকে অর্ঘ্য না দিয়া জলগ্রহণ করেন না।

পরমদেবতার সেই অরূপ রূপ প্রভাতগগনের শোভায় জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকরের অম্লান কিরণধারায় নভোমণ্ডল হইতে ধীরে ধীরে ভূমণ্ডলে নামিয়া আসিল। এই দিব্য রূপরাশিকে পৃথিবীতে নামিতে দেখিয়া জলস্থল কাঁপিয়া উঠিল। কে সর্ব্বাগ্রে এই রূপরাশিকে ধারণ করিবে তাহার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হিমাচল, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, নিজ উন্নত মস্তক পাতিয়া দিল। আকাশের সমগ্র রূপরাশি হাস্যমুখে হিমাচলের অভ্রভেদী শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলাগিরির উন্নত শিরে আলুথালু বেশে এলাইয়া পড়িল। ইহার স্পর্শে পর্ব্বতের পাষাণময় শিরে কোটী কোটী বনলতা লতাইয়া উঠিল—পাতায় পাতায় অযুত লক্ষ পার্ব্বত্য ফুল ফুটিয়া উঠিল—দিকে দিকে নির্ম্মল নির্ঝরিণীর বক্ষে সৌন্দর্য্যের রজতধারা উছলিয়া পড়িল। প্রকৃতির এই অনুপম রূপলাবণ্যে আর্য্যসন্তান বিমুগ্ধ হইয়া গেল এবং বিশ্বসৌন্দর্য্যের পূজা করিতে লাগিল। এই মহাপূজা এই মহোৎসব এই বিশ্বানন্দের তরঙ্গ আজিও আমাদের দেশকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। আর্য্যসন্তান এই পরম সৌন্দর্য্যের পূজা আজিও ভুলিতে পারেন নাই।

হিমাচলশিরে ক্রমে এত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল যে, কালে সেই সৌন্দর্য্যস্রোতে সমগ্র গিরিরাজ্য ভাসিয়া গেল। শেষে তথায় আর স্থান না পাইয়া সৌন্দর্য্যধারা তথা হইতে নদনদীর স্রোতে মিশিয়া গ্রামনগর ডুবাইয়া বিশাল নীলাম্বুনিধির অগাধ-গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দিল। আকাশের সৌন্দর্য্য আকাশ হইতে ক্রমে স্নিগ্ধ ধরণীতলে নামিয়া আসিল। পূর্ব্বে যেখানে কোন বর্ণই ছিল না এখন তথায় সপ্তবর্ণ উদিত হইল। বিশ্বরচয়িতা এমন একটী বিন্দু বা কণিকাকেও রচনা করিলেন না,

যাহার রূপ বা বর্ণ নাই। অগ্নিপ্রস্রবণ সূর্য্যেরও রূপ ফুটিল এবং জীবের পদতলগত ক্ষুদ্র বালুকারও রূপ দেখা দিল। নীলাচল গগনতলেও শতকোটী গ্রহতারকার ফুল ফুটিল, আবার ধরাতলের শ্যামল শস্পদলেও কুসুম হাসিল। ইন্দ্রধনুমালী জলদজালেও রূপ হাসিল, আবার শিখি-পাখা-ঢাকা পাদপশাখাতেও রূপ ফুটল। প্রজাপতিপালে, শুকশারী-দলে, ময়না-বুলবুলে রূপ চঞ্চল শিশুর ন্যায় খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্বেত শতদলে, গোলাপ-বকুলে, শেফালিকা-বেলে, চম্পক পারুলে সৌন্দর্য্য হাসিয়া উঠিল। নব দূর্ব্বাদলে, নীল সিন্ধু-জলে, বনস্পতি কোলে, লতিকার জালে সৌন্দর্য্য গড়াইয়া পড়িল। প্রকৃতির এই সুচিত্রিত সুরঞ্জিত সুনির্ম্মল দৃশ্যপটে বিশ্বনাটকের অভিনয় আরম্ভ করিবার জন্য কে জানে কোথা হইতে বালকবালিকারূপে প্রথম মানবশিশু আসিয়া হাস্যবদনে দর্শন দিল। জল-স্থল ও তরুলতার মধ্যে কোথা হইতে এই মানবযুগল আসিল, তাহা কত মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ ঋষিও আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। ঐ প্রথম মানব-শিশুদ্বয়ের অনাবৃত সৌন্দর্য্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেন পূর্ণতা লাভ করিল। এই মানবশিশু প্রকৃতির শোভাদর্শনে আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহারা হাস্যমুখে এদিকে ওদিকে কতই ছুটাছুটি করিতে লাগিল; লতাবিতানে কতই লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। আপনাপনি মনের উল্লাসে ফুলসাজে কতই সজ্জিত হইল। প্রকৃতি এই মানবশিশুদিগকে সাদরে সস্নেহে নিজ সুকোমল অঙ্কে স্থান দান করিলেন। বালক-বালিকার লাবণ্যের কাছে প্রকৃতির লাবণ্য দাঁড়াইতে পারিল না। আকাশের চাঁদ সুন্দর বটে, কিন্তু মানবসৌন্দর্য্যের নিকট সে সৌন্দর্য্য পরাজিত হইল। শতদল সুন্দর বটে, কিন্তু মানবসৌন্দর্য্যের নিকট তাহাও ম্লান বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যই মানবশিশুর ফুটন্ত সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। তাহাদের মুখমণ্ডলের স্বর্গীয় সুষমা ত্রিজগতকে মোহিত করিল, বনের পশুপক্ষীদিগকেও ভুলাইল।

ক্রমে মানবশিশু নানাসাজে সজ্জিত হইয়া বিশ্ব-রঙ্গভূমির সর্ব্বত্র অধিকার করিল। নানাবর্ণের নরনারীতে ক্রমে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গেল। মলয়মারুতের হাসির সঙ্গে মানব কতই ছুটাছুটি করিতে লাগিল; দিবসে নিশীথে, সখাসখী সাথে, শত নৃত্যগীতে, নব নব উৎসব আরম্ভ করিল; ফুল-জল লইয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রেমার্দ্রহৃদয়ে বিশ্বদেবতার চরণে কতই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল। মানব-শিশু বুঝিল জগৎপিতা আত্মপ্রকাশের উপযোগী করিয়া মানবশরীর গঠন করিয়াছেন, নিজের সৌন্দর্য্যরাশি মানব-সন্তানের বদনে মাখাইয়া দিয়াছেন এবং নিজের হাসি মানবের সহাস্য আননে ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি পিতা, মানব তাঁহার আত্মজ; তিনি বিশ্বরাজ, মানব বিশ্বরাজপুত্র। তাই মানব অরণ্যের মধ্য হইতেও বলিয়া উঠিল—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। পিতার ক্রোড়ে মানবপুত্রের বড়ই শোভা হইল। সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া পিতা সাদরে তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুত্রও পিতার চরণধূলি মাথায় লইয়া পিতৃমুখপানে অতৃপ্তনয়নে চাহিতে লাগিল। পিতার রূপ পুত্রে, পুত্রের রূপ পিতায় মেঘমালায় বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতে লাগিল। মানবজাতি ত যথার্থই পিতৃহারা অনাথ নয়। এই বিশ্বভবন মানবের পৈতৃক গৃহ, বিশ্বেশ্বর মানবের জন্মদাতা পিতা, রক্ষাকর্ত্তা প্রভু, জ্ঞান-দাতা গুরু, এবং প্রেমশিক্ষার প্রধানাচার্য্য। পিতা নিজ প্রতিরূপে পুত্রকন্যার ছবি অঙ্কিত করিলেন—পুত্রকন্যাও নিজ প্রতিরূপে পিতার ছবি আঁকিতে শিখিলেন। পিতা-পুত্রের ছবিতে কতই লুকান লাবণ্য বাহির হইল, কতই অজানা ভাব প্রকাশিত হইল এবং কতই অচেনা কান্তি ভাসিতে লাগিল। পুত্রকন্যার প্রেমাশ্রুমাখা প্রেমাঞ্জনে ঢাকা পিতৃপ্রতিমার শোভা নিতান্তই অসামান্য হইয়া উঠিল। ঈশ্বরের স্নেহ ও মানবের ভক্তি একত্র হইয়া কত শত অভিনব নাটক-উপন্যাস, বেদ-বাইবেল, কোরাণ পুরাণ রচনা করিল। ভগবান ও ভক্তের এই ভালবাসার কথা কত কথকতার সৃষ্টি করিল, কত হাসি-কান্নার অবতারণা করিল, কত তপোবন ও তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিল।

সঙ্কলন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মানকচু সম্বন্ধে প্রবাদ—[আমরা নিম্নে যে প্রবাদ উল্লেখ করিলাম, তাহার অন্তর্নিগূঢ় তত্ত্ব যদি কেহ আমাদিগকে জানাইতে পারেন, আমরা তাহা সাদরে পত্রস্থ করিব। দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক প্রবাদের ভিতরেই ঐতিহাসিক, সামাজিক বা অন্য কোন বিষয়ক তত্ত্ব লুক্কায়িত থাকে। তং সং]

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে বিজয়া দশমীর পর সার্দ্ধ দুই দিবস পর্য্যন্ত শিবের গৃহিণী দুর্গা নাকি মানতলায় বাস করেন। এই জন্য অনেক গৃহস্থ বাড়ীর সম্মুখে, খিড়কীর দ্বারে মানগাছ পুঁতিয়া রাখেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, প্রবীণা গৃহিণীগণ বিজয়ার পরই আঙ্গিনায় মানগাছ ও হরিদ্রাগাছ রোপণ করেন। মহাদেব ভগবতীকে মর্ত্ত্যধামে আসিতে দিতে

সম্মত ছিলেন না; দুর্গা জোর করিয়া চলিয়া আসেন। দশমীর পর যখন দেবী স্বামীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, শিব তখন তাহাতে বাধা দেন। তাহ দেবী মান করিয়া মানতলায় আড়াই দিন বসিয়াছিলেন। তার পর দাম্পত্য কলহের নিবৃত্তি হয়। শিব দুর্গাকে লইয়া কৈলাসগমন করেন। এই প্রবাদটী স্মরণ করিয়া বহু গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীগণ মানগাছকে অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। দুর্গোৎসবের 'নবপত্রিকায়' মান ও কচুর গাছ গৃহীত হয়। (আয়ুর্ব্বেদ, জ্যৈ. ১৩২১)

নাগরিক আদর্শ—প্রাচীন ভারতে—

Local Self-Government Gazetteএ শ্রীযুক্ত K. S. Ramswami Sastri প্রাচীন ভারতের নাগরিক আদর্শ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে বলেন—

(১) পয়ঃপ্রণালী—পৌরজনবর্গের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নাগরিকগণ যথেষ্ট চেষ্টিত থাকিতেন। প্রত্যেক বাড়ী হইতে যাহাতে জল-নিকাশ হয়, সেইজন্য রীতিমত ঢালু পয়ঃপ্রণালী রাখিতে হইত। এই সকল পয়ঃপ্রণালীর প্রস্থ তিন পদ হইত। বাড়ী হইতে জল বাহির হইয়া বৃহত্তর সরকারী পয়ঃ-প্রণালীতে পড়িত। এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যদি কেহ বাড়ীতে এইরূপ পয়ঃপ্রণালী না রাখিত, তবে তাহাকে ৫৪ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। আমাদের কলিকাতায় যেমন এক বাড়ীর গাত্রে আর এক বাড়ী থাকে, অনেক স্থলে দুই বাড়ীর মাঝখানে কোনও ফাঁক থাকে না, সেকালে সে প্রকার হইবার উপায় ছিল না। দুই বাড়ীর মধ্যে তিন-চার পদ ফাঁক রাখিতে হইত। বাড়ীর মালিকেরা পরামর্শ করিয়া এমনভাবে গৃহনির্ম্মাণ করিতেন, যাহাতে অপরের কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা হইত না বা হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। বৃষ্টি পড়িয়া বাড়ীর ছাদ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য মাদুর দিয়া ছাদ ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। মাদুর ছাদের উপর দৃঢ়-সম্বদ্ধ থাকিত, যাহাতে বাতাসে বা ঝড়ে না উড়িয়া যায়।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা—যদি কাহারও বাড়ীর কোন গর্ত্ত, সিঁড়ি, মই, গোময়রাশি বা অন্য কিছু রাস্তার লোকের বা পার্শ্বের বাড়ীর লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিত, বা জল জমিয়া কাহারও দেওয়ালের ক্ষতি করিত, তবে যাহার অবহেলার কারণে এই বিরক্তি বা ক্ষতি হইত, তাহাকে ১২ পণ জরিমানা দিতে হইত। পয়ঃপ্রণালী দিয়া রীতিমত জল নিষ্কাশিত না হইলেও ১২ পণ জরিমানা ব্যবস্থা ছিল। বিষ্ঠা বা মূত্রের জন্য দুর্গন্ধ উত্থিত হইলে জরিমানার পরিমাণ ছিল ২৪ পণ। যাহাতে কাহারও কোনরূপে স্বাস্থ্যহানি না হয়, সে বিষয়ে যে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইত, উপরি উক্ত নিয়মগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(৩) হাসপাতাল—হাসপাতালেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক হাসপাতালের ভৈষজ্যাগারে প্রচুর পরিমাণে ঔষধ রাখা হইত। এত ঔষধ থাকিত যে, এক আধ বৎসরের ব্যবহারে তাহা নিঃশেষ হইত না। ভারে ভারে ঔষধ ভৈষজ্যাগারে জমা রাখা হইত। শুধু জমা রাখা হইত না, প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করাও হইত। অর্থ-শাস্ত্রে দেখা যায়, তখন চার প্রকার চিকিৎসক ছিল। প্রথম, ভিষজঃ বা চিকিৎসকাঃ অর্থাৎ সাধারণ বৈদ্য; দ্বিতীয়, জাঙ্গলবিদঃ, অর্থাৎ ইহারা বিষবৈদ্য; তৃতীয়, গর্ভব্যাধিজ্ঞাঃ বা সূতিকাচিকিৎসকাঃ, চতুর্থ, পল্টনের অস্ত্রচিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীগণ। পল্টনের অস্ত্র-চিকিৎসকগণের সঙ্গে অস্ত্র, যন্ত্র, বস্ত্র প্রভৃতি এবং শুশ্রূষা-কারিণীগণের নিকট পথ্য, আহার্য্য, পানীয় প্রভৃতি থাকিত। প্রত্যেক সংবদ্ধ পল্টনের সঙ্গেই চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী থাকিত। পশুচিকিৎসার জন্য পশু-চিকিৎসক ছিল। ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য নানা প্রকার গাছগাছড়া আবাদ করা হইত। রাজসরকার হইতেও ঔষধের উপযোগী বিভিন্ন প্রকার গাছগাছড়ার চাষ করা হইত। রাজসরকার হইতে চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করা হইত।

(৪) খাদ্যাদি—যাহাতে খাদ্যাদির জন্য দেশে কোনরূপ পীড়া না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। কেহ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইলে দণ্ড লাভ করিত। জনবহুল সহরে বা পল্লীতে যাহাতে রোগ প্রবল না হয় বা সংক্রামক না হয়, তজ্জন্য রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কোথাও জল বাধিয়া যাহাতে কাদা না হয়, আবর্জ্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। যাহার অবহেলায় এই সকল ঘটিত, সে দণ্ড লাভ করিত। রাজপ্রাসাদ, মন্দির, তীর্থস্থান, বা জলাশয়ের নিকট মলমূত্রত্যাগ অপরাধ গণ্য হইত। যদি কেহ অসুস্থতা নিবন্ধন বা ঔষধ সেবনের ফলে ঐরূপ অপরাধ করিত, তাহাকে ক্ষমা করা হইত। সহরের বা গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে মৃত জীবজন্তু বা নরদেহ নিক্ষেপ বা সমাধি বা সৎকার স্বাস্থ্য-নীতির বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইত। মৃতসৎকারের বা গোর দিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্য পথ দিয়া শবদেহ বহন করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

(৫) শবব্যবচ্ছেদ—তখন শবব্যবচ্ছেদেরও ব্যবস্থা ছিল। যাহাতে শব পচিয়া না যায়, তজ্জন্য শবে এক প্রকার তেল মাখানো হইত। বিষভক্ষণ, উদ্বন্ধন, শ্বাস-

রোধ, জলে ডোবা প্রভৃতি আকস্মিক কারণে যাহাদের অপমৃত্যু ঘটিত, তাহাদের শব তৎক্ষণাৎ ব্যবচ্ছেদের জন্য ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইত। উপস্থিত চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতেন যে, কি কারণে লোকটীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কি প্রকারে মৃত্যুর কারণ নির্ণীত হইত, তাহার লক্ষণপরিচয় অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। চিকিৎসকের কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে রীতিমত সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণে বিচারপূর্ব্বক মৃত্যুর কারণ নির্ণীত হইত।

(৬) অগ্নিনির্ব্বাণব্যবস্থা—যদি কোন গৃহস্থের নিকট পাঁচ প্রকার জলপাত্র (কুম্ভ, দ্রোণ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত জলপাত্র প্রভৃতি), মৈ, কুড়াল, ধূমনিবারক কুলা, জলন্ত দুয়ার জানালা টানিয়া নামাইবার জন্য আঁকশি, সাঁড়াশি (খড় ছড়াইবার জন্য), এবং চামড়ার একটী মশক না থাকিত, তাহাকে ¼ পণ জরিমানা দিতে হইত। লৌহকর্ম্মকারদিগকে নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে থাকিতে হইত। প্রত্যেক গৃহস্থকে ডাকিলে বাড়ীতে যাহাতে সদাসর্ব্বদা পাওয়া যায়, তাহার নিয়ম ছিল। বড় বড় পথের ধারে ধারে এবং চৌমাথায়, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সহস্র সহস্র কলস জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইত, যাহাতে আগুন লাগিলে অতি সহজে জল পাওয়া যায়। কোথাও কোন দ্রব্যে আগুন লাগিলে যদি কোন গৃহস্থ তাহা নিবাইতে সাহায্য না করিত, তবে তাহাকে ১২ পণ দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু ভাড়াটিয়াদিগকে কোন প্রকার দণ্ড দিতে হইত না।

অর্চ্চনা বৈঃ—১৩২৭।

পঞ্চগোরা—ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে কয়েকজন ইংরাজ এদেশের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাচীনদিগের ধারণা ছিল। তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—আজকাল অধিকাংশ যুবক হয় তো তাহা জানেন না। শ্লোকটী এই—

হেয়ার্ কলভিন্ পামারশ্চ কেরি মার্ষম্যানস্তথা।
পঞ্চ গোরান্ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

Hindu Patriot—June 16, 1920.

সঞ্চয়ভাণ্ড বা Provident Fund—প্রাচীন ভারতে—

ষষ্ঠাংশং বা চতুর্থাংশং ভৃত্যেভৃ্ত্যস্য পালয়েৎ।
দদ্যাৎ তদর্দ্ধং ভৃত্যায় দ্বিত্রিবর্ষৈঃখিলং তু বা॥

শুং নীঃ ২'৪১৪

(শান্তিনিকেতন বৈঃ, ১৩১৭।

শ্রমজীবিসমস্যা—প্রাচীন ভারতে—

যথা যথা তু গুণবান্ ভৃতকস্তদ্ভৃতিস্তথা।
সংযোজ্যা তু প্রযত্নেন নৃপেনাত্মহিতায় বৈ॥

শু. নী. ২. ৩৯৮।

যে হীনভৃতিকা ভৃত্যাঃ শত্রবস্তে স্বয়ং কৃতাঃ।
পরস্য সাধকাস্তে তু ছিদ্রকোষপ্রজাহরাঃ॥

ঐ ২. ৪০০।

কার্য্যমানা কালমানা কার্য্যকালমিতিস্ত্রিধা।
ভৃতিরুক্তা তু তদ্বিদ্ভৈঃ সা দেয়া ভাষিতা যথা॥

২২. ৩৯২

কর্ম্মকালানুরূপমসম্ভাবিতবেতনং। অর্থশাস্ত্র ১৮৩ পৃঃ
কর্ষকঃ শস্যানাং গোপালকঃ সর্পিষাং বৈদেহকঃ পণ্যানামাত্মনা ব্যবহৃতানাং দশভাগমসম্ভাবিতবেতনো লভেত। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ১৮৮ পৃঃ।

ভৃতাবনিশ্চিতায়াং তু দশমং ভাগমাপ্নুয়ুঃ।
লাভে গোবীর্য্য-শস্যানাং বণিগ্-গোপ-কৃষীবলাঃ॥

নারদসংহিতা।

বৃদ্ধ মনুকৃত বিবাদার্ণবসেতু দেখ।

গবাং শতাদ্ বৎসতরো ধেনুঃ স্যাৎ দ্বিশতাদ্ ভৃতিঃ।
প্রতি সম্বৎসরং গোপে সংদোহশ্চাষ্টমেঽহনি॥

নারদসংহিতা।

সমুদ্রযাত্রাকুশলা দেশকালার্থবেদিনঃ।
নিয়চ্ছেয়ুর্ভৃতিং যাং তু সা স্যাৎ প্রাগকৃতা যদি॥

বিবাদার্ণবসেতু ১৬৮ পৃঃ

অবশ্য-পোষ্যবর্গস্য ভরণং ভৃতকাৎ ভবেৎ।
তথা ভৃতিস্তু সংযোজ্যা তদ্যোগ্যভৃতকায় বৈ॥

শু° নী° ২. ৩৯৯

(শান্তিনিকেতন বৈ, ১৩২৭)

অমন্ত্রমক্ষরং নাস্তি নাস্তি মূলমমৌষধং।
অযোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি যোজকস্তত্র দুর্লভঃ॥

শু. নী. ২. ১২৬ (ঐ ঐ)

নিদ্রা—It is folly for persons accustomed to eight or nine hours' sleep to try to take only four. We do know that most great men have needed more sleep and have taken more than has been credited to them. In one of our standard works on therapeutics, the writer states that Nepoleon took but four hours of sleep. Had the writer been as careful in his research in this matter as in others, he would have found that Nepoleon who was bleesed, if ever man

was, with the constitution of an ox, took between six and eight hours of sleep, and though he would go for long interval without rest, always made up for such a loss, on one occasion sleeping thirty-six hours at a stretch. Benjamin Franklin, who was as thrifty of his time as he dared to be, and who was very robust, limited himself to six hours of repose, but not less, and if the history of the robust great were looked into carefully, it would be found that they had about as much sleep as the average men.

It is a greater gift to be able to sleep "at will" and under any circumstances than to do with little sleep. More time is wasted in getting to sleep than in sleeping. On the other hand, there is little doubt that too long sleep, too protracted bodily relaxation, is not best for the human organism, and many of our relaxed young people with no regular employment and more time than they know how to consume to advantage, would be the better for spending less time in bed. A prescription for early rising would do us good.

Medical Journal—Quoted in
Indian Messenger 19. 9. 17.

বশিষ্ঠ—জেন্দাবেস্তায় উৎকৃষ্টতম, মঙ্গলতম অর্থে ব্যবহৃত। (শান্তিনিকেতন বৈশাখ, ১৩২৭)

Zendabesta—সংস্কৃতে অনুবাদ করেন ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে নের্যোসঙ্ঘ (নরসিংহ) ধবল।

(শান্তিনিকেতন বৈশাখ, ১৩২৭)

ছবি ও অঙ্কন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

এদেশের প্রাচীন গ্রন্থে ও নাটকাদিতে চিত্রের (painting) এত উল্লেখ আছে ও তাহার এত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাহা অন্যান্য দেশে নিতান্ত বিরল। ভাস স্ব-রচিত নানা নাটকে চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'দূতবাক্য' নামক নাট্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্য্যোধন কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অবমাননার চিত্রাবলী নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ গ্রন্থে বৎসরাজের সহিত বাসবদত্তার বিবাহ উভয়ের চিত্র অবলম্বনেই ঘটিয়াছিল, কেন না তাঁহারা উভয়ে বিবাহের পূর্ব্বে কৌশাম্বীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নবাসবদত্তা গ্রন্থেও ঐ চিত্রেরই উল্লেখ দেখা যায়। প্রতিমা নামক ভাসের নাটকে দেখিতে পাই, ভরত রাজকীয় চিত্রশালায় তাঁহার অনবস্থান সময়ে অযোধ্যায় যে যে ঘটনাবলী হইয়াছিল এবং যে ভাবে রামের বনবাস ঘটিয়াছিল তাহার পরিচায়ক মূর্ত্তি ও চিত্রগুলি নিরীক্ষণ করিতেছেন। উত্তররামচরিতেও রামসীতা তাঁহাদের জীবনের ঘটনাগুলির চিত্র নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহারও পরিচয় মিলে। অর্জ্জুন উহার চিত্রকর ছিলেন। ঐ সমস্ত অঙ্কন ও ছবি যে মূলের ঠিক অনুরূপ ও সজীব হইত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অজন্তার দেওয়ালের গাত্রে অঙ্কনবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা সাধারণের বিদিত যে, সংস্কৃতসাহিত্যের যুগে চিত্রের যে পরিচয় মিলে, ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বে প্রতি রাজা ও ধনবানের গৃহে চিত্রশালা থাকিত।

রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শন নাটকে চিত্রের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। জয়দেব-রচিত প্রসন্নরাঘব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রহস্ত মাল্যবানপ্রেরিত শত্রুনির্ম্মিত সেতু ও আক্রমণ-উদ্যোগের চিত্র বা নক্সা রাবণের হস্তে দিতেছেন। কর্ণসুন্দরী গ্রন্থে কেবলমাত্র কুমারীর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তাহার উপর রাজার অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, এইরূপ পরিচয় মিলে। বৃহৎকথামঞ্জরী, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় যে, অঙ্কনের ও অঙ্কিত ছবির সাহায্যে পাত্রপাত্রী-সংগ্রহের চেষ্টা চলিত। পদ্মপত্রে কখন বা কাষ্ঠফলকে চিত্র অঙ্কিত হইত; রাজকুমারীগণকে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। কথাসরিৎসাগরের পঞ্চম ও ষোড়শ তরঙ্গে দেওয়ালের গাত্রে ছবি টাঙ্গাইবার ও রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের গাত্রে সমগ্র রামায়ণের ঘটনাবলী অঙ্কনের উল্লেখ আছে।

উপরের লিখিত বিবরণ বেহার ও উড়িষ্যা-জার্নালের ১৯২৬, ডিসেম্বর-সংখ্যায় প্রকাশিত মেহটা সাহেবের প্রবন্ধের সারাংশ। পশ্চিমে কাশীরাজের প্রাসাদের দেওয়ালের গাত্র জুড়িয়া যে রামায়ণ ও মহাভারতের ছবি আছে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, রাজপুতানায় ও অন্যান্য অনেক রাজার প্রাসাদে দেওয়ালের গাত্রে ঐরূপ সুন্দর অঙ্কন আজও বিরাজমান। একদা অঙ্কনবিদ্যা একরূপ এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল

সত্য বটে, কিন্তু দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠনে ও তাহার চালচিত্রে এদেশের নিরক্ষর পটুয়াগণ তাহাদের প্রতিভার যে পরিচয় প্রদান করে, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। লক্ষ্ণৌ ও নদিয়ার পটুয়াগণ মূর্ত্তি ও খেলানা নির্ম্মাণে ও তাহাতে রং ফলাইতে সিদ্ধহস্ত। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঐগুলির উপর অধুনা দেশীয়গণের যথেষ্টপরিমাণে প্রীতি বাড়িয়াছে। ইংরাজগণও ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। আমাদের দেশে বিবাহ ও অন্যান্য শুভকার্য্যে যে আলপনা দেওয়া হয় এবং হিন্দুস্থানীগণের গৃহের বাহিরের দেওয়ালে তাহাদের মহিলাগণ যে লতাপাতা অঙ্কন করেন, তাহা প্রাচীন চিত্রবিদ্যার সামান্য ছায়ামাত্র।

অঙ্কনবিদ্যার উপর এদেশবাসীর মমতা ও চেষ্টা আবার জাগিয়াছে। ইহার ফলে যে সমস্ত চিত্র অধুনা অঙ্কিত হইতেছে, তাহা সত্য সত্যই আশাজনক। কয়েকজন দেশীয় শিল্পীর অঙ্কন পাশ্চাত্যভূমির বিশেষজ্ঞগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

মোগলরাজত্বের সময়ে অঙ্কনবিদ্যা সমধিক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং উহার উপরে পারস্যের প্রভাব পড়িয়াছিল; উহার শেষ পরিণাম পাটনাতে। কিন্তু কালবশে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে পড়িয়া অঙ্কনবিদ্যা এদেশে বিলুপ্ত হইয়াছিল। হিন্দুগণের মধ্যে গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কনকলা একেবারেই অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল প্রাচীন হিন্দুচিত্রের বিশেষত্ব শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও কয়েকজন নব্য শিল্পীর হস্তে আবার ফুটিয়া উঠিতেছে এবং দেশবাসীর অঙ্কন ও চিত্র বুঝিবার শক্তি ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

সংবাদ।

পুণ্যাহ—গত ১৬ই আষাঢ় শুক্রবার শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে 'কালীগ্রাম'-পরগণার শুভ 'পুণ্যাহ'-কর্ম্ম পতিসর সদর-কাছারীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ই. বি. রেলে ১৮০ মাইল উত্তরে আত্রাই ষ্টেশনে নামিতে হয়; সেখানে 'আত্রাই'-নদীতে নৌকাযোগে পূর্ব্বমুখে ১০।১২ ঘণ্টা চলিলে পতিসর পৌঁছান যায়। ক্ষুদ্র 'নাগর' নদীর তীরে উহা অবস্থিত। নদীর দুই ধারে বড় বড় মাঠ, তাহাতে কচি কচি ধানের শীষ সবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্থানে স্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট ১০।১২টী মেটে ঘরে এক-একটী কৃষকপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকলের মাঝে কাছারী বাড়ীর ভিতর অট্টালিকা ও সিংহাঙ্কিত সুবৃহৎ তোরণদ্বার দূর হইতে দৃষ্টিপথে পড়িয়া ঠাকুরপরিবারের প্রভাব ও প্রতাপ যুগপৎ ঘোষণা করে।

উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ১২॥০ ঘটিকায় প্রচুর বাদ্যোদ্যম ও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ দ্বারা পুণ্যাহের শুভ সূচনা দিকে দিকে বিঘোষিত হইল। অনন্তর সুসজ্জিত সভাগৃহ ধীরে ধীরে উপস্থিত আমলা-কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ হইলে ষ্টেটের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় শুভসূচক দধি ও জীবন্ত মৎস্য দর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যমহাশয়কে অগ্রণী করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একটী উচ্চতর বেদীতে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব ও তাঁহার পূজনীয় পুত্রগণের প্রতিকৃতিগুলি বিচিত্র পত্রপুষ্পে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। এই বৃহত্তর বেদীর বাম পার্শ্বে অপর একটী বেদীতে আচার্য্যের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা ও সমবেত প্রজাগণকে উদ্দেশ করিয়া 'পুণ্যাহ' সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম এই যে, এদেশে পুণ্যাহ হইতেছে বর্ষার উদ্বোধন উৎসব; কৃষক ইহারই মধ্যে ভাবী শস্যসম্ভারের ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পায়। বস্তুতঃ কৃষকসম্প্রদায়েরই এই উৎসবকে রাজা প্রজার প্রতি প্রীতিবশতঃ একানুভূতির প্রেরণায় স্বকীয় করিয়া লইয়াছেন; তাই এই উৎসব রাজা ও প্রজার মিলনোৎসব। অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমবেত প্রজাপুঞ্জ ও অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অপরাহ্ণে দধি-চিপিটকের সুবৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল।

গৃহপ্রবেশ—গত ২৪শে আষাঢ় শনিবার শুভ দশমী তিথিতে ঢাকুরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সস্ত্রীক 'গৃহপ্রবেশ'-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইনি আদিব্রাহ্মসমাজের একজন অনুরাগী ভক্ত এবং পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পূজনীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। সমাগত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়পরিজনকে লইয়া গৃহকর্ত্তা

বেদীর সম্মুখে উপবেশন করিলে বেদান্ততীর্থ মহাশয় সুললিত ভাব ও ভাষায় গৃহপ্রবেশের তত্ত্বকথা বিশ্লিষ্ট করিয়া সকলকে উদ্বোধিত করেন। অতঃপর চিন্তামণি বাবু যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক একটী উপদেশ পাঠ করেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন অনুরাগী সভ্য। উপাসনা অন্তে সমাগত ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাদিগের জন্য প্রচুর জলযোগ ও আহারের আয়োজন হইয়াছিল। গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর আদর-আপ্যায়নে ও আন্তরিক অনুরাগে সকলে প্রীত হইয়াছিলেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব— ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় দেবর্ষি নারদ সম্বন্ধে সন্ধ্যাকালে কথকতা করেন। তাঁহার কথকতা ও তৎসহ সঙ্গীত সকলের মনোজ্ঞ হইয়াছিল। পরদিন ৯ই আষাঢ় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আদিব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় কামাখ্যাবাবুর উপদেশে ও চিন্তামণি বাবুর উদ্বোধন ও উপাসনায় সকলেই তৃপ্তিবোধ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের গায়ক কাঙ্গালীবাবু ও সুমিষ্টকণ্ঠ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। যন্ত্রাদিযোগে তাঁহাদের সুকণ্ঠবিনির্গত সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দুই দিনেই শ্রোতৃবর্গ ও উপাসকগণের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ বহুকালের। 'প্রতিষ্ঠা'-সময়ের গণনায় এই ব্রাহ্মসমাজ চতুর্থ স্থান অধিকার করে। আদিব্রাহ্মসমাজের পরেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ, তাহার পরেই ভবানীপুর, তৎপরবৎসরেই বেহালা ব্রাহ্মসমাজ। শ্রদ্ধেয় শিতিকণ্ঠবাবু এই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছে। এই পরিণত বয়সে তাঁহার অদম্য উৎসাহ সকলের অনুকরণীয়। প্রতি সোমবারে এই ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক উপাসনা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট আচার্য্যেরা আসিয়া এখানে বক্তৃতা-দান ও উপাসনা করিয়া থাকেন।

শোকসংবাদ।

ডাঃ ৺জে এস্‌লিন কার্পেণ্টার—গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার লণ্ডন-নগরীতে স্বীয় আবাসভবনে সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ জে এস্‌লিন কার্পেণ্টার মহোদয় পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। ইনি 'ইউনিটেরিয়ান' সমাজের একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষ ও তাহার যুগধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি চিরদিন ইনি আন্তরিক অনুরাগ পোষণ করিতেন। ইনি মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের ভাগিনেয় এবং মহাত্মা রাজা রামমোহনের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। প্রাচ্য ভাব ও ভাষায় ইনি এত অধিক অনুরাগী ছিলেন যে, পালী ভাষায় ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; এবং ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে "হিবার্ট" বক্তৃতায় ইনি অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় একজন প্রকৃত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও জাগ্রত ধর্ম্মবোধসম্পন্ন পুরুষকে হারাইয়া কেবল 'ইউনিটেরিয়ান' সমাজ নহে, সমগ্র মানবসমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা ইঁহার পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার মহজ্জীবনের আদর্শ লোকসমাজে বিস্তৃতিসাধন এবং লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

৺আনন্দপ্রকাশ ঠাকুর— আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের স্নেহের আনন্দপ্রকাশ কয়েক মাস হইল (গত ৩০শে চৈত্র বুধবার, ১৩৩৩) পরলোকগমন করিয়াছেন। যৌবনের বিকাশের অল্পদিন পরেই তাঁহার এই মৃত্যুসংবাদ আমাদিগকে বিচলিত করিয়াছে। তাঁহার পিতা ৺অক্ষয়কুমার ঠাকুরের সহিত (এটর্ণি) আদিব্রাহ্মসমাজের বিশেষ যোগ ছিল। অক্ষয়বাবুর পিতা শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মহর্ষিদেবের ও আদিব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ নিবিড় ছিল। নামের ঐক্য থাকায় মহর্ষি তাঁহাকে "সখা" বলিয়া ডাকিতেন এবং সেই সূত্রে "সখাবাবু" নামে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন মণ্ডলীর ভিতর পরিচিত ছিলেন। সে সময়কার নিত্য উপাসকগণের মধ্যে সখাবাবু একজন। অক্ষয় বাবুও প্রায় উপাসনায় যোগ দিতেন। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে পিতামহ, পিতা ও পুত্রের তিরোধান ঘটিল। পরমমাতা তাঁহার স্নেহক্রোড়ে আনন্দপ্রকাশকে স্থান দান করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পত্নী ও পুত্রগণের অন্তরে শান্তি বিধান করুন।
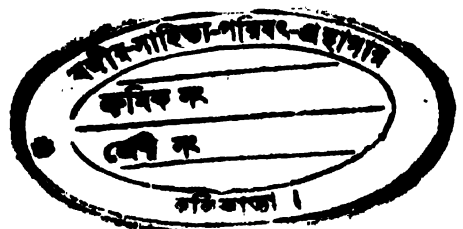
হিতৈষণা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ)—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০ আনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুখে মুখে যে-সব ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন গ্রন্থকার (মহর্ষির পৌত্র) তাহাই লিখিয়া রাখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ যে গভীর ধর্ম্মোপলব্ধির পরিচায়ক—তাহা বলাই বাহুল্য। পুস্তকখানি আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থমালার অঙ্গ পূর্ণ করিবে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

ক্ষিতীন্দ্রবাবু সুপ্তোত্থিত দেশবাসীর সম্মুখে কতকগুলি পবিত্র ভাবনা ধরিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর লেখায় পবিত্রতা আছে। আজকালকার ব্যভিচার যেরূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের আদর বাড়িলে বুঝা যাইবে সমাজের গতি ফিরিবে।

উৎসব—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

গ্রন্থকারের পূজ্যপাদ পিতামহ মহর্ষি তাঁহাকে কথাচ্ছলে যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছিলেন, সেগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ৩১ বৎসর পূর্ব্বে "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" নাম দিয়া তৎসমুদায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এখন যেমন আমরা নানাজাতিকে উন্নতি-শিখরে আরূঢ় দেখিতে পাই, পুরাকালেও সেইরূপ অনেক জাতি অনেক উন্নত হইয়াছিল; যথা ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসীক, ইহুদী প্রভৃতি। তন্মধ্যে ভারতীয় আর্য্যগণ সভ্যতায় ভদ্রতায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে সবিশেষ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশবাণী পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া গৃহে রাখিতে ও পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর। বাজে নভেল ও নাটক না পড়িয়া এইরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র হইবে এবং জ্ঞানের সীমাও বাড়িয়া যাইবে। ৩১ বৎসর পরে এই পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃ-প্রকাশিত করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা-সাহিত্যের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।

গন্ধবণিক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২।

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর স্বর্গীয় পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কথাচ্ছলে যে সকল উপদেশ বলিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তকখানিতে সে সকল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে সৃষ্টি, পৃথিবী, অন্নময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ, ধর্ম্মের বিকাশ, ঈশ্বরলাভ প্রভৃতি কঠিন বিষয়ের আলোচনা আছে। মহর্ষিদেব এ সব বিষয় কিরূপ সুন্দর ও সহজভাবে সকলের বোধগম্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই যে এই বইখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ঢাকা প্রকাশ—১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩২।

ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম্মোপদেশ উপাদেয়। এ গ্রন্থে ইহাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে "ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা যে, তাঁহার সৃষ্টিতে জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি হউক। স্বাধীনতার বলেই এই জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি। যখন সেই জ্ঞান-ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে না পারা যায় তখন আবার অধোগতি হয়"। প্রথম কয়েক অধ্যায়ে সৃষ্টি কিরূপে হইল, কিরূপে ভগবান তাঁহার শক্তি অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিলেন, কিরূপে নীহারিকা বিকম্পিত করিয়াছিলেন, তৎপর কিরূপে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইল, কিরূপে সেই জ্যোতিঃ ও তেজ ঘনীভূত হইয়া সূর্য্য হইল, কিরূপে পৃথিবী সৃষ্টি হইল, কিরূপে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টি চলিতেছে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। আর্য্যজাতি কিরূপে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হউক তাহা আর্য্যদিগের দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। গ্রন্থকার আর্য্য ঋষিদের অমূল্য উপদেশ বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত কতকটা সমদর্শীভূত হওয়াতে ও আর্য্যদের উন্নতির কথা ইতিহাসের সহিত সমঞ্জসীভূত হওয়াতে কৃতবিদ্য যুবকদের নিকট এ গ্রন্থ আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসের এমন প্রাণ-স্পর্শী ভাব আছে যে পাঠকের চিত্তে আপনা আপনি ধর্ম্মবিশ্বাস আনয়ন করে ও প্রাণকে সেই অনাদি অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়। পুস্তকের ভাষা অতি সরল ও সুন্দর। এই মধুর ও সুন্দর ভাষায় ভারতে

ধর্ম্মের চরম উন্নতি কিরূপে হইয়াছিল ও পরব্রহ্মের উপাসনার স্বরূপ কি তাহা দেখান হইয়াছে। হিন্দুমত ও ব্রাহ্মমত সর্ব্বত্র এক না হইলেও গ্রন্থে ধর্ম্মের যে মহান উদার ভাব আছে তাহাতে সকলেরই প্রাণমন ঈশ্বরে আকৃষ্ট হইবে।

হিন্দুরঞ্জিকা—১লা ভাদ্র, ১৩০২।

প্রভাতী।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ। সুলিখিত।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

ইহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মুখ্য ৩৩টী ছোট ছোট চিন্তাতরঙ্গিণী সরল ও মধুর ভাব ও ভাষা-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে সেই অমৃতের আধার প্রেম-পারাবারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। রজনীপ্রভাতে ডালা ভরিয়া প্রস্ফুটিত কমল তুলিয়া সাধক ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া ভগবানের গুণগানে যেরূপ নিজেও আনন্দিত হন এবং অন্যকেও সুগন্ধে ও সাধনশিক্ষায় আনন্দ দান করেন, গ্রন্থকার প্রভাতী কমল আহরণ করিয়া ভগবানে অর্পণ করিয়া নিজেও আনন্দিত হইয়াছেন এবং পাঠকগণকেও আনন্দ, শান্তি ও কর্ম্মক্ষেত্রের শিক্ষা দিয়াছেন। প্রভাতী প্রার্থনা পড়িতে পড়িতে প্রাণ যেন কেমন আকুল হয়। কি যেন এক প্রভাতী স্ফূর্ত্তি প্রাণকে প্রাণারামের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, আর জ্ঞান ও কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইবার শক্তি হৃদয় মধ্যে জাগাইয়া তুলে। প্রভাতে ভগবানের নাম ও গুণ গান করিতে করিতে তাঁহার অমৃতনামে প্রাণ পরিপূর্ণ করায় গ্রন্থকার সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে চলিবার শিক্ষা দিয়াছেন, কর্ম্মের হোমাগ্নি জ্বালিয়া যত কিছু পাপ যত কিছু অমঙ্গল সমস্ত ভস্মীভূত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শিখাইয়াছেন—"স্বাধীন মানব তুমি রিপুগণের পরাধীন হইও না—স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া যদি তোমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যায় যাক্, তাহার জন্য যদি তোমাকে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয় তাহাও তোমার মঙ্গল—সে মরণে নবজীবন লাভ হইবে।" তিনি শিখাইয়াছেন "অজ্ঞান অসত্য অধর্ম্ম পায়ে ঠেলিয়া দাও, আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিও না, সুখের স্বপ্ন পায়ে দলিয়া ফেল, সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না"। তিনি জন্মভূমির প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের সহিত শিখাইতে ভুলেন নাই, তিনি শিখাইয়াছেন জন্মভূমির সেবাতে মরণকেও বরণ করা গৌরবের কথা। ভাষা এমন সরল ও সুন্দর, ভাব এমন প্রাণস্পর্শী এবং উপদেশ এমন সারবান্ যে পড়িতে পড়িতে প্রাণ আপনা আপনি ভগবচ্চরণে নত হইয়া প্রেমভক্তিতে অবনত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চায়। এই গ্রন্থ বঙ্গীয় যুবকের ঘরে ঘরে থাকা কর্ত্তব্য।

হিন্দুরঞ্জিকা—১লা ভাদ্র, ১৩০২।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"প্রভাতে উঠিয়া জীবন যেমন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয়, তেমনি প্রভাতে উঠিয়া চিন্তক্ষেত্রেও নানাবিধ চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠে। আমারও হৃদয়ে প্রভাতের উপযোগী যে সকল চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কতকগুলি "প্রভাতী" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।" প্রতিভাবান লেখক ক্ষিতীন্দ্র বাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির ন্যায় "প্রভাতীও" বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে অনেক আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্ব সরল প্রার্থনার ভাষায় যেভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা সচরাচর বিরল।

ঢাকাপ্রকাশ—১৫ই কার্ত্তিক, ১৩০২।

ক্ষিতীন্দ্র বাবু সুপ্তোত্থিত দেশবাসীর সম্মুখে কতকগুলি পবিত্র ভাবনা ধরিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর লেখায় পবিত্রতা আছে। আজকালকার ব্যভিচার যেরূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের আদর বাড়িলে বুঝা যাইবে সমাজের গতি ফিরিবে;

উৎসব—অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

ক্ষিতীনবাবুর ব'য়ের সমালোচনা কর্ত্তে যাওয়া, আমার মত ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলবার আছে—আমারও আছে; তার ওপর 'সম্পাদক মহাশয়ের স্নেহ-আজ্ঞা'—কাজেই দু'কথা বলতেই হ'ল।

"মনুষ্যের জীবন," একটা মস্ত পথ। এ পথের দুধারে গাছ, পালা, লতা, পাতা, বাতাস, পাখীর গান—আবার কাঁটাবন, খানা ডোবা।—ঠিক মত চলতে পাল্লে, এপথে যেতে কোন' কষ্ট বোধ হয় না—বরং সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, পথশ্রম মনে পড়ে না।—আর চোখ বুজিয়ে চল্লে, কাঁটার আঘাত খেয়ে, খানা ডোবায় প'ড়ে ক্ষত বিক্ষত হতে হয়—পথশ্রমও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠে। কাজেই এ পথে চলতে হ'লে—সাবধান হতে হবে।

এই পথ দিয়ে চোখ খুলে ঠিকমত চল্লে—যেমন একদিক দিয়ে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'তে হয়—তেমন আর এক দিক দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের অধিকারীর প্রকৃত ছায়া হৃদয়ে প্রকটিত হয়—

আর চোখ বুজিয়ে গেলে—যেমন একদিক দিয়ে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে পথে পড়ে থাকতে হয়—তেমন আর একদিক দিয়ে তাঁর পুণ্য-মন্দির দূরে প'ড়ে যায়—

ক্ষিতীন বাবু 'প্রভাতীর' সুরে সুরে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুর বেঁধে দিয়ে আমাদের বোজা চোখ খুলে দিয়েছেন—নব জাগরণে উঠে সে পথে চল্‌তে হবে তাঁরই উদ্দেশে। ......অদূরেই তাঁর শান্তি নিকেতন।"

জন্মভূমি—আষাঢ় ১৩৩২।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত; শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১৲।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় নানাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও অধীত বিদ্যা সুব্যক্ত আয়ত্ত করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি জাগিয়া উঠে, তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের উপর নির্ভর করিয়া মন নিশ্চিন্ত হয়, হৃদয় সরস হয়। অধিকন্তু এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভয়াবহ পরধর্ম্ম নহে; বস্তুতঃ তাহা উদার সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই একটি উজ্জ্বল অংশ। পরমহংসদেব বলিতেন যে, সকল ধর্ম্মে শুধু যে সত্য আছে এমন নয়, সকল ধর্ম্মই সত্য। ব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ ইহাও যেমন সত্য, ব্রহ্ম সাকার ও সগুণ ইহাও তেমনি সত্য। এইটুকু উপলব্ধি করিলে ও স্বীকার করিলে হিন্দু ও ব্রাহ্মে কোন গোল থাকে না। গ্রন্থখানি পড়িলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি একটা আকর্ষণ আসিয়া পড়ে, ইহা যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের বিষয় তেমনি গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—আষাঢ় ১৩৩৩।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। "হিতৈষণা গ্রন্থাবলী"র ২৬ সংখ্যক পুস্তক। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, মূল্য ১৷৹।

জীবন-সন্ধ্যার উপযোগী প্রার্থনাবলী। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয়ের প্রাণের আকুতি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসগুলি বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহা সাধারণের বেশ উপভোগ্য। কাগজ ছাপা ভাল।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ ১৩৩৩।

গ্রন্থখানি কয়েকটি সুলিখিত আখ্যায়িকায় অলঙ্কৃত। লেখকের হৃদয়ের পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব বিশদরূপে বহুতর সন্দর্ভে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। সংসারের খুটিনাটি ঘটনা ও বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য হইতে তিনি যে বিশ্বকবির গভীর প্রেমের সন্ধান দিয়াছেন তাহা তত্ত্ব-পিপাসুর নিকট বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

কায়স্থ সমাজ—অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩২।

সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধেই প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও সাহিত্য-কুশলতার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান অভিভাষণে তিনি পূর্ব্ব যশ অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যে সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি জাতীয় উন্নতির ঘোর বিরোধী বলিয়া মনে করেন, তাহাই আবার কাহারও মতে দেশকে শক্তিশালী করিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিলেই ভাল হইত। বক্তা যদিও সাম্প্রদায়িকতাকে কোণঠেসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বাণী অনেকটা ব্রহ্মোপাসক সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতিই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। পরম সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও তিনি সর্ব্বস্থলে উদারতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দুই এক স্থলে ব্যাকরণদুষ্ট পদপ্রয়োগ ও বর্ণাশুদ্ধিও লক্ষ্য হইল।

কায়স্থ সমাজ—চৈত্র ১৩৩৩।

আর্ট ও সাহিত্য—কি করিলে নিজের ও অপরের হিত সাধিত হয়, তাহা সকলেরই বিশেষত শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিশেষ আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার আত্মীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দোষ দেখাইতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। সকল যুবক যদি এইরূপ সৎসাহসের পরিচয় দেন তবে বুঝিব সমাজ ন্যায়ের দিকে জাগিতেছে।

উৎসব—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বাবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০০৯ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮৮। অঞ্জলি—সর্ব্বব্যাপী দেবতা।

১। তুমি আমাদের মনের নিয়ন্তারূপে যখন আমাদের অন্তরতম চিত্তগুহায় অধিষ্ঠিত থাক, তখন রিপুগণ চৌরের ন্যায় লুকাইবার জন্য অন্ধকারাবৃত স্থান অন্বেষণ করে। তোমার চরণে যাঁহারা সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহারা তোমার নামে গানের যে হার রচনা করেন, তাহা তুমি স্নেহ ও প্রীতিসহকারে গ্রহণ কর। তখন সুরলোকবাসী দেবতারাও আমাদের সঙ্গে একতানে তোমার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন।

২। তোমার আবির্ভাবে এই ভূলোক দ্যুলোকে পরিণত হইয়াছে। ভূলোকের যেখানে যে অন্ধকার কোণ ছিল, সমস্তই তোমার জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। পাপ তাপ দুঃখ শোক এখন অবধি এই রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতেছে। মর্ত্ত্য মানবের বাসভূমি স্বর্গরাজ্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি এই মর্ত্ত্যভূমিতে আবির্ভূত না হইলে কর্ম্মযজ্ঞের উদ্ভবই হইত না; মেঘের সৃষ্টিই হইত না, সুতরাং বারিবর্ষণও হইত না। তোমার আবির্ভাব না হইলে ভূধর সাগর, নদ নদী, শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসকল, এসকলের কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে মানুষ কি লইয়া প্রাণ ধারণ করিত?

৩। তুমি সুন্দর—ওহে তুমি বড়ই সুন্দর। জগতের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা তো তোমারই সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র। তুমি বৃহৎ। তুমি এই সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। আমাদের মন যতদূর বিস্তার ধারণ করিতে পারে, তুমি তাহা অপেক্ষাও অনেক দূর ব্যাপ্ত করিয়া আছ। পর্ব্বত সকল হইতে নদী নির্ঝরিণী নিঃসৃত হইয়া যেমন ক্ষেত্রসকলকে উর্ব্বর করিয়া তাহা হইতে শস্যরাজি বাহির করিয়া জীবগণের খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তুমিও সেইরূপ তোমার করুণাধারা বর্ষণ করিয়া তোমার প্রজাগণের প্রয়োজনসকল নিত্য বিধান করিতেছ। তুমি সুখকর ও কল্যাণকর। মনের অপেক্ষাও তুমি বেগবান। তোমার বেগের তুলনা নাই। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তেই এই বিশ্বজগত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমাকে যখন আমরা নেতারূপে লাভ করিয়াছি, তখন শত্রুগণ কর্ত্তৃক আমাদের পরাভব স্বতই পরাভূত হইয়াছে।

৪। ভ্রাতা যেমন সর্ব্বদাই ভগ্নীর কল্যাণ প্রার্থনা করেন, তুমিও সেইরূপ আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলসাধনেই নিরত আছ। তুমি আমাদের বন্ধু, সখা ও সুহৃৎ। শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য আমাদের মন যেমন স্বতই ধাবিত হয়, তুমিও সেইরূপ অমঙ্গল ও পাপ প্রভৃতির স্বতই মৃত্যুমুখে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্ম যখন জগতে পরাহত হইতে থাকে, তখন তুমি রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই অধর্ম্মের নিধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তির ভীষণ তেজ অধর্ম্মের মোহাবিষ্ট লোকেরা একটুও সহ্য করিতে পারে না।

৫। জলের মধ্যেও যেমন অগ্নির তেজ ওতপ্রোত হইয়া আছে, তুমিও সেইরূপ জলের মধ্যে স্নেহরূপে থাকিয়া জীবগণকে স্নিগ্ধ রাখিবার উপায় বিধান করিয়াছ। তুমিই উষাকালে অরুণতপনের ভিতর দিয়া আবির্ভূত হও এবং প্রাণীগণকে জাগ্রত কর। তুমিই দিবসে রৌদ্রের তেজ এবং নিশীথে চন্দ্রমার জ্যোৎস্নাসুধা ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করিয়া শতবিধ ওষধিকে বর্দ্ধিত করিতে থাক; সেই সকল বর্দ্ধিত ওষধির সাহায্যে জীবগণ পুষ্টি লাভ করে। সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ তোমাকে বিশ্বজগতে ওতপ্রোত দেখিতে না পাইয়া মৃত্যুর সহিত খেলা করে; তোমার ভক্তেরা তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিয়া এবং তোমাকে অমৃতস্বরূপ জানিয়া নির্ম্মল আনন্দসাগরে অবগাহন করেন ও নিত্য নবজীবন লাভ করেন।

৮৯। অঞ্জলি—রক্ষক দেবতা।

১। তোমার শক্তি ও কার্য্য বিচিত্র। তোমার জ্ঞান ও প্রকাশ বিচিত্র। তোমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য বিচিত্র। সূর্য্যের প্রকাশে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সকল স্থান প্রভান্বিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তুমি যে মানবের অন্তরে প্রকাশিত হও, তাহার দেহ মন ও আত্মা সকলই উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার তাহার নিকটে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই প্রাণের প্রাণ। তোমারই আদেশে প্রাণবায়ু আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। তোমারই আদেশে প্রাণীগণ আপনাকেও দিয়া সন্তানগণকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকে। তোমারই জ্ঞানজ্যোতিতে আমাদের চিত্ত আলোকিত হইয়া উঠে এবং পাপতাপ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়।

২। তুমিই আমাদিগের রক্ষক। সুদৃঢ় দুর্গ ভেদ করিয়া যেমন শত্রুগণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ তোমার স্নেহপ্রেমে আমরা যখন আচ্ছাদিত থাকি, তখন সমস্ত রিপু মিলিত হইয়াও আমাদের চিত্ত হইতে শান্তি হরণ করিতে পারে না। দূর্ব্বাতৃণ যেমন মাতা ধরণীর বলে বলীয়ান হইয়া অন্যান্য তৃণসকলকে পরাজিত করে, আমরাও সেইরূপ তোমারই বলে দেহ ও মনে বলপ্রাপ্ত হইয়া রিপুগণকে সহজেই পরাজিত করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিরা যেমন অন্তরে তোমাকে উপলব্ধি করিয়া তোমার জয়গান করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ তোমার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া তোমার জয়ধ্বনিতে দ্যুলোক ও ভূলোক মুখরিত করিয়া তুলিতেছি। তুমিই একমাত্র আমাদের সম্ভজনীয়। তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি আমাদের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন কর।

৩। তোমার উপাসকের চিত্ত যেমন নিবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ও স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ তোমার জ্যোতি আমাদের অন্তরে ধ্রুবতারার ন্যায় সর্ব্বদাই জাগ্রত আছে। গৃহলক্ষ্মী যেমন গৃহের সর্ব্বত্র প্রসন্নতা বিকীর্ণ করেন, সেইরূপ তোমার প্রসন্ন মুখের বিমল হাসি আমাদের অন্তরে নিয়তই প্রফুল্লতা সম্পাদন করিতেছে। তুমি অনন্ত। তোমার জ্ঞানবলক্রিয়াও অনন্ত। বিশ্বজগতের শতসহস্রবিধ জ্ঞান ও বলক্রিয়ার ভিতরে তুমিই শতসহস্র প্রকারে প্রকাশ পাইতেছ। আমরা তোমারই আদেশে শ্রেয়-প্রেয়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া পরিণামে শ্রেয় লাভ করিয়াই বিজয়ীর বেশে গৃহে প্রত্যাগমন করি।

৪। শত শত শত্রু তাহাদের যন্ত্র হইতে দীপ্ত গোলকসকল নিক্ষেপ করিয়া যেমন আমাদের ভয় উৎপাদন করে, সেইরূপ তোমার তেজ শতবিধ আকারে আমাদের ভিতর দিয়া বহির্গত হইয়া শত্রুদের সম্মুখীন হয়, তখন শত্রুগণ সন্ত্রস্তচিত্তে পলায়ন করিতে সচেষ্ট হয়। জগতে যাহা কিছু

কল্যাণ, তুমিই সে সমস্তের আকর। তুমিই জীবগণের অন্তরে প্রেম প্রস্ফুটিত কর। তোমারই প্রেম নরনারীর হৃদয়ে কত বিচিত্র খেলা খেলিয়া কি আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করে।

৫। দিবসের শেষে যেমন রাখাল গাভীগণকে গৃহাভিমুখে লইয়া চলে, আমাদের ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইলে তুমিও সেইরূপ আমাদিগকে তোমার গৃহে লইয়া চল। তোমাকে দিবার মত আমরা কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি না। আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহাই নিঃশেষে তোমার চরণে উপহার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। তোমার বিরহেও আমরা ব্যথায় অধীর হইয়া পড়ি, আবার তোমার দর্শনেও আমরা সুখের বেদনায় বিমূঢ় হইয়া যাই। উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা দেবত্বে উন্নীত হইতে থাকি।

নব সাধন।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥

"পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে, যিনি পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না।"

সংসারে থেকে আমরা যে কত আকর্ষণের মধ্যে পড়ি, তার ইয়ত্তা করা যায় না। শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, জীবনের প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা রূপ, নানা গন্ধ, নানা সুর, নানা ছন্দ আমাদিগকে ভুলিয়ে রাখে, কল্পনায় আমরা রাজ্য গঠন করি, কল্পনায় আকাশে উড়িতে থাকি। কখনও মনে করি আমি আমার প্রভু, কর্ত্তা, কখনও মনে করি আমার অভীপ্সিত সব জিনিসই আমি করায়ত্ত করতে পারি, কখনও মনে করি আমার জীবন একেবারে সম্পূর্ণ আমার অধীন। এমনি করে যত মায়া-মরীচিকা আমাদিগকে বিহ্বল করে রাখে। যখন একে একে সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, সংসারের বিকট সত্য এসে আমাদের সামনে তাণ্ডব-নৃত্য করতে থাকে, তখন মনে করি জীবনটা মায়া, এটাকে ছাড়তে পারলেই ভাল, সংসারবিমুখ হয়ে প্রাণ ছুটে যায়—কোন্ অজানা প্রদেশের উদ্দেশে; যেখানে, মনে করি, না আছে দুঃখ, না আছে শোক, না আছে কোন বিভীষিকা। জানি না সংসার ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায় কি না।

অনেক সময় দেখা যায়, যাঁরা সংসার ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা মনুষ্যজীবনের দুর্ব্বলতা পরিহার করতে পারেন নি। মানুষের জীবনের কতকগুলি আবশ্যকীয় কর্ম্ম আছে, যাকে আমরা সহজে এড়াতে পারি না। আমাদের জীবন, শরীর মন ও আত্মার সম্মিলিত শক্তি। মন ও আত্মা অদৃশ্য, কিন্তু তাদের শক্তি শরীরের মধ্যে প্রকাশশীল। সুতরাং এই তিনটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। সমাজ ছাড়লে, সংসার ছাড়লে শরীর ছাড়া যায় না। দেহাতীত অবস্থায় মানুষকে থাকতে দেখা যায় না। রক্ত-মাংসের শরীরকে রক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হয়। সেই চেষ্টা হীন নহে। ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, যখন আমরা দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে সংযত করে আত্মার অধীন করি। আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার পূর্ণ অধিকার। ইন্দ্রিয়গুলি চায় আপন আপন শক্তির উপভোগ—চক্ষু চায় সুরূপ, কর্ণ চায় সুস্বর, নাসিকা চায় সুগন্ধ, জিহ্বা চায় সুস্বাদ, এবং স্পর্শেন্দ্রিয় চায় কোমলতা। প্রতি ইন্দ্রিয় আপনার চরিতার্থতার জন্য ব্যাকুল। ইন্দ্রিয়সুখ-সাধনের জন্য অনেক সময় জীবের কর্ম্মচেষ্টা আরব্ধ হয়। শরীর ও মন ইন্দ্রিয়ের সেবা করতে থাকে। কিন্তু যদি এইরূপ জীবন আত্মার শক্তির দ্বারা নিয়মিত না হয় তাহলে শীঘ্রই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মানুষ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে সুখ মনে ক'রে ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করে; ফল হয়, শরীর ও মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, জীবনপ্রদীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয়। তাই এমন পন্থার অন্বেষণ চাই, যাতে এই দুর্দ্দশায় না পড়তে হয়। তখন হয় নীতি ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

এইরূপে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানুষ অগ্রসর হয় ধর্ম্মের পথে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত শক্তি, সমস্ত বিচার, সমস্ত সাধনা তাকে নিয়ে যায় সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে, অসীমের আকর্ষণে প্রাণ হয়ে যায় ক্রমে অনন্ত বিস্তৃত। সীমাহীন রাজ্যের সন্ধান পেলে আর ক্ষুদ্র সংসার তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। এই যে অনন্তের অনুসন্ধান, এই অসীমের মধ্যে সত্তালাভ—ইহাকেই বলি আত্মোপলব্ধি। যখন দেখি, আমার সমস্ত কাজে, সমস্ত চিন্তায়, অসীম-দেবতার ইচ্ছা ও বিভূতি তখন আমি প্রকৃতপক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করি। আমি ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, ভগবানের প্রেম আমাতে প্রকাশিত, আমার সঙ্গে তাঁর চিরমিলন, চির যোগ—এইরূপ অবস্থা কখন লাভ

হয়? শরীর ও মনের দ্বারা যে পরিচয় পাওয়া যায় তার অতিরিক্ত এমন কিছু আছে যাহা এই পরিচয়কে মিষ্ট করে, সত্য করে।

সত্য অনুসন্ধানই মানুষের ধর্ম্ম। জীবনের প্রতি কাজের মধ্যে, সংসারের বৈচিত্র্যে, প্রকৃতির লীলায় অহর্নিশ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে সত্য বস্তুকে; সে দেখে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে জীবন বাঁধা, আজ এক ধারা জীবনে প্রবাহিত, এক ঘটনাপ্রবাহে যাহা লাভ করছি পরদিন তার বিপরীত। চির পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে মানুষের মন খুঁজে বেড়ায় কোন রীতি, কোন পরম্পরা। যত চিন্তা ও জ্ঞান বৃদ্ধি লাভ করে ততই দেখে বহুর মধ্যে এক, বিচিত্র ঘটনালহরীর মধ্যে এক ইচ্ছা, এক গতি, এক রীতি। এইখানে মিলে যায় বিজ্ঞান ও দর্শন, এইখানে মিলে যায় চিন্তা ও সাধনা। সে কি আনন্দের দিন যেদিন মানুষ আপনার জীবনে একের পরিচয় পেয়েছিল, যেদিন এক তার হৃদয়-মন পরিপূর্ণ করে আপনাকে প্রকাশিত করেছিল! সে প্রকাশ শুদ্ধ জ্ঞানে নয়, সে প্রকাশ হৃদয়ে ও আত্মায়, প্রেমে ও সাধনায়।

সমস্ত চরাচর এক দেবতার মহাশক্তিতে, অনন্ত প্রেমে, বিপুল সৌন্দর্য্যে, অসীম জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও পরিচালিত। প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতি তৃণ, প্রতি দ্রুম, প্রতি জনপদ, প্রতি প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রতি হৃদয়, প্রতি ঘটনা তাঁর পরিচয় দিচ্ছে। ধর্ম্ম এই পরিচয়ের মধ্যে। প্রাণ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনদেবতার চরণপ্রান্তে আপনাকে সমাহিত করে ধন্য হয়, হৃদয়ের পূজা এবং ভক্তি উদ্বেলিত হয়ে জীবন সরস হয়, সাধনা সার্থক হয়। যেমন জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, সত্যানুসন্ধান প্রকৃতিগত, তেমনি পূজার ভাব স্বতই সকল প্রাণ থেকে উৎসারিত হয়ে উঠছে। সকল দেশের নরনারী সর্ব্বকালে এই পূজার জন্য উন্মুখ। আপনাকে দেবতার চরণে অর্পণ না করতে পারলে শান্তি নাই, আরাম নাই। যখন মানুষের জ্ঞান অপরিপূর্ণ থাকে তখন সামনে যাহা পায় তাই তার উপাস্য ও পূজ্য হয়। বৃক্ষ-লতা ও গিরি-নদী প্রভৃতি অনেক সময় মানুষের হৃদয়কে বিস্ময়পূর্ণ করেছে, তাদের ধর্ম্মভাবকে জাগরিত করেছে, তাদের পূজা লাভ করেছে। ক্রমে জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্যোতির সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পূজার বস্তু ভূমার রূপ ধারণ করেছে। ভূমা এক—অনন্ত, প্রকাশ বহু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক। তাঁর প্রকাশে বিশ্ব প্রাণময়। প্রাণময়কে প্রাণে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে জীবন সার্থক হয়। তাঁর সত্য শিব সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্যের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই পূজা কেবল একজনের অধিকার নয়, কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নয়, ইহা সকলের অধিকার। দীনদরিদ্র, রাজাপ্রজা তাঁর পূজার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করছে।

ধর্ম্মসাধনা ব্যক্তিগত বলে অনেকের ধারণা; তাই দেখতে পাওয়া যায়, কত লোকে সংসার ছেড়ে গিয়ে অরণ্যে নির্জ্জন চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। হয় ত তাঁরা শান্তিলাভ করতে পারেন। হয় ত তাঁরা ভূমার আনন্দধারা পান করতে পেরেছেন। সেই আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে তাঁরা আত্মহারা হয়ে আছেন। কিন্তু সমাজ পরিত্যাগ করে যাঁরা গেছেন তাঁরা মঙ্গলময়ের বিচিত্র বিধানের কথা মানুষকে তেমন করে বলতে পারেন না। তাঁদের ব্যক্তিগত সাধনা সমাজের সম্পত্তি নয়। গৌতম বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করে মানুষকে মুক্তির পন্থা দেখালেন। সমাজের মঙ্গলসাধনে জীবন উৎসর্গ করলেন। যিশু সেবা করে মানুষকে সুস্থ সবল করলেন। মহম্মদ জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করে তাঁর স্বদেশবাসীকে কুসংস্কার-মুক্ত করলেন, চৈতন্য হৃদয়দেবতার প্রেমে মত্ত হয়ে মানুষকে মাতিয়ে দিলেন সেই প্রেমে। যে আগুনে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না, জল উত্তপ্ত হয় না, তাকে আগুণ বলিতে পারি না, দাহিকাশক্তিই আগুণ, উত্তাপদানেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি জ্ঞানবিস্তারে, হৃদয়ের উদারতায়, প্রেমের আদান-প্রদানেই ধর্ম্ম। সমস্ত শক্তির বিকাশ না হলে ধর্ম্মসাধনা পূর্ণ নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ পূর্ণ নয়। কেবল জ্ঞান, কিম্বা কেবল প্রেম, কিম্বা কেবল কর্ম্মে মানুষ আপনাকে পূর্ণ মনে করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যেই জীবনের উন্নতি। ভক্তিবিহীন জ্ঞান শুষ্ক, কর্ম্ম বন্ধন; জ্ঞানবিহীন ভক্তি উন্মাদনামাত্র, কর্ম্ম মূল্যহীন আচার; কর্ম্মবিহীন জ্ঞান পুষ্পবিহীন পূজা, জলে না নেমে সন্তরণশিক্ষা। ধর্ম্ম সেইখানে সত্য, যেখানে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সম্মিলন; যেখানে জ্ঞান অনন্ত, প্রেম অপ্রতিহত এবং কর্ম্ম কুণ্ঠা ও সঙ্কোচশূন্য। কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম একদিন ভারতকে আচ্ছন্ন করেছিল। ব্রাহ্মণ সেই কর্ম্মের পুরোহিত। কর্ম্মের বন্ধনে মানুষ আপনার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আচার ও নিষ্ঠার মধ্যে ধর্ম্ম প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল। পরে জ্ঞান বিদ্রোহী হইয়া উঠায় ঔপনিষদ ধর্ম্মের প্রচার হয়। জ্ঞানই সেখানে প্রধান। জ্ঞান ও কর্ম্মকে সম্মিলিত করবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা হল। গীতার শিক্ষার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেই সমন্বয়ের চেষ্টা। পরে ধর্ম্মের মধ্যে প্রেমের প্রবাহ বইল। তাতে হারিয়ে গেল কূলকিনারা। এক একটা তরঙ্গ এসে এক এক দিক ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভক্তির অতিমাত্রায় এল গুরুবাদ, ভক্তের স্বাধীনতা

লোপ। ক্রমে নীতিও মলিনতা লাভ করল। সমাজের মধ্যে এল আবিলতা। সমাজে নবযুগে জ্ঞানের বিস্তৃতি হবার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্মচিন্তা নূতন আকার ধারণ করেছে। নির্জ্জন গুহা থেকে ধর্ম্ম এসেছে লোকালয়ে, নিষ্কাম সাধনা ছেড়ে হয়েছে তাহা সার্ব্বজনীন প্রেমে পরিণত। দুঃখীর দুঃখ দূর করে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়ে, রোগীর শুশ্রূষা করে, দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন করে মানুষের প্রাণ ধন্য হচ্ছে। জীবসেবায় ভগবান আপনার প্রেমকে প্রকাশিত করেন। এই নবসাধনায় সকলের চেষ্টা আবশ্যক। আত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে, সকল বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে প্রকাশিত। শরীরের মধ্যে আত্মা আবদ্ধ নয়, ইহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। একজন মানুষ যখন আর এক জনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়, সেখানে দেখতে পাওয়া যায় অদৃশ্য শক্তির কাজ; শিশুর প্রতি জননীর স্নেহে সেই পবিত্র প্রেমেরই আভাস পাওয়া যায়। সমাজের মধ্যে যদি শ্রদ্ধার ভাব বিস্তৃত হয়, কিংবা স্নেহভালবাসা জয়যুক্ত হয়, যদি শুদ্ধ পবিত্র ভাবসকল অনাহতভাবে প্রকাশ পেতে পায়, তবেই মানুষের ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। বিশ্বদেব মানুষকে যে সমস্ত শক্তি দিয়েছেন, তার সংহতি ব্যতীত তাঁর পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। জ্ঞানে, প্রেমে ও পুণ্যে উন্নতিলাভ জীবনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। সমস্ত কার্য্যে সমবেত চেষ্টা দরকার। জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে জগতের সকলের চেষ্টায়। সকল দেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞানসাধনায় যাহা আবিষ্কৃত হয়, উহা সমাজের সম্পত্তি। বেদে উপনিষদে যা লেখা আছে, প্লেটো-সক্রেটিস যা বলেছিলেন, গ্যালিলিও নিউটন যা আবিষ্কার করেছেন, সে সমস্তই মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে। বর্ত্তমান যুগের সমস্ত দেশের নব নব আবিষ্কার বা নব নব চিন্তা বিশ্বের জ্ঞানসম্পদের ভাণ্ডার পূর্ণ করছে। বার্গসঁ বা অয়কেন কি চিন্তা করলেন বা বার্ট্রাণ্ড রসেল কি ভাবছেন, জগদীশচন্দ্র বা টমসন কি আবিষ্কার করেছেন সমস্ত নিয়ে আমরা জ্ঞানের একত্ব অনুভব করছি. পূর্ব্বপশ্চিমের ভেদাভেদ মিটে গেছে। জ্ঞানে মানুষ এক, প্রাকৃতিক জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতের চিন্তাতেও মানুষ ক্রমে একত্বের দিকে যাচ্ছে। সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত দর্শন, সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এক ধারার প্রবাহ। কালের বিশেষত্ব দেশের বিশেষত্ব ছাড়িয়ে মানুষ গিয়ে পড়ছে এক সাগরের অভিমুখে। বিশেষত্বের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক শক্তিকে পেয়ে আমরা বুঝি ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন। আমরা কোন শাস্ত্রকে বাদ দিতে পারি না, কোন সাধুকে ছাড়তে পারি না, কোন চিন্তাকে অস্বীকার করতে পারি না। যদি কাউকে বাদ দিই কিম্বা অস্বীকার করি, তবে সেখানে আমরা ধর্ম্মের উদার ভাবকে আঘাত করি। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান-য়িহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উত্থান দেশকালের পার্থক্যভেদে। নবযুগে এই পার্থক্যকে ঘুচিয়ে আমাদের যেতে হবে পূর্ণ জ্ঞানের সন্ধানে, পূর্ণ প্রেমের সাধনায়। নরনারী, বৃদ্ধ, শিশু, সকলের সম্মিলিত সাধনায় বিশ্বরাজের অপ্রতিহত শক্তি প্রকাশিত হতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এই নবসাধনার প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র। এখানে আমরা চাই বিশ্বের সব সত্য প্রকাশিত হোক, ইহার দ্বারা বিশ্বের নরনারীর প্রীতি বর্দ্ধিত হোক এবং সকল কর্ম্মে মানুষ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিত অনুভব করুক।

ব্রাহ্মসমাজের শত-বার্ষিক উৎসব সমাগতপ্রায়। এই শত বর্ষের মধ্যে আমাদের সাধনা কতদূর অগ্রসর হয়েছে পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। আমরা কি সত্যের অনুসন্ধানে তৎপর আছি? আমাদের উদারতা দেশ-কালের ব্যবধান ছাড়াতে পেরেছে কি না? আমাদের কর্ম্ম কি শুদ্ধ পবিত্র? কর্ম্মের বন্ধনে পড়ে আমরা আত্মার প্রকৃত পরিচয় কি ভুলে গেছি? মানুষ আমাদের দেখে কি নূতন সাধনার বার্ত্তা পেয়েছে? আজ আমাদের সকলকে এই সব ভাল করে আলোচনা করতে হবে। ব্রাহ্মসমাজে যদি আমরা গতানুগতিকের ন্যায় বিনা চিন্তায় এবং বিনা সাধনায় কতকগুলি কেবল মূল সত্য স্বীকার করি, তাহলেই আমাদের যথেষ্ট হলো না। আমাদের লাভ করতে হবে নূতন শক্তি, জাগতে হবে নূতন চেতনায়। শুধু কতকগুলি মন্দির তৈয়ারী করে দিলে, কিম্বা কয়েকটি অনুষ্ঠান করলে ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয় না। ব্রাহ্মসমাজ যদি আপনার উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তবে সকলকে উন্মুখ থাকতে হবে নূতন সত্যের দিকে, নূতন চিন্তার দিকে, নূতন কর্ম্মপ্রণালীর দিকে, যাতে আমরা বিশ্বের মঙ্গল করতে পারি, এবং নিজেরাও ভগবানের বিভূতি অনুভব করতে পারি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের জ্ঞান, প্রেম এবং কর্ম্মশক্তিকে এই সাধনায় নিযুক্ত করুন।

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঘরের গাড়ী।

তখন তো ট্রামগাড়ী হয় নাই, কাজেই যাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে তিন উপায়ে

যাতায়াত করিতে হইত—ঘরের গাড়ী, ঠিকা গাড়ী অথবা পাল্কী। তখন ঠিকা গাড়ী ও পাল্কীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তখন বড়লোকদের অর্থাৎ ধনীদের ধনবত্তা দেখাইবার অন্যতর প্রধান উপায় ছিল—সকালে সুদৃশ্য জুড়ি অথবা চৌঘুড়ি বা ছয়ঘুড়ি আটঘুড়ি পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ল্যাণ্ডোতে জুতিয়া সহরের দেশীয় পল্লীর মধ্যে নিজে হাঁকাইয়া বেড়ানো ও দুর্গন্ধ বায়ুসেবন এবং একটা সুদৃশ্য ঘোড়া জুতিয়া "পাল্কীগাড়ী" বা "আফিস-ব্রাউন-বেরি" গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে বা আফিসে যাতায়াত। বৈকালে ধনী বাবুরা আবার সুদৃশ্য ওয়েলার জুড়ি জুতিয়া ল্যাণ্ডো ফিটন বা অন্য কোন প্রকার মাথাখোলা গাড়ীতে গঙ্গার ধারের রাস্তায় "হাওয়া খাইয়া", পরে, বিলাতী ব্যাণ্ড বুঝুন বা নাই বুঝুন ইডেন গার্ডেনের ধারে গাড়ী রাখিয়া তাহাতেই বাজনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। সেকালে বাঙ্গালী বাবুরা গোরাদের ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিতেন, কারণ সেইভাবেই তাঁহাদের অধিকাংশই গৃহে পিতামাতার নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। তখন গোরাদের অত্যাচারও কিছু বেশী মাত্রায় দেখা যাইত। গোরার ভয়ে বাবুরা ইডেন গার্ডেনের অন্তত সম্মুখের দিকে নামিতে সাহস করিতেন না—ধুতি-চাদর পরিয়া নামিলেই হয় গোরাদের হাতে, আর না হয় তো ইংরাজ কনষ্টেবলদের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতে হইত।

যাই হোক, বাবুদের দৌলতে সেকালে কত রকমেরই গাড়ী যে বিলাত হইতে আমদানী হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না—ল্যাণ্ডো, ফিটন, বগি, ল্যাণ্ডোলেট, দশঘুকরে ব্রাউনবেরি, ব্যারুষ ইত্যাদি। আজকাল সে সমস্ত গাড়ীও বেশী দেখা যায় না, আর তাহার নামও শোনা যায় না। উচ্চ দরের ডাক্তার বা জজ প্রভৃতি, যাঁহারা আপনাদের গাম্ভীর্য্যগৌরব বাহিরে বজায় রাখিতে প্রচলিত রীতি অনুসারে বাধ্য হইতেন—ভিতরে তাঁহারা যতই কেন মদ-মাতাল বা হল্লাবাজ হৌন না,—তাঁহারাই সাধারণত "ব্রুহাম" (Brougham) গাড়ী ব্যবহার করিতেন। ব্রুহাম গাড়ীর আরোহীদিগকে দেখিলে সকলের মনে একটা মহা "সমীহ" ভাব জাগিয়া উঠিত—মনে হইত, না জানি, আরোহী হাইকোর্টের কোন্ জজ বা মেডিকেল কলেজের কোন্ বড় ডাক্তার। আজকাল মোটর গাড়ীর কল্যাণে ঘরের গাড়ীর আর সে মাহাত্ম্য নাই—সে বৈচিত্র্যও দেখা যায় না। এখন মোটর গাড়ী না রাখিলে ধনীর "বড়মানষি" বা ধনবত্তা দেখানো হয় না। আবার Ford সাহেবের কল্যাণে কিছুদিন বাদে বোধ হয় মোটর গাড়ীই বল, আর এরোপ্লেনই বল, এ সমস্ত রাখিয়াও ধনীদিগের বড়মানুষী দেখানো সম্ভব হইবে না।

বড়মানুষীর পরিচয়।

গাড়ীঘোড়ার ভিতর দিয়া সেকালের বড়লোকদের বড়মানুষী দেখাইবার বেশ একটা মজার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারা নিজেরা, বিশেষত তাঁহাদের ছেলেপিলেরা, স্কুলে বা আফিসে হয় ঘরের গাড়ীতে যাইতেন, আর কোন কারণে কোন দিন ঘরের গাড়ী ব্যবহারের অসুবিধা হইলে Second class বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকা গাড়ীতে চড়িতেন না, তাঁহারা Third class বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই চড়িতেন। আমরা দেখিতাম, একমাত্র —র বাড়ী হইতেই যাঁহারা ঠিকা গাড়ী ব্যবহারে বাধ্য হইতেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীরই গাড়ী ব্যবহার করিতেন—সে সময়ে প্রথম শ্রেণীর ঠিকা গাড়ীর নামও কেহ জানিত না। এই প্রথা যে কি প্রকারে প্রচলিত হইল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। শুনিতাম, সেকালের ধনী সুবর্ণবণিকদের নিকট হইতে এই প্রথা আসিয়াছিল। আমরা বাল্যকালে বহুকাল যাবৎ দেখিয়াছি যে, খুব ধনী লোকেরাও রেলগাড়ীতেও কি জানি কেন তৃতীয় শ্রেণীতেই যাতায়াত করিতেন। ধনী লোকদিগের মধ্যশ্রেণী (inter class) ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবহার আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ক্রমশ আসিয়াছে। সম্ভবত সেকালে গোরা সৈনিক ও ইংরাজেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদ্র দেশীয় আরোহীদের উপর সাধারণত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেন এবং মধ্য শ্রেণীতে নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গিরাও দেশীয়দের উপর যে ব্যবহার করিত, তাহার হস্ত এড়াইতে গিয়া এই প্রথার উৎপত্তি হয়।

খাসগেলাস।

সেকালের ধনী সুবর্ণবণিক সমাজ হইতে শুনিয়াছি, বড়মানুষী দেখাইবার অন্তত আরও একটী রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। শোনা যায়, বীরু মল্লিক বিবাহের জনযাত্রায় (procession) সর্ব্বপ্রথম খাসগেলাস প্রবর্ত্তিত করেন। খাসগেলাসগুলি গেলাসের আকারে অভ্রের দ্বারা প্রস্তুত হইত; তাহাতে মোমবাতি বসাইবার ব্যবস্থা থাকিত। সেকালের মোমবাতি আসল তিমিমাছের চর্ব্বি হইতে প্রস্তুত হইত—।৵৹ আনায় ১৬টী বাতির এক প্যাকেট পাওয়া যাইত। ক্রমে সহসা দেখা গেল যে, Shaw Wallace কোম্পানি তাঁহাদের বর্ম্মা প্রদেশস্থিত কেরোসিন তৈলের ডিপো হইতে এক রকম নকল মোমের প্রস্তুত বাতি আমদানি করিতে লাগিলেন। সেগুলির দাম হইল ।৹ চার আনায় এক প্যাকেট; দরিদ্র

ভারতবাসী সস্তা দেখিয়াই তাহাই গ্রহণ করিল, আসল চর্ব্বির বাতি অল্প দিনের মধ্যেই উঠিয়া গেল।

বরের চতুর্দ্দোলার দুই পার্শ্বে প্রায় আধপোয়া রাস্তা ধরিয়া খাসগেলাসের ঝাড় চলিত। সেই সময়ে রাস্তার বেকার ছোকরাগুলি বড়ই কাজে আসিত। যিনি যত বড় ধনী, তিনি তাঁহার সাধ্যমত তত বেশীদূর খাসগেলা-সের ঝাড় চলাইবার ব্যবস্থা করিতেন। বর যখন কন্যার বাড়ী পৌছিতেন, তখন ঐ সকল খাসগেলাসবাহক ছোকরাগণ যে যেদিকে পারিত, ঐ সমস্ত আধ-পোড়া বাতিশুদ্ধ খাসগেলাসের ঝাড় লইয়া পলায়ন করিত—এইরূপ হট্টগোল সহকারে পলায়ন বলিতে গেলে বিবাহের অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। হঠাৎ শোনা গেল যে, ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার পুত্রের বিবাহে বাঁধা রোসনাইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঁধা রোসনাইয়ের কথা কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই। বাঁধা রোসনাইয়ের ব্যাপারটা এই—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী হইল দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীটের পশ্চিম শেষাংশে; কন্যাপক্ষের বাড়ী হইল রামবাগানের কাছাকাছি; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় আধ ক্রোশ; কালীকৃষ্ণ ঠাকুর করিলেন—বাহকদের স্কন্ধে যে সমস্ত খাসগেলাসের ঝাড় যাইবার তাহা তো গেলই; উপরন্তু তাঁহার বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে গ্যাসের আলোর দুইটী লম্বা লাইন বসিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, এই বাঁধা রোসনাই ব্যাপারে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। আজকাল মোটরের আঘাতে যেমন ঠিকাগাড়ী ও পাল্কীর অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ অ্যাসিটিলিন গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক আলোর ধাক্কায় খাসগেলাস কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে।

পাল্কী।

ঠিকা গাড়ীর বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে সেকালের অন্যতর বাহন পাল্কী সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা যাহা মনে আসিতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। পাল্কী শব্দের ব্যুৎপত্তি কি অথবা পাল্কী সর্ব্বপ্রথম কোথা হইতে আমদানি হইল, সে সমস্তের গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিবার ভার আমা অপেক্ষা যোগ্যতর অন্য কোন ব্যক্তির স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলাম।

আমার মনে পড়ে, সর্ব্বপ্রথম যখন নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন একটা কালো ঘোড়া-জোতা পাল্কী-গাড়ীতে গিয়াছিলাম। গাড়ী চড়িয়া স্কুলে গিয়াছিলাম, সে আনন্দ হৃদয়ে ধরিত না। কিছুদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হইল—পাল্কী করিয়া স্কুলে যাইতে হইবে। সে আরও মজা লাগিল। "ধাক্‌কুনাবড় হেঁইয়া নাবড়" এই ছন্দের বুলি শুনিতে শুনিতে স্কুলে যাতায়াত হইত—পাল্কী-বেহারাদিগের বুলির প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলিতাম —"ধাক্‌কুনাবড় হেঁইয়া নাবড়"।

সাধারণত ৪ জন বাহক পাল্কী কাঁধে করিয়া লইয়া চলিত। আশ্চর্য্য এই যে, জীবনের এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উড়িয়া ভিন্ন অপর কোন জাতির ব্যক্তিকে কলি-কাতায় পাল্কী কাঁধে করিতে দেখিলাম না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, পাল্কী বহন করিতে তাহাদের কষ্ট হওয়া দূরে থাক, তাহারা যেন এই কার্য্যে আনন্দলাভ করিত। ইহার কারণ মনে হয় এই যে, তখন উড়িষ্যায় কথায় কথায় বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি লাগিয়াই ছিল; দারিদ্র্যের করাল বিভীষিকা উড়িষ্যাবাসীকে যেন সর্ব্ব-দাই ঘিরিয়া থাকিত। তাই পাল্কী বহিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, ইহাতেই তাহাদের আনন্দ। এখন বুঝিতেছি যে, উড়িয়াদের মধ্যে গৌড় বাউরি প্রভৃতি দুই-চার জাতি আছে, যাহারা একমাত্র পাল্কী বহনের অধিকারী —অপর কোন জাতির কেহ পাল্কী বহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জাতি যাইবে। সেকালে আমরা অতশত জানি-তাম না—উড়িয়ামাত্রকেই "দাস" বা "দাসপুয়া" অর্থাৎ দাসপুত্র বলিয়া জানিতাম এবং মনে করিতাম যে, প্রধানত পাল্কী বহনের জন্যই উহাদের জন্ম। এখন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে এবং পাল্কীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে তাহারা "ডকে" "জেটিতে" এবং বড়বাজারের মালামাল লওয়ালওয়ির কাজে লাগিয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে দেখিতে পাতলা হইলেও ইহাদের সহ্যশক্তি আশ্চর্য্য। এই সকল কার্য্যে পাল্কী বহা অপেক্ষা রোজ-গারও অনেক বেশী করিতেছে। পাল্কীবহা ব্যতীত ইহারা পূর্ব্বে মাথায় করিয়া মোট বহিত, কাজেই খুব বেশী বোঝা বহিতে পারিত না। কিন্তু এখন রেল-ষ্টেশনের কুলিদের দেখাদেখি একপ্রকার হাতগাড়ি ব্যবহার করে, তাহাতে তিনজন লোক আবশ্যক হইলেও —একজন লোক সম্মুখের দুইটা হাতল ধরে, আর দুইজন লোক পিছন হইতে ঠেলিতে থাকে—তিনজন লোকের উপযুক্ত বোঝা অপেক্ষা অনেক বেশী বোঝা লইয়া যাইতে পারে। জেসপ কোম্পানিই সর্ব্বপ্রথম এই হাত-গাড়ি বাজারে প্রচলিত করেন। এই হাতগাড়ীর দৌলতে উড়িয়াগণ গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করে, কারণ ইহারা জানে যে, আবশ্যক হইলে ঘোড়ার সম্মুখে এই হাতগাড়ি ধরিলে ঘোড়াগাড়ী থামিতে বাধ্য হইবে। ইহারা ভয় করে মহিষের গাড়ী এবং ট্রামগাড়ীকে এবং এই উভয় হইতে সর্ব্বদাই যথাসাধ্য দূরে থাকে।

সেকালে পাল্কী দাঁড়াইবার স্থান কর্পোরেশন তেমন

কিছু ঠিক করিয়া দেয় নাই। পাল্কীবাহকেরা যেখানে বাসা করিয়া থাকিত, সেই বাসার কাছেই কর্পোরেশন "Palanquin Stand" বলিয়া একটা কাঠের খোঁটা মারিয়া দিত এবং কাছাকাছি যে পাল্কীর আড়া বা আড্ডা আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ঐ বাহকেরাই হয় তো একখানি পাল্কী ঐ খোঁটার পার্শ্বে রাখিয়া দিত। কাহারও পাল্কী দরকার হইলে সেই পাল্কীর কাছে গিয়া—"বেহারা, দাসপো" ইত্যাদি আহ্বানে চীৎকার করিতে করিতেই আড়া হইতে সুখনিদ্রিত বেহারাগণ চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে সাড়া দিয়া উঠিত। অনেক সময়ে দেখা যাইত যে দুই-একজন বাহক কোথাও গিয়াছে, তাহাদের মন্দগতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেককে অনেক সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। সেকালে পাল্কীর ব্যবহার বেশী থাকার কারণে আড়াও অনেকগুলি ছিল। এক জোড়াসাঁকো অঞ্চলেই আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি তিন চারিটি আড়া দেখিতাম। সেই সমস্ত আড়ায় বেহারারা অর্থাৎ বাহকেরা সকলেই প্রায় আমাদের জমিদারির প্রজা ছিল। ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত clannish—এক স্থানের লোকেরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া যতদূর সম্ভব এক আড়ায় থাকিবে, এক দলে কাজ করিবে ইত্যাদি। দু'দশ বৎসর পরে কিন্তু যখন আর একবার বাধ্য হইয়া পাল্কী চড়িয়া স্কুলে গিয়াছিলাম, তখন স্কুলের ছেলেরা বড়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল—তখন সভ্যতার সুর বদলাইয়া গিয়াছে। আমরাও অগত্যা পাল্কী ছাড়িয়া পায়ের গাড়ীতেই স্কুলে যাইতে লাগিলাম।

সেকালে পাল্কী প্রধানত (১) অল্পবেতনের অনেক কেরাণীবাবু আফিসের যাতায়াত কার্য্যে ব্যবহার করিতেন, আর (২) মহিলাদিগের যাতায়াতের জন্য পাল্কীর ব্যবহার অনিবার্য্য ছিল। দুই পা চলিতে গেলেই পাল্কীই মহিলাদিগের একমাত্র অবলম্বন ছিল বলিলেও চলে। আমাদের বাড়ীর সীমানার ভিতরেও এবাড়ী ওবাড়ী অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের বাড়ী হইতে তাঁহার ভাই গিরীন্দ্রনাথের বাড়ী যাতায়াত করিতে গেলেও পাল্কী ব্যতীত হাঁটিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল—পদব্রজে যাইলে সম্ভ্রমের হানি হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। পাল্কী বাড়ীর ভিতরের বা অন্তঃপুরের ফটকে রাখা হইত। পাল্কীতে যিনি চড়িবেন, তিনি তো চড়িলেন; তাহার পর পাল্কীর উভয় পার্শ্বের দরজা বন্ধ করা হইল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত করা হইল। বালিসের যেমন "খোল" সেইরূপ পাল্কীর "খোল" হইল ঘেরাটোপ—সেটী ধনীর ধনবত্তার পরিমাণ অনুসারে বিচিত্র বস্ত্রখণ্ডসমূহে নির্ম্মিত করিয়া তাহাকে কতকটা সুদৃশ্য করিবার অন্তত চেষ্টা করা হইত! ঘেরাটোপের উদ্দেশ্য এই যে, বাহিরের লোক মহিলাকে দেখিতে পাইবে না, এবং মহিলাও বাহিরের লোককে দেখিতে পাইবেন না। সঙ্গে একটী পরিচারিকা একখানি সুপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিয়া—পুরাতন দাসী হইলে সাধারণত কোন ক্রিয়াকর্ম্মে প্রাপ্ত একখানি তসরের সাড়ী পরিয়া—এক পার্শ্বে ছুটিয়া চলিবে; অপর পার্শ্বে বাড়ীর কোন পুরাতন চাকর যথোপযুক্ত বেশপরিহিত হইয়া ছুটিয়া চলিবে; এবং পাল্কীর সম্মুখে চুড়িদার পায়জামা ও চাপকানপরিহিত ও চাপরাশধারী এক পুরাতন দ্বারবান মাথায় তকমাবিশিষ্ট শামলা পাগড়ী পরিয়া অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া চলিবে। এত কাণ্ডের পর তবে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষিত হইল বলিয়া বিবেচিত হইত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই সমস্তের মূলে স্ত্রীজাতির আত্মরক্ষার ক্ষমতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস লুক্কায়িত ছিল। মূলে যাহাই থাক, ঘেরাটোপে বন্ধ হইয়া মহিলাদিগের যাতায়াতের অসঙ্গত প্রথা তখন প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, গাজিপুরে যাইবার পথে দেখি, সেখানেও এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শুনিলাম, সেখানে পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল না; কিন্তু বঙ্গমহিলারাই নাকি এই প্রথা প্রচলিত করাতে এখন মাড়োয়ারী প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ঐপ্রকার ঘেরাটোপে বন্ধ পাল্কীতে চড়িয়া না গেলে মহিলাদের সম্ভ্রমে আঘাত পড়ে! গাজিপুরের ভিতরে মহিলারা পদব্রজে এপাড়া ওপাড়া বেড়াইলে সম্ভ্রমের হানি হইবে না, কিন্তু দিলদারনগর ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাটে গিয়া ষ্টীমারে উঠিবার জন্য যে আধপোয়া রাস্তা বালির চর ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে, সেইটুকু রাস্তা ঘেরাটোপে মোড়া, অন্তত শুধু পাল্কীতেও চড়িয়া না গেলে মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট হইবে—ইতি সিদ্ধান্ত!

পাল্কীচড়ার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে হইলে মফঃস্বলে আসিতে হয়—যেখানে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সুদীর্ঘ পথ পাল্কীবেহারারা একই অবোধ্য পদ সমস্বরে আওড়াইতে আওড়াইতে তোমাকে লইয়া যাইবে, বিশেষত যেখানে জ্যোৎস্নানিশীথে রাত্রিকালেও তোমায় চলিতে হইবে। একবার আমাকে নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে মহানদীর সুতপ্ত সুপ্রশস্ত বালুচর ভেদ করিয়া পাল্কীতে যাইতে হইয়াছিল—চতুর্দ্দিক সুনিস্তব্ধ—সুদূরে গরুগুলি চরিতেছে—বেহারাদিগের সমস্বরে উচ্চারিত পদগুলি সেই নিস্তব্ধতাকে যেন আরও নিস্তব্ধতর করিয়া তুলিতেছিল! সে যে কি আনন্দ ও আরাম পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আর একবার বাল্যকালে যখন

সর্ব্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে যাই. তখন আমরা ষ্টেশন হইতে পাল্কী করিয়া গিয়াছিলাম। আমরা তিন ভাই তিনটী পাল্কীতে যাইতেছি। চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, অন্ধকার রাত্রি—জ্যোৎস্নাবিহীন ; বেহারারা লইয়া চলিয়াছে—মুখে তাহাদের একটীমাত্র বুলি—"হিন্ তাল্ —হিন্ তাল্"—উড়িয়াদের মত বিবিধপ্রকারের বুলি নয়। তাহাদের বুকের ভিতর হইতে সেই শব্দ বহির্গত হইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—আজও সেই চিত্র আমার সম্মুখে অনেক সময়ে সুমধুর আকারে উপস্থিত হয়।

সদাচারের মূলে সদ্ভাব।

(জনৈক শিক্ষক)

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের সঙ্গে ছাত্রদিগকে যে প্রকার ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, অথবা গৃহে বা সমাজে বালকবালিকাদিগকে পরস্পরের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যবহার "সদাচার" বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সেগুলি conventionality বা প্রথারূপে দাঁড়াইয়া যায়। ছেলেদের তদনুসারে ক্রমাগত চলিতে বলায় সেগুলি উঁহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, এমন পরিবার খুব অল্পই আছে, যে পরিবারে, কার্য্যে না হইলেও অন্তত উপদেশে, সদাচার শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছেলেদিগকে জানিতে দেওয়া উচিত যে, কোন্ ব্যবহারগুলিকে সদাচার বলা হয়।

সাধারণত প্রচলিত সদাচারের উপর শিক্ষকেরাও প্রয়োজনমত অন্যান্য ব্যবহারকে সংযোগ করিয়া দিতে পারেন। বিশেষত আহারাদির সময়ে বা পূজাদির নিমন্ত্রণে যে সকল সদাচার রক্ষা করিতে হয়, সেগুলি সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন একটী ফল ছুরি দ্বারা কাটিলাম—কাটিয়া সেই ছুরি দ্বারা তাহা খাইলাম। কিন্তু এটী সদাচার হইল না—এটী অসভ্যতা। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, ঐরূপ করিতে থাকিলে কখন্ যে জিহ্বাদি কাটিয়া যাইতে পারে তাহার ঠিকানা নাই। সেইরূপ পূজা-উপাসনার সময়ে কথা কহিতে নাই, গোলমাল করিতে নাই—করিলে অভদ্রতা হইবে, ভদ্রোচিত আচার হইবে না ; কারণ এই যে, উপাসনার সময় মন স্থির করিতে হয়। মন স্থির করিবার জন্য নীরবতা ও নির্জ্জনতা আবশ্যক—গোলমাল করিলে ঐ নীরব ও নির্জ্জনভাব নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার সদাচারের ব্যতিরেকস্থল যে নাই, তাহা নহে। একবার ইংলণ্ডের রাজকুমার অ্যালবার্টের সঙ্গে এক কৃষক আহারাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আহারাদি করিতে করিতে কৃষক ছুরি দিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। বিলাতে চামচ ও কাঁটা দ্বারা সাধারণত লোকে খায়—ছুরি দ্বারা খাওয়া বড়ই অসভ্যতা। কৃষক নিজগৃহে ছুরি দিয়া খাইত বলিয়াই রাজকুমারের সঙ্গে আহারে বসিয়াও ছুরি দ্বারা খাওয়া যে অসভ্যতা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণও কৃষকের দিকে হাঁ করিয়া চাহিতে লাগিল। কিন্তু পাছে সেই কৃষক ঐরূপ একদৃষ্টে চাহনির কারণে অসোয়াস্তি বোধ করে, সেই কারণে রাজকুমারও ছুরির সাহায্যে খাইতে লাগিলেন। ছুরি দিয়া খাওয়া অভদ্রতা হইলেও এক্ষেত্রে রাজকুমারের কার্য্য ভদ্রজনোচিতই হইয়াছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না—রাজকুমারের ঐপ্রকার আচরণের মূল হইল "সহানুভূতির ত্বরিত গতি"। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সদাচারের মূলে সদ্ভাব।

সদাচারে অভ্যস্ত হইতে চাহিলে, অপরের মনে কি ভাব হয়, কোন্ কার্য্যকে অন্যেরা কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহা অনুভব করিবার অভ্যাস চর্চ্চা করিতে হয়। ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তাহারা যে সকল আচারব্যবহারকে সদাচার বলিয়া জানে, অনেক সময়ে তাহারা সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না কেন? সম্ভবত, তাহারা একটী প্রধান কারণ বলিবে যে, তাহারা "ভুলিয়া যায়"। ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে ভুলিয়া যাইবার প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহারা অপরের মনে কোন্ কথা ভাল লাগে বা খারাপ লাগে, তাহার দিকে কোনই দৃষ্টি না দিয়া কেবল নিজের যাহাতে ভাল লাগে তাহাই করিতে চায়। হয়তো একজনের নিকট কোন জিনিস লইতে হইবে ; "দয়া করে ঐ জিনিসটা দিন" বলিলে সেই লোকটীও সন্তুষ্ট হয়, এবং সমুচিত ভদ্রতাও রক্ষিত হয় ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদি বলা যায়—"ঐ জিনিসটা দাও হে"—ইহা অভদ্রের মত কথা হইয়া গেল। মনে কর, একজনের বাড়ী গিয়াছি—সেখানে গিয়া এ দরজা খুলিতেছি, ও দরজা খুলিতেছি, এ জিনিসে হাত দিতেছি, ওজিনিসে হাত দিতেছি—এগুলি অভদ্রের মত কাজ হইল। অপরের বাড়ী গিয়া, তাহার মালিক যে জিনিস যে ভাবে রাখেন, সেইভাবে সেই জিনিস থাকিতে দেওয়া উচিত, তাহার উল্টাপাল্টা করা উচিত নয়—ইহাই হইল সভ্যতাভব্যতা। এই সদাচারের মূলে কি? বাইবেলে এই ভাবের একটী কথা আছে যে, "তুমি তোমার নিজের প্রতি অন্য লোকের যে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিবে, অপরের প্রতি তোমারও সেই প্রকার আচরণ করা কর্ত্তব্য।" আমরা বলিতে পারি যে, এই প্রকার সদ্ভাবই সদাচারের মূল।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক এচ্-এচ্ কুাইলটার (H. H.

Quilter) শিশুদিগের জন্য লিখিত তাঁহার "সম্মুখে ও ঊর্দ্ধে" (Onward and Upward) নামক একখানি গ্রন্থে অপরের স্থলে নিজেকে বসাইবার অত্যাবশ্যক অভ্যাস আমাদের চরিত্রের উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে তদ্বিষয়ে একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মনে কর, দুইটী কুকুর এক কসাইয়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত—তন্মধ্যে একটী বেশ চুকচুকে ও সযত্নলালিত, তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নভোজনের আশায় গৃহে ফিরিতেছে; অপরটী ক্ষুধার্ত্ত, অযত্নে শীর্ণ-দেহ কুত্তা—তাহার কোথাও আহার্য্য পাইবার আশা নাই। কসাইটী সহসা একখানি হাড় রাস্তার মাঝে ছুড়িয়া ফেলিল। প্রথমোক্ত "বীর" কুকুরটী তড়াক্ দৌড়িয়া তাহা উঠাইয়া লইল, তখন অনশনশীর্ণ দ্বিতীয় "চোর"কুত্তা ঈর্ষান্বিতচিত্তে হতাশদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে লাগিল। "এইটী হইল প্রথম চিত্র; এইবার আর একটী চিত্র দেখিব।" দুইজন লোক পল্লীগ্রামের এক রাস্তার এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত—দেখে যে একটী সোণার মোহর পড়িয়া আছে। ঐ দুইজনের মধ্যে একজন হইতেছে যুবক, শক্তিশালী এবং মধ্যবিত্ত; অপর ব্যক্তি হইতেছে বৃদ্ধ ও দরিদ্র। উভয়েই মোহরটী দেখিল। যুবক বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাই ঐ মোহরটী দেখিবামাত্র তাহার মনে হইল যে, এই মোহরের বিনিময়ে অনেকগুলি নিজের ইচ্ছামত পুস্তক কিনিতে পারিবে। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাহার মনে হইল যে, ঐ মোহরটী বৃদ্ধলোক পাইলে তাহার আরও কত বেশী উপকারে আসিতে পারে—তাহার নিজের অপেক্ষা ঐ দারিদ্র্যের পাষাণভার-গ্রস্ত বৃদ্ধ ইহা পাইলে তাহার কত অভাব দূর হইতে পারে। এই প্রকার সাত-পাঁচ ভাবিয়া যুবকটী বৃদ্ধকে বলিল—"দেখ বন্ধু, এখানে তোমার উপকারে আসিতে পারে, এমন একটী জিনিস পড়িয়া আছে"; ইহা বলিয়া যথাপূর্ব্বং আনন্দের সহিত শীষ দিতে দিতে চলিতে লাগিল। "বীর" কুকুরটী কেবল নিজের সুখ, নিজের ক্ষুধার বিষয়ই ভাবিতে পারিয়াছিল; তাহার মনে, অপর কুকুরটী যে ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে পারে, সে কথাই মনে আসিল না। "সে তাহার নিজের বিষয়ই অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ঐ যুবক ছাত্রটী নিজের বিষয় ভাবিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অপরের বিষয়ও চিন্তা করিতে বিস্মৃত হয় নাই।"

বিদেশীয়দিগের প্রতি, দুর্ব্বল ও অঙ্গহীনের প্রতি এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার সদাচার গণ্য হইবে। অপরের বিষয় চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার শক্তির নাম হইল সহানুভূতি। এই সহানুভূতিই হইল সদাচারের মূল—ইহাকে বর্দ্ধিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। খুব ছোট ছোট শিশুরা অনেক সময়ে দেখায়, তাহারা যাহা, তাহা যেন তাহারা নয়;—অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা অপরের হইয়া অভিনয় করে—দেখায় যেন, তাহারা অপর কেহ। তিন বৎসর চার বৎসরের শিশুকে সৈনিক হইয়া খেলা করিতে দেখিয়াছি—এক আধ মিনিট নয়; দিনের পর দিন গিয়াছে, তবু তাহার ঐ প্রকার খেলাতে অরুচি ধরে নাই। রাত্রে শুইবার সময় সে কিছুতেই তাহার সৈনিক-পরিচ্ছদ খুলিবে না। তাহার মুখের বলি হইতেছে—"আমি গোরা সৈনিক, আমি এখানে পাহারা দিব।"

যাক; আমাদের কল্পনাকে এই প্রকার উড়িয়া চলিতে দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু সময়ে সময়ে একটু চেষ্টা-চরিত্র করিয়া কল্পনার সাহায্যে অপরের স্থলে নিজেকে দাঁড় করাইয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

ছেলেদিগকে বলিলে মন্দ হয় না যে, তাহারা নিজেকে বিদেশীয় মনে করুক। তাহাদের দিকে লোকেরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, অথবা তাহাদিগের উদ্দেশে লোকেরা হাসিতামাসা করিতেছে, ইহা তাহারা নিশ্চয়ই পছন্দ করিবে না; বরঞ্চ তাহারা তাহাদের মনোগত ভাব বুঝাইতে অক্ষম হইলে অপর কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। ইহার ফলে তাহারা বুঝিবে যে, বিদেশে গেলে তাহারা তদ্দেশবাসীর নিকটে যে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিবে, বিদেশীয়-গণ সেইরূপ আমাদের দেশে আসিলে তাহাদের প্রতি আমাদেরও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই যে বিদেশ হইতে আসিয়া নানা ব্যক্তি উদরান্ন সংস্থানের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিস বিক্রয় করে, তাহাদিগকে নানাপ্রকার অপমান অত্যাচার করিয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন নিতান্তই অকর্ত্তব্য। তাহাদের মনের ভিতর প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবারই প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক, বীর নেলসনের জীবনীলেখক সাদে (Southey) একটী নিগ্রো বালকের বিষয় বলিয়াছেন। যে বিদ্যালয়ে সাদে পড়িতে যাইতেন, সেই বিদ্যালয়ের নিকটেই ঐ বালকটী বাস করিত। ঐ বালকটীকে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা "কেলে ভূত" বলিয়া দিনরাত্রি উত্যক্ত করিয়া মারিত। একদিন সাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলিবার জুতা ভাঙ্গিয়া গেল; তখন ঐ নিগ্রো বালক তাহার নিজের জুতাযোড়াটী সাদেকে দিল। সাদে যখন পরে নিগ্রো বালককে সেই জুতা যোড়াটী ফেরত দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তখন সে সাশ্রুনয়নে সাদেকে বলিল—"অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আর "কেলে ভূত" বলিবেন না।" ইহার পূর্ব্বে সাদে অনুভবই করিতে পারেন নাই যে, নিগ্রো বালককে

ঐ ডাকনাম দিয়া কি কষ্টই দিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি নিজেকে ঐ নিগ্রো বালকের স্থানে স্থাপন না করায় উহার মনের ভাব বুঝিতেই পারেন নাই।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ছোট ছেলেরা রাস্তায় অন্ধ, খঞ্জ, পাগল প্রভৃতিকে লইয়া বড়ই আলাতন করে; সময়ে সময়ে যথেষ্ট নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। কিন্তু তাহারা যদি সেই সকল ব্যক্তির স্থলে আপনাদিগকে কল্পনার সাহায্যে সংস্থাপিত করে, তাহা হইলে তাহারা কিছুতেই ঐ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই প্রকারে সদাচারে অভ্যস্ত হইলেই তাহারা গোলমাল, অথবা কলরব করিতে বিরত থাকিবে; যাহাকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, তাহাকে সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে ইত্যাদি। বড় বড় বিষয়ের ন্যায় ছোট-খাটো বিষয়েও প্রথমাবধি সদাচার শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক বালকের অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য।

শঙ্কা।

(ব্রহ্মসঙ্গীত—স্বরলিপি সহ)

বেহাগ—চৌতাল।

নাথ প্রেমচন্দ্র ডাকি হে ব্যাকুল চিতে
শঙ্কা বড় জাগিছে প্রাণে
দেখ হে দুঃখ ঘিরিছে।
বিপদনাশন রক্ষা কর
কল্যাণঘন শোকহর
দুঃখহরণ কৃপা-আগার
তব চরণ ধরিছি॥

দশদিশি উঠি' বেজে
বিজয়-বারতা সুশীতল
করে চিত-শতদল—
যত ভয় মরিছে।
এসো পরাণবন্ধু আজি
কাটি' শোক প্রাণমাঝে—
পুরাও মহান আশা—
এই দীন মাগিছে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

\+ • ২ • ৩ ৪ +
I র্সা -া। না ধপা। -মা -গা। মগা পা। মা গা। -ঃ -রঃ সা I সঃ ন্যঃ।
না • • থ • • প্রে • ম চ • • ন্দ্র ডা কি

• ২ • ৩ ৪ + •
। পা না। -সাঃ পঃ। পা -া। মা গা। -া মসা I সা -া। গাঃ রঃ।
• হে • ব্যা কু • ল চি • তে • শ • ঙ্কা •

২ • ৩ ৪ + • ২
। সা সা। পা পা। পা না। -নর্সা না I -া ননা। না র্সা। -া না।
ব ড় জা গি ছে প্রা • • ণে • দেখ হে দু • ঃখ

• ৩ ৪
। -ধপপা -া। -মা -গঃ মঃ। পা -না I
ঘি • • • • রি ছে •

\+ • ২ • ৩ ৪ +
[র্সা র্গা]
I { পা পা। পা না। না না। র্সা -া। র্সা -া। র্সা র্সা I পর্সা -া।
বি প দ না শ ন র • ক্ষা • ক র ক •

০ ২ ০ ৩ ৪
। র্সা র্সা । র্সঃ -নরঃ র্সা । না -পা । পা (পনা । -ধর্সা না) } I ধপা ।
ন্যা ণ ধ • • ন শো • ক হ • • • র হ

৪ + ০ ২ ০ ৩ ৪
। -মা গা I মগা রঃ । সা গা । গা মা । পা পা । পা না । ধনর্সা না I
• র দু • ঃখ হ র ণ কৃ পা আ গা • • র

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I -া না । না র্সা । র্সা না । -ধপপা -া । -মা -গঃ মঃ । পা -না I
• ত ব চ র ণ ধ • • • • রি ছি •

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ +
I সা সা । -া পা । -া পা । পা -া । পা ধপা I -মা গা I গা গা ।
দ শ • দি • শি উ • ঠি' বে • জে বি জ

০ ২ ০ ৩ ৪ + ০
। মা পা । নঃ -ধঃ না । র্সা না । পা ধপা । -মা গা I গঃ গাঃ । -া গা ।
য় বা য় • ভা সু শী • ত • ল ক রে • চি

২ [গা] ০ ৩ ৪ + ০ ২
। -মঃ -পঃ মা । গঃ গাঃ । -া রসা । -া সা I সা ন্‌া । -প্‌া ন্‌া । -সা সা ।
• • ত শ ত • দ • • ল ধ ত • ভ • র

০ ৩ ৪
। গা -মঃ পঃ । মা গা । -ঃ -রঃ -সসা I
ম • • রি ছে • • • •

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ + ০
[র্সা র্গা । র্গর্রা র্রর্সা]
I পা পা । পা না । -া না । র্সা -া । র্সা র্রর্সা । -া র্সা I র্সা -া । র্সা র্সা ।
এ সো প য় • ণ ব • ন্ধু আ • • জি কা • টি' শো

২ ০ ৩ ৪ ৪ +
। -নর্রা র্সা । না -পা । পা (পনা । -ধর্সা না) } I ধপা । মা গা I গা -া ।
• • ক প্রা • ণ মা • • • ঝে মা • ঝে • পু •

০ ২ ০ ৩ ৪ + ০
। সা গা । -াঃ মঃ । পা -নঃ -ধঃ । না র্সা । -া র্সা I -া ননা । না র্সা ।
রা ও • ম হা • • ন আ • শা • এ • ই দী

২ ০ ৩ ৪
। -া না । ধপপা -া । -মা -গঃ মঃ । পা না II
• ন মা • • • • পি ছে •

———•———

বর্ষা।

নব বর্ষা।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আষাঢ় মাসের তরুণ বয়সে রৌদ্রতাপে দিগ্‌বিদিক্‌ সমুজ্জ্বলিত। হা জল! হা জল! করিয়া জীবগণের শুষ্ককণ্ঠ অধিকতর শুষ্ক হইতেছে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল,—লতাপল্লব মৃতপ্রায় অবসন্ন ও নতশির হইয়া পড়িল, দিঙ্‌মণ্ডল ধূমময় হইল। ঘরে বাহিরে সমান তাপ মনুষ্যের কপোলদেশ দগ্ধ করিতেছে। অদ্যাপি বর্ষা নাই। কি হইল এই রবে ধরা পূর্ণ হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড বায়ু স্তম্ভিত হইল; পক্ষিসবে নীরবে উন্মুখীন হইয়া বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিল। ক্রমে পশ্চিম দিক্‌ ছায়াময় হইল। প্রবাহিনীর পরপারে একখানি সুন্দর শ্যামল নবীন মেঘ অল্পে অল্পে আকাশের পশ্চিমাঞ্চল আবরণ করিল। বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত ইন্দ্রধনু আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভায় নয়ন রঞ্জন করিতে লাগিল। প্রাণিমাত্রে গগনের এই অনুপম লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে সমুৎসুক। নির্যাতনকারী প্রখর রবি সলজ্জ হইয়া মেঘের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন; এখন বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল গাঢ় মেঘে পরিব্যাপ্ত হইল। চাতকিনী সহর্ষ মনে মেঘের ক্রোড়ে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঈশ্বরপ্রেমী সাধুব্যক্তি পূর্ব্বকথা স্মরণপূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মোহান্ধ ব্যক্তির অজ্ঞানের মধ্যেও এক একটি সাধুভাব যেমন শোভা পায়, তেমনি তরুন জলধরের শ্যামল অঙ্গে শুভ্র বকাবলী এক্ষণে সুন্দর দেখাইতেছে। কোন অপরিচিত দেশে ব্রহ্মমন্দির দেখিলে ব্রহ্মপরায়ণের হৃদয় যেমন নৃত্য করে, তেমনি নীরদসমাগমে ময়ুর-ময়ুরী পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। ক্রমে প্রতীহারী হিমানিল সমাগত বৃষ্টিধারার সন্দেশ আনিয়া দিল। বহুদিন বিরহের পর অভিন্নহৃদয় পুণ্যাত্মারা পরস্পর আলিঙ্গনে যেমন তৃপ্তাঙ্গ হয়েন, তেমনি তাপিতদেহে শীতসমীরণ স্পর্শ করাতে প্রাণীসবে শীতল হইল। অনেকদিন পরে কাদম্বিনী মেদিনীসন্দর্শনে পুলকিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল; মেদিনীও যেন উচ্ছ্বাস দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। অদ্য বজ্রনিনাদশ্রবণে চন্দ্র-তারকারা ভীত হইয়া যেন আকাশপথে সমুদিত হইল না। অন্ধকার রজনীর ভীষণ আশ্চর্য্য ভাবে হৃদয় আচম্বিত হইতেছে। পাপাসক্ত হৃদয়াকাশ যেমন মোহতিমিরান্ধ, অদ্য সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে জগৎসংসার তেমনি অঞ্জনময় আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি করুণাময় পরমেশ্বর বিপন্ন পথিকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়াছেন; দুর্ব্বৃত্ত মূঢ়ের অন্তরেও তিনি যেমন এক একবার স্বীয় জ্যোতি প্রেরণ করেন, তেমনি কনকলতিকা-সদৃশ বিজলীদল এক-একবার চারিদিক চমকিত করিয়া তাহার পথে আলোক দিতেছে। সাংসারিক প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইলে সাধু সরলহৃদয় সভয়ে যে প্রকার সেই পরমমাতার আশ্রয়ে নিলীন হন, সেইরূপ বজ্রধ্বনিতে বিকম্পমান শিশুগণ আতঙ্কে জননীর ক্রোড়ে লুকায়িত হইতেছে। ভক্তের হৃদয়ধামে অবিচ্ছেদে যেমন ঈশ্বরের করুণামৃত বর্ষিত হইতে থাকে, তেমনি শ্রবণমনোহর সুশীতল বারিধারায় ধরাতল সিক্ত হইতেছে। ভেকের মকমক রবে জনগণের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। প্রচণ্ড মারুত মহাবেগে সৌধশিখরে আঘাত করিতেছে। বিষয়ীরা আশ্রমসুখে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রায় রত। ভক্তজনও নিশ্চিন্ত হইয়া বিরলে সেই পরম সুহৃদের সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। যাঁহার আদেশে বীভৎস দাবানল উৎকট বজ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতে পারে, যাঁহার আদেশে এক পলকে মহাবর্ষণে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল যাইতে পারে, তাঁহার শরণ ছাড়িয়া কোথায় পরিত্রাণ পাইবে? হে করুণার সাগর! এই পঞ্চভূতের বিষম সংগ্রামের মধ্যে এই আশ্রমতলে আমি তোমারই গুণগান করিতেছি, তুমি নির্জ্জন কুটীরে অবতীর্ণ হইয়া আশা পূর্ণ কর। আমি যাহা দেখি, আর যে তোমা ছাড়া কিছুই দেখিতে পাই না; সকল শব্দে তোমার স্বর ভিন্ন কিছুই শুনিতে পাই না। প্রভো! এমন নির্জ্জন এমন নিশ্চিন্ত স্থান আর পাইব না; যদি কৃপা করিয়া এই কাঙালের হৃদয়ে আসিয়াছ তবে আর তোমাকে ছাড়িব না। আমি আজন্ম কেবল তোমারি নির্জ্জন সহবাসের অনুরাগী। নাথ! এই বর্ষার সমাগমে আমি বুঝিয়াছিলাম আজ আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হইবে, নবীন মেঘোদয়ে তোমারি উদয় অনুভব করিয়াছিলাম। বারিবর্ষণে তোমার অমৃতবর্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি, আবার বিদ্যুল্লতায় তোমারই নিরুপম সুন্দর জ্যোতি দেখিতেছি। নাথ! আজ চতুর্দ্দিকের ভীষণ গম্ভীর নিনাদের মধ্যে একাকী তোমার সঙ্গে নিবাতকম্পিত শান্তিসলিলে ভাসিতেছি, নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তোমার স্নেহলেপিত বাহুর আলিঙ্গনে নিলীন রহিয়াছি।

ভরা বর্ষা।

প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ নিদাঘকাল বর্ষার সমাগমে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর ভীষণ আশ্চর্য্য ভাবে হৃদয় আচম্বিত হইতেছে। ঘননীল মেঘাবলী আকাশের

সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া আছে। নিবিড় অন্ধকার যেন জগৎকে অঞ্জনময় করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কনকলতিকা সদৃশ বিজলিদল চমকিত হইতেছে; কড়কড় বজ্রধ্বনিতে মেদিনী বিকম্পমানা; শিশুগণ আতঙ্কে জননীর ক্রোড়ে লুকায়িত হইতেছে। শ্রবণমনোহর শন্‌শন্‌ রবে সুশীতল বারিধারা ধরাতল সিক্ত করিতেছে। ভুজঙ্গের ত্রিবক্রগতি অবলম্বন করিয়া নীরস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। পূর্ণকলেবর স্রোতস্বতী কূলস্থিত মহোচ্চ পাদপসকল উৎপাটন করিয়া প্রবলবেগে সাগরসঙ্গমে গিয়া মিলিত হইতেছে,—যেমন দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মপরায়ণ সাধুব্যক্তি কোন বাধা না মানিয়া সংসারের প্রতিকূলে ঈশ্বরসমীপে চলিয়া যান। ভেকগণ সরসীতটে মকমক্‌ শব্দে প্রাণীগণের নিদ্রাকর্ষণ করিতেছে। বর্ষা বিদ্যুৎ মেঘ বজ্র পর্ব্বতের অচল অঙ্গে বিষম বলে আঘাত করিলেও উন্নত গিরি বিপন্ন সাধুব্যক্তির ন্যায় সকলি তুচ্ছ করিয়া অবিচ্ছেদে মুক্তবায়ু উপভোগ করিতে দণ্ডায়মান। আবার অদূরে ভূতলে কি ভয়ানক শব্দ হইল! বুঝি প্রতিবাসীর অট্টালিকা ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে পরাজিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ভরা বরষার এই অচন্দ্রতারকা গভীরা যামিনী প্রলয়কালের হৃদ্বিকারক ভাব অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দেয়। এক্ষণে কোন্‌ অসাড় হৃদয় সেই "ভয়ানাং ভয়ং" পরমেশ্বরের চরণে শরণাগত না হয়; কাহার কণ্ঠ না বিনীত ভাবে কহিতে থাকে "হে ভগবন্‌! বুঝিলাম তোমার সহিত বিরোধ করিয়া কোথাও নিস্তার নাই, উৎকট বজ্র, ভীষণ দাবানলে তোমার আদেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতে পারে—তোমার আদেশে এক পলকে ত্রিলোক মহাবর্ষণে উপপ্লাবিত হইতে পারে; পঞ্চভূত তোমার আজ্ঞাধীন দাস।"

দেখিতে দেখিতে প্রাতঃকাল সমাগত হইলে উষাদেবী আজ নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। পূর্ব্বদিক তরুণ ভানুর অভ্যুদয়ে আজ আর রক্তবস্ত্র পরিধান করিল না। প্রকৃতি, মেঘের অবগুণ্ঠনে আজি অপূর্ব্ব শোভায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন। লতাপল্লব সকলি নয়নমুগ্ধকর নবীন হরিদ্বর্ণে শ্রীবন্ত হইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রণত হইতেছে; বায়সগণ কা—কা রবে আর্দ্র পক্ষ ধুন্বন করত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। বিস্তৃত প্রান্তর অপার সাগরসমান জলে ভাসিতেছে; প্রকাণ্ড মৎস্য উল্লম্ফনের পর অগাধ জলরাশির মধ্যে আবার নিমজ্জন করিতেছে। লোধ্র অর্জ্জুন যূথিকা প্রভৃতি চারিদিকে পুষ্পকুমারীগণ মেঘের সহিত হাস্যক্রীড়া করিতে রত। কদম্বস্পর্শী কাদম্বিনী মণিময় বিতানের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বৃক্ষতলে ময়ূর ময়ূরী কেকারবে গুহাগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া নৃত্যসুখে মত্ত। নদীর দুই পার্শ্বস্থিত কাছাড় কেতকীপুষ্পের সৌরভচ্ছটায় আমোদিত। মধ্যে মধ্যে তটপ্রপাতে সরিতের হৃদয় বিদারিত হইতেছে। এই সময়ে এক একবার সূর্য্য উদয় হইয়া ঘননীল মেঘেও অগৌণস্নাতা প্রকৃতির অঙ্গে কিরণ বর্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য ছটা বিস্তার করিতেছে। এমন কালে সকলি অনুকূল। এ সময় মানবহৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দসুখে নিমগ্ন না হইয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে যে কত ভাব হৃদয়কে প্লাবিত করে তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিবে। প্রতি ঘটনার প্রতি পরিবর্ত্তনে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত করিবার প্রশস্ত সময়। বিধাতঃ! আশ্চর্য্য তোমার কান্তি, মহৎ তোমার অধিকার; আমি এই পৃথিবীতে তোমার মহিমা দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইলাম। তুমি আমার স্তম্ভিত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া শান্তিবারি বর্ষণ কর পুনর্ব্বার তোমার কাছে এই প্রার্থনা।*

প্রেমের বন্ধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহাধনী আমি রয়েছি সুখে
প্রাসাদের পরে;
নাহি হেথা যেন দুখের লেশ
বাহিরে অন্তরে।

উঠে শোন ঐ ক্রন্দন নিয়ত—
শুধু হাহাকার
দূর-দূরান্তরে পল্লীর মাঝে;—
কিছু নাহি আর—
দিবানিশি জাগে
শুধু হাহাকার!

যাহাদের তরে রয়েছি বেঁচে
সুখের সন্তান;
যাহাদের শ্রমে রয়েছে জেগে
কবিতার প্রাণ;
কভু যদি আসে কাতর স্বর
তাহাদের হতে,
শুনিব না তা'—যদি পশে তাহা
শ্রবণের পথে—
হোক দূর হতে?

তাদের কেন বাসিব না ভাল?—
ভাই নহে তারা?
তাদের অশ্রু মুছাব না কেন?—
বন্ধু নহে তারা?

* এই প্রবন্ধ ১৭৮৫ শকে লিখিত (পুণ্য)।

চন্দ্র সূর্য্য উঠি' ঢালিছে প্রেম ;
অনন্ত তারকা দিতেছে প্রেম ;
ঋতু বর্ষ যায় প্রেম রাখিয়া ;
ফুল ফুটে উঠি' পড়ে ঝরিয়া—
যৌবনের প্রেম দেয় রাখিয়া ;
নদী গেয়ে গেয়ে সাগরে ধায়,
প্রেমের সুবাস রাখিয়া যায় ;

এরা যদি প্রেম পারে গো দিতে,
পারিব না আমি ?
এরা যদি বিশ্ব পারে ডাকিতে,
ডাকিব না আমি ?

তাদের আমি হৃদয়ে রাখিব ;
প্রাণেতে রাখি' নয়ন মুছাব ;
মুছায়ে আঁখি কাহিনী শুনিব ;
তাঁরি নামে যত দুঃখ ঘুচাব ;—
আমি তা'রা হব,
তা'রা আমি হবে ;
আমি বিশ্ব হব,
বিশ্ব আমি হবে।

মহাদেব যেন রহিব ভোর
প্রেম পান ক'রে—
বিশ্বে আমাতে পড়িবে বন্ধন
অদ্বিতীয় ডোরে।

অরূপের রূপ।

(২)

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

জগতপিতার সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া মানবসন্তান অসামান্য সুন্দর রূপ ধারণ করিল। নরনারী পরস্পরের মুখের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইল। কি জানি, বিধাতা মানবের মুখশ্রীতে কি দিব্য সুষমা ঢালিয়া দিলেন যে, একজন অপরের জন্য একেবারে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইল। একজন অপরের বিচ্ছেদে প্রাণদান করিল। রূপের আগুণে পুড়িয়া সৌন্দর্য্যালোলুপ মানব অঙ্গারের ন্যায় মলিন হইয়া গেল—ভস্মের ন্যায় অপদার্থ হইয়া গেল। প্রজ্জ্বলিত হুতাশন না জানি কি কবিতার ভাষায় কত সাদরে পতঙ্গকে ডাকে, তাই পতঙ্গ আর দূরে থাকিতে পারে না—অস্থির হইয়া হুতাশনের অনন্ত রূপরাশিতে পড়িয়া পুড়িয়া মরে। রূপের আহ্বানের কাছে জীবের প্রাণ তুচ্ছ হইয়া যায়। সিন্ধুজলে হিমাংশুর চঞ্চল প্রতিবিম্বে সৌন্দর্য্য-বিভোর চৈতন্যদেব কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া এমনই অচৈতন্য হইলেন যে, সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিবার জন্য আত্মজ্ঞান হারাইলেন—ক্ষীণ পতঙ্গের ন্যায় সেই অনন্ত রূপসাগরে লাফাইয়া পড়িলেন—দেখিতে দেখিতে ধরিতে ধরিতে কোথায়—কোথায়—কোথায় তলাইয়া গেলেন। এই ঝম্পপ্রদানে, এই প্রাণদানে কত যে শান্তি—কত যে তৃপ্তি তাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। কাননবাসিনী জনকনন্দিনীর তপস্বিনীরূপে স্বর্ণলঙ্কাপুরীর বীরচূড়ামণি দশানন কি অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন যে, সেই সৌন্দর্য্যরূপিণী পাবকশিখায় স্বর্ণপুরী আলোকিত করিতে গিয়া তাহা চির অন্ধকারে বিলীন করিয়া দিলেন। স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

ব্রহ্ম নিজের স্বরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন বলিয়াই আমরা যে দিকে তাকাই সেই দিকেই অপরূপ রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়ি। এই বিশ্বের প্রতি অনুপরমাণু সুন্দর। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—এমন সাজান-গোছান—এমন ধৌতপরিমার্জ্জিত বিশ্ব আর দ্বিতীয় নাই। বায়ু বিশ্বনাথের এই মহা প্রাঙ্গণকে প্রতিদিন পরিষ্কার করে, এবং আকাশের বারিধারা মাঝে মাঝে ইহাকে ধৌত করিয়া দেয়; শিশিরবিন্দু শান্তিজল ছিটায়, নব দূর্ব্বাদল আসন বিছায়, তরুলতা পুষ্প-পত্রে সাজায়। এই প্রাকৃতিক শোভার কোলে কত শত যোগী ঋষি যে সেই পরম পুরুষের স্বরূপচিন্তায় সমাধি-মগ্ন হইয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই প্রাণারামের চিন্তায় কত বাল্মীকি যে মৃত্তিকাস্তূপে ডুবিয়া গেলেন তাহা বলা যায় না। এই সৌন্দর্য্যকে দেখিবার জন্য ধরিবার জন্য সম্ভোগ করিবার জন্য কত সাধক যে পর্ব্বতের অঙ্গে মিশিয়া পাষাণ হইয়া গেলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রাণের উপরে মায়া থাকিলে—প্রাণদানে কৃপণতা করিলে—কেহ কোনও দিকে চাহিও না, কেহ কাহারও রূপ দেখিও না, কেহ কাহাকেও ভালবাসিও না। অশ্রুধারায় ভাসিবার সাধ না থাকিলে কেহ চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাহারও সৌন্দর্য্য দেখিও না, কাঁদিবার ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কাহারও পানে চাহিও না, হারাইবার ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কিছু কুড়াইতে যাইও না। এই সৃষ্টির কোন সৌন্দর্য্য চিরদিন এক স্থানে থাকে না। আকাশে পূর্ণচন্দ্র একদিকে উদয় হইয়া অপর দিকে

অস্ত যায়—হৃদয়াকাশে হৃদয়েশ্বর এক পথ দিয়া আসিয়া অন্য পথে পলায়ন করেন। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন—"ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে, যখন তোমারে পাই দেখিতে; যেন হারাই হারাই, সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।"

প্রকৃতির এই নবীন রূপরাশি, এই সৃষ্টিকে চির মনোহারিণী করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে প্রকৃতি সদাই সুন্দরী। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে, শীতে ও বসন্তে প্রকৃতি নিয়তই লাবণ্যময়ী। এত রূপ কোথায় কোন্ অরূপে লুকান ছিল তাহা কে জানে! এত বর্ণ কোথায় কোন্ অবর্ণে বিলীন ছিল তাহা কে বুঝে! রক্ত, পীত, শ্বেত, হরিত প্রভৃতি পত্রে পুষ্পে প্রকৃতি যথার্থই অতুলনীয়া। পৃথিবী যে বিবিধ বর্ণের অমূল্য রূপসম্পত্তি পাইল, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি কেহই তাহা পাইল না। প্রকৃতির এই অনিন্দ্য দিব্য কান্তি প্রকৃতিপতি পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যেরই ছায়ামাত্র। কল্লোলিনী কূলে, বিটপীর মূলে, লতা-বিতানে, নিকুঞ্জকুটীরে সমস্ত প্রকৃতিতে তাঁহারই সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইয়া আছে।

এই রোগ-শোক-জরামৃত্যুসঙ্কুল ভবসংসারে, এই ত্রিতাপদগ্ধ দুর্ব্বল মানবপরিবারে সৌন্দর্য্য না থাকিলে কেহই বাস করিতে পারিত না। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী প্রকৃতির চন্দ্র-সূর্য্য লতাপাতা ছাড়িয়া ক্রমে মানবপরিবারের শ্রী-সম্পদরূপে গৃহে গৃহে আসন পাতিলেন। প্রতি গৃহ হইতে এই গৃহদেবতার পূজার মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্যের পূজা, সম্পদের পূজা, ধন-ধান্যের পূজা হয় না, এমন সংসার দেশে বোধ হয় একটীও নাই। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান সকলেই বসন-ভূষণে, ধন-ধান্যে, স্বর্ণ-রজতে নিজ নিজ গৃহে এই দেবীর পদচিহ্ন অঙ্কিত করিলেন। বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ যখন অলঙ্কার ও সুন্দর শুভ্র বসন পরিয়া একত্র দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহাদের রূপে ঘর আলোকিত হইল, তাঁহাদের আনন্দমাখা হাসিতে গৃহের নিরানন্দ ভাব পলাইল। আকাশে শোভা আছে, উদ্ভিদ্‌রাজ্যে সৌন্দর্য্য আছে, আর জ্ঞানে ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল মানবসংসারে সৌন্দর্য্য নাই, একথা কে বলিতে পারে! মানবের মুখের মধুর হাসি দেবতা ভিন্ন আর কাহারও মুখে নাই। মানবনয়নের প্রেমভরা বিশ্ব-মাতান কমনীয় চাহনিতে ঈশ্বরেরই সুমঙ্গল দৃষ্টির ছায়া দৃষ্ট হয়। মানবের সুপ্রশস্ত ললাট-ফলকের উজ্জ্বল প্রতিভাভাতি, দেবমূর্ত্তি ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে না। মানব, প্রকৃতির আকাশ-পাতাল, নদ-নদী সমুদ্র, বন-উপবন সকলেরই ছবি আঁকিয়া আপনার গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিল—গৃহ প্রাচীর সজ্জিত করিল। প্রকৃতি কিন্তু আপনার পত্রে ফলে, ফুলে জলে, কোথাও মানবের সুন্দর ছবি কিছুতেই আঁকিতে পারিল না। এইখানেই মানবশিল্প প্রকৃতির শক্তিকে হারাইয়া দিল। মানবজ্ঞান বিজ্ঞানের বলে, বুদ্ধিকৌশলে প্রকৃতির উপরে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-কথা প্রকৃতি নিজ মুখে বর্ণিতে পারিল না, কিন্তু মানবের রূপ-লাবণ্যের ব্যাখ্যা মানব নিজেই গদ্যে পদ্যে ও সঙ্গীতে কত ভাবেই না প্রকাশ করিল। সরোবরে কত পদ্মিনী ফুটিয়াছে ও শুকাইয়াছে, তাহার কোন ইতিকথা উহারা কেহই লিখিয়া রাখে নাই; কিন্তু চিতোরের শতদলপদ্মরূপিণী পদ্মিনী মানবের ইতিহাসে লিখিত হইয়া চিরদিন নব নব সৌন্দর্য্যচিত্র ফুটাইতেছেন। নীলাম্বরতলে কত জ্যোতিষ্ক কত হাসি হাসিয়া কোন্ দিকে কোথায় ডুবিয়াছে সে সকলের কথা কোনও জ্যোতিষ্কই লিখিয়া রাখিতে পারে নাই, কিন্তু উত্তরকোশলের রাজলক্ষ্মী জনক-দুহিতার দিব্য কান্তি পৃথ্বীতলে ডুবিয়া গেলেও অমর কবি বাল্মীকির অমৃতময়ী লেখনী তাঁহাকে চিরদিনই উর্দ্ধে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভারতাকাশের সে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরদিনই হাসিয়া বেড়াইবে—কখনই ডুবিবে না। মানবের হাতে লেখনী আছে, সে সব কথাই লিখিয়া রাখিতে পারে। মানবের হাতে তুলিকা আছে, সে সব ছবিই আঁকিয়া রাখিতে পারে। এই জন্যই মানব প্রকৃতির অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াও শেষে প্রকৃতির উপরে উঠিয়াছে।

মহাভারতীয় যুদ্ধের তারিখনির্ণয়*।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

আজ পর্য্যন্ত অনেক পণ্ডিতই মহাভারতীয় যুদ্ধের তারিখ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এখনও ঐ বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতটাই সর্ব্ববাদসম্মত হয় নাই। তারিখ নির্ণয়ের ভিতর দুইটী জিনিস রহিয়াছে,—কোন্ অব্দে উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং কোন্ মাসের কোন্ তারিখে উহা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। সম্প্রতি আমি বৎসর নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া মাস ও তারিখ নির্ণয়ের দিকেই আমার অভিমত প্রকাশ করিব। গীতাজয়ন্তী উৎসব সম্পাদনের জন্য বৎসর অপেক্ষা তারিখটাই অধিকতর প্রয়োজনীয়; কারণ যুদ্ধ যে বৎসরই সংঘটিত হউক না কেন, উহাতে বার্ষিক গীতা উৎসব

* শ্রীযুক্ত জে, এস, করণ্ডিকার, বি-এ, এল, এল, বি, লিখিত প্রবন্ধের শ্রীপঞ্চানন রায় কৃত অনুবাদ।—বৈদিক ম্যাগাজিন হইতে উদ্ধৃত।

সম্পাদনের কোন ব্যাঘাতই ঘটিবে না, কিন্তু উহার জন্য দিনটাই সর্ব্বস্ব, এবং গীতামণ্ডল প্রতি বৎসর উক্ত উৎসব সম্পাদনের ভার লওয়া অবধি, কোন্ বিশেষ দিনে উহা সমগ্র ভারতে সম্পাদিত হইতে পারে, ইহা ঠিক করাই বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ মহাযুদ্ধারম্ভের তারিখ ঠিক করা, বৎসর ঠিক করা অপেক্ষা অধিকতর সহজ; কারণ প্রথমোক্ত বিষয়ে আমাদিগকে মহাভারতের আভ্যন্তরিক প্রমাণসমূহের বাহিরে যাইতে হয় না, অপরপক্ষে দ্বিতীয় বিষয়টী স্বভাবতই নানাবিধ বাহ্য প্রমাণসাপেক্ষ, এবং উহা হইতে অসংখ্য বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। যে দিনে যুদ্ধারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট গীতাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বৎসর ছাড়িয়া দিয়া কেবল সেই দিনটী নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে শুধু মহাভারতের মাত্র একাংশের কতকগুলি শ্লোকের উপর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক শ্লোকগুলিও পরস্পর অনুকূল নহে, সুতরাং তাহাদের কতকগুলিকে হয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া একেবারেই বাদ দেওয়া দরকার, নচেৎ তাহাদের পরস্পর-বিরুদ্ধতা দূর করিবার জন্য পাঠান্তর করা কিংবা অত্যাবশ্যক পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার্থ অভিনব ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এখন পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই এরূপ কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে সমর্থ হন নাই, যাহা আপাতপ্রাপ্ত অন্য কতকগুলি শ্লোক দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। অতএব এমন কতকগুলি শ্লোক আবিষ্কারে প্রত্যেক পণ্ডিতেরই সকল বুদ্ধি নিয়োগ করা আবশ্যক, যেগুলি কিছুতেই প্রক্ষিপ্ত গণ্য হইতে পারে না; তাহার পর তাঁহারা অবশিষ্ট শ্লোকগুলির পাঠান্তর কিংবা নূতন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিয়া, ঐ অপ্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সহিত উহাদের অসামঞ্জস্য দূর করিবার চেষ্টা করেন।

এই বিচারপদ্ধতি অনুসারে চলিয়া মহাভারত মহাযুদ্ধারম্ভের দিন সম্বন্ধে কি বলিতেছে, দেখা যাউক। সৌভাগ্যবশতঃ যুদ্ধারম্ভের মাস সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। প্রত্যেক পণ্ডিতই অগ্রহায়ণ মাসেই সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া একপ্রকার স্বীকার করেন; কিন্তু মতের মিল এইখানেই শেষ হইয়াছে। মন্দ্রদেশীয় পণ্ডিত ভেলাণ্ডি আয়ার কার্ত্তিকের শেষদিনকেই যুদ্ধের প্রথম দিন বলিয়া স্বীকার করেন। নাগপুরের শ্রীযুক্ত দফ্তরি মহাশয় অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনকেই যুদ্ধারম্ভের দিন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই মতবাদের কোন একটীকে স্বীকার করিলে, চতুর্দ্দশ দিনের রাত্রির যে যুদ্ধে ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছিল, উহা প্রত্যক্ষভাবে তাহার বিরুদ্ধে যায়। সেই রাত্রির উদীয়মান চন্দ্রের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, ঐ রাত্রি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশম রাত্রি হইবে। অতএব স্বয়ং মহাভারতেরই এতগুলি শ্লোকের সহিত অসামঞ্জস্যহেতু ঐ দুই পণ্ডিতের মতবাদকে পরিহার করিয়া আমরা মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্ধর প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের অধিকাংশ কর্তৃক স্বীকৃত মতবাদে আসিয়া পড়ি। এই পণ্ডিতগণ অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশ দিনকেই যুদ্ধারম্ভের দিন বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের মতের প্রমাণস্বরূপে নিম্নোক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করেন:—

"চত্বারিংশদ্ দিনান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥"

শল্যপর্ব্ব ৩৪।৬

এই শ্লোক অনুসারে তাঁহারা শ্রবণা নক্ষত্রকেই যুদ্ধের শেষদিনের নক্ষত্র ধরেন, এবং উহা হইতে পশ্চাতে অষ্টাদশ দিন গণনা করিয়া মৃগনক্ষত্রে উপস্থিত হন। ঐ নক্ষত্র সাধারণতঃ অগ্রহায়ণের চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ দিনে পড়ে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত হইতে বহুবিধ অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিক ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ, আমরা অগ্রহায়ণের চতুর্দ্দশ কিংবা পঞ্চদশ দিনকেই যদি যুদ্ধারম্ভের দিন বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে ঘটোৎকচের নিশীথ আক্রমণের পরে চন্দ্রের উদয় মহাভারতের বর্ণনার সহিত মিল খায় না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের অষ্টাদশ দিন অগ্রহায়ণের শেষদিনে না পড়িয়া পৌষের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে পড়ে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির কোন যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না।

"মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত"।

ভীষ্ম, অঃ ১৭-২

"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি"॥

অনু, ১৬৭, ২৭।২৮

"উষিত্বা শর্ব্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে।
সময়ং কৌরবাগ্র্যস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ॥
স নির্য্যযৌ গজপুরাদ্ যাজকৈঃ প[illegible]ঃ।
দৃষ্ট্বা নিবৃত্তমাদিত্যং প্রবৃত্তং চোত্তরা[illegible]ম্॥"

অনু, ১৬৭, ৫।৬

এই উদ্ধৃতাংশগুলির প্রথমটীতে বলা হইয়াছে যে, যেদিন যুদ্ধারম্ভ হয় সেদিন চন্দ্র "মঘাবিষয়গ" ছিল। এই "মঘাবিষয়গ" শব্দের রোহিণী কিংবা মৃগ অর্থ করিবার জন্য টীকাকারগণ তাঁহাদের সমস্ত বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু কোন প্রকারেই "মঘাবিষয়গ"

শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। আরও, দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, তাঁহাদের কেহই "মাঘো হি সমনুপ্রাপ্তঃ" চরণের স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত অর্থ করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত "অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ" এবং সেইপ্রকার "উষিত্বা শর্ব্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে" শ্লোকাংশ দুইটীরও এরূপ কোন অর্থ দিতে পারেন না যাহাতে ভীষ্ম মাঘমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন করিতে পারে।

তাঁহাদের পথে আর একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক আছে। "পুষ্যেণ সংপ্রযাতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ" এই শ্লোকাংশ হইতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, যেদিন চন্দ্র শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল সেইদিন বলরাম প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন্ দিন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? যেদিন চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, ইহা সেইদিন হওয়াই উচিত; কিন্তু সেই দিনটী কার্ত্তিকের কৃষ্ণাপঞ্চমী; অতএব ইহা একেবারেই অসম্ভব, কারণ পাণ্ডবেরা তখনও কুরুক্ষেত্রে উপস্থিতই হন নাই এবং কৃষ্ণ স্বয়ং তখনও হস্তিনাপুরে শান্তিস্থাপনের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত ছিলেন।

এইরূপে এই টীকাকারগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিক হইতেই নানাপ্রকার আপত্তি উত্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। আমরা কতকগুলি শ্লোককে মোটামুটি মৌলিক বলিয়া গ্রহণ না করিলে এই অসুবিধা দূর হইবে না, কারণ স্বাভাবিক বর্ণনার মুখে উহারা আসিয়াছে; এবং যেটী প্রথম দৃষ্টিতেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হয় সেটীকে অগ্রাহ্য করি। "চত্বারিংশ দ্দিনান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ" ইত্যাদি শ্লোকটী মৌলিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ, গদাপর্ব্বে সামন্তপঞ্চকস্থিত তীর্থস্থানগুলির বর্ণনাসূত্রে এই শ্লোকগুলি আছে। এই বর্ণনাটী স্পষ্টই প্রক্ষিপ্ত, কারণ ইহাতে দেখা যায় যে, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের সংত যুদ্ধি বন্ধ রাখিয়া, বলরাম-বর্ণিত অমূলক গল্প শুনিতেছেন। সুতরাং এই একমাত্র শ্লোকটীকে বাদ দিলে আমরা অন্য সবগুলি শ্লোকই তাহাদের অর্থ টানাবোনা না করিয়া পরস্পরের সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই ব্যাখ্যা করিতে পারি। কালক্রমানুসারে এই শ্লোকগুলি গ্রহণ করা যাক। "কৌমুদে মাসি রেবত্যাং", এই শ্লোকের নির্দ্দেশমত কৃষ্ণ তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ দিনে যাত্রা করেন। কিন্তু শান্তিযাত্রার কার্য্য কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে—যেদিন দুর্য্যোধন শুভদিন বলিয়া তাঁহার বাহিনীকে কুরুক্ষেত্রে যাইতে আদেশ করেন,—অবসান হইয়াছিল। কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশ দিনে পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের সৈন্যসন্নিবেশ করেন। সেদিন স্কন্দষষ্ঠীর উৎসব, এই দিনে ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের অস্ত্রপূজা করিতেন। এই উৎসব সমাপ্ত হইলে উলূক দুর্য্যোধনের নিকট হইতে বার্ত্তা লইয়া পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে আসিয়াছিল। উলূকের মুখে প্রদত্ত শ্লোক "লোহাভিহারসংবৃত্তং" হইতে ইহাই অনুমিত হয়।

সুতরাং স্কন্দষষ্ঠী উৎসব সমাপনের পরে কোন দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ভেল্লাণ্ডি আয়ার এবং নাগপুরের দপ্তরি মহাশয়দ্বয় মনে করেন যে, যুদ্ধ অমাবস্যার দিন কিংবা তাহারই দুই একদিন পরে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হয় তাঁহাদের দৃষ্টি স্পষ্টই স্কন্দষষ্ঠীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অথবা তাঁহারা উহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিলে আমরা অগ্রহায়ণের সপ্তম কিংবা অষ্টম দিনে উপস্থিত হই।

এই পর্য্যন্ত কালক্রম সুস্পষ্ট ও সন্দেহের অতীত; অতঃপর আমাদিগকে অনিশ্চিত ভূমিতে দাঁড়াইতে হইবে। যুদ্ধারম্ভদিনে দৃষ্ট ঘটনা বর্ণনা করিয়া কতকগুলি শ্লোক আছে। কিন্তু ঐ বর্ণনার অধিকাংশ এরূপ অস্পষ্ট ভাবের যে, উহা হইতে প্রকৃত দিনটীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। এবিষয়ে কেবল একটী ব্যতিক্রম-স্থল দৃষ্ট হয়। "মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" এই শ্লোকটীর যথার্থ ব্যাখ্যা ধরিলে উহার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যতদূর জানি, কোন টীকাকারই উহার যথার্থ ব্যাখ্যা দেন নাই। ব্যাস বলেন যে, চন্দ্র ঐদিন "মঘাবিষয়গ" ছিল। যদি চন্দ্র যথার্থ মঘানক্ষত্রেই ছিল, তাহা হইলে 'মঘাবিষয়গ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মঘাসু' ব্যবহৃত হইত; সুতরাং চন্দ্র মঘানক্ষত্রে ছিল না, পরন্তু মঘানক্ষত্রের সহিত পর্য্যায়ভুক্ত কোন নক্ষত্রে ছিল। ভরণী, মঘা, পূর্ব্বা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বাভাদ্রপদা নক্ষত্রগুলি এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। অতএব এইগুলির কোনও একটাতেই চন্দ্রের অবস্থিতি করা উচিত। পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারাগ্রাফ বা পরিচ্ছেদে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, যুদ্ধ অগ্রহায়ণের সপ্তম কিংবা অষ্টম দিনের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং অগ্রহায়ণের অষ্টম দিনের পরবর্ত্তী কয়েক দিনের নক্ষত্র যদি দেখি, আমরা অগ্রহায়ণের একাদশ দিনে মঘা পর্য্যায়ের অন্তর্গত ভরণী নক্ষত্র দেখিতে পাই। ভরণী উগ্রনক্ষত্র বলিয়া ধরা হয় এবং উহার অধিপতি যম। মঘা নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃদেবতা। সুতরাং উভয় নক্ষত্রই যুধ্যমান সৈন্যদলের অমঙ্গল সূচনা করিয়াছিল, এবং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এইরূপ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ রোহিণী কিংবা মৃগনক্ষত্রের ন্যায় মৃদুনক্ষত্রে আরম্ভ

না হইয়া ভরণী নক্ষত্রে আরম্ভ হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল।

এইস্থলে একটী প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, ব্যাসদেব সাক্ষাৎ-ভাবে ভরণী নক্ষত্রের উল্লেখ না করিয়া, মঘা নক্ষত্রকে আনিতে গেলেন কেন? ইহার এই এক কারণ মনে হয় যে, যখন যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত হন তখন চন্দ্র মঘাতে ছিল। সুতরাং সঞ্জয় যখন যুদ্ধের প্রথম অবধি আনুপূর্ব্বিক ঘটনাগুলি বলিয়া যাইতেছিলেন, তখন স্বভাবতই চন্দ্র যেদিন মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, সেই দিনের ভীষণ দুর্ঘটনার কথা তাঁহার মনে জাগিয়া ছিল; এবং ভরণী নক্ষত্র একই প্রকার অশুভসূচক হওয়ায়, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের এই ধারণা সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, যে দুর্ঘটনা মঘা নক্ষত্রে সংঘটিত করিয়াছিল, যুদ্ধারম্ভের দিনই তাহার আরম্ভ,—কারণ ঐদিনও চন্দ্র মঘানক্ষত্রের ন্যায় সমান অশুভ-সূচক একটী নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিল।

এখানে একটু জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা আবশ্যক। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত-প্রণীত ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসের ৯১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বেদাঙ্গ জ্যোতিষপদ্ধতি অনুসারে তিথি ও নক্ষত্র গণিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে তিথিসকলের বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়ই আছে। অপর দিকে, নক্ষত্রসকলের ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিই আছে। এক্ষণে আমি ধরিলাম যে, অনুবৎসরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অনুবৎসরে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন (মার্গশীর্ষবদ্য ১) একটী ক্ষয়তিথি। সুতরাং অগ্রহায়ণ শুদি ১১ তারিখে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ধরিয়া লইলে, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা-নবমী যুদ্ধের দশম দিন হয়; এই দিনে ভীষ্মাচার্য্য তাঁহার অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ধীরভাবে মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে থাকেন। আমরা ভরণী নক্ষত্রকে যুদ্ধের প্রথম দিনের নক্ষত্র ধরিয়া লইয়াছি। অগত্যা স্বভাবতই দশমদিনের নক্ষত্র "পূর্ব্বা" হওয়াই উচিত; কিন্তু যখন নক্ষত্রের ক্ষয় নাই বৃদ্ধিই আছে, তাই আমরা ধরিতেছি যে, ভরণী ও মঘার মধ্যবর্ত্তী কোনও নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল—এইরূপে দশম দিনের—যেদিন ভীষ্ম পতিত হন—নক্ষত্র পূর্ব্বা নয়, মঘা।

এক্ষণে দেখা যাউক যে এই তিথি (অগ্রহায়ণ শুদি ১১) এবং নক্ষত্র ভরণী কিরূপে "মঘাবিষয়গঃ সোমঃ" এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করে। অভিমন্যু যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের কৃষ্ণানবমীতে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরদিবস অর্থাৎ অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমীতে সূর্য্যাস্তকালে জয়দ্রথ নিহত হন এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে। মধ্যরাত্রে ঘটোৎকচ নিহত হন। অতঃপর উভয় সৈন্য-দলই কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে, অনন্তর চন্দ্রোদয় বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে মদনধনুর সহিত চন্দ্রের উপমা দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রের এই বর্ণনার সহিত কৃষ্ণপক্ষীয়া দশমী তিথির চন্দ্রের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রোদয়ের পর উভয় পক্ষের যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয় ও প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া চলে। এই গণনার সহিত অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথির চন্দ্রোদয়েরই মিল হয়, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দিনের মিল হয় না। ইহাতে মনে হয় যে, যুদ্ধ অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বহুদিন প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে যুদ্ধের প্রথম দিনের নক্ষত্র ধরা হয় রোহিণী কিংবা মৃগ নক্ষত্র এবং অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী কিংবা পূর্ণিমা তিথিকে যুদ্ধারম্ভের দিন বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু তাহা হইলে, যুদ্ধের চতুর্দ্দশতম দিন,—যেদিন ঘটোৎকচ নিহত হন—অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষীয়া দ্বাদশী, ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী তিথিতে পড়িবে। কিন্তু ঐ সকল দিনের চন্দ্রোদয়ের সময় কোন প্রকারেই পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রোদয়—বর্ণনার সহিত মিল খায় না অথবা ঐ সকল দিনের চন্দ্র, বর্ণনার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলও হইতে পারে না এবং ঐ সকল দিনের চন্দ্রকে মদনের ধনুর সহিত তুলনাও করা যাইতে পারে না। অতএব যুদ্ধের চতুর্দ্দশদিনের চন্দ্রোদয়বর্ণনা অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াই সপ্রমাণ করে।

এই ভিত্তিতে অগ্রসর হইলে, যুদ্ধের অষ্টাদশ অর্থাৎ শেষদিন অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর সহিত মিলিয়া যায় এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ঐদিনের নক্ষত্র হয়। এই দিন দুর্য্যোধনের পতনের পর অশ্বত্থামা রাত্রিকালে শিবির আক্রমণ করেন এবং ঐ রাত্রি রৌদ্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিকেই রৌদ্রী বলা হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার আর একটী সঠিক সূত্র পাইলাম।

জ্যেষ্ঠা শব্দটীও বলিয়া দেয় যে, যেদিন চন্দ্র অধুনা-জ্ঞাত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল, সেইদিন দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছিলেন; কারণ একটা প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এই নক্ষত্রটী রোহিণী বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু ঐ নক্ষত্রে দেবশত্রুগণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হন বলিয়া উহাকে জ্যেষ্ঠা নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করা হয়। এখন যদিও দুর্য্যোধনকে কখনও অসুর এবং ইন্দ্রশত্রু বলা হয় না, তথাপি কৌরবগণ জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য শত্রুগণের পক্ষভুক্ত থাকায় দেবশত্রু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন এবং রোহিণীও মহাভারতীয়

যুদ্ধের পর হইতে জ্যেষ্ঠা নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, যাহা স্পষ্টই মহাভারতের পূর্ববর্ত্তী, তাহাতে "রোহিণী" শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু অথর্ব্ব-সংহিতা যাহা উক্ত যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাতে জ্যেষ্ঠা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তথাপি বহুপরবর্ত্তী কালিদাসের যুগ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠার পূর্ব্ব নাম রোহিণী কোন কোন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক মাঝে মাঝে কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে; এমন কি কালিদাস নিজেও তাঁহার "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্" গ্রন্থে উক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় চিৎপুর রোডস্থিত কমললোচন বসুর বাটীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা হয়। বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহের অতি নিকটে কমল বসুর বাটী ছিল। আদিব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহের মিউনিসিপাল নম্বর ৫৫ অপার চিৎপুর রোড। প্রাগুক্ত ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র, বুধবার তারিখে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সহিত বিদ্যা-বাগীশ মহাশয়ের অপর ষোলটি ব্যাখ্যান ঈশান বাবু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ বাহির করেন। বিদ্যাবাগীশ আরও কয়েকটি ব্যাখ্যান দেন, কিন্তু ঈশান বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সবগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডযাত্রার পূর্ব্বে ১৭৫২ শকের ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হয় তাহার ক্রমিক সংখ্যা ৯৮; এগুলি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ দিন হইতে গণনা করিয়া বার্ষিক উৎসবের সংখ্যা বর্ত্তমানে নিরূপিত হইয়া থাকে। রামমোহন রায় তৎপূর্ব্বে "আত্মীয় সভা" নামে একটি সভা ১৭৩৭ শকে স্থাপিত করেন। ঐ আত্মীয় সভাতে উপনিষদাদি পাঠ ও সঙ্গীতাদি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ আত্মীয়-সভাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূচনা। আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপনাবধি উহাতে প্রথম অবস্থায় "আত্মীয় সভার" অনু-রূপই পাঠ ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি বলি যে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রহ্মো-পাসনার সূচনা হয় নাই, উহার পূর্ব্ব হইতেই "আত্মীয় সভায়" ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হয় না। আমরা আমাদের উক্তি সমর্থনার্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৬৯ শকের আশ্বিনসংখ্যা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "১৭৩৫ শকে রঙ্গ-পুর হইতে তিনি (রাজা) কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। * * * ১৭৩৭ শকে রাজা মানিক-তলার নিজ উদ্যানগৃহে "আত্মীয়সভা" স্থাপন করি-লেন। কিয়ৎকাল পরে সেস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মতলা বাটীতে সভা হইত। তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মাণিকতলার উদ্যানে সভা আরম্ভ হইয়াছিল। সায়াহ্নকালে আত্মীয় সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত; কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজ-নারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং লাল-মোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ পরমধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন। * * * ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এক এক বার ব্রাহ্মসমাজ হয়। ১৭৪১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত বিহারী-লাল চোবে আপনার তুলা বাজারের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান করিলেন; তাহাতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা রামমোহন রায়, রঘুনাথ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ধনবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে গণনা করিলে আগামী ১৮৫০ শকের ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বর্ত্তমানে ১৮৪৯ শকাব্দা চলিতেছে। ঐ দিনটীকে বিশেষভাবে শতবার্ষিক দিবসরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা কয়েকজন বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। মহাত্মার জন্মভূমি রাধানগরে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য যাহাতে উক্ত সময়ের পূর্ব্বে সমাধা হইয়া যায় এবং আগামী বর্ষে যাহাতে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নূতনভাবে বিগঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল এই উদ্যোগের প্রাণস্বরূপ। কলিকাতা "রামমোহন লাই-ব্রেরী" যাহা আজ কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেও দ্বিজেন্দ্রবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। উত্তরকালে পালমহাশয়ের নাম ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে অবিনশ্বরভাবে বিরাজ করিবে।

রাজা দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাধাপ্রসাদ, কনিষ্ঠের নাম রমাপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠের পুত্রসন্তান নাই; তাঁহার দৌহিত্রগণের নাম ললিতমোহন, কিশোরীমোহন, (কলিকাতা স্মল-কজ কোর্টের জজ) ও নন্দমোহন। ললিতমোহন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। মোহিনীমোহন (এটর্ণি), রমণীমোহন (কলিকাতা কর্পোরেসনের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান), রজনীমোহন (এটর্ণি) ইঁহারা ললিতমোহনের পুত্র। ইঁহাদের ভগিনী বিদুষী শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত মহর্ষির পৌত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজার সহিত মোহিনীমোহনের এবং রমণীমোহনের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা উষার বিবাহ হয়। এক্ষণে দুইটি কন্যাই পরলোকে। যাহা হৌক, এইরূপে রাজার পরিবারের সহিত মহর্ষির পরিবারের সম্মিলন ঘটে। রাধানগরে রামমোহনের স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা শ্রীমতী হেমলতা যোগ্যতার সহিত ১৯১৬। ২২এ এপ্রেল তারিখে সম্পন্ন করিয়া আসেন।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদকে রাজা আদিসমাজের অন্যতম ট্রষ্টী নিয়োগ করিয়া যান। আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের মিউনিসিপাল বিল, অন্যতম ট্রষ্টী হিসাবে রাধা-প্রসাদের নামে তাঁহার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পরে রমাপ্রসাদেরও সহিত আদিসমাজের সম্বন্ধ নামতঃ নহে কিন্তু কার্য্যতঃ বহু বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। রমাপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং নিজ ক্ষমতাবলে তিনি যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান। তিনি সর্ব্বপ্রথমে হাইকোর্টের অন্যতম দেশীয় বিচারপতি নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু অসময়ে দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়া তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় তিনি হাইকোর্টে জজের আসনে বসিতে পারেন নাই। তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান, তাঁহা-দের নাম হরিমোহন ও প্যারীমোহন। এক্ষণে হরিমোহন ও প্যারীমোহন কেহই বর্ত্তমান নাই, এবং তাঁহাদের ঔরসজাত কোন সন্তানও নাই। ৺হরিমোহনের বিধবা পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী রাধানগরে রাজার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণে যেরূপ আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজার তিরোধানের পরে অক্লিষ্টকর্ম্মা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রষ্টী ছিলেন, এবং শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর রমানাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়, ইঁহারা কর্ণধার হইয়া না দাড়াইলে এদেশে রাজার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। রাজার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা যখন আবার ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ নবীন তেজে আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল; তাই আমরা ব্রাহ্মসমাজের জয়ে জয়যুক্ত হইয়া ইহার ছায়ায় বসিয়া অসীম তৃপ্তি লাভ করিবার অবসর পাইয়াছি।

সে সময়ে আর এক জন মহাত্মার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখিতে পাই। তাঁহার নাম শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্র নাথ ঠাকুর। ইনি সুবিখ্যাত রাজা রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র। ইনি সর্ব্বপ্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের মধ্যে কলিকাতার যাবতীয় ধনাঢ্য ও সুশিক্ষিতগণের নামের উল্লেখ পাই। (খিদিরপুর) ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহেই হইত; কোন কোন বার রাজা রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে হইত।

আমরা বলিতে চাই, রাজাকে ও মহর্ষিকে বিশেষ ভাবে বুঝিবার সময় উপস্থিত। তাঁহাদিগকে ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মিলন সম্ভব হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নবপ্রেরণার আবির্ভাব সহজ হইবে। পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ১৭৫১। ১১ই মাঘ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহে স্থায়ীভাবে যে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত পরিপূর্ণ আবির্ভাব-কাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া মহর্ষি ঠিক ঐ দিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের আয়ুষ্কাল গণনা করিতে আরম্ভ করেন। এক ভাবে বলিতে গেলে ১৭৩৭ শকের আত্মীয়-সভা বা ১৭৫০। ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশোন্মুখ অবস্থা এবং ১৭৫১। ১১ই মাঘেই তাহার নবীন ও স্থায়ী গৃহে উহার সম্পূর্ণ বিকাশ।

নানা কথা।

মাদল পাঁজি। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে তালপাতায় যে প্রাচীন ইতিহাস রক্ষিত আছে, তাহা হইতে অনেক তথ্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। ঐ তাল-পাতার পুঁথিগুলি 'মাদল' নামক বাদ্যযন্ত্রের আকারে বিভিন্ন বাণ্ডিলে সন্নিবেশিত থাকায়, উহার নাম মাদল

পাঁজি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যা অঞ্চলের অন্য অন্য পুঁথির প্রত্যেক পাতা ঠিক মধ্যভাগে ছিদ্রের ভিতর দিয়া সুতা গলাইয়া আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু মাদল পাঁজি সে ভাবের নহে। উহাতে জোড়া জোড়া তাল-পাতা আছে এবং উহার প্রান্তে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর সুতা চালাইয়া পরস্পর আবদ্ধ করা হয়। উক্ত মাদল পাঁজিতে জগন্নাথের মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার লিখিত আছে। মন্দিরের গুদামের ভিতরের যাবতীয় দ্রব্যের তালিকা, মন্দিরের পরিচারকগণের কার্যপ্রণালী, পূজাপার্ব্বণের বিধি, উড়িষ্যার গজপতি মহারাজগণের প্রচারিত আদেশ এবং এই সকল মহারাজ-গণের ইতিবৃত্ত, এসমস্তই উক্ত পাঁজিতে স্থান পাইয়াছে। এই মহারাজগণের ইতিবৃত্ত "রাজচরিত" বলিয়া আখ্যাত। A. Stirling সাহেব উক্ত রাজ-চরিতের সবিশেষ বিবরণ ১৮২৫ অব্দের Asiatic Researchএ বাহির করেন। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক পণ্ডিত ইং ১৮৪৪ অব্দে "পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা" নাম দিয়া বঙ্গ-ভাষায় পদ্যে উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। হণ্টার সাহেব উক্ত ভবানীবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া যান। উক্ত "রাজচরিতে" বিগত ছয়শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কালের বিবরণ পাওয়া যায়। শোভন দেবের রাজত্বসময়ে মোগল বাদসাহের আমীর রক্তকেতু (?) উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং সমস্ত দেশকে বিধ্বস্ত করেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বিহার ও উড়িষ্যা জর্নালের বর্ত্তমান সালের মার্চ্চ সংখ্যায় বলিয়াছেন যে উহাতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ আছে, তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-নৈপুণ্য। রাজ-গিরির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আজও যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা দর্শকের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে। গুপ্তরাজগণের আমলের খোদিত মূর্ত্তিসমন্বিত স্তম্ভ আজও খণ্ডিত অবস্থায় তথায় বিরাজমান। দাক্ষিণাত্যে বিজয়-নগরের ওয়ারাঙ্গলের (Warangal) দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল সমধিক আশ্চর্য্যজনক। কাঞ্চির ভরদ্বাজমন্দির চোলগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ধর্ম্মভাবের উত্তেজনাতেই ভারতের নানাস্থানে সৌধ বা মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের কোন পরাক্রান্ত রাজার প্রাসাদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু অতি প্রাচীনের শত সহস্র দেবমন্দির পূর্ব্বগরিমা বিবর্জ্জিত হইলেও, কালের ধ্বংস-কারী লীলাকে উপেক্ষা করিয়া উচ্চচূড়া লইয়া আকাশ ভেদ করিয়া আজও সমুন্নতভাবে দণ্ডায়মান। উড়িষ্যার প্রাচীন রাজপ্রাসাদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই, কিন্তু কোনার্ক, লিঙ্গরাজ ও জগন্নাথ দেবের মন্দির আজও রহিয়াছে। আইন আকবরি গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, রাজা নরসিংহদেব বার বৎসর ধরিয়া দেশের সমস্ত রাজস্ব কোনার্কের মন্দিরনির্ম্মাণে ব্যয় করেন। এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজস্ব তিন ক্রোড় টাকা ছিল। আমাদের দেশের শাস্ত্রে কেবলমাত্র মন্দির নির্ম্মাণ নহে কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার সংস্কারের বিধিও রহিয়াছে।

মন্দির মাত্রেরই ভিত্তি সমচতুষ্কোণ হওয়া চাই। ইহাই অগ্নি, মৎস্য, দেবী ও গরুড় পুরাণের বিধি। এই চতুষ্কোণ পত্তনের উপরে দেবমন্দির, জগন্মোহন, নাট-মন্দির, ভোগমন্দিরের সমাবেশ থাকায় উহা আয়তক্ষেত্রের আকার ধারণ করে, অন্য কথায় উহাদের সমষ্টিতে দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায় এবং দৈর্ঘ্যের অনুপাতে উহার বিস্তার কম হইয়া পড়ে। এই সকল মন্দিরের চূড়া কখন বা ১, কখন ৩, কখন ৫, কখন ৭ কখন বা ৯টি হয়। কোন কোন মন্দিরের পত্তন অষ্ট ভুজ। সংহিতাকার রঘুনন্দন সমচতুষ্কোণ মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

রাজমার্ত্তণ্ড নামক গ্রন্থে বাসগৃহনির্ম্মাণের যে ব্যবস্থা আছে তাহা ষোড়শ প্রকারের; যথা (১) আয়ত (২) চতুরস্র (চারকোণ বিশিষ্ট) (৩) বৃত্ত (গোলাকৃতি) (৪) ভদ্রাসন (মধ্যে চতুষ্কোণ চত্বর বা প্রাঙ্গন সমেত গৃহ) (৫) চক্র (৬) বিষমবাহু (৭) ত্রিকোণ (৮) শকটাকৃতি (৯) দণ্ড (লম্বা ব্যারাকের মত) (১০) পনবস্থান (চতুষ্কোণ, অধিকন্ত যাহার সম্মুখস্থ অংশ ঈষৎ গোল) (১১) বৃহন্মুখ অর্থাৎ সম্মুখস্থ ভাগ প্রশস্ত (১২) মুরজ (বাদ্যযন্ত্র মুরজাকৃতি) (১৩) ব্যজন (পাখার আকৃতিযুক্ত) (১৪) কূর্ম্ম (কূর্ম্মাকৃতি) (১৫) ধনু (ধনুকের মত বক্র) (১৬) শফ (ঘোড়ার খুরের আকৃতি)। বিশ্বকর্ম্মা-প্রকাশ নামক গ্রন্থে আরও অন্যবিধ হর্ম্ম্যনির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে।

ভদ্রাসন অর্থে আমরা বাস্তু ভিটা বলি। কিন্তু ভদ্রা-সনের শাস্ত্রীয় অর্থ তাহা নহে। চারিদিকে গৃহ এবং মধ্যে বিস্তৃত চত্বর বা উঠান, এইরূপ বাটিকেই ভদ্রাসন কহে। এইরূপ গৃহ কতকটা নিরাপদ এবং বায়ুচলাচলের সুবিধা-জনক। সার জন মার্সেল সাহেব এলাহাবাদের নিকট ভিটা খনন করিতে করিতে এইরূপ এক ভদ্রাসনের সন্ধান প্রাপ্ত হন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ঐ ভদ্রাসন বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। বাটীর মধ্যে উঠানের বিধান রোমকদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু এইরূপ ভদ্রাসনের পরিবর্ত্তে বিলাতী অনুকরণে যে সমস্ত সুবৃহৎ গৃহাদি আজ কাল বিনির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে বাটীর ভিতরে উঠানের ব্যবস্থা নাই, অট্টালিকার চারিপার্শ্বে

অল্পবিস্তর জমি খালি রাখা হয়। আমরা নিজে ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী সহরের উত্তর দিকে যে সুপ্রাচীন বণ্ডেল গির্জ্জা দেখিয়াছিলাম, তাহা ভদ্রাসনাকৃতি অর্থাৎ চক্‌মিলন। উহার প্রবেশদ্বারের ঊর্দ্ধভাগ তরবারি ও বন্দুক দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য সজ্জিত।

বঙ্গদেশে যে সকল মন্দিরের প্রচলন, তাহা আধুনিক বলিতে হইবে। খুব পুরাতন মন্দির প্রায়ই নয়নগোচর হয় না। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহার আবির্ভাব। জাফর খাঁ গাজি পুরাতন হিন্দু মন্দির ভগ্ন করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এইখানেই মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেশের মন্দিরগুলির উপাদান পাতলা ও মোটা ইষ্টক। এদেশের মন্দিরগুলিকে (শিবমন্দির বা গৌরাঙ্গমন্দির) মোটামুটি দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে—(১) যাহার উপরের অংশ একহারা, চালাঘরের চালের ন্যায় ঢালু অর্থাৎ চারচালার মত, (২) যাহার উপরিভাগ দো-থাক চালার মত। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের মন্দিরগুলি অন্যভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ইত্যাদি।

ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল হিন্দু বা জৈন মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে মুসলমানদিগের মসজিদ নির্ম্মাণের আদর্শের ছায়াপাত অজ্ঞাতসারে ঐ সকল মন্দিরের গঠন-কৌশলে পড়িয়াছিল। কাঙ্গরার বিষ্ণুমন্দিরের গঠনে মোগলদিগের গঠনপ্রভাব সুব্যক্ত।

ভারতীয় হর্ম্ম্য-গঠন প্রণালীকে তিনটি বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করিতে হইবে, যথা ইহার শিল্পনৈপুণ্য, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ধর্ম্মভাব। প্রাচীন ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলিতে আন্তরিকতা ও ত্যাগের ভাব সুব্যক্ত। মন্দিরগুলি ত আর কিছুই নহে, ইহা ঈশ্বর উদ্দেশে দানের ব্যাপার। মূল্যবান মসজিদগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় সুসজ্জিত; রস্কিন (Ruskin) সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে কতকগুলি ইষ্টক বা প্রস্তরের সমবেশই স্থাপত্যবিদ্যার পরিচায়ক নহে। কিন্তু যাহার গঠন দেখিবামাত্র অন্তরে যুগপৎ সুস্থতা্‌বা তৃপ্তি বা আরামের ভাব, ও সতেজ ভাব ও আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠে, তাহাই উচ্চ অঙ্গের গঠনশিল্প। (The sight of which, contribute to mental health, power and pleasure.)

আজকাল মূল্যবান গৃহাদি যাহা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব, প্রাচীন ভারতের মন্দিরাদির মত সুব্যক্ত হইতেছে না। ভারতের গঠনশিল্প প্রাচীন রীতির কঠোর নিয়মে সীমাবদ্ধ হইলেও, উহার মৌলিকতা, উহার সতেজভাব এবং উহার অন্তর্নিবিষ্ট বুদ্ধি-কৌশল সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে গঠনকার্য্যে বিদেশীয় অনুকরণপ্রিয়তা যে কেবলমাত্র স্থান পাইতেছে, তাহা নহে, উহা এদেশের জলবায়ুর তদ্রূপ উপযোগী বা প্রাচীন ধারার অনুগত হইতেছে না।*

পত্রাবলী।

৺রাখালদাস হালদার মহাশয়কে লিখিত।

16th March, 1862.
Krishnaghur.

My dear Sir,

My father has received the kind letter you wrote to him sometime ago. He is much obliged to you for the willingness you have expressed to render us any assistance we may be in need of when we go to England. I and my friend Baboo Monomohan Ghose are going to start on the 23rd of this month by the P. & O. Company's Steamer "Colombo" ; as desired by you we have engaged our passage for Marseilles where we hope to arrive in the latter end of April. On our arrival at Marseilles we shall send you a telegram, that you may procure lodgings for us beforehand. As we are quite ignorant of the language, mannars and customs of the people of France we shall deem it a great favour if you will kindly furnish us with the necessary instructions which may be of use to us during our journey through that country. If you will be pleased to write to us immediately after the receipt of this, and send your letter to the care of P. & O. Company's Agent at Marseilles, I may have it on my arrival there.

From the Railway Station in London we shall drive with our luggage to University Hall Gordon Square direct as desired by Mr. Pratt.

Trusting this will find you in good health.

I remain yours sincerely
Suttender Nath Tagore.

---

* O. B, Journal. March, 1927.

19th March, 1862,
Calcutta.

My dear Sir,

I wrote to you a letter dated Krishnaghur the day before yesterday. We have since thought it proper to go viâ Southampton instead of Marseilles. I will write to you again, till then I beg to request you that you will not engage our lodgings or make any other arrangements for us. We may send a telegram to you from Southampton informing you at what hour we arrive in London.

Yours sincerely
Suttender Nath Tagore,

আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

গত ২৯শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৪ই আগষ্ট রবিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকার সময় ২নং চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের গৃহে গত ২৫শে শ্রাবণের বিজ্ঞাপন অনুসারে অধ্যক্ষসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক।
২। ,, হরিপদ ত্রিবেদী।
৩। ,, পাঁচুগোপাল মল্লিক।
৪। ,, নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।
৫। ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। ,, সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

যে দেবতা পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্বোধিত করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চরণে সমবেত সভ্যবৃন্দের প্রণতি জানাইয়া কর্ম্ম আরব্ধ হইল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১৫ই ফাল্গুন (১৩৩৩ সালের) অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় অনুমোদিত হইল।

২। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব-কমিটিতে আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ১০ জন নির্ব্বাচিত সভ্যকে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল যে :—

১। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
২। ,, শিতিকণ্ঠ মল্লিক।
৩। ,, পাঁচুগোপাল মল্লিক।
৪। ,, হরিপদ ত্রিবেদী।
৫। ,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৬। ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। ,, ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। ,, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৯। ,, নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।
১০। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ,, রবীন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
১২। ,, বনওয়ারীলাল চৌধুরী।
১৩। ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৪। ,, সুশীলকুমার গুপ্ত।
১৫। ,, সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

এই কয়েকজনকে এক-একখানি চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক যে, তাঁহারা উক্ত কমিটিতে যোগদান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে সম্মত আছেন কি না? তাঁহাদের প্রত্যুত্তর পাইলে সম্পাদক মহাশয় যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

২। চিন্তামণি বাবুর পত্র পঠিত ও আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১লা শ্রাবণ তারিখে একখানি পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তিনি আর নিয়মিতভাবে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে সক্ষম হইবেন না।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, তাঁহার এই পত্রের প্রত্যুত্তরে অধ্যক্ষসভা হইতে একখানি অনুরোধপত্র লিখিত হউক; এবং এখন অবধি তিনি যে দিবস উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য সমাজে আসিবেন, সেই দিনের পাথেয় যাহা পড়িবে তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

৩ সমাজের কোন অংশ ভাড়া দেওয়ার বিষয় আলোচিত হইল।

একজন ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানার জন্য নীচের সিঁড়ীর সম্পূর্ণ ঘরটি ভাড়া লইতে চান। উপস্থিত সভ্যদিগের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকুস্থল দর্শন করিবার পর স্থির হইল যে, দোতালায় উঠিবার সিঁড়ীটি পাশের সরু লম্বা ঘরটীতে স্থানান্তরিত করিয়া

সমাজের অনুকূল চুক্তিতে তাঁহাকে উহা ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সিঁড়ী স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে একজন ইন্‌জিনিয়ারের পরামর্শ লইতে হইবে। এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের উপর যথাকর্ত্তব্য করিবার ভার প্রদত্ত হইল।

৪। সমাজের ট্যাক্সের বিষয় আলোচিত হইল।

বর্ত্তমানে এই আর্থিক দুর্দ্দিনে সমাজকে মাসে মাসে ২৩৲ টাকা করিয়া ট্যাক্সের গুরুভার বহিতে হইতেছে। জনৈক আইনব্যবসায়ী এককালীন ২০০৲ টাকা পাইলে সমাজকে এই করভার হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। স্থির হইল যে, তিনি সমাজকে এই গুরু করভার হইতে মুক্তি দিতে পারিলে, তাঁহাকে ২০০৲ টাকা দেওয়া হইবে।

৫। রণগোপাল চক্রবর্ত্তীর পেন্সন সম্বন্ধে আলোচিত হইল।

ইনি আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রালয়ের একজন অতি পুরাতন কর্ম্মচারী। ২২ বৎসর ধরিয়া ইনি প্রিণ্টারের কার্য্য করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে প্রায় ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া ইনি কম্পোজিটরের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে বার্দ্ধক্যনিবন্ধন কার্য্যে অবসর লইয়া পেন্সন পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন। স্থির হইল যে, এরূপ দীর্ঘকাল বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করায় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা উচিত। সমাজের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হইলে তাঁহাকে মাসিক অনধিক ৪৲ টাকা ভাতা দেওয়া হউক।

৬। বিবিধ।

(ক) আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহসংস্কার-প্রস্তাব ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবের সম্মিলিত কমিটিতে উত্থাপন করা উচিত কি না আলোচিত হইল। স্থির হইল যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনের স্মৃতিমণ্ডিত তাঁহার এই একমাত্র ও সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠানটির সংস্কার-প্রস্তাব সম্মিলিত কমিটিতে সর্ব্বাগ্রেই উপস্থিত করা উচিত। আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে যাঁহারা শতবার্ষিকের কমিটিতে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে উক্ত কমিটিতে এই বিষয় উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(খ) নূতন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল যে, অধ্যক্ষসভার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মহাশয় এরূপ কতকগুলি কর্ম্মীর নাম উপস্থিত করুন যাঁহারা সত্যই আদিব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে কর্ম্ম করিতে যত্নশীল হইবেন।

(গ) ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক পদে নিয়োগ আলোচিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ডাঃ চৌধুরীর মত একজন উপযুক্ত লোককে পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকরূপে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাঁহার উক্ত পদে নিয়োগ সানন্দে অনুমোদিত হউক।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৪।

স্বাক্ষর—শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক
সভাপতি।

গ্রন্থপরিচয়।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।—অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শনাধ্যাপক ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ, ডি (লণ্ডন), বি-এল, বার-এ্যাট্-ল কর্ত্তৃক অনুদিত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ১৬ পেজী ডবল ফুলস্কেপ আকারের ৯১ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের সাধারণ প্রচলিত নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়া উহার সেশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত মত প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থকার প্রথমে 'সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের' যে সূত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া উহার নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সেই সূত্র ও তাহাদের বিজ্ঞানভিক্ষু, অনিরুদ্ধ ভট্ট ও বৈদান্তিক মহাদেব-কৃত ব্যাখ্যানের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর গৌড়পাদ ও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার সহিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার আলোচনাপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতে যেমন এক পরমা প্রকৃতি আছেন, তেমনই এক পরম পুরুষও আছেন। অনন্তর 'সেশ্বর সাংখ্য' নামে প্রসিদ্ধ পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং মহাভারত, গীতা ও ভাগবতে উল্লিখিত সাংখ্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার স্বমত দৃঢ়করত গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন।

গ্রন্থকার ইহাতে কাপিলসাংখ্যের একটী সুচিরপ্রতিষ্ঠ সর্ব্বমান্য মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক অপূর্ব্ব বিচারপদ্ধতি লইয়া যে অভিযান করিয়াছেন, তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং ইহার ইংরাজী মূলাংশ

'মডার্ণ রিভিউ'এ প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কঠিন বিষয়ে এরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ অতি বিরল। আশা করি, ভারতীয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পাণ্ডিতসমাজ এবং অভিনব মতবাদের বিস্তৃত আলোচনাপূর্ব্বক ইহার সত্যাসত্য বিনির্ণয়ে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীদু. চ. সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

ফরাসী উপকথা।—শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সাম্যপ্রেস ৬নং কলেজস্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

গ্রন্থকার অনেক যত্ন করিয়া বালক বালিকাদের জন্য ফরাসী দেশের কতকগুলি উপকথা এই গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। অনুবাদটি যে সরস ও উপাদেয় হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আমরা একটি চার বৎসরের শিশুকে এই গল্পগুলি শুনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সে গল্পগুলির রস এবং গ্রন্থন্যস্ত চিত্রগুলি রীতিমত উপভোগ করিয়াছে। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, আমরা নিজেরাও ইহা পাঠে শৈশবের আনন্দ অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল। আমরা অচিরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীক্ষি. না. ঠা.।

সংবাদ।

ব্রাহ্মসমাজে উদারতা।—হিন্দু-সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মূলতঃ কোনও বিরোধ নাই; এই জন্য উভয়ের অসহযোগও প্রার্থনীয় নয়। আদিব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই এই অসাম্প্রদায়িক মিলনমন্ত্রের উদ্যোক্তা—পরস্পরের সহযোগপ্রার্থী। দেখিতেছি, আদিব্রাহ্মসমাজের সেই প্রচেষ্টা এতদিন নিভৃত ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আজ জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে। গত বৎসর আদিব্রাহ্মসমাজেরই সহকারিতায় ঢাকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত দুইটী পরিবারের মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠান একেশ্বরবাদসম্মত হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার পর এক বৎসরের মধ্যেই যে সেই ঢাকা নগরীতেই পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য নেতা স্বনামখ্যাত বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়; ইহা আমরা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ বিবেচনা করি। ঢাকানগরীতে সমাগত অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতও ঐ উৎসবে সানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন।

আমরা এই সংবাদে পরম আনন্দলাভ করিলাম। আদিব্রাহ্মসমাজের ইহাই চিরন্তন সাধনা; মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহাই চাহিয়াছিলেন। বিরোধ নয়, মিলন—অসহযোগ নয়, পরস্পর সহযোগই আমাদের লক্ষ্য। আজ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখাও যে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, ইহাই পরম সুসংবাদ।

ভাদ্রোৎসব।—গত ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা সম্মিলিতভাবে সমগ্র দিবসব্যাপী ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এবার উৎসবের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, এলবার্ট হল। উক্ত দিবস প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকার বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর উদ্বোধনটী বেশ তেজোগর্ভ ও উদ্দীপনাময় হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্রমহাশয়ের আরাধনা এবং কামাখ্যাবাবুর উপদেশও সময়োপযোগী ও সুন্দর হইয়াছিল। উদীয়মান গীতিকবি শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্রের সুকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত সকলকে আনন্দিত করিয়াছিল। অপরাহ্নে মহিলাদিগের প্রার্থনা, পাঠ ও প্রসঙ্গ হইয়াছিল। সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম এ মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুমিষ্ট স্নিগ্ধগম্ভীরকণ্ঠে ভক্তবাণী পাঠ করিয়া সকলকে পরম তৃপ্তি দান করেন। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শোকসংবাদ।

৺লতিকা দেবী।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা দেবী গত ৫ই ভাদ্র সোমবার প্রত্যুষে মহাষ্ঠভবনে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩৩ বৎসর হইয়াছিল। গৌহাটী আর্ল'ল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়ার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া ইনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র যে চলিয়া যাইবেন তাহা কেহ মনে করেন নাই; ইনি অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েকটী পুত্রকন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা, স্বামী, পুত্র ও শিশুসন্তানগুলিকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

৺নারায়ণচন্দ্র ভারতী।—তরুণ সাহিত্যিক নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতী মহাশয় গত ১৭ই আষাঢ় শনিবার অকালে তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাসবাটীতে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৩ বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প বয়সেই ইঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সুন্দর বিকাশ ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গরত্ন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির ইনি দীর্ঘকাল সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, নানা সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইত; তত্ত্ববোধিনীতেও ইনি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রবীণোচিত চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। ইঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালা ভাষা একটী সুসাহিত্যিকের সেবা হইতে অকালে বঞ্চিত হইল। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

ভ্রমসংশোধন।

গত বৈশাখ-সংখ্যা পত্রিকার ৯ম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের নিম্ন দিক হইতে গণনায় চতুর্দ্দশ পংক্তিতে "মহর্ষির এই উক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে" স্থলে "মহর্ষির এই উক্তিতে ভুল আছে" হইবে।

Reg. No. C. 412

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ
আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০১০ সংখ্যা | ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস-সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। আশ্বিন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৴০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

১০১০ সংখ্যা

১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

ভাদ্রোৎসবে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ এই ভক্তমণ্ডলী—আপনারা সকলেই এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। আপনাদিগকে কিরূপে উদ্বুদ্ধ করিব, আপনাদের প্রাণ কিরূপে জাগাইয়া তুলিব, তাহা আমি জানি না। আজ যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তো জাগ্রত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই তো অন্তরে জাগরণ লইয়াই এখানে আসিয়াছেন; কাহারও দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবার অপেক্ষায় তো তাঁহারা এখানে আসেন নাই। যিনি মহৎ হইতেও মহত্তর, যিনি অনাদি পুরাণ পরম পুরুষ, তাঁহারই মঙ্গল আহ্বানে, তাঁহারই অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা সবান্ধবে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রাণের অন্তরে প্রকৃত একনিষ্ঠা থাকিলে, ভগবানের প্রতি আমাদের স্থিরদৃষ্টি থাকিলে, আমাদের এই ভাদ্রোৎসবের সাম্মিলিত উপাসনা নিশ্চয়ই সার্থক হইবে।

এই সম্মিলিত উপাসনার সার্থকতা সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র সংশয় নাই। প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আমরা এই সম্মিলিত উপাসনা করিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যে মহাপুরুষ, যে দূরদর্শী ক্ষণজন্মা রাজা রামমোহন রায় একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের চরণোপান্তে বসিয়া মিলিতভাবে উপাসনা করিবার বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, কয়জন তাঁহার সেই শুভকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন? মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অপর কেহই তো তাঁহার এই কার্য্যে সাহায্যদানে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারই বা সেই কার্য্যে কয়জন আত্মীয়স্বজন, কয়জন বন্ধুবান্ধব স্বীয় সহায়হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন? রাজা রামমোহন রায়ের সহকর্ম্মীর সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া যখন দেখি যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীদিগের সংখ্যা জন পঁচিশ হইতে তাহার শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন কি এই সম্মিলিত উপাসনার [illegible] সম্বন্ধে মনে কোন প্রকার সংশয় স্থান [illegible]তে পারে? কখনই নয়।

আবার যখন [illegible], পরস্পরের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য, পরস্পরের মতামতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া কত বিরহবিচ্ছেদের ব্যথা বহিয়া গেল, কত বিরোধবিদ্বেষের প্রবল ঝড় বহিয়া গেল, কত বিবাদবিসম্বাদের প্রচণ্ড

দাবানল জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু সেই মর্ম্মচ্ছেদী ব্যথা, সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, সেই প্রচণ্ড দাবানল অতিক্রম করিয়াও আজ যখন আমরা পুনরায় এই উপাসনাক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি, তখন এই ভাদ্রোৎসবের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে তিলমাত্র সংশয় স্থান পাইতে পারে না। হৃদয়ে প্রকৃত উপাসনার ভাব লইয়া আসিলে, ভগবানের মঙ্গল দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিলে, তাঁহার চরণে সমস্ত ফলাফল নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, প্রেমের পথে চলিতে চাহিলে সংশয়ের সাধ্য কি যে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটী কোণও অধিকার করিতে পারে ?

স্বার্থ কুসংস্কার প্রভৃতিই হইল সংশয়ের পরিপোষক অনুচর। বর্ত্তমান জাগরণের দিনে স্বার্থ, কুসংস্কার প্রভৃতি যে সকল শতবিধ পাষাণপাথর দিয়া আমরা আমাদের হৃদয়ের দুয়ার বন্ধ করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পঙ্কিল আবর্জ্জনা সঞ্চয়ে সহায়তা করিয়া আসিতেছি, সেই সকল পাষাণপাথর দূরে সরাইয়া ফেল—আবশ্যক হইলে ভগবানের মঙ্গলনামের বিস্ফোরকসাহায্যে সে সমস্ত উড়াইয়া দাও। হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে ভয় পাইও না ; সুখের স্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া অন্ধকারকে অন্তরে পোষণ করিতে যাইও না।

খোলো—খোলো—এই উৎসবক্ষেত্রে ভগবানের মঙ্গল আলোক নামিয়া আসিতেছে—হৃদয়ের দুয়ার আর রুদ্ধ রাখিও না। সরাইয়া ফেল পাথরের বাধা—মঙ্গলময় ভগবানের অরূপ রূপের জ্যোতিতে হৃদয়কে বিকশিত করিয়া তোল এবং জীবনকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত কর। ফলাফলের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিও না। এই উপাসনাক্ষেত্রে তাঁহারই অধিষ্ঠান জানিয়া এখানে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ কর। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার জন্য এত দূর আসিয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইও না। কত লোক সমাগত হইয়াছেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই—কেবল প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে হৃদয়ের দেবতা পরম পুরুষকে বসাইয়া ভক্তিশ্রদ্ধার অঞ্জলি দ্বারা তাঁহারই চরণপূজা কর, এবং এই উৎসবকে, এই সম্মিলিত উপাসনাকে সার্থক করিয়া তোল।

সময়ে সময়ে নিরুৎসাহের তপ্ত নিশ্বাস যখন আমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন আমাদের হৃদয় সংশয়মেঘে আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম করে বটে ; তখন আমাদের মনে হয় বটে যে, যে সদ্ভাবের ফলে আমরা এই মিলনের পথে চলিয়াছি, বুঝি বা আমাদের ভিতর হইতে সেই সদ্ভাব চলিয়া গিয়াছে। বর্ষাসমাগমে তেজসমুজ্জ্বল তপনের নির্ম্মল প্রকাশও যেমন স্বল্পকালের জন্য জলদের অন্তরালে লুকাইয়া পড়ে, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী কিন্তু প্রাচীনপক্ষপাতী অনেক প্রবীণ ব্যক্তি যখন প্রবীণতার নামে, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার নামে কথায় কথায় এই সম্মিলিত উপাসনা দূরে থাক, ব্রাহ্মসমাজেরই প্রয়োজনের উপর গভীর সংশয়ের পর্দা আমাদের সম্মুখে ধারণ করেন, তখন আমাদের হৃদয় হতাশার অতল তলে ডুবিয়া যাইতে চায় বটে, সংশয়ের তীব্র উত্তাপে বিশুষ্ক হইবার উপক্রম করে বটে। কিন্তু হে তরুণ যুবক বন্ধুগণ ! তোমরা আমার এই অর্দ্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা গ্রহণ কর। এই সম্মিলিত উপাসনার উপর আস্থা কখনই হারাইও না। গীতার মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমি নিঃসংশয়চিত্তে তোমাদিগকে বলিতেছি যে, কল্যাণজনক কর্ম্মের বিনাশ নাই। ভগবানের অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টির উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া হৃদয়ে শুভ ইচ্ছা নিয়ত জাগ্রত রাখিয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হও—ইহা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সফলতা লাভ করিবে।

যাঁহারা এই সম্মিলিত উপাসনায় সংশয় প্রকাশ করেন, আমরা বলিব তাঁহাদের হৃদয়ে বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; তাঁহাদের অন্তর হইতে এখনও বিরোধবিবাদের বীজ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। আমরা বলিব, ভগবানকে সত্যই আমাদের একই পিতা, সত্যই আমাদের একই জননী বলিয়া তাঁহারা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন। ভালই তো—আমরা মানুষ যদি হই, বীরপ্রসবিনী ভারতের স্তন্যে, ভারতের অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের অমৃতসলিল পান করিয়া যদি আমরা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকি, তবে সেই বাধাবিঘ্ন দূর করিতে ভয় পাইব

কেন? সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়, পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের বিঘোষিত এই অভয়মন্ত্র জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া বীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সেই পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্নই তো দূর করিতে হইবে।

যে ঘটনা উপলক্ষে আমাদের এই ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই ঘটনার বিষয় একবার আলোচনা করিলে দেখিব যে, রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে একমেবাদ্বিতীয়ং পরম পুরুষের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন, সে সময়ে তাঁহার সম্মুখে কি প্রকার দুর্ভেদ্যকল্প বাধাবিঘ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন যদি তিনি সেই বাধাবিঘ্নের বিভীষিকা দেখিয়া ব্রহ্মনামপ্রচারে পশ্চাৎপদ হইতেন, তাহা হইলে আজ আমরা এখানে সম্মিলিত হইবার অবসরই পাইতাম কিনা সন্দেহ। তাঁহার কার্য্যে মুষ্টিমেয় সহকর্ম্মী পাইয়াছিলেন বলিয়া—কৈ—তিনি তো তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই? তাঁহার শত্রুগণ নানাবিধ চক্রান্তে ফেলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন—কৈ—তাহাতেও তো তিনি বিচলিত হন নাই—নিজের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন মুষ্টিমেয় সহকর্ম্মী লইয়া ঐ একই কার্য্যে ব্রতী হইবার ফলে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন—কৈ—তিনিও তো তাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই? সেকালের সহিত একালের তুলনা করিলে আমরা তো নিরাশার কোনই কারণ দেখি না। বর্ত্তমান যুগে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই তো প্রকাশ্যে অপ্রতিম ভগবানের উপাসনা গ্রহণ না করিলেও অন্তরে ইঁহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এখনও ভারতের পল্লীগ্রামের নানা স্থানে পল্লীবাসীগণ ব্রহ্মোপাসকের প্রতি নানা বিষয়ে শত্রুতা সাধনের চেষ্টা করিলেও রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বিবাদের যে তীব্রতা দেখা যাইত, এখন আর সেরূপ তীব্রতা তো দেখা যায় না।

সত্যধর্ম্মপ্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে; চারিদিক হইতে, বিভিন্ন নামে বটে, কিন্তু সেই একই ভগবানের চরণে আশ্রয় পাইবার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষার কাতরধ্বনি যে প্রকার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অভয়বাণী যেরূপ আমাদের অন্তরে আঘাত করিতেছে, তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে যুবক বন্ধুগণকে ইহা বলিবার অধিকার রাখি—তোমরা যদি কৌস্তুভ মণির মত ব্রাহ্মধর্ম্মের অমোঘ বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভগবানকে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি দিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা দেখাইতে পার; যদি তোমরা পরস্পর যথার্থ প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া, পূর্ব্বের বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকরূপে আপনাদের পরিচয় দিতে পার, তবেই এই সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় সেই একসঙ্গে চলা ফেরা, সেই প্রাণে প্রাণে মিলনের ভাব কবে যে ফিরিয়া পাইব জানি না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের প্রাণের বস্তু হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র যদি সত্যই আমাদের ইষ্টমন্ত্র হয়, তবে সেই পূর্ব্বেকার ভাব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। নিজের স্বার্থ আঁকড়াইয়া ধরিলে চলিবে না। নিজের যশ ও মান, নিজের ধন ও পদগৌরবকে সর্ব্বস্ব করিলে চলিবে না। ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থকে নিজের স্বার্থে মিশাইয়া লও। নিজের যশ ও মান, নিজের ধন ও পদগৌরবের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে বড় করিয়া তুলিয়া ধর। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং—একসঙ্গে চল, একসঙ্গে কথা বল—পরস্পর আর বিচ্ছিন্ন থাকিও না। বর্ত্তমান যুগের মূল প্রাণ হইল অন্যোন্যসাহচর্য্য—পরস্পরকে সহায়তা করা। সেই যুগধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইও না। আমরা বড়ই পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া আছি বলিয়াই অনেক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করি না। কিন্তু ব্রহ্মসাধনের পথে, সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে মিলিতভাবে অগ্রসর হও, দেখিবে, তোমাদের জীবনের প্রতি বিভাগে, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি অংশে তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হইবে; তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সহজেই উপলব্ধ হইবে। কেবল ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিলে চলিবে না—অন্যায় আমোদপ্রমোদের পিচ্ছিল পথে না গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে প্রতিপালন কর। এই উৎসব, এই সম্মি-

লিত উপাসনাকে সার্থক কর, সুফলপ্রসূ কর; ব্রাহ্মসমাজকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্ত সূর্য্যের তেজে প্রভান্বিত করিয়া তোল; ভগবানের নাম ভারতের সর্ব্বত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর; তাঁহার উপাসনা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া জীবনকে ধন্য কর। এই দরিদ্র ভারতভূমি হইতে দুঃখ দৈন্য বিদূরিত হউক। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষণ করুন।

ব্রহ্মের আদর্শ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

এই ব্রহ্মাণ্ড যে কত বিশাল তাহা আমাদের কল্পনায় আসে না। একখানা ট্রেন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল করিয়া চলে তবে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম নক্ষত্রে পৌঁছিতে তাহার চারি কোটি বৎসর লাগে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ক্রোশ; অথচ এমন এমন দূরবর্ত্তী নক্ষত্র আছে যে সেখান হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছিতে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক লাগে। যে আলোকে আজ আমরা সেই প্রকার একটী নক্ষত্র দেখিতেছি সে আলোক যখন পৃথিবীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখন হয়ত শাক্যসিংহের জন্ম হয় নাই। এক সময়ে আমাদের এই পৃথিবীটাকে লোকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিত এবং মানুষকে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু এখন আমরা এই বিশ্বকে এত প্রকাণ্ড বলিয়া জানিয়াছি যে, পৃথিবীটা অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বড় ছোট হইয়া গিয়াছে। এই তুচ্ছ কীট মানুষকে ব্রহ্ম দেখেন এবং প্রত্যেকের সুখ দুঃখ উত্থান পতন প্রার্থনা ও দীর্ঘনিশ্বাস তিনি লক্ষ্য করেন ইহা অনেক লোকের নিকট বড় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই একবার একজন জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশে বলিয়াছিলেন যে, এই যন্ত্রটীর মধ্য দিয়া আকাশের প্রতি তাকাইলে মানুষ যে ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জীব এই অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়।

ব্রহ্ম যে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের আধার এ কথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মস্বরূপে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য আছে—একথা বলিলে তাঁহাকে মানুষের আদর্শে কল্পনা করা হয়। কিন্তু যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা কোন্ সাহসে আমরা তাঁহাকে পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র কীট মানুষের মত মনে করিব? যদি ঈশ্বরের হাত পা চোখ মুখ কল্পনা করায় দোষ হয়, তবে তাঁহার জ্ঞান প্রেম পুণ্য কল্পনাতে দোষ হইবে না কেন? তাই কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ—তিনি অনন্ত সত্তা মাত্র। কেহ কেহ বা তাঁহাকে অসীম শক্তি বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না।

নির্গুণ ব্রহ্ম থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি? যে ব্রহ্ম আমাদের সুখ দুঃখ আপদ বিপদ সংগ্রাম ও অবসাদের প্রতি উদাসীন, যিনি আমাদের কোন সংবাদই রাখেন না, তাঁহার পূজাও চলে না, তাঁহার কাছে প্রার্থনাও চলে না। যাঁহারা তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও বিপদকালে তাঁহার নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেহ কেহ ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেই ইচ্ছা করেন না, সময়ে সময়ে তাঁহার জীবন্ত আবির্ভাবের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া ও তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। কিন্তু এরূপ উচ্চ অবস্থা অল্প লোকের জীবনেই আসে এবং যাঁহাদের আসে তাঁহাদেরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তখন ব্রহ্মের কথা জানিবার জন্য তাঁহাদেরও হৃদয় ব্যাকুল হয়।

আমরা পূজা করি চরিত্রের। নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত মানুষ অপেক্ষা কত বড়, কিন্তু আমরা তাহাদের পূজা করি না। এই জীবধাত্রী ধরিত্রী কত প্রকাণ্ড এবং সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষাও কত লক্ষ গুণ বড়, কিন্তু আমরা পৃথিবী ও সূর্য্যের পূজা করি না। যে বস্তু অজ্ঞান এবং অচেতন, যাহার স্নেহ প্রেম ও পবিত্রতা নাই, তাহা যতই বড় হউক না কেন, তাহা আমার তুলনায় হীন, তাহা আমার নিকট পূজা পাইবার যোগ্য নয়। ব্রহ্ম যদি শুধু অনন্ত সত্তা মাত্র হন বা অনন্ত শক্তি মাত্র হন, যদি তিনি জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের আধার না হন, তবে তাঁহাকেও আমরা পূজা করিতে পারি না। ভিক্টার হিউগো সত্যই বলিয়াছেন যে, যে ব্রহ্মে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য নাই তাঁহাকে আর পরম পরিপূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নির্গুণ নহেন, কিন্তু সকল গুণেই অনন্ত।

আমরা যখন ক্ষুদ্র এবং তিনি যখন অনন্ত, তখন আমরা কিছুতেই তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি না। তাঁহার স্বরূপ আমাদের চিন্তা ও কল্পনার অতীত। আবার আমরা তাঁহার যতটুকু দেখি তাহাও যথাযথ দেখি না—হয়ত তাঁহার প্রেমের দিকটা একটু বেশী করিয়া দেখি এবং তাঁহার পুণ্যের দিকটা হয়ত বা একটু কম করিয়া দেখি। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা সত্যের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। এই ছায়াকেই আমরা ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করি। কিন্তু আশা আছে একদিন তাঁহাকে আরো উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইব। কেহ

একখণ্ড প্রস্তরকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে; কেহ বা দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেই প্রণাম করিতেছে; কেহ কেহ নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশকে সুবিশাল ব্রহ্মমন্দিরের তোরণদ্বার জানিয়া ভক্তিভরে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে; কেহ কেহ বা মনে করিতেছে যে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ ক্ষমা ও প্রেমের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রুশকাষ্ঠে ঘাতকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, স্বর্গরাজ বুঝি কতকটা সেইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন। যাঁহার অনন্তস্বরূপ মানুষের ধারণার অতীত অথচ যাঁহার পূজা না করিলে মানুষের চলে না, তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই কোন-না-কোন সামগ্রীকে নিদর্শন বলিয়া অবলম্বন করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, আমরা কি আমাদের প্রাণমন্দিরে কোন হীনচরিত্ররূপে চিত্রিত দেবদেবীকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব, না প্রেম ও পবিত্রতার অবতার কোন মহাপুরুষের চরিত্রকে ঈশ্বরের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিব?

এইরূপ কোন মহাপুরুষের চরিত্রকে ব্রহ্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকের আপত্তি আছে, কেননা এরূপ করিলে ঐ ব্যক্তির একটা মূর্ত্তি তাঁহাদের মনশ্চক্ষে আসিয়া পড়ে। এই কারণে তাঁহারা ব্রহ্মকে পরম পিতা বা পরম জননী বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত। কিন্তু মানুষ কি শুধু জড়দেহ মাত্র? এই দেহের অধিপতি যিনি, এই দেহ যাঁহার বাসগৃহ, প্রকৃত মানুষ কি তিনিই নহেন? তিনি যদি প্রকৃত মানুষ হন তবে এই জগতে মানুষ ভিন্ন আর কোন্ বস্তুকে আমরা ঈশ্বরের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি?

বাস্তবিক মানুষও তো নিরাকার। জ্ঞান-চৈতন্য-স্নেহ-প্রেম-পুণ্য-শান্তিই মানব-আত্মার প্রকৃতি—ইহার কোনটাই তো জড়বস্তু নয়, বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর নয়। ঈশ্বর যেমন চিন্ময়, মানুষও বাস্তবিক তেমনি চিন্ময়। উভয়েই নিরাকার।

এই মানব-আত্মার সীমা কোথায়? একটী মানব-আত্মার তুলনায় সৌরজগৎটা কত ক্ষুদ্র! একবার স্মৃতির বিষয় চিন্তা করুন। স্মৃতি আমাদের নিকটে এত পরিচিত শক্তি যে, ইহার মধ্যে কিছু যে বিস্ময়ের বস্তু আছে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। সেণ্ট অগষ্টীন বলিয়াছেন যে স্মৃতির শক্তি কি অদ্ভুত? ইহা কিরূপে কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া অতীত ঘটনাকে বর্ত্তমানে উপস্থিত করে তাহা ভাবিতে গেলে অভিভূত হইতে হয়। সেইরূপ একবার কল্পনার কথা চিন্তা করুন। গৃহে বসিয়া মানুষ কল্পনার প্রভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইতে পারে, এমন কি চন্দ্রমণ্ডলে ও সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হইতে পারে। মানুষ ভিন্ন জগতে আর কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই। স্নেহ-প্রেমের কথা চিন্তা করুন। লেখাপড়া বা কাজকর্ম্ম উপলক্ষে পুত্র বিদেশে গিয়াছে, পিতামাতার প্রাণ তাহারই কাছে পড়িয়া আছে। যে সকল প্রিয়জনকে আমরা পৃথিবীতে হারাইয়াছি—তাহাদিগকে আবার দেখিবার জন্য আমাদের কত আকুল আকাঙ্ক্ষা! প্রেম যেমন মানুষের প্রাণকে সকল সীমা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে, স্বর্গে বা পৃথিবীতে এমন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। আবার মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি না সম্পন্ন করিতেছে। মানুষ কত যে সুন্দর সুন্দর চিত্র, কত যে সুন্দর সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি, কত যে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছে, কত সহস্র সহস্র নির্ম্মল আনন্দ-উপভোগের সামগ্রী সৃষ্টি করিতেছে একবার চিন্তা করুন। মানুষ যে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করে ইহা কি অদ্ভুত সৃষ্টি! এজন্য কোন জড় পদার্থকে অবলম্বন করিতে হয় না। এই মানস সৃষ্টির রচয়িতা যাঁহারা, তাঁহারা কত অদ্ভুত। লোকে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র দেখিতে দেশদেশান্তরে যায়, কিন্তু জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য সামগ্রী যে মানুষ নিজে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না।

বাস্তবিক মানুষ তো তুচ্ছ নয়। স্মৃতির সূত্রে যাহা অতীতের সহিত সংসৃষ্ট, কল্পনার পক্ষে যাহা ইচ্ছাগতি, প্রেমে যাহা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরপ্রসারিত, যাহার সৃষ্টিশক্তি ভবিষ্যতের বিস্ময় ও আনন্দের উৎস—সে মানুষ এত তুচ্ছ নয় যে, আমরা মানব-আত্মাকে পরমাত্মার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইব।

একটী ছোট পাত্র সমুদ্রের জলে পূর্ণ করিয়া আনিলেও একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়া দিতে পারেন সমুদ্রের জলে কি কি পদার্থ আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র পাত্রের জল দেখিয়া সমুদ্রের বিশাল বিস্তার, তাহার অতলস্পর্শ গভীরতা, চন্দ্রকিরণে তাহার উচ্ছ্বাস, ঝড়ের সহিত রণরঙ্গে তাহার উত্তাল নৃত্য এবং বিপুল হুঙ্কার কল্পনা করা যায় না। সেইরূপ মানব-আত্মাকে তাঁহার আদর্শ বলিয়া লইলেও মানুষ দেখিয়া আমরা তাঁহার অনন্তস্বরূপ কখনই অবধারণ করিতে পারি না। জগতে মানব-আত্মা অপেক্ষা অদ্ভুত কোন-কিছু আমরা জানিনা, তথাপি অনন্তস্বরূপের তুলনায় আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহাও যেন আমরা না ভুলি। তাঁহাকে জানিয়াছি বা বাক্যের দ্বারা আমরা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ, এরূপ স্পর্দ্ধা যেন আমাদের না আসে।

জড় জগতের তুলনায় আমাদের এই জড় দেহটা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। কিন্তু যে জড়কে জ্ঞানের দ্বারা আমি

জানিতেছি তাহার অপেক্ষা আমি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। আমাদিগের নিকটে যাহা সর্ব্বোচ্চ তাহাকেই আমরা ব্রহ্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি, এবং এ কথা নাস্তিকেরাও অস্বীকার করিবেন না যে, আমরা যাহা কিছু জানি যত প্রকার সামগ্রীর সহিত আমরা পরিচিত, তৎসমুদয়ের মধ্যে মানব-আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই আমরা বলি, ব্রহ্ম পরম আত্মা বা পরমপুরুষ। সংসারে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কিছুই নাই, তাই আমরা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলিয়া মনে করি, এবং ভগবানকে পরম পিতা এবং পরম জননী বলিয়া অর্চ্চনা করি।

তপস্যা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দেব! তুমি রেখো না বাধা
তপস্যার পাথে।
অমৃত বারি বরষি' হে
জুড়াও অনাথে।
কত পাপ করেছি আমি—
কত মহাপাপ;
তাপ তার ঘুচে না যেন—
তার মহাতাপ।
আকুল প্রাণে খুঁজি, কোথা
শান্তি—শান্তি কোথা?
কেহই তো ডাকে না কাছে
ঘুচাইতে ব্যথা।
বসনের আঁচল দিয়ে
মুছি' অশ্রুধারা
কেহই তো আসে না কাছে
আপনার পারা।
নিরাশার আঁধার দেখি
চারিদিকে ঘিরে;
এ জগতে মিলে না শান্তি
অন্তরে বাহিরে;—
মায়ের স্নেহের কোলেও
শান্তি নাহি পাই;
জগতে আপনার বলে
নাহি কোন ঠাঁই।
দূর করি' বিষয়মোহ
যদি প্রাণ ধায়;
জগতের অতীত তুমি—
যদি তোমা চায়,
তবেই তপস্যার তেজে
ঘুচিবে আঁধার;
মোহ গিয়ে তখন হবে
সবি আপনার।
তখনি ফেলিবে মলয়
সুরভি নিশ্বাস;
নদীর গানেতে শুনিব
প্রেমের উচ্ছ্বাস।
তপস্যাই দেখিছি হেথা
মরম-জুড়ান
পুষ্পশোভী শ্মশান যেন
পূর্ণ শান্তি-প্রাণ।

রাজা রামমোহনের জন্ম-ভূমি দর্শন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা রামমোহনের জন্মভূমি রাধানগর পরিদর্শনার্থ বিগত ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করি এবং তৃতীয় দিনে ফিরিয়া আসি। রাধানগর কলিকাতা হইতে ৩২ মাইল মাত্র। বেনারস রোড ধরিয়া ডোমজুড় ও আমতার ভিতর দিয়া দামোদর পার হইয়া পূর্ব্বে পদব্রজে যাইবার ব্যবস্থা ছিল। ১৬ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া সে সময়ে অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে এতদপেক্ষা অধিক পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন। আমার পিতা স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় দুই তিন বৎসর ধরিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত নর্ম্যাল স্কুলে অধ্যয়নার্থ বেহালা হইতে প্রতিদিন যাতায়াতে সাত ক্রোশ হাঁটিতেন। ইহার উপরে যখন মর্ণিং স্কুল হইত তখনও অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে যাইতেন এবং বেলা ১২টার পরে নিজ বাটীতে আসিয়া পৌছিতেন। তখন যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না। লোকে বাধ্য হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত হাঁটিতে অভ্যস্ত হইত। তাঁহাদের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল, মনে অসাধারণ বল ছিল।

আমরা হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩০ মাইল রেলে অতিক্রম করিয়া কোলাঘাটে পৌছিলাম। তথা হইতে ষ্টিমারযোগে 'পানসিউলী' এবং তথা হইতে নৌকাযোগে প্রায় ১৪ মাইল, মোটের উপর ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পরে রাধানগরে পৌছিলাম। যাইতে প্রায় ১৪ ঘণ্টা সময় লাগিল। আমাদের যাইবার উদ্দেশ্য ছিল, রাজার পৈত্রিক ভদ্রাসনের উপরে তাঁহার যে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে প্রথমতঃ তাহা দেখা;

দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক কোন্ অনুকূল অবস্থার ভিতরে তাঁহার অন্তরে এই অভিনব একেশ্বরবাদের আলোক আসিয়া পড়িয়াছিল তাহার সন্ধান লওয়া; তৃতীয়তঃ রাজার জীবদ্দশায় রাধানগরের ও নদীর পরপারে অবস্থিত কৃষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করা; এবং চতুর্থতঃ রাজার হৃদয়ে অমানুষিক তেজ ও উদ্যম কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা প্রতীতি করা।

এইগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর রাধানগর প্রমুখ গ্রামগুলির অবস্থান বুঝা আবশ্যক। রূপনারায়ণের তীরবর্ত্তী 'পানসিউলী' হইতে উত্তরদিকে উহার একটি শাখা বাহির হইয়া বক্রগতিতে চলিতে চলিতে বহুদূরে দামোদরের সহিত মিলিয়াছে। ঐ শাখা-নদীর নাম দ্বারকেশ্বর। ঐ নদী বর্ষাকালে খুব প্রবল হয়; কিন্তু শীতকাল পড়িতে না পড়িতে জল কমিয়া গিয়া উহার বিশাল বক্ষ ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। এই নদীপথে ৩ ক্রোশ অতিক্রম করিলে বাম দিকে 'থানাকুল' গ্রাম। ঐ গ্রামে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম হয়। নদীতে থানাকুলের পরে জলের অল্পতা; কিন্তু বর্ষায় নদীর উভয় পারে যথেষ্ট ভাঙ্গন আছে। নদীতীরবর্ত্তী অনেক মন্দির জলপ্রবাহে নদীর কুক্ষিগত। থানাকুলের সুপ্রসিদ্ধ ঘণ্টেশ্বর-মন্দিরের অর্দ্ধাংশ জলসাৎ হইয়াছে, সামান্য অংশ দুর্গাঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। তন্ত্রে "ঘণ্টেশ্বর"-দেবতার উল্লেখ আছে।* এই "ঘণ্টেশ্বর" খুব জাগ্রত বলিয়া সাধারণের ধারণা। এই থানাকুল পর্য্যন্ত মোটরবোট আজকাল যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু প্রতিদিন উহা পাওয়া যায় না। নদীর জল আরও কমিয়া গেলে ঐ বোট থানাকুল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিবে না। থানাকুল ছাড়িয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে দক্ষিণে রাধানগর—রাজার জন্মভূমি; বাম দিকে গোপালনগর ছাড়াইয়া কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া আরও এক মাইল অগ্রসর হইলে বামদিকে লাঙ্গুলপাড়া। ঐ স্থানে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের আবাসনিকেতন ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় দৌহিত্র ললিতবাবু ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, সুন্দর অট্টালিকা ও বাগান সমেত উহা রাজার পৌত্র প্যারীমোহন বাবুকে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়া যান। প্যারীমোহন বাবু ঐ বাটী মেরামত করিয়া উহাকে তে-তলায় পরিণত ও চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন। ঐ বাগানের পশ্চাতে রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রাধানগর ছাড়িয়া আসিয়া ঐ লাঙ্গুলপাড়ায় নিজের ভদ্রাসনবাটী নির্ম্মাণ করেন বলিয়া মনে হয়; ঐ ভদ্রাসনের সান্নিধ্যে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী চাতালসমেত বাঁধাঘাট। উহার জল আজও বেশ নির্ম্মল। রাজার সময়ে চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক আসিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে উহার জল ব্যবহার করিত। ছুঁৎমার্গ হেতু হিন্দুর সহিত মুসলমানের মধ্যে মধ্যে সামান্য সংঘর্ষ হইত বলিয়া, রাজা নিজে ঐ পুষ্করিণী হইতে কয়েক কলসী জল পাড়ের উপর তুলিয়া রাখিতেন এবং মুসলমান রমণীগণের কলসী ঐ জলে মধ্যে মধ্যে স্বয়ং পূর্ণ করিয়া দিতেন। তখন রাজার বয়স বেশী নহে; কিন্তু এই অল্প বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ের বিশালতায় পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারও কলসী ভাঙ্গিয়া গেলে রাজা নিজ হইতে তাহাকে নূতন কলসী দান করিতেন।

উপরে যে নূতন বসতবাটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে কয়েকটি কুঠারী রহিয়াছে, কিন্তু উহা একভাবে পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইল। উহার সম্মুখে বসিবার জন্য একটি উচ্চ চত্বর ছিল। উহার ভগ্নাংশ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তথায় কয়েকটি বড়গাছ জন্মিয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহার উপরে চালা ছিল। ঐ চত্বর ৬৪ কোণ-বিশিষ্ট ছিল এবং দেখিতে প্রায় গোলাকৃতি; এই কারণে উহাকে 'গোলঘর' বলিত। উহার সম্মুখে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। অনেকে বলেন যে রাজা ঐখানে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সূর্য্যের অস্তমিত মহিমা সন্দর্শন করিতেন এবং অসীমের ভাব তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিত। রাজার ভ্রাতা রাধানগর হইতে উঠিয়া আসিয়া ঐখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু রায়বংশের আর কয়েকটি শাখা আজও রাধানগরেই বাস করিতেছেন। ইদানীং তাঁহাদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের বাটীর সম্মুখের উদ্যান ও জলাশয় নদীর গর্ভগত হইয়া গিয়াছে। রাধানগরে রাজার সূতিকাগৃহের পার্শ্বেই ৺মহেন্দ্রনাথ (রায়) বিদ্যানিধির বাসগৃহ রহিয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর উপেন্দ্রনাথ রায় আজও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৭৩।৭৪ বৎসর। তাঁহার নিকট রাজার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। রায়বংশের অন্যান্য শাখা বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য পল্লীতে বাস করিতেছেন। রাধানগরে রাজার যে পৈতৃক আবাসনিকেতন ও দেবালয় ছিল, তাহা ভগ্ন ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ায়

---

* ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর-নদীতটে
ভাগীরথী-নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ। ২৪। ২১ শ্লোক। 'শিবশক্ত'-প্রোক্ত। থানাকুল হইতে দ্বারকেশ্বর নদী "রত্নেশ্বর" নাম গ্রহণ করিয়াছে। উহারই পুরোভাগে কৃষ্ণনগর, রাধানগর, লাঙ্গুলপাড়া প্রভৃতি অবস্থিত।

উহা ভাঙ্গিয়া তাহার উপরেই রাজার স্মৃতিমন্দির বিনির্ম্মিত হইতেছে। রাজার সূতিকাগৃহ ঐ স্মৃতিমন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে অবস্থিত। সূতিকাগৃহের চিহ্ন নাই, স্থান-নির্দ্দেশ মাত্র করা যাইতে পারে। স্মৃতিমন্দিরের পার্শ্বেই ১৬৮৩ শকে গঠিত দোলমঞ্চ আজও বর্ত্তমান। পুরাতনের সাক্ষীস্বরূপ ঐ দোলমঞ্চটি রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। রাজার ঐ সূতিকাগৃহের অদূরে রায়বংশের উপাস্য দেবতা "রাজরাজেশ্বরের" ছোট মন্দির ছিল। তাহার ভগ্নাংশ আজও রহিয়াছে। কথিত আছে যে, রাজার পিতামহরা সাত ভাই ছিলেন। তাঁহাদের সাত ভাইএর সাত জন স্ত্রী; তাঁহারা নিজে সুরকি ভাঙ্গিয়া ঐ ক্ষুদ্র মন্দির-নির্ম্মাণে সাহায্য করেন। তাঁহাদের আন্তরিকতা ও ভগবদ্ভক্তি যে অপূর্ব ছিল, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। অনেকে বলেন যে, রায়বংশ অন্য দেবতার পূজা না করিয়া, একমাত্র ঐ "রাজরাজেশ্বরের" পূজক ও উপাসক ছিলেন। বহুদেবতার পরিবর্ত্তে ঐ একদেবতার উপাসনা দেখিয়া এবং তাঁহার উপরে সকলের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া রাজা উহা হইতে প্রেরণা লাভ করত ঐ একই দেবতার পূজার সন্ধান বলিয়া গেলেন। পার্থক্য কেবল এই রহিল যে, রাজার দেবতা অরূপ ও অশরীর। ঐ "রাজরাজেশ্বর" অদ্যাপিও রায়পরিবারের মধ্যে পালা অনুসারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান।

একেশ্বরবাদের উপর যখন রাজার চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর যখন তিনি অশ্রদ্ধাবান হইলেন, তখন তিনি পিতামাতার ও আত্মীয়স্বজনের ভর্ৎসনার ভার স্কন্ধে লইয়া লাঙ্গুলপাড়ার জ্যেষ্ঠের "নূতন বাটী" ছাড়িয়া কতকটা অগ্রসর হইয়া প্রায় নদীকূলে তিনটি পাকা কুঠারী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্বেই শবদাহ হইত। এ কারণে কেহ কেহ বলেন যে রাজা শ্মশানের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্যারীমোহনের কাছারিবাটী আজকাল যেখানে অবস্থিত, তাহার অন্দরমহলে রাজার ঐ তিনটী কুঠারী ছিল। রাজার মৃত্যুর বহু পরে যখন প্যারীমোহন ঐ কাছারিবাটী সংস্কার করেন, তখন তিনি রাজার নির্ম্মিত কুঠারী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আমরা অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ছাদহীন পুরাতন ইষ্টকের দেওয়াল রহিয়াছে। উহাই রাজার নির্ম্মিত গৃহের শেষ পরিণাম কি না, কেহ তাহার বিশেষ সন্ধান দিতে পারিলেন না। ভিতরের অংশ দোতলা, কিন্তু অন্দর মহল বাসাভাবে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে কলিকাতার আবাসনিকেতন হইতে পালকীর ডাকে এইখানে আসিতেন এবং দুই চারি দিন বাস করিতেন। এই সময় তিনি তাঁহার মনোজ্ঞ ব্যবহারে সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। কেহ কেহ বলেন শ্মশানের উপর বাস করিবার কারণে রমাপ্রসাদের পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন নিঃসন্তান হইয়াছিলেন। হরিমোহনের পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন নাই। প্যারীমোহনের পোষ্যপুত্র ধরণীমোহন বিনয়ী ও হৃদয়বান ব্যক্তি। রাজার স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পল্লীগ্রামে নদীতটে শবদাহের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান নাই। বিশেষতঃ যেখানে একবার শবদাহ হয়, সেই অঙ্গারের চিহ্নের উপরে অন্যে শবদাহ করে না। সে কারণে শবদাহ স্থান নদীতীরে বিক্ষিপ্ত।

পূর্ব্বকথিত লাঙ্গুলপাড়ার রাধাপ্রসাদের বাটী ও রঘুনাথপুরের বর্ত্তমান প্যারীমোহনের বাটীর মধ্যে একটি প্রশস্ত রাস্তার ব্যবধান। লাঙ্গুলপাড়া রাধানগরের সম্মুখস্থ নদীর পরপারে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজার বংশের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়-উপাধি নবাবের প্রদত্ত। কেবল মাত্র রাজার বিবাহ পিতার অনুরোধে বংশজের ঘরে হইয়াছিল, একারণ তিনি ভঙ্গ-কুলীন হইয়া পড়েন; কিন্তু রায়-বংশের অন্যান্য শাখার ভিতরে আজও অনেকে স্বভাব-কুলীন রহিয়াছেন।

রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন বিদেশে কার্য্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তদীয়া পত্নী শোক-বিহ্বলা হইয়া নদীসন্নিকটে অধুনাতন প্যারীমোহনের কাছারী বাটীর সম্মুখস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়েন এবং অনুমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিস্তর অনুনয়-বিনয় করেন। কিন্তু তাঁহার সকল অনুরোধ ব্যর্থ হয়। অপরের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইল! রামমোহন যে গাব-গাছের মূলে বসিয়া ঐ হৃদয়বিদারক দৃশ্য সন্দর্শন করেন, তাহা আজও বিরাজমান। অগ্নির সাহায্যে বিধবার শোকাশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল!! তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে বৃক্ষের মূলে তিনি অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ঐ গাব-গাছের সন্নিকটস্থ সেই অশ্বত্থবৃক্ষমূল ইষ্টক দ্বারা গাঁথান হইয়াছে। ঐ স্থানটুকু "অশোকতলা" বলিয়া খ্যাত। এই 'সহমরণ' অনুষ্ঠানের ভীষণতা দর্শনে রাজার অন্তরে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, সহমরণ-রাহিত্যের জন্য তাঁহার অদম্য চেষ্টার ফলে, উহার প্রতিকূলে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহা হইতেই তিনি বহুদিন পরে সান্ত্বনা পাইলেন। ঐ অনুমরণ ইং ১৮১১ সালে ঘটে।

প্যারীমোহনের কাছারীবাটী হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই হরিমোহনের পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দ-

রীর কাছারীবাটী; তাহার সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী। ইং ১৯১৬ সাল হইতে রাজার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ কারণে যাঁহারা রাধানগরে যাতায়াত করিতেছেন, গোপালসুন্দরীর আতিথ্য তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ অসুবিধা হইতে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার মত আশ্রয়দাত্রী না পাইলে বিড়ম্বনা ও দুর্গতির সীমা থাকিত না। তিনি অকাতরে অন্নদান ও আশ্রয়দান করিতেছেন। প্যারীমোহনের পোষ্যপুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন লাঙ্গুলপাড়ায় না থাকিলেও তিনি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের অন্যতম সহায়।

রাধানগর সুবিখ্যাত ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু স্বনামধন্য মনীষিবৃন্দের জন্মভূমি। কিন্তু অধুনা তাঁহারা বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ কেহই এখানে বাস করেন না। তাঁহাদের আবাসস্থান পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান জনহীন। রাধানগরের পরবর্ত্তী গ্রাম, যাহা লাঙ্গুলপাড়া গ্রামের সম্মুখস্থ নদীর পরপারে অবস্থিত, তথায় বৌদ্ধমন্দিরাদি, দোলমঞ্চ ও ধর্ম্মঠাকুর রহিয়াছেন; কিন্তু চারিদিক হইতে অরণ্য জাগিয়া উঠিতেছে। এই রাধানগর, কৃষ্ণনগর, খানাকুল, গোপালপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া সে সময় যে সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রসিদ্ধি সর্ব্বত্র সুবিদিত। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে অসংখ্য টোল এতদঞ্চলে অসংখ্য ছাত্রবর্গকে বিনামূল্যে শিক্ষা দান করিত। এখানে দিক্‌বিজয়ী কয়েকজন পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কণাদ তর্কবাগীশ, মিথিলা হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্র আনয়ন করেন এবং নিজে উক্ত দুরূহ শাস্ত্রের 'ভাষারত্ন' নামে এক টীকা রচনা করেন। এখানকার পণ্ডিতগণের সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান এতই সুগভীর ছিল যে, স্মার্ত্তকার রঘুনন্দনের সকল মত তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা শাস্ত্র সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিতেন, খানাকুল কৃষ্ণনগরের মত বলিয়া তাহা খ্যাত ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজ করিত। সুবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাঠ এইখানেই বিরাজিত। গোপীনাথের মন্দির কারুকার্য্যের আদর্শস্থানীয়। কথিত আছে, মহাপ্রভু ও অনেকানেক ভক্ত বৈষ্ণবের পদধূলি এইখানে পড়িয়াছিল।* আমরা এতক্ষণ এই সকল স্থানের পরিচয় দান করিলাম। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে আমরা কয়েকটী বিষয় নিজে লক্ষ্য করিবার জন্য এখানে আসি।

যে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে উহা বাস্তবিকই মহাত্মা রাজা রামমোহনের গুরুত্বের ও মহত্ত্বের উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের তলদেশ হইতে জমির উপরে উচ্চে চারি হাত পর্য্যন্ত ভিত্তি বড় বড় প্রস্তরে গ্রথিত, তাহার উপর প্রায় তিন হাত প্রশস্ত ভিতের উপর ছাদ অবস্থান করিতেছে। মধ্যস্থানের হলটী ৪০ ফুট লম্বা ও কুড়ি ফুট প্রস্থ। হলের উভয় পার্শ্বে ছাদে ঢাকা বারাণ্ডা। হলের অপর প্রান্তে প্রায় অর্দ্ধ গোলাকৃতি আর একটী ছোট হল, তাহার উপর ছাদ বা ডোম প্রস্তুত হয় নাই। সম্মুখে প্রশস্ত সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেই হলের সম্মুখে সুরচিত প্রস্তরের থাম, ও প্রস্তরের খিলান। উহার ছাদ আজও হয় নাই। বাটীর চারি কোণে চারিটি প্রকোষ্ঠ। এই স্মৃতিমন্দিরের এক পার্শ্বে রায়বংশের কয়েক জন আজও বাস করিতেছেন। সম্মুখে শত ফুট দূরে নদী বহিয়া যাইতেছে। মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি কালে-

---

* শ্রীশ্রীঅভিরাম-লীলামৃত নামক পুস্তিকাতে আছে :—

(১)

অভিরাম লীলাস্থান অতি মনোহর।
মাণিক স্থানেশ ভূতনাথ ঘণ্টেশ্বর
চারি স্বয়ম্ভু নগরে শোভে চারি ধার
তন্মধ্যে বিরাজে মহাপ্রভু গোপীনাথ।

(২)

তন্মধ্যে বিরাজে মহাপ্রভু গোপীনাথ
হরেকৃষ্ণ কবে কাশী শ্রীব্রজ সাক্ষাৎ।
সজ্জন সমাজ ধন্য শ্রীকৃষ্ণনগর—
গোপীনাথ শোভে তাহে অতি মনোহর।

(৩)

রত্নাকর নদী ধন্য তীর্থ তব তটপূর্ণ
গোপীনাথে বক্ষে করি গুপ্ত বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যত গৌর-ভক্তবৃন্দ
দ্বাদশ পাঠের কেন্দ্র শ্রীপাঠ প্রথম।

(৪)

শ্রীদ্বারকেশ্বর-তটে রত্নাকর সন্নিকটে
বিরাজ মোহনরূপে লয়ে গোপীগণ।
শ্রীপাঠ কৃষ্ণনগর খানাকুল মনোহর
পরম আনন্দকর জুড়ায় নয়ন।
গুপ্ত বৃন্দাবনে আছ, ছাড় বৃন্দাবন।

(৫)

শ্রীকৃষ্ণনগর ধাম দ্বাদশ পাঠ প্রধান—
দ্বারকেশ্বর যাহার যমুনার প্রায়।
তুমি যথা, বৃন্দাবন যথার্থ তথায়।

(৬)

মধ্যে মধ্যে প্রভু, নিত্যানন্দগণ সনে—
আইলেন প্রিয় অভিরামের ভবনে।
অভিরামের বাটীতে করিয়া সন্ন্যাস—
শ্রীগৌরাঙ্গ করিলেন বাস ছয়মাস।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। অভিরামের আবির্ভাবের পরে ইহা গুপ্তবৃন্দাবন বলিয়া খ্যাত। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সম্মুখস্থ দ্বারকেশ্বর নদীর এই অংশ রত্নাকর নামে খ্যাত; ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।
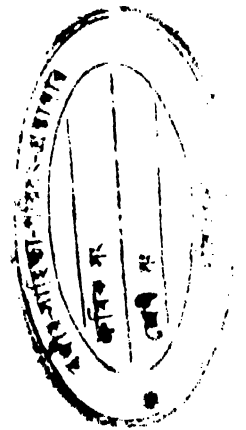
ক্টরের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে। জমির মূল্য ছাড়িয়া দিলে, স্মৃতিমন্দিরের উপকরণের ও গঠনের মূল্য কালকাতার তিনটি ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটির অপেক্ষা অল্প হইবে না; বহিঃসৌন্দর্য্যেও ইহা চিত্তাকর্ষক। কার্য্য শেষ হইতে এখনও ২৫।৩০ হাজার টাকার আবশ্যক। ইতিমধ্যে ৪০।৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, মনে হয়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্য্যন্ত গাঁথুনিতে যে ইষ্টক ব্যবহার হইয়াছে, তাহার প্রতিখানিতে 'ওতৎসৎ' এই কয়েকটি অক্ষর খোদিত।

রাজার প্রতিভা বিকাশের অনুকূল স্থানীয় অবস্থা। বসতবাটীর সম্মুখস্থ বর্ষার খরস্রোতা বিশালকলেবরা নদী ও বাটীর অপর পার্শ্বে সুদূরবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র, এই দুইটী তাঁহার অন্তরে অনন্তের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রাজার পিতৃবংশ শাক্ত, মাতৃবংশ বৈষ্ণব। এই উভয়ের সাধনগত বৈষম্য তাঁহার অন্তরে সত্যপথ নিরাকরণের চেষ্টা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এখানকার অসাধারণ পণ্ডিতগণের তেজস্বিতা এবং রঘুনন্দনকে অতিক্রম করিয়া কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতের স্বাধীনতা তাঁহাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার জন্য অবসর দিয়াছিল। সহমরণের বীভৎস দৃশ্য যাহা তদানীন্তন কালের ধর্ম্মের একটি অঙ্গ, ইহা তাঁহার অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; এবং ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি কি তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহার তরুণ হৃদয়কে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। পরে পিতামাতার নিকট হইতে অনাদর, নিজ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার ব্যাপার, তাঁহাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে এবং নিজের স্বাধীন মতের উপরে আরও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। ধ্রুব যেমন পিতার নিকট অবমাননা ও তিরস্কার লাভ করিয়া মাতা সুনীতির নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম" আমি সেই স্থান লাভ করিতে চাই, যাহা আমার পিতাও লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ সংকল্প তাঁহারও অন্তরে উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল। ষোড়শ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া হিমাচল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে ভাব অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাতে পশুপ্রীতি তাঁহার অন্তরে স্থান পাইয়াছিল, তাই তিনি আদি-ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এখানে পশুবধ আদৌ হইবে না। পরে আরব্য ও পারস্য ভাষা পাঠ করিতে করিতে নিরবয়ব ব্রহ্মের সন্ধান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মসজিদে যে কোনরূপ ছবি বা মূর্ত্তি স্থান পায় না, ইহার মূল্য বুঝিয়া ট্রষ্টডীডে লিখিয়াছিলেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে কোনরূপ ছবি বা মূর্ত্তি থাকিতে পারিবে না। পরিশেষে কাশীতে গিয়া উপনিষদ ও বেদান্তগ্রন্থাদি পাঠে তাঁহার হৃদয়ের ভাব আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। মাতার দিক দিয়া তিনি বৈষ্ণবের সংস্কার যেটুকু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সঙ্গীতকে তিনি উপাসনার অঙ্গীভূত করিয়া দিলেন। তিনি নিজে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে ধর্ম্মপ্রচারে উচ্চস্থান প্রদান করিলেন। তিনি নিজে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ বড় কেহ ছিল না, ইহা জানিয়াও তিনি বেদবিৎ ও বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আচার্য্যের স্থান দিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষিও এ বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজা নিজে কখন আচার্য্যের স্থান অধিকার করেন নাই। পুস্তিকা রচনাতেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নিবদ্ধ ছিল। তিনি নিজে ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদকে জনসমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠা দান করিতে হইলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপককে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাদিগকে হস্তগত করা চাই; তাই তিনি উৎসবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিতেন। সকল ধর্ম্মের ভিতর সত্যের অল্লাধিক বিকাশ উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার উপলব্ধির বিরাটতায় কাহাকেও অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই, অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করেন নাই, সত্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য ও সকলকে বুঝিবার অবসর দান করিবার জন্য, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বার সকলের সমক্ষে তুল্যভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, অথচ এই ধর্ম্মে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া গেলেন। নিজেও আহার-বিহারে ও পরিচ্ছদে জাতীয় ভাব রক্ষা করিলেন। রাজার ভাবকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বিরাট হৃদয় লইয়া তাঁহার আবির্ভাব, বিশাল সাধনা লইয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব পরিণতি, ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রাখর্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার অভিব্যক্তি।

রাজার অন্তঃকরণ তেজ ও উদার। রাজা একভাবে সত্যের দ্রষ্টা—ঋষি। তিনি যেমন অসঙ্কুচিত ভাবে সত্যকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র মানবসমাজে অতি বিরল। তিনি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলের ধর্ম্মশাস্ত্র ধীরতার সহিত পূর্ব্ব সংস্কারবিবর্জ্জিত হইয়া গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাই তিনি "তহফুতল মোহাদিন" গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন এবং Precepts & Jesus সঙ্কলন করিতে পারিয়াছিলেন। রাজার যুগে এই উদারতা ও অন্য ধর্ম্মের ভিতরে সত্যের উপলব্ধি দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া যাই। তর্ক করিতে গিয়া তিনি কাহাকেও নির্ম্মমভাবে আঘাত করেন নাই; কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, কি

নৈতিক ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ব্যাপারে তিনি সত্যের সেবক ছিলেন। সত্যই তাঁহার পরিচালক এবং সত্যই তাঁহার পথপ্রদর্শক। এই সত্যই তাঁহাকে অজেয় বীর্য্য দান করিয়াছিল। তিনি জ্ঞানের পথে চিরকাল বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে এমন একটি বিনয়ের ভাব ছিল যে, সেই বিনয় তাঁহাকে জ্ঞানের গর্ব্ব ও অহঙ্কার হইতে প্রহরীর ন্যায় চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নামের ও যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। এত বড় মহাপণ্ডিত, এত বড় হৃদয়বান্ ব্যক্তি, নিজ রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতে যাহার অপূর্ব্ব বিকাশ, এত বড় চক্ষুষ্মান মহাপুরুষ, আমরা আজও তাঁহাকে সম্প্রদায়বিক্ষুব্ধবুদ্ধিতে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, Comparative Theology-র জন্মদাতাকে তাঁহার ন্যায্য সম্মান দিতে পারিলাম না। পাষাণে ইষ্টকে বিনির্ম্মিত স্মৃতিমন্দির শতবর্ষ পরে তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিতেছে বটে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্য, এ দেশের জন্য ধর্ম্মকে জ্ঞানের প্রেমের অনুগত করিবার জন্য যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের আমাদের ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র। যদি একেশ্বরবাদকে হৃদয়ের ভিতরে সমস্ত অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, বিলাসবর্জ্জিত বৈরাগ্যের সহিত যদি উহার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, উপনিষদের ভাবে ও মন্ত্রে যদি ঈশ্বরের যশোগান করিতে পারি, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবিহীন হইতে পারি, অকারণ নিন্দাবাদের পরিবর্ত্তে সহৃদয়তার পরিচয় দান করিতে পারি, সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে যদি আপনাকে মুক্তিদান করিতে পারি, তবেই আমরা রাজার অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণ আংশিক ভাবে পরিশোধ করিতে পারিব, তাঁহার প্রাপ্য গুরুদক্ষিণা কতক পরিমাণে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব, অন্যথা নহে।

মহাভারতীয় যুদ্ধের তারিখনির্ণয়।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

আর একটী পরোক্ষ প্রমাণ আছে, উহা অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে যুদ্ধারম্ভের মতটী সমর্থন করে। ভীষ্মপর্ব্বে এই শ্লোকটী রহিয়াছে।

"শ্বেতো গ্রহস্তথা চিত্রাং সমতিক্রম্য তিষ্ঠতি।
অভাবং হি বিশেষেণ কুরূণাং তত্র পশ্যতি॥"

ভীষ্ম ৩—১২।

এখানে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্বেত নামক ধূমকেতু চিত্রা নক্ষত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উক্ত দিনে কৌরবপক্ষীয়ের ভীষণ ক্ষতি সূচিত করিতেছে।

"শ্বেত ইতি জটাকারা রুক্ষঃ পাপো নিয়মিতাগগতঃ।
বিনিবর্ত্ততেঽপসব্য ত্রিভাগশেষাঃ প্রজাঃ কুরুতে॥"

এক্ষণে অগ্রহায়ণের একাদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ধরিয়া লইলে, যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিনে চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করে এবং এই বিশেষ দিনেই অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকির হস্তে দিবাভাগে এবং ঘটোৎকচের হস্তে রাত্রিতে, কৌরবেরা ভীষণ পরাজয় লাভ করিয়াছিল।

যুদ্ধশেষ হইলে পাণ্ডবগণ তীর্থস্নানাদির জন্য ত্রিশ দিন ওঘবতী নদীতীরে বিশ্রাম করেন। অনন্তর আরও ৯০ দিন পরে অর্থাৎ যুদ্ধশেষ হইতে পঞ্চাশত্তম এবং ভীষ্মের পতন হইতে অষ্টপঞ্চাশত্তম দিনে, সূর্য্য উত্তরমুখী হইতে আরম্ভ করে। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সকলে ভীষ্মের নিকট বিদায় লইতে আগমন করেন। তখন ভীষ্ম নিম্নোক্ত কথাগুলি দ্বারা তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করেন।

"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥"

অনুশাসন-অধ্যায় ১৬৭—১৭—২৭।

এতদ্দ্বারা তখন যে মাঘ মাস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু শ্লোকগুলির অবশিষ্টাংশ বিভিন্ন লেখক তাঁহাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনার্থ বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। ইহার অর্থ স্পষ্টই বুঝা যায়। এইটী মাঘ মাস এবং এই পক্ষ, যাহার একাংশ ইতিপূর্ব্বেই অতিবাহিত হইয়াছে ও এখনও তিন অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে — শুক্ল পক্ষ বলিয়াই গণ্য হওয়াই উচিত। ইহা স্পষ্টই দেখাইয়া দেয় যে, উক্ত পক্ষ শুক্লপক্ষ ছিল না, তথাপি ভীষ্ম দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ইহা শুক্লপক্ষেরই সমান ছিল. কারণ ইহার কেবলমাত্র একাংশ গত হইয়াছে, তিন অংশ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত পক্ষটী যদি যথার্থই শুক্লপক্ষ হইত তাহা হইলে, "ইহা শুক্লপক্ষ বলিয়াই গণ্য হওয়াই উচিত," এই বাক্যের কোন সার্থকতা থাকিত না। ইহা ব্যতীত যদি আমরা পক্ষটীকে মাঘের শুক্লপক্ষ বলিয়াই ধরিয়া লই, তাহা হইলে আমরা ভীষ্মের পতন হইতে ৫৮ দিন পাই না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে. ভীষ্ম অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠীতিথিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হন। অতএব তাহা হইতে ৫৮ দিন গণনা করিয়া, আমরা মাঘের কৃষ্ণচতুর্থী কিংবা একটী ক্ষয়তিথি ধরিয়া মাঘের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে উপস্থিত হই। আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে, যুদ্ধ অনুবৎসরে আরম্ভ হইয়াছিল এবং যে হেতু বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনুসারে মাঘ মাস হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়,

বৎসরটী তখন ইন্দ্বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইল। ইন্দ্বৎসরে উত্তরায়ণ মাঘের কৃষ্ণাচতুর্থীতে আরম্ভ হয়। অতএব ধর্ম্ম নিশ্চয়ই মাঘের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে ভীষ্মের নিকট আসিয়াছিলেন এবং এই দিনটী "ত্রিভাগশেষপক্ষোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়, কারণ উক্ত পক্ষের তিন দিন গত হইয়া এখনও ১১ দিন অবশিষ্ট ছিল। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, ভীষ্ম মাঘের শুক্ল অষ্টমীতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, ভীষ্ম মাত্র ৪৭ দিন যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথিতমত ৫৮ দিন নহে; তদ্ব্যতীত "ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি" এই শ্লোকটী একটী অর্থহীন প্রলাপ-বাক্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমরা অবশ্যই ধরিয়া লইব যে, ভীষ্ম মাঘের কৃষ্ণপঞ্চমীতে অর্থাৎ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনুসারে ইন্দ্বৎসরে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবার একদিন পরে দেহত্যাগ করেন।

নিম্নে এই কালনির্ণয়ের সারসন্নিবেশ করা গেল:—

(১) অগ্রহায়ণের শুক্ল একাদশী তিথিতে ভরণী নক্ষত্রে যুদ্ধারম্ভ।

(২) অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে (অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ প্রতিপদ্ ক্ষয়তিথি হওয়ায়) মঘানক্ষত্রে (ভরণী ও মঘার মধ্যস্থিত কোন একটী নক্ষত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়) ভীষ্মের পতন।

(৩) রাত্রিতে জয়দ্রথের পতন, ঘটোৎকচের নিধন এবং চন্দ্রোদয়ের পর পুনরায় যুদ্ধারম্ভ।

(৪) অগ্রহায়ণের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে রোহিণী নক্ষত্রে (পরে জ্যেষ্ঠা নামে অভিহিত) দুর্য্যোধনের মৃত্যু এবং অশ্বত্থামার নিশীথ-আক্রমণ।

(৫) মাঘের কৃষ্ণচতুর্থীতে (মাঘের কৃষ্ণতৃতীয়া ক্ষয়তিথি হওয়ায়) উত্তরায়ণ আরম্ভ।

(৬) যুদ্ধক্ষেত্রে ৫৮ দিন শয়নের পর মাঘের কৃষ্ণপঞ্চমীতে ভীষ্মের দেহত্যাগ।

এই কালতালিকা প্রায় সমস্ত সমস্যারই সমাধান করে, কিন্তু লৌকিক প্রবাদ অনুসারে ইহাতে দুইটী প্রধান দোষ আছে। ভীষ্ম মাঘীয় শুদি (শুক্ল) অষ্টমীতে লোকান্তরিত হন বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু যদি আমরা উক্ত দিনটীকে ঠিক বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে উপরোক্ত কোন শ্লোকের সহিতই তাহার মিল হয় না। এতদ্ব্যতীত, মহাভারতের কোথাও নিঃসংশয়রূপে উল্লিখিত নাই যে, ভীষ্ম মাঘীয় শুদি অষ্টমীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ "ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি" এই শ্লোকাংশের ঐরূপ অর্থ কিছুতেই করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভীষ্ম মাঘীয় শুদি অষ্টমীতে এই ধরাধাম ত্যাগ করেন, এই জনপ্রবাদ আসিল কিরূপে? বেদাঙ্গ জ্যোতিষ হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষমতে এক কালচক্রের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটী বৎসরে পাঁচটা বিভিন্ন তিথিতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। উক্ত তিথিগুলি নিম্নোক্ত ক্রমানুসারী:—

(১) মাঘ শুক্লপ্রতিপদ্; (২) মাঘ শুক্লত্রয়োদশী; (৩) মাঘ কৃষ্ণ দশমী; (৪) মাঘ শুক্ল সপ্তমী; (৫) মাঘ কৃষ্ণচতুর্থী।

সাংবৎসরিক উৎসবের মাস নির্দ্ধারণের সাধারণ নিয়ম এই যে, ইহা প্রত্যেক বৎসর সেই মাসের কোন তিথি ধরিয়া হয়—উহা উত্তরায়ন কিংবা দক্ষিণায়নে পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না; কিন্তু যখন ভীষ্ম উত্তরায়ণ আরম্ভের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সাংবৎসরিক চান্দ্র মাস ও তিথি ধরিয়া নয়, কিন্তু প্রত্যেক বৎসর উত্তরায়ণের আরম্ভ দিবস অনুযায়ী সৌর মাসের বিভিন্ন তিথিতে সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। যদি এই অনুমান সম্ভব বলিয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে ইহা স্বাভাবিক যে, কতক বৎসর পরে, ভীষ্মের দেহত্যাগের মাসের ঠিক তিথিটী অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল এবং আমরা কেবল ইহাই জানি যে উক্ত তিথিটী উত্তরায়ণ আরম্ভের একদিন পরবর্ত্তী। এই হিসাবে যথাক্রমে পাঁচটী বিভিন্ন তিথিই উক্ত সাংবৎসরিক উৎসবের তিথি বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু বহুবৎসরব্যাপী দীর্ঘকাল পরে, অয়নাংশ পরিবর্ত্তিত হওয়ার (precession of the equinoxes) কারণে উত্তরায়ণ মাঘ মাসে না হইয়া পৌষ মাসে আরম্ভ হয়, কাজেই মাঘ মাসের কোন বিশেষ দিনই উত্তরায়ণ আরম্ভের দিন বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ইহার পর প্রকৃত ভীষ্ম-সাংবৎসরিক বলিয়া মাঘ মাসের কোন বিশেষ তিথিকে পুণ্যতিথি ধরা যাইতে পারে না। অতএব পঞ্চবার্ষিক কালচক্রের পাঁচটী বিভিন্ন তিথির মধ্য হইতে মাঘী শুদি অষ্টমীকে সাধারণ লোকের ভীষ্ম-সাংবৎসরিক তিথি ধরা স্বাভাবিক।

"চত্বারিংশদ্দিনান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ। পুষ্যেণ সংপ্রযাতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥" এই শ্লোকটী সম্বন্ধে দ্বিতীয় সমস্যা আছে। যে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা কর, এই শ্লোককে উপরোক্ত সকল বিষয়গুলির সহিত খাপ খাওয়াইতে পারা যায় না। কিন্তু গদাপর্ব্বের যে অংশে এই শ্লোকটী আছে, তাহা যখন স্পষ্টই প্রক্ষিপ্ত, তখন এই শ্লোকের উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করা যাইতে পারে না। বিভিন্ন টীকাকার অপরাপর শ্লোকের স্বকৃত ব্যাখ্যার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য এই শ্লোকটীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; যদি আমারও ঐরূপ অধিকারের দাবী করিতে পারি তাহা হইলে আমিও উহাকে নিম্নোক্তপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই:—

অহো নিঃশত্যাহানাস্থ কুরুক্ষেত্রাং গতশা মে।
মৈত্রেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি রোহিণ্যাং পুনরাগতঃ ॥

যুদ্ধারম্ভের দুই দিন পূর্ব্বে অগ্রহায়ণের শুদি নবমীতে, চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে যখন ছিল, বলরাম শিবির ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। সূর্য্য রেবতীর অধিপতি। এইজন্য ইহাকে মৈত্র নক্ষত্র বলা হয়; সেই জন্যই শল্যপর্ব্বের ২৫—১৪ অধ্যায়ে বলরাম মৈত্র নক্ষত্র যোগে তীর্থযাত্রা করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রেবতী পুষ্যা নক্ষত্রের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বলরাম পুষ্যাযোগে গিয়াছিলেন ইহাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে প্রত্যাবৃত্ত হন, যাহাকে সেই সময় রোহিণী বলা হইত। কিন্তু সৌতির সময় জ্যেষ্ঠা নামটী প্রচলিত হইয়া ছিল সুতরাং রোহিণীকে জ্যেষ্ঠা অর্থে হয়তো ভুল বুঝিয়াছিল এবং রোহিণী শব্দ সম্ভবত একই নামের আর একটী নক্ষত্র বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই অবধি এই দ্বিতীয় রোহিণী পুষ্য নক্ষত্রের মতই শুভসূচক ধরা হইতেছে। ধরা যাইতে পারে যে, বলরাম বলিয়াছিলেন যে তিনি পুষ্যাযোগেও প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। একটা বিষয় ঠিক যে, যেস্থলেই গ্রন্থকার পুষ্যাযোগ শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন সেই স্থলে তিনি কেবলমাত্র পুষ্যা নক্ষত্রকে মনে করেন নাই, পরন্তু শুভসূচক হিসাবে পুষ্যার সমপর্য্যায়ভুক্ত যে কোন নক্ষত্রকে উদ্দেশ করিয়াই উহা ব্যবহার করিয়াছেন। পুষ্যাযোগ আবার কিরূপে শ্রবণায় পরিবর্ত্তিত হইল ইহা একটী রহস্য, এবং যখন কোন আকস্মিক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না, তখন এই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করাই বৃথা। এই শ্লোকটী অন্য শ্লোকগুলির যে কোন ব্যাখ্যার অর্গলরূপে দাড়াইয়া আছে বলিয়া উহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

জনপ্রবাদ অনুসারে অগ্রহায়ণের একাদশ দিবসই যুদ্ধারম্ভের দিন, কারণ এই দিনই মোক্ষৈকাদশী, এবং দক্ষিণ ভারতে আর একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে ঐদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবর হইতে একটা দেবী বহির্গত হইয়া আসিয়াছিলেন।

মহাভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে আমরা কতকগুলি শ্লোক পাই; ঐ সকল শ্লোকে সূর্য্যাস্তের পরই যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ অন্ধকার আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা আছে। যুদ্ধের সপ্তম দিনের পূর্ব্বে এরূপ অন্ধকারের উল্লেখ নাই। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, সপ্তম দিনের পর অবধি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জ্যোৎস্নার বর্ণনা আছে। চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা বিশেষতঃ—

"ততো মুহূর্ত্তাৎ ভগবান্ পুরস্তাৎ শশলক্ষণঃ।
অরুণং দর্শয়ামাস গ্রসন্ জ্যোতিঃ প্রভাং প্রভুঃ ॥
ততো মুহূর্ত্তাং ভুবনং জ্যোতির্ভূতমিবাভবং।
ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্ত্তত ॥"

—ইত্যাদি দ্রোণপর্ব্বের অন্তর্গত ১০৪—১৮৬ অধ্যায়ের শ্লোকগুলি, উক্ত রাত্রি যে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ দশমীর রাত্রি ছিল অর্থাৎ যুদ্ধ যে অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশীতেই আরম্ভ হইয়াছিল, এই মতটীই সুদৃঢ় করে। এবং ঐ দিনে গীতা যখন গীত হইয়াছিল তখন উক্ত দিনটীই গীতাজয়ন্তী দিবস।

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রিক্‌ষ গাড়ী।

পাল্কীর স্থান দেখি, সহসা অধিকার করিয়াছে "রিক্‌ষ" বা মানুষটানা দুই-চাকার গাড়ী। ইহার আসল নাম হইতেছে "জিন্‌রিক্‌ষ", সংক্ষেপে "রিক্‌ষ"। চীন ও জাপানে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। সম্ভবত অনেক ভারতীয় জাপানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাতায়াতের কারণে জাপান হইতেই ইহার আমদানী হইয়াছে। ঠিক যে কে ইহার প্রথম আমদানি করিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। যতদূর মনে পড়ে, আশ্চর্য্যজনক বস্তুরূপে দুই একখানি ঘরের রিক্‌ষ রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে ভাড়াটিয়া রিক্‌ষ সমস্ত সহরটাকে, বিশেষত উত্তরাংশ ছাইয়া ফেলিল। ইহার বহুল প্রচলনের যথেষ্ট কারণ আছে। পাল্কী অপেক্ষা ইহা যে সহজে চলে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ রিক্‌ষর ভিতরটা মখমলে মোড়া। গাড়ীগুলির চাকায় রবার চড়ানো। রিক্‌ষ এত হাল্কা যে, একটা মানুষেই সহজে জোরে টানিয়া লইয়া চলিতে পারে। ভিতরে দুইটী লোক বসিতে পারে এবং পা-দানিতে অল্প-স্বল্প মালপত্রও রাখা যাইতে পারে। ভাড়াও খুব সস্তা—অন্তত পাল্কীভাড়া সেকালে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা বড় বেশী নয়। আর, আজকাল যে যত শীঘ্র কাজ সারিতে পারিবে, সে তত বেশী লাভবান হইবে। পাল্কীতে দুইজন বসিয়া চলা সহজ ছিল না—তাহা লইয়া পাল্কীবেহারাদের সঙ্গে পদে পদে বকাবকি করিতে হইত। পাল্কীতে মালপত্র লইয়া চলা সম্ভবই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; তদ্ব্যতীত পাল্কী বহিবার জন্য অন্তত ৪ জন বেহারা আবশ্যক হইত। ৪ জন বেহারা পাল্কী বাহিয়া ঘণ্টায় যতদূর যাইবে, রিক্‌ষ একজন টানিয়া চলিয়া তাহার তিনগুণ না হোক, অন্তত দুইগুণ পথ সহজেই চলিয়া যাইবে।

চীনেম্যান বা চীনবাসীরা স্বদেশে ইহা চড়িতে অভ্যস্ত বলিয়া প্রথম প্রথম তাহারাই রিকশ বেশী ব্যবহার করিত। এখন ইহাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও মহিলাগণ চড়িতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু ঐ যে ইহার ভাড়া সস্তা এবং সেই কারণে ইহা বেশীর ভাগ দরিদ্র ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, অতএব উহাতে ধনী ব্যক্তি চড়িলে নাকি তাঁহাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, অর্থব্যয় করিবার ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতা বিবিধ উপায়ে প্রদর্শন করিবার উপরেই আজকালকার সম্ভ্রম দণ্ডায়মান—আমি এপ্রকার সম্ভ্রমের ভাবকে সম্ভ্রমের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি।

রিকশ চড়ায় সময়ে সময়ে এক-আধটা হাস্যকর ব্যাপারও ঘটিয়া থাকে। একবার এইরূপ একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একটী স্থূলকায় ব্যক্তি রিকশ চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে মোটরের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিতেই বাহক ভয়ত্রস্ত হইয়া একপাশে সরিয়া গিয়াই গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিল। রিকশটী সম্মুখে না নামিয়া একেবারে পশ্চাতে উল্টাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বেচারী আরোহীও উল্টাইয়া পড়িলেন! রিকশ থামাইবার নিয়ম হইতেছে সম্মুখে ঝুঁকাইয়া রাখা।

ঠিকাগাড়ীর আড্ডা।

সেকালের ঠিকাগাড়ীর কথাও বড়ই আমোদজনক। তখন ঠিকাগাড়ী ও পাল্কীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। পাল্কীর সংখ্যার অঙ্ক অনায়াসেই শতকের ঘরে এবং ঠিকাগাড়ীর প্রত্যেক শ্রেণীর সংখ্যার অঙ্ক সহস্রের ঘরে পড়িত। সেকালে ঠিকাগাড়ীর সংখ্যাও যেমন অধিক ছিল, ঠিকাগাড়ীওয়ালাদের প্রতাপও সেইরূপ প্রবল ছিল। আমাদের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ঠিকাগাড়ীর অনেকগুলি আড্ডা ছিল। সেই সকল আড্ডার অধিকারী ছিল অধিকাংশ স্থলেই এক-একজন হিন্দুস্থানী। আমাদের বাড়ীর খুব নিকটে চিৎপুর রোডের উপরেই যে আড্ডা ছিল, তাহার অধিকারী ছিল এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বটুবাবু। সকাল হইতে না হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আড্ডার মুখের কাছে বটুবাবু একটা বেঞ্চি পাতিয়া দুই একজন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিত—উদ্দেশ্য কোন গাড়োয়ান তাহাকে ঠকাইতে না পারে। গাড়ী-ঘোড়া ও তাহাদের জন্য যাহা কিছু খরচ সমস্তই বটুবাবুর; গাড়োয়ান তাহা খাটাইয়া যাহা রোজগার করিবে, তাহারই অংশ প্রতি ঘণ্টায় এত হিসাবে বটুবাবুকে দিবে। কাজেই গাড়োয়ান কখন্ গাড়ী-ঘোড়া বাহির করিল এবং কখন্ বা খাটাইয়া আড্ডায় লইয়া আসিল, তাহা সতর্কতার সঙ্গে দেখিতে হইত। বটুবাবু বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিবার মাঝখানেই গাড়োয়ানদের সঙ্গে ঘোড়ার দলাইমলাই লইয়া অথবা দানা কম দিয়াছে বলিয়া ভাঙ্গা গলায় মহা গোলযোগ লাগাইয়া দিত। তখন ঠিকাগাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আজকালকার মত পৃথক সহিস থাকিত না—গাড়োয়ানই সহিসেরও কাজ করিত। সমস্ত দিন-রাত বসে এইভাবে পাহারা দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না। চক্ষু হইতে নিদ্রাকে সরাইয়া রাখিবার জন্য একটা হাত-গড়গড়াতে তাওয়া-দেওয়া তামাক চড়াইয়া দিনরাত ধোঁয়া উড়াইতে বাধ্য হইত—বলা বাহুল্য তাহার গালে পান একটা-না-একটা বরাবর তোলা থাকিত। সেকালে পাহারাওয়ালারাও মনে হয় নিদ্রাদেবীর কিছু বেশী বশীভূত ছিল। তাহারাও মধ্যে মধ্যে চক্ষু হইতে ঘুম তাড়াইবার জন্য বটুবাবুর পার্শ্বে আসিয়া গালগল্প জুড়িয়া দিত এবং পান ও তামাকের অংশ পাইয়া বটুবাবুকে প্রাণের ভিতর হইতে বোধ হয় দীর্ঘজীবী হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া আবার অলস পদক্ষেপে স্বকার্য্যে হাজিরা দিতে প্রস্থান করিত। বটুবাবু যে ব্রাহ্মণ, তাহার সগর্ব্ব পরিচয় দিবার জন্য তাহার বুকের উপর দিয়া পৈতাগাছটী বেশ টান দিয়া ফেলা থাকিত; যদি কোর্ত্তা পরা থাকিত, তবে কোর্ত্তার উপর দিয়া উহার আধখানি বাহির করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বটুবাবু পশ্চাৎপদ হইত না।

দস্তুরির ব্যাপার।

ধনীদিগের গৃহের দ্বারবানদিগেরও সঙ্গে গাড়োয়ানেরা একটা বন্দোবস্ত করিতে ভুলিত না। আমরা বাড়ী হইতে পটলডাঙ্গাস্থিত সংস্কৃত কলেজে অনেক সময়েই দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকা গাড়ী করিয়া যাইতাম—প্রথম শ্রেণীর ঠিকা গাড়ী তখনও দেখা দেয় নাই। ১০টা বাজিলেই দরওয়ানের উপর হুকুম হইল—গাড়ী লে আও। দরওয়ান গাড়ী লইয়া আসিল—ভাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল ছয় আনা; দরওয়ানের দক্ষিণা মিলিল একটী পয়সা। যে গাড়োয়ান একটী পয়সা দিতে অসম্মত হইত, তাহার গাড়ী আনা হইত না। গাড়োয়ান দেখিল, একটা পয়সার বিনময়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিলেই ছয় আনা লাভ—আইনত একঘণ্টা খাটিলে বারো আনা উপার্জ্জনের কথা—কাজেই গাড়োয়ান পয়সাটী দিতে কোনই আপত্তি করিত না। আবার বৈকালে ৪টার সময় যখন স্কুল হইতে আনিবার জন্য দরওয়ান যাইত, তখনও সে সেই বটুবাবুরই একটা ঘরঘরে নামমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী লইয়া যাইত এবং দস্তুরি এক পয়সা পকেটস্থ করিত। সেকালে দাসদাসীদের মধ্যে এই একটা ফ্যাষন ছিল যে, তাহাদিগকে যতই বেশী বেতন দেওয়া হোক না কেন, কোন প্রকার "উপরি" লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহারা কিছুতেই

সন্তুষ্ট হইত না। ক্রমে পুরাতন দরওয়ান বাড়ী গেল, তাহার স্থলে এক নূতন দরওয়ান আসিল—এ সেই ঈশপের King Logএর পরিবর্ত্তে King Storm আসার গল্পের সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল। দস্তুরির মাত্রা এক পয়সার স্থলে দুই পয়সায় উঠিল। কাজেই স্কুলে যাইবার গাড়ীভাড়াও তখন ছয় আনার স্থলে সাত আনায় দাঁড়াইল—নইলে গাড়ী পাওয়াই যায় না! ক্রমে এই দস্তুরিপ্রথা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, একজন দরওয়ান প্রকাশ্যভাবে নূতন এক গাড়োয়ানকে শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে, "তুমি প্রচলিত ভাড়ার উপর এতটা বেশী চাও, তাহার অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তোমার।" আমি উপর হইতে তাহা শুনিতে পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলাম—তাহার ফলে সেই দরওয়ানকে তাহার ঘরসংসার দেখিবার জন্য যথাসত্বর দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

সমস্ত গাড়োয়ানরা তখন এমনই একজোট ছিল যে, তুমি এ আড্ডায় গাড়ীভাড়া গাড়োয়ানের কথামত না দিলে অন্য আড্ডা হইতেও তোমার গাড়ী পাওয়া মুস্কিল হইত। ঠিকাগাড়ী করিয়া সেকালে যখন সাঁতরাগাছি, আন্দুল বা বেহালা যাইতাম, সেই সময়েই গাড়োয়ান ও দরওয়ানদের মধ্যে মহা আনন্দ। দরওয়ানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়িয়া যাইত যে, কে গাড়ী ঠিক করিবে—যে ঠিক করিবে, সেই মোটা রকমের দস্তুরি পাইবে। কিন্তু এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্রমে যখন দরওয়ানদের মধ্যে গৃহবিবাদ পাকিয়া উঠিবার উপক্রম হইল, তখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা হইল যে, মোটারকমের দস্তুরি যে-ই কেন পাক্ না, তাহা সব কয়জন দরওয়ানের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইবে। সাঁতরাগাছি প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতি ভাড়া ৩৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল; কাজেই দরওয়ানদের দস্তুরিও চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত লাভ হইত—তাহা দিতে গাড়োয়ানদের বড় একটা গায়ে লাগিত না। এখন সে স্থলে ঐ সকল দূরবর্ত্তী স্থানে এক টাকার ভিতর যাতায়াত এবং ইচ্ছামত যাতায়াত চলে—যখন ইচ্ছা তখনই চলিলাম, আবার যখন ইচ্ছা তখনই ফিরিয়া আসিলাম—গাড়োয়ানদের বাক্যবাণ সহ্য করিবারও অবসর হয় না। সস্তার একটা নমুনা দিই—আজকাল ১০।১২ মাইল দূরস্থিত বেহালায় যাতায়াত পাঁচ আনার মধ্যে হইয়া যায়।

ঠিকাগাড়ীর মালিক ও গাড়োয়ানদিগের প্রতাপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহারা যে ভাড়া চাহিবে, সেই ভাড়া না দিলে সওয়ারি লইবে না—তাহাদের ইচ্ছামত যাতায়াতে সওয়ারি লইবে না, কেবল পৌঁছাইয়া চলিয়া আসিবে। তখন গাড়ীর লাইসেন্স দেওয়া কলিকাতার মিউনিসিপালিটির অধীনে ছিল। গাড়োয়ান সওয়ারি না লইলে অথবা অন্যায় ভাড়া দাবী করিলে গাড়ীর মালিকের নামে না হয় নালিশ করা হইল—নালিশ করিলে না হয় তাহার দণ্ড হইবে—কিন্তু মালিকের নাম পাওয়া যায় কিরূপে? মালিকের নাম-টুকু পাইবার জন্য মিউনিসিপালিটির সঙ্গে অনন্ত চিঠি লেখালেখি করিতে কেহই রাজি হইত না—সেকালের মিউনিসিপালিটির নিকট হইতে চিঠির উত্তর পাওয়া শুনিয়াছি এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। নানা কারণে, বিশেষত গাড়োয়ানদিগের অত্যাচারে আরোহীগণের উত্যক্ত হইবার কারণে, লাইসেন্স দিবার ভার মিউনিসিপালিটি পুলিশের উপর সমর্পণ করিল। পুলিশ জনসাধারণকে সহজে গাড়ীর মালিকগণের নামের সন্ধান দিবার জন্য গাড়ীর দরজার উপরে তাহাদের নাম এবং দরজার নিম্নভাগে খুব বড় বড় অক্ষরে গাড়ীর নম্বর সাদা রং দিয়া লিখাইতে বাধ্য করিল। ইহার ফলে পুলিশেরা দুষ্ট গাড়োয়ানদিগকে ধরপাকড় করিবার এবং অত্যাচারিত আরোহীদিগের উহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার সুবিধা হইল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ানদিগের অত্যাচারের মাত্রাও কিছু কমিয়া গেল। কিন্তু ইহা সাময়িক মাত্র। অবশেষে ট্রামগাড়ী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঠিকা গাড়োয়ানদিগের বিষদন্ত খসিয়া গেল।

অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

(জনৈক শিক্ষক)

ছেলেরা যদি কোন সভায় যায়, তবে সেখানে কি দেখে? দেখে যে, সদাচারের প্রতি সকলেই মনোযোগ দিতেছে—পরস্পরের প্রতি সকলেই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। ইহাই হইল সভ্যতা ও ভদ্রতা। গুরুজন আসিলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হয়, তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়—এই প্রকার আচার-ব্যবহার হইল এদেশীয় সভ্যতার অঙ্গ, ভদ্রতার অনুষঙ্গী। আবার আদালতে যদি যাও বা রাজসভায় যদি যাও, সেখানে বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে হয়। ভদ্র নাম পাইতে চাহিলে যেস্থলে যে প্রকার ব্যবহার করা উচিত, সেই প্রকারই ব্যবহার করিবে। ইউরোপীয়গণ মাথায় টুপি সরলভাবে পরে, ইহা সকলেই জানে। আমি দেখিয়াছি, এক ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক ইংরাজ ধনী ব্যবসায়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন, সেই ব্যবসায়ী সাধারণ ইংরাজের ন্যায় সরল-ভাবে টুপি না পরিয়া মাতাল সাহেবেরা অনেক সময়ে যেমন বাঁকাইয়া টুপি পরে, সেই ধরণে টুপি পরিয়া ঢুকিলেন—ঢুকিয়া পরে টুপি খুলিয়া ফেলিলেন। আমিও সেখানে কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত ছিলাম। সে চলিয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে স্পষ্ট বলিলেন—এই লোকটী সভ্যতা জানে না, নিতান্ত অসভ্য—নিজের ধনবত্তা দেখাইবার জন্য এই রকম বেপরোয়া ধরণে টুপি পরিয়াছিল।

সমাজে উন্নত আসন অথবা বড় পদবী থাকিলেই যে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রত্যেককেই যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনই সভ্যভব্য লোকের উপযুক্ত কার্য্য। সিসিলির রাজা অ্যালফন্‌জো একবার রাজপরিচ্ছদ ছাড়িয়া গুপ্তভাবে ক্যাম্পেনিয়া প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পথে দেখেন যে, এক গর্দ্দভ-চালকের গর্দ্দভের পা কাদায় বসিয়া গিয়াছে—গর্দ্দভ কিছুতেই উঠিতে পারিতেছে না। চালক জানে না যে, এই পথিক রাজা—সে তাঁহাকে ডাকিয়া গর্দ্দভকে উঠাইবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই চালকের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন; অবশেষে রাজা ও চালক উভয়ে মিলিয়া গর্দ্দভটীকে কাদা হইতে টানিয়া তুলিলেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সেখানে যে সমস্ত লোক জমায়েৎ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চালককে জানাইল যে, তাহাকে যিনি সাহায্য করিয়াছেন, তিনি দেশের রাজা। লোকটী তখন মহা ভীত হইয়া রাজার পদতলে পড়িল এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে আহ্বান করার অপরাধের জন্য কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন—"কোনই অপরাধ কর নাই—মানুষের কর্ত্তব্য মানুষকে সাহায্য করা।" ইহার ভিতর কেমন সহজ ভদ্রতা প্রকাশ পাইল।

যখন চতুর্দ্দশ ক্লেমেণ্ট পোপ হইলেন, তখন যথারীতি বিভিন্ন দেশের দূতগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একে একে পোপের সহিত যেমন পরিচিত হইতে লাগিলেন, অমনি নতমস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, পোপও নতমস্তকে তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া, দরবারসভার অধিকারী পোপকে জানাইলেন, নতমস্তকে ঐ প্রকার প্রত্যভিবাদন করা তাঁহার পক্ষে শোভনীয় নয়। উত্তরে তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন, আমি অতি অল্প দিনই পোপ হইয়াছি; এখনও সদাচার ভুলিবার অবসর পাই নাই।" বলা বাহুল্য যে, এক্ষেত্রে পোপ খুব ঠিক কাজই করিয়াছিলেন। কারণ এই যে, উচ্চ পদ পাইলেন বলিয়াই যে পোপকে বিনয় প্রভৃতি সদাচার ভুলিতে হইবে, এমন কোন লেখাপড়া ছিল না।

এইস্থলে আমার নিজের একটী ঘটনা বলি। আমি এক আফিসে কর্ম্ম করিতাম। সেই আফিসে কুলীনব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় কর্ম্মচারীও কর্ম্ম করিতেন। একদিন একটী বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে একটী কায়স্থ কর্ম্মচারী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাকে এবং সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উভয়কেই নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মণটী মহা গর্ব্বসহকারে দক্ষিণহস্ত উল্টাইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। অবশেষে কায়স্থ কর্ম্মচারী চলিয়া যাইবার পর ব্রাহ্মণটী আমাকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, আমি যখন ব্রাহ্মণ, তখন আমার কায়স্থকে প্রতি-নমস্কার করা উচিত হয় নাই। আমি তদুত্তরে বলিলাম যে, কায়স্থেরও অন্তরে যে ভগবান, আমারও অন্তরে সেই একই ভগবান, তখন কেন যে নমস্কার করিব না তাহা বুঝি না।

আমা অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চে, তাঁহাদিগকেও যেমন আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ আমা অপেক্ষা যাহারা নিম্নে, তাহাদিগকেও সেই-রূপ যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন যে, দাসদাসী প্রভৃতি নিম্নবর্ত্তী লোক-দিগের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলেই নিজের উচ্চতা বা বড়লোকত্ব পরিষ্কাররূপে দেখানো হয়। কিন্তু তাহা মোটেই ঠিক নয়—উহাতে কেবল নিজের অভদ্রতাই প্রকাশ পায়। এই প্রকার লোকেরা নিজেদের সমপদবীস্থ বা উচ্চপদস্থ লোকদিগের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনে অগ্রসর হন।

যাহারা খাটিয়া খায়, তাহারা ঐ প্রকার আচার-ব্যবহার মোটেই পছন্দ করে না। তাহারা সরল প্রাণের সরল ব্যবহার প্রত্যাশা করে। তাই অনেক সময়ে তাহারা সভ্যভব্য ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া ভুল করে। কিন্তু এটাকেও ভুল বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কতক লোক ভব্যতার সঙ্গে গর্ব্বিত ব্যবহার করে বলিয়া যে আমরা ভব্যতাকে ঘৃণা সহকারে পরিত্যাগ করিব তাহা নহে। এই প্রকার গর্ব্বিত ব্যবহার তো প্রতিদিনই আমাদের নজরে আসে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে গর্ব্বিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেও সদাচার পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে।

রূঢ় ব্যবহার সাহসের নিদর্শন নহে। সাহসের সঙ্গে বিনয় অনায়াসে মিলিতে পারে। যদি ছেলে-মেয়েদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহারা সময়ে সময়ে অসদ্ব্যবহার করে কেন, তাহা হইলে কএকটী কারণ খুঁজিয়া পাওয়া পাওয়া যায়—(১) তাহারা উহা অপেক্ষা ভাল সদাচার জানে না; (২) তাহারা অমনোযোগ ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া চিন্তা করিতে চাহে না; (৩) তাহারা ঐ প্রকারে নিজেদের বে-পরোয়াভাব দেখাইয়া সাহসের পরিচয় দিতে চায়। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে প্রথম দুই যুক্তির অযৌক্তিকতা দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় যুক্তিকে মৃদু উপহাসের মুখে উড়াইয়া দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে দেখা যায় যে, ছেলেরা খুব চীৎকার করিয়া কথা বলে, "অনুগ্রহপূর্ব্বক" প্রভৃতি বিনয়োচিত সম্বোধন করিতে ভুলিয়া যায়, বড়দের প্রতি রূঢ়ভাব ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ভাবে যে বড়ই পৌরুষের কাজ হইল। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে অহঙ্কার ও "ঠোঁটকাটা-গিরি" আর সৎসাহস একই পদার্থ নয়। রাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি শিবাজি প্রভৃতিকে বিনয়, ভদ্রতা প্রভৃতির বিষয়ে বালকদিগকে আদর্শস্থানে রাখিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে পরাজিত শত্রুকেও কি প্রকার সম্মান প্রদর্শিত হইত তাহার উপদেশ দেওয়া উচিত। বাইবেলেও একটী গল্প আছে—তিনজন কাপ্তেন যুদ্ধার্থে বহির্গত হইয়া বেথেলহেমের নিকট শিবির ফেলিয়াছিলেন। সেই স্থানটা ডেভিডশত্রু ফিলিস্টাইনদিগের অধিকৃত ছিল। এখন, ঘটনাক্রমে কাপ্তেনদিগের শিবিরের কাছে ডেভিড আসিয়া পিপাসায় ছটফট করিয়া জলের জন্য হাহুতাশ করিতেছিলেন। বেথেল-হেমের তোরণের নিকটে যে কূপ ছিল, সেই কূপের জলে ডেভিড তাঁহার বাল্যকালে কতবার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন তিনজন সেই হাহুতাশ শুনিয়া ডেভিডের অজ্ঞাতে এবং মহাসঙ্কটের মধ্যেও কতকটা জল সংগ্রহ করিলেন। তার পর, তাঁহারা শ্রান্ত ও ক্ষত দেহে শিবিরে ফিরিয়া ডেভিডের নিকট সেই জল আনিয়া দিলেন। কিন্তু ডেভিড, যদিও তিনি একজন বড়দরের নেতা ছিলেন, বলিলেন যে, তাঁহার পক্ষে এরূপ মূল্যবান জল পান করা ঠিক নয়, এবং ইহা বলিয়া জলটুকু মাটিতে ঢালিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার জন্য কোন মানুষকে এত কষ্ট স্বীকার করাইবার কোনও অধিকার তাঁহার নাই।

জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামে কি প্রকার স্বার্থত্যাগ, কি প্রকার অক্লান্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস হইতে এইজন্য যখন তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল, তাহার প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য তিনি কথা খুঁজিয়া পান নাই। তখন কংগ্রেসের Speaker (মুখবক্তা) বলিলেন যে, "উহাঁর সাহসও যেমন, উহাঁর বিনয়ও তদনুরূপ।"

প্রত্যেক বালকের জানা উচিত যে, অধিকাংশ স্থলেই বলবীর্য্য ও সৌন্দর্য্য একত্র বাস করে। জড় পদার্থেও ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—পালিস করা granite প্রস্তর বল, ইস্পাত বল, বা মেহগ্নি প্রভৃতি কাঠ বল, সকলের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিনিসকে পালিস করিতে থাকিলে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিই হয়, অথচ উহাদের বলের হ্রাস হয় না। শিক্ষিত ও সভ্যভব্য—এই দুইটী কথার অর্থ প্রায়ই এক।

মোট কথা এই যে, সকলের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য। আমাদের উচিত মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখানো। কেবল পোষাকের প্রতি বা গাড়ীঘোড়ার প্রতি সম্মান দেখাইলে

আমাদের উপযুক্ত কাজ হয় না। সাধারণ লোকে খুব জাঁকালো জরিজামদার পোষাক দেখিলে বা কাহাকেও মোটর গাড়ীতে আসিতে দেখিলে বড় বেশী সম্মান প্রদর্শন বা খাতির দেখাইতে অগ্রসর হয়। কিন্তু এটী হইতে দেওয়া উচিত নয়। ছেলেদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহারা যদি কোন অপরিচিত স্থানে গিয়া পড়ে, আর সেখানকার লোকেরা তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাদিগকে নগণ্য মনে করে, কোন প্রকারে গ্রাহ্যই না করে, তাহা হইলে তাহাদের মনের অবস্থা কি রকম হয়? কেবল যে কথা দ্বারাই অবজ্ঞা প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা মনে করিও না; আমাদের আচার-ব্যবহারের দ্বারাও অবজ্ঞাপ্রকাশ সম্ভব। সদাচার সম্বন্ধে এই মন্ত্রটী মনে রাখিও—"তোমার নিজের প্রতি অন্য লোকের নিকটে যে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিবে, তোমারও অন্য লোকের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।"

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(২)

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ছিল। এখানে বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ ভাবে পঠন-পাঠন হইত। অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। অনেক সুপণ্ডিত অধ্যাপক এখানে বাস করিতেন। এই বাঁশবেড়িয়ার কমলাকান্ত চূড়ামণি, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইঁহার নিকট সর্ব্বপ্রথমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই চূড়ামণির প্রতি দেবেন্দ্রনাথের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। এই চূড়ামণির পুত্রের নাম শ্যামাচরণ। ইনি তত্ত্ববাগীশ বলিয়া পরে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং আদিব্রাহ্মসমাজের সহায়ীভূত তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকরূপে ১৭৬৯ শকের আষাঢ় মাসে নিযুক্ত হন। তৎসময়ে শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সভার সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই শ্যামাচরণের নিকট মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপে বাঁশবেড়িয়ার সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যে চারি জনকে কাশীধামে প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে রমানাথ ও তারকনাথের বাটী বাঁশবেড়িয়াতে ছিল। আনন্দচন্দ্রের বাটী সোণারপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে ছিল। বাণেশ্বরের বাটী কোথায় ছিল তাহা আমি জানি না। এইত গেল নগেন্দ্রনাথের জন্মভূমির পরিচয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন নগেন্দ্রনাথ, শিতিকণ্ঠ ও আরও কয়েকজন উঁহার ছাত্র হন। শিতিকণ্ঠ বাবু বলেন যে, মহর্ষি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আসিতেছেন, নগেনবাবু এ সংবাদ শিতিকণ্ঠবাবুকে দিয়া তাঁহাকে ঐ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে টানিয়া আনেন। ঐখানে উপদেশাদি গ্রহণে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা দৃঢ় হয়। ঐ ব্রহ্ম-বিদ্যালয় হইতে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে তাঁহারা ও আরও কয়েকজন উত্তীর্ণ হন, এবং তাঁহারা দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবুর স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ঐ সময়টি ব্রাহ্মসমাজের প্রবল উদ্দীপনার কাল ছিল।

আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, নগেন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় টালীগঞ্জ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু উহা ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথমে হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন; সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় উক্ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া কতক দিন বসিয়া থাকেন, পরে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি বেহালাব্রাহ্মসমাজ, আদিব্রাহ্মসমাজ ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে যে আলোক লাভ করিয়া পরে কৃষ্ণনগরে যান, উহা তাঁহাকে স্থির হইতে দেয় নাই; তাঁহার ব্যাকুলতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস আমার পিতা স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত কয়েকখানি পত্র হইতে প্রকাশ পাইবে। ঐ পত্রের মধ্যে একখানি এখানে প্রকাশিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

(কলিকাতা ডাকঘর হইতে বেহালা ব্রাহ্মসমাজে উক্ত মহাশয়ের নিকট পৌছে।)

(তখন বেহালায় পোষ্ট অফিস হয় নাই; বেহালা-ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে উহা পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। চিঠিখানিতে তারিখ নাই, ডাকঘরের মোহরে ৭ই মে—সন অস্পষ্ট।)

অসংখ্য নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

কিছুদিন হইল মহাশয়ের একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর এডিসনল্ জজ সাহেবের সেরেস্তাদার হইয়াছেন। পীড়ার জন্য অনেকদিন অনুপস্থিতি হওয়াতে হুগলী কলেজে আমার নাম ছিল না। সুতরাং আমিও

কৃষ্ণনগরে তাঁহার নিকট আসিয়াছি। এখানে সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিতেছি। এখানকার কালেজে বোধ হয় শীঘ্র নিযুক্ত হইব। কৃষ্ণনগর আসিবার সময় নবদ্বীপ, শান্তিপুর, অম্বিকা কালনা, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়াছি। কিন্তু অম্বিকা কালনা ভিন্ন আর কোন স্থান ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। বর্দ্ধমানাধিপতির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদি এখানে লোকের মনোহরণ করিতেছে। ভাগীরথী, চক্রদহ প্রভৃতি স্থানে নানা আকার ধরিয়াছে। উঁহার উভয় কূলের প্রান্তর-শোভা চিত্তকে বিশ্বশিল্পীর প্রীতিসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেয়। কৃষ্ণনগর অতি উত্তম স্থান। এখানকার জল-বায়ু অতি উত্তম। এখানকার জলঙ্গী বা খোড়ে নদীর জলের উপমা সজ্জনের মন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানকার কালেজ, মিসনরি স্কুল, আদালত প্রভৃতি সকল দেখিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে দুই দিবস গিয়াছিলাম। সাধারণ পুস্তকালয়ে মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকি। সে দিবস ডাইসেন সাহেব সন্ধ্যার পর মিসনরি স্কুলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা করেন। শুনিলাম, পূর্ব্বে একদিন আর একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বংশবাটীর ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মাণ জন্য তথাকার কএকটি ব্রাহ্ম ভ্রাতা যত্ন করিতেছেন। পিতৃব্য মহাশয় কৃষ্ণনগরে লইয়া আসাতে আমি তো উক্ত মঙ্গলকার্য্য সাধনে অক্ষম হইলাম। এখানে অনেক ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোক আছেন। কএকদিন হইল রাজার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া অনেকে পরিচয় দেন, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম বড় দেখিতে পাই না। এখানকার সমাজে উপাসনার সময় সংস্কৃত পাঠ হয় না। আমি প্রথম যেদিন সমাজে যাই, সেই দিবসই উপাচার্য্য ব্রজোবাবুর সহিত আলাপ করিলাম। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইলে দেখিলাম যে, তিনি আত্মপ্রত্যয় বা সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ঈশ্বরের অসীমত্বে সংশয় করেন। গত বুধবারে সমাজে উপাসনার পর তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম্ম এই :—

• • • তিনি পূর্ণমঙ্গল কি না, তৎবিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি বাক্য-মনের অগোচর, তাঁহার স্বরূপ কে বুঝিতে পারে? • • • একটা কথা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি বলিয়াই যে নিঃসংশয়ে গ্রাহ্য করিব, এমন নহে; সকল বিষয় বিচার করিয়া তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। কোন কথায় আমাদের অন্তঃকরণ সায় দিলেই যে সে কথা স্থির হইল, এমন নহে; যতক্ষণ না বুদ্ধি তাহাতে সায় দেয়, ততক্ষণ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। বুদ্ধি কিছু সামান্য বস্তু নহে। পূর্ব্বকালের লোকেরা যে সকল বিষয় বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমরা এখন বুঝিতেছি; এবং আমরা এখন যাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা ভবিষ্যতের লোকে বুঝিবে। সেইরূপ ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপে আমাদের এখন সংশয় হইতেছে, তিনি বাস্তবিক পূর্ণমঙ্গলস্বরূপ কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভবিষ্যতের লোক একথা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয়।"

সমাজ ভঙ্গ হইলে দুটি ব্রাহ্মের নিকট বলিলাম যে উপাচার্য্য মহাশয় যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। ব্রাহ্মসমাজে এরূপ বক্তৃতা হওয়া অত্যন্ত দোষের কথা। যিনি ঈশ্বরের পূর্ণমঙ্গলস্বরূপে এতদূর সংশয় করেন, তাঁহাকে উপাচার্য্যের কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত নহে। এই দুইটি ব্রাহ্মের মধ্যে একটি কালেজের শিক্ষক, ইঁহার নাম শ্রীহরনাথ মৈত্র, ইনি সমাজের সম্পাদক। এই মহাশয় আমার কথায় সায় দিলেন। দ্বিতীয়টি প্রথমতঃ উপাচার্য্যের মত রক্ষা করিবার মানসে তর্ক আরম্ভ করিলেন, পরে কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিলেন। আমি একদিন ব্রজোবাবুকে বলিলাম, মহাশয়! আপনাদের যখন বক্তৃতা অন্য স্থানের ব্রাহ্মদের সহিত মিলে না, আপনারা কি ব্রাহ্মদের মধ্যে নূতন এক দল করিতে চাহেন? ব্রজোবাবু উত্তর করিলেন—"দল (seet) হইবেই তো। প্রকৃতিভেদে মতভেদ হইয়া থাকে।" কি আশ্চর্য্য! যাঁহার যত্নে এখানকার সমাজ হয়, যিনি এতকাল পর্য্যন্ত সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, যিনি সমাজের আচার্য্য, তাঁহার এই মত, তিনিই এইরূপ ব্রাহ্ম। এখানকার অন্য ব্রাহ্মের কথা দূরে থাক। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম এবিষয়টি সংবাদপত্রে লিখিব, কিন্তু তাহা বড় ভাল বোধ হইল না। এক্ষণে আপনাকে জানাইলাম, এবিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি জ্ঞাপন করিয়া চিরবাধিত করিবেন। আমি রামতনু বাবুর নিকট প্রায় প্রতিদিন গমন করিয়া থাকি। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ে কথাবর্ত্তা হয়। কেশববাবুর বক্তৃতায় কৃষ্ণনগরে যে উৎসাহ-অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণপ্রায় দেখিতেছি। আপনার শারীরিক কুশল সমাচার পাইবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত আছি। গতকল্য নিমাই বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। তাঁহার অন্য ঠিকানা জানা না থাকাতে বেহালা সমাজে আপনার নিকট পাঠাইয়াছি। নিমাই বাবু এখন কি সমাজে আসিয়া থাকেন? জীবনসহায় কেমন আছে। এখানে ঘুর্ণি নামক স্থানে একটি সমাজ আছে। উহা এখান হইতে অর্দ্ধমাইল হইবে। আগামী সমাজে তথায় বোধ হয় গমন করিব। কালেজের বালকদের দ্বারা উক্ত সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ইতি

নিতান্ত অনুগত ভৃত্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর।

পুঃ—কেশববাবুকে কি বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে? রামতনুবাবু একথায় কিছু সন্দেহ করেন। আপনি ইহার যথার্থ সংবাদ লিখিলে পরম উপকৃত হইব। কলিকাতা কলেজ কিরূপ চলিতেছে। সত্যেনবাবু কি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন? তাঁহার কিছু কি সমাচার পাওয়া গিয়াছে?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নিদাঘ সরিৎ।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম-এ বি-এল)

নিদাঘ মধ্যাহ্ণে তপ্ত বালুময় তীর,
ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এক বহে ঝির্ ঝির্।
চারি দিকে বালু রাশি ধুধু ধু ধু করে,
ঝিম্ ঝিম্ উঠে বাষ্প বালুকা নিকরে।
জন প্রাণী নাই কেউ চৌদিকে উত্তাপ,
তপন তাপনে যেন হাঁপরের তাপ।
ক্ষুদ্র নদী নাহি তাহে হিল্লোল কল্লোল,
চল চল ছল ছল তরঙ্গ বিহ্বল,
কোথায় ছুটিয়া চলে নাহি জানে বালা,
প্রাণের নিভৃতে চায় বাঁধনের জ্বালা!
অচিরে আসিবে স্রোত ভেঙ্গে যাবে কূল,
ঘাত প্রতিঘাতে হবে দুকূল আকুল।
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত ঘুর্ণী স্রোতের ঘটায়,
আবিল হইবে বক্ষঃ তরঙ্গ ছটায়।
ফুলে কেঁপে ভরা নদী বিপুল উচ্ছ্বাসে,
রঙ্গে ভঙ্গে ধেয়ে যাবে আকুল উল্লাসে।
কত ভাব কত দ্বন্দ্ব কত গ্লানি প্রাণে,
উঠিবে ভাসিবে পুনঃ দিগন্ত প্লাবনে।
আবার শরত কালে সুনীল গগন,
নির্ম্মল সলিলে তার হেরিবে আনন।

মহৎ ও তাঁহার দান।*

(শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ)

মহতের প্রতিভায় আস্থা স্থাপনই মানবপ্রকৃতির ধর্ম্ম। আমাদের শৈশবের সঙ্গিগণ যদি কালে মনস্বী হইয়া উঠেন ও রাজপদে উন্নীত হ'ন, তাহা হইলেও আমরা বিস্মিত হই না। সকল পুরাণই (mythology) উপদেবতাদির বৃত্তান্তে পূর্ণ এবং ঘটনার সন্নিবেশে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দেখা যায়; এই উপদেবতাদের প্রতিভা অসামান্য। গৌতমের উপকথায় (?) লিখিত আছে যে, ধরিত্রীর আদি মনুষ্য ইহাকে ভক্ষণ করেন এবং ইহার আস্বাদন তাঁহার সুমিষ্ট বোধ হইয়াছিল।

মহতের জন্যই প্রকৃতির অস্তিত্ব। জগৎ সাধুলোকের সত্তা ও সত্যতা-হেতুই অদ্যাবধি ধ্বংস হয় নাই; ইহারা পৃথিবীকে অধিবাসের উপযোগী করেন। ইহাদের সহিত যাঁহারা একত্র বাস করেন, তাঁহারা জীবনের আনন্দ ও উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন। আমরা এই প্রকার জনসঙ্ঘে বিশ্বাস করি বলিয়াই জীবন মাধুর্য্যময় ও বহনযোগ্য হয়; আমাদের সন্তানগণ ও নানাস্থান ইহাদের নামে পরিচিত হয়, ইহাদের নাম আমাদের ভাষার ক্রিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং ইহাদের কার্য্যাবলী ও মূর্ত্তি আমাদের গৃহে চিরস্থায়ী হয়, দিবসের বহু ঘটনা ইহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

মহতের অন্বেষণ যৌবনের স্বপ্ন, প্রৌঢ়ের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। তাঁহার অনুষ্ঠানের নিদর্শন দেখিতে, অথবা সম্ভব হইলে তাঁহার দর্শনলাভে ধন্য হইতে আমরা বিদেশে দূরদূরান্তরে গমন করি। ইহার জন্য আমরা বিবিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হই। অনেকে বলিয়া থাকেন,—ইংরাজগণ কর্ম্মকুশল, জার্ম্মানগণ আতিথ্য-সৎকারে অভ্যস্ত, ভালেন্‌সিয়ার জলবায়ু আরামদায়ক, এবং সাক্রামান্টো পর্ব্বতশ্রেণীতে অশেষ সুবর্ণ আছে। এই সকল কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমরা ঐরূপ ধনশালী বা আতিথ্যপরায়ণ জাতির আবিষ্কার করিতে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমণ করি না। যদি এরূপ কোন চুম্বক থাকিত যাহার দ্বারা প্রকৃত ধনী ও শক্তিমানের দেশ ও আলয় নিরূপিত হইত, তাহা হইলে অবশ্য আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ঐ চুম্বক ক্রয় করিয়া সেই দেশের উদ্দেশে অদ্যই পথে বহির্গত হইতাম।

কোন নগরে বাষ্পযানের উদ্ভাবক বাস করিলে সমুদায় নগরবাসীর গৌরব বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে সকলেই ভিক্ষুক হইলে, তাহারা পিপীলিকা ও অন্যান্য কীটের ন্যায় বিরক্তিকর হইয়া থাকে।

আমাদের ধর্ম্ম—মহতের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি। কথা ও কাহিনীর অমরগণ মহজ্জীবনের উদ্দীপ্ত অংশবিশেষ। ইহুদীয়, খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ ও ইস্‌লামীয় মহাদর্শননিচয় মানব-মনের অতি-প্রয়োজন আত্মগঠন-কার্য্য। আমাদের ব্রহ্মবাদ চিত্তের বিশোধক মাত্র।

মধুর পক্ষে মিষ্ট হওয়া এবং লবণের পক্ষে ক্ষাররসযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। মনস্বী সর্ব্বদা উচ্চ চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণের নিকট উহা পরিশ্রম ও ক্লেশ-সাপেক্ষ; তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেই সকলের

---

* Emerson-এর "The use of great men" অবলম্বনে।

প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হ'ন। কিন্তু ভ্রান্তিমুক্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাহাদিগকে অবিরত যত্নবান্ হইয়া আত্ম-সংশোধন করিতে হইবে। সুন্দরের প্রতিকৃতি স্বতঃই আমাদের মানসে অঙ্কিত রহে, তাঁহাকে ইহার জন্য চেষ্টিত হইতে হয় না; অথচ ইহা হইতে আমরা কত সময় কত প্রকারে উপকৃত হই। জ্ঞানী স্বীয় গুণ অপরের নিকট অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারেন। বাস্তবিক, সকলে নিজের শ্রেষ্ঠ কার্য্য সহজেই সম্পাদন করিতে পারে। মহত্ত্ব যাহার স্বভাবসিদ্ধ তিনিই মহৎ এবং তাঁহার সমাধ্যান আর কাহারও স্মৃতি বহন করিয়া আনে না অর্থাৎ তিনি কাহার অনুরূপ বা অনুকৃতি এভাব মনে উদয় হয় না।

মহদ্ ব্যক্তিগণ আমাদের অতি সমীপে অবস্থান করেন; আমরা প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি। তাঁহারা আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া স্বস্থান অধিকার করেন। যাহা সৎ তাহা সুফলপ্রসূ। নির্দ্দোষ আপেলেই বীজ উৎপন্ন হয়, মিশ্রজাতীয় আপেলে হয় না। নদী আপনার তটভূমি নির্ম্মাণ করিয়া লয়,—উন্নত ভাবও বিশ্বে প্রচারের পথ, স্থায়িত্বের জন্য সুদ্ধাম, ব্যাখ্যানের জন্য শিষ্যসংহতি সংগ্রহন করে।

অল্পবুদ্ধি লোক দর্শককে কেবল চমৎকৃত করিতে চায়। কিন্তু মহৎপ্রতিভা আমাদিগকে রক্ষা করে। সৎপ্রতিভা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রসারিত করে ও আমরা অভিনব চিন্তাধারা প্রাপ্ত হই। কোনও জ্ঞানী আমাদের মধ্যে আগমন করিলে বাক্যালাপের দ্বারা তিনি বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব সুখ-সুবিধার উপায় নির্ণয় করিয়া সম্পদের নূতন জ্ঞান উৎপাদন করেন। তিনি বিত্তবানের ভ্রম ও দৈন্য এবং অকিঞ্চনের মুক্তি ও বৈভব দেখাইয়া দেন।

যুগে যুগে মানব কয়েকটী মনীষীকে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপকত্বে বৃত করিয়া তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আমরা অনন্ত মূঢ়তায় পঙ্কিল হইয়া কাল্পনিক দৈব অট্টালিকা ও মায়াপুরী রচনা করিয়া আত্ম-প্রতারিত হই। ঐ মহাত্মাগণ আমাদের বিবেচনা-শক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মে নিবেশিত করেন। এই কারণেই তাঁহারা নরজাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়া নানাপ্রকারে সম্মানিত হ'ন।

মানসিক শিক্ষা-সভ্যতার পরিমিতির মধ্যে মহত্ত্বের অধিষ্ঠান মহত্তরের আবির্ভূতি সম্ভবিত করে। সুনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির লক্ষ্যও পরিণতি অভ্যুন্নতি। ইহার সীমা কোথায়, কে বলিতে পারে? মানবের কার্য্যই বিশৃঙ্খলা তিমিররাশির দূরীকরণ; যদবধি সে জীবিত থাকিবে তদবধি সে বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের প্রচার করিয়া সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিবে, এবং এইরূপে জগতে প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবে।

নানা কথা।

মিস মেয়োর গ্রন্থ।—এই গ্রন্থ লইয়া আলোচনা কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতটা আলোচনার বিশেষ দরকার ছিল বলিয়া মনে করি না। লেখিকা দেবীচরিত্র নন যে, তাঁর গ্রন্থ আদরের বস্তুরূপে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার গ্রন্থসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করি। উহাকে পূতিগন্ধময় "ড্রেণেজ রিপোর্ট" মনে করিয়া এক কোণে সরাইয়া রাখিলেই চলিত। অতিরিক্ত আলোচনার ফলে আমরা কতকগুলি অনিষ্ট করিয়াছি—(১) বহু পুস্তক বিক্রয় করাইয়া লেখিকার পকেটে অনেক অর্থ আনাইয়া দিয়াছি, যাহার ফলে তিনি আরও দু'দশখানা ভারতনিন্দার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন। (২) আমাদের মনের দাসভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। এখনও আমরা সত্যের উপর দাঁড়াইতে পারি নাই বলিয়াই ঐ বিদেশীয় কে কোথায়—হৌক না কেন সে তুচ্ছ নগন্য ও হীনচরিত্র—কি বলিয়াছে, অমনি তাহাদের প্রশংসায় আনন্দে নৃত্য করি এবং তাহাদের নিন্দায় মরিয়া যাই। (৩) শুনিতে পাই যে, এই গ্রন্থের ভিতর রাজনৈতিক একটা গূঢ় রহস্য লুকাইয়া আছে। আছে তো আছে—তাহাতে এল গেল কি? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, এই গ্রন্থের সাহায্যেই আমাদের রিফর্ম দেওয়াটা পিছিয়ে যাবে? আমাদের তো সে বিশ্বাস নাই। আমরা যদি স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য হই, তবে কাহারও দ্বারে আবেদননিবেদনের থালি লইয়া দাঁড়াইতে হইবে না এবং শত মিস্ মেয়োর "ড্রেণেজ রিপোর্টের"ও সাধ্য হইবে না সেই স্বাধীনতালাভ পিছাইয়া দেওয়া। ভগবানের বিধানেই তখন আমরা স্বাধীনতা পাইতে বাধ্য হইব। আর যদি যোগ্য না হই, তবে এই গ্রন্থ লইয়া যতই আন্দোলন-আলোচনা করি—স্বাধীনতালাভের কাল আসে নাই বলিয়াই, ভগবৎবিধানেই তাহা পিছাইয়া যাইবে। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ধর্ম্মকে, সত্যকে, ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা—তখন সমস্ত পৃথিবী একদিকে হইলেও স্বাধীনতা, স্বরাজ বা কিছু কেহই আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। এই গ্রন্থ সমালোচনাসূত্রে আমরা বোধ হয় একটু বেশীমাত্রায় লঘুচিত্ততা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের উচিত ছিল—উহার বিষয় দু'চারিটী কথা বলিয়া dignified silenceএর সহিত উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখা।

(৪) অযথা সমালোচনার ফলে আমরা উঁহাকে অযথা গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছি—যে গৌরব কোনক্রমেই উহার অদৃষ্টে জুটিবার সম্ভাবনা ছিল না। (৫) উহার সমালোচনাসূত্রে অন্যান্য জাতির নিন্দা করিয়া আমরা নিজেদের তপস্যার ক্ষয় করিয়াছি; যে শক্তি নিজেদের উন্নতিকল্পে সঞ্চিত করিতেছিলাম, সেই শক্তিসঞ্চয়ের পথে যে কত ব্যাঘাত আসিয়াছে, তাহা মনে হয় খুব অল্প লোকই তলাইয়া দেখিয়াছেন। মিস মেয়োর মত লেখিকার শত গ্রন্থ ভারতভূমির ন্যায় বৃহৎকায় হস্তীর গাত্রে সূচীবিদ্ধ করিতে পারে কিনা সন্দেহ।

গ্রন্থপরিচয়।

পরিহাস—কবি শ্রীরসময় লাহা বিরচিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিহাসরসিক কবি রসময় লাহা বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। এই 'পরিহাস' কাব্যখানিতেও তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুমধুর ব্যঙ্গ কবিতার আবরণে সমাজের দোষগুলির প্রতি কবি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্য সকলেরই আস্বাদন করা উচিত। 'সহজ জীবন', 'সোজা কথা', 'মানুষ' 'কর্ম্মী', 'দেশের মাটি', প্রভৃতি কবিতা ভাবে ভাষায় যেমন সুন্দর আদর্শে তেমনি উন্নত। 'বাহুবল' কবিতাটি ইংরাজী কবিতার মনোজ্ঞ বঙ্গানুবাদ। কবির সহিত আমরাও সুর মিলাইয়া বলি:—

'দেশের মাটি কাম্‌ড়ে ধরে' ছেড়ে বিলাস সহর-বাস;
পল্লী-মাটির কর্‌গে সেবা, মানুষ যদি হতে চাস্‌'॥

পরিহাসরসের মধ্য দিয়া এরূপ শিক্ষাপ্রদ কবিতা খুব কম দেখা যায়।

ভোরের পাখী।—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—(১) শ্রীপ্রমোদ বড়াল ২০ দুর্গাপিতুরী লেন বহুবাজার, (২) আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, (৩) আর. বি, দাস ৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট, (৪) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রয়েল ৮ পেজী ৭৬ পৃষ্ঠা মূল্য ৸৹।

এখানি স্বরলিপি-গ্রন্থ। সুকণ্ঠ গীতিকবি শ্রীমান্‌ নির্ম্মল চন্দ্র তাঁহার কয়েকটী সুন্দর গান স্বরলিপি সহ প্রকাশ করিয়া কাব্যামোদী গীতরসিকগণের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলির কথা যেমন সহজ, সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী সুর তেমনি সুমধুর। আমরা মাঘোৎসব, নববর্ষ প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষে কতবারই "তুই পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্‌", "বিশ্বেশ্বর মন্দিরে এই" "অরূপেরি রূপ হেরে এই" "নিশীথের তারারা সব" প্রভৃতি গান তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি ও মুগ্ধ হইয়াছি। কতবার কত অজানা ব্যক্তি তাঁহার এই সকল গান শুনিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই কবির গানে এমনই একটি স্বাভাবিক সরলতা, বিশ্বজনীন ভাবের গভীরতা আছে যে, মানবচিত্তকে উহা সহজেই স্পর্শ করে। প্রত্যেক গানেই কবির বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট, প্রকৃতি ও ভগবানের প্রতি গভীর প্রীতি সুব্যক্ত। আমরা এই কবির দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁহার গানগুলি বাংলার ঘরে ঘরে গীত হউক। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

হাডুডুডু।—'বঙ্গবাণী' পাঠশালার অধ্যক্ষ ছাত্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ১নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার কলিকাতা হইতে শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি-এল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

'হাডুডুডু' বাঙ্গালা দেশের একটী প্রাচীন খেলার নাম। স্থানভেদে 'ভেলদিগ্‌দিগ্‌' 'কপাটি' প্রভৃতি ইহার নামভেদ দেখা যায়। গ্রন্থকার তাঁহার এই পুস্তকে বাঙ্গালা দেশের এই পুরাতন পল্লীক্রীড়াকে যুগোপচিত রুচির অনুসরণে নূতন মূর্ত্তি ও নব জাগরণ প্রদান করিয়াছেন। ৯টী সুবিস্তীর্ণ পরিচ্ছেদে খেলার প্রাচীনত্ব, বিশেষত্ব, বৈচিত্র্য, নিয়মাবলী ও কৌশল আলোচিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গি সুন্দর। স্থানে স্থানে মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সাধারণের বোধসৌকর্য্যের জন্য অনেকগুলি হাফটোন চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে। ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারে ঢ+১৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আমরা এই পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীঃ—

সংবাদ।

স্মৃতিসভা।—গত ৩১শে ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলেজ-স্কোয়ারের এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট্‌-হলে পরলোকগত মনীষী ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের একটী বাৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছিল। প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অনেকে মৃত মহাত্মার সরলতা,

সবলতা, স্বাদেশিকতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর আলোচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী পদ্মিনী ঘোষজায়ার উপাধি-প্রাপ্তি।—আমরা অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্ব্ববাঙ্গালার 'সারস্বত-সমাজের' উনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক উপাধিসভায় ঢাকানিবাসী শ্রীমান্ সুনীরচন্দ্র ঘোষ এম-এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী পদ্মিনী ঘোষ, (কুমিল্লার মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের কন্যা) পূর্ব্ববাঙ্গালার সারস্বত-সমাজের সংস্কৃত কাব্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সাহিত্যসরস্বতী" উপাধি এবং গরদের উড়ানী পারিতোষিক পাইয়াছেন। শক্তিঔষধালয়ের বিদ্যোৎসাহী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বিএ, একটি সুবর্ণপদক এবং কর্ম্মনিষ্ঠ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ একখানি পুস্তক পুরস্কার দিয়াছেন। সারস্বত সমাজের কনভোকেশনে মহিলার উপস্থিতি এই প্রথম।

উড়িষ্যাপ্লাবন।—বৈতরণী নদীর ভাঙনে ভীষণ জলপ্লাবন হওয়ায়, উড়িষ্যায়, বালেশ্বর ও কটক জেলায় শোচনীয় দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। ভদ্রক ষ্টেষনের নিকট হইতে বি. এন. আর. লাইনের কুড়ি মাইল ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় বহুদিন যাবৎ ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল। এই প্লাবনে বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে, বহু মনুষ্য ও গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক স্থলে শস্য হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

বন্যা উড়িষ্যার চিরন্তন ব্যাপার হইলেও এইবার উহার প্রকোপ অতি ভীষণ। সরকারপ্রদত্ত বিবরণী হইতেও ইহা বেশ প্রমাণিত হয়। উহাতে প্রকাশ যে, ৬৫ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান এই বন্যার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছে। ৩০ হাজার পরিবার গৃহহীন হইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ জন মনুষ্য ও শতকরা ৫টী করিয়া গৃহপালিত গবাদি পশু এই বন্যার মুখে প্রাণ হারাইয়াছে। ফ্রী-প্রেসের প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, এই বন্যার ফলে উড়িষ্যার যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা দশ বৎসরেও পূর্ণ হইবে না।

বন্যা যখন উড়িষ্যার চিরন্তন ব্যাপার তখন উহার নিবারণকল্পে গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট যত্নবান হওয়া উচিত। অনেকের বিশ্বাস যে, প্লাবন-প্রতিরোধের জন্য সরকার নদীর দুই ধারে যে বাঁধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার এই 'বরই' দেশবাসীর পক্ষে 'শাপ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বাঁধের ফলে প্রতি বৎসর বর্ষায় পলিমাটী জমিয়া নদীগর্ভ ভরাট হইয়া উঠিতেছে; ফলে দিন দিন বন্যার সম্ভাবনা আরও আসন্নতর ও আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সরকার হইতে এই সব কথার সত্যাসত্য নির্ণীত হওয়া আবশ্যক এবং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ বন্যা-প্রতিরোধকল্পে যে সব উপায় অবলম্বন করিতেন তাহাও তাঁহাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত।

পুণ্যকর্ম্ম।—উড়িষ্যার এই সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনে উৎপীড়িত ও দুঃস্থ একটী ভদ্রপরিবারকে কলিকাতাবাসী আমাদের কয়েকজন পরিচিত বন্ধু মিলিতভাবে এককালীন ২৩৮৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই বন্যায় এই পরিবারের প্রায় ৪০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ইঁহাদের এই পুণ্যকর্ম্ম সাধারণের অনুকরণীয়।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত ১৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ম ঘটিকার সময় শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺লতিকা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ মনোভিরাম বড়ুয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে মহর্ষি-ভবনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস যথাসময়ে সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে 'শয্যাসন' প্রভৃতি ষোড়শ দানসামগ্রী উৎসর্গীকৃত হইল। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা ও শ্রাদ্ধকর্ম্ম সুসম্পাদন করিলেন। মহিলাকণ্ঠে কয়েকটী সময়োচিত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সভার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধসভায় যে সব ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল সর্ব্বশেষে তাঁহাদের প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শোক-সংবাদ।

৺গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।—গত ২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ১ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বেচু-চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বহুদিন হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন; কিন্তু এত শীঘ্র যে 'ডাক' আসিবে তাহা কেহই সম্ভাবনা করেন নাই। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ক্রম ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। এই নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ আচার্য্যকে হারাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে

আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহার লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

দুইটী অভিভাষণ —আমরা বরিশালের ব্রহ্মবাদীর সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "দুইটী অভিভাষণ" একখণ্ড পাইয়াছি। ঐ দুইটী অভিভাষণ যথাক্রমে ১৩২৯ সালে বরিশালে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অভ্যর্থনাসমিতির এবং ১৩৩২ সালে ঢাকায় উক্ত সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই দুইটী অভিভাষণে ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত অনেক সমস্যাই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমস্যাগুলি খুব স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার সময়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে কত দূরে পড়িয়া গিয়াছে, চিন্তা করিলে অশ্রু সম্বরণ করা দুরূহ হয়। প্রথম অভিভাষণের শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন, পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভের অধিকারী—ঠিক কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটী কথা বলা আবশ্যক যে, যিনি পরমাত্মাকে বরণ করেন, তিনিও তাঁহাকে লাভের অধিকারী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রাহ্মেরা যতদিন না সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ছাড়িয়া তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি, এই মন্ত্রকে যথার্থ প্রাণের সহিত কায়মনোবাক্যে সাধন না করিবেন এবং সমষ্টিভাবে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলচিন্তনে অগ্রসর না হইবেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজ সমুন্নতশিরে দাঁড়াইতে পারিবে না।

The Message—আমরা গোরক্ষপুরের আনন্দাশ্রমের সাধু সদানন্দের নিকট হইতে এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। সাধু সদানন্দ আর কেহই নন, আমাদের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস। তাঁহার হৃদয় যেরূপ উদার, তাঁহার এই পত্রিকাও তদ্রূপ উদার প্রেমের বাণী (Message of love) বহন করিয়াই সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বাণী তাঁহার পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইবে। সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই মহাবাণী স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহার এই পত্রিকা চিরজীবী হউক এবং ব্রহ্মনামের মহিমা দেশবিদেশে বিঘোষিত করিতে থাকুক।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত

পাঁচ মাসের আয় ও ব্যয়

১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

আয়	২৬৮২।/৯
পূর্ব্ববৎসরের স্থিত	৩১৪।৩
সমষ্টি	২৯৯৬॥৶০
ব্যয়	২৭৯৫॥/৯
স্থিতি	২০১৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আনুষ্ঠানিক দান	২৫৲
মাসিক দান	২০৲
এককালীন দান	৬৸০
উৎসবের দান	২৲
হাওলাত আদায়	৮৮।০
ঋণগ্রহণ	৩০০।৶৩
সসপেন্স	১২০০৲
বণ্ডেড্ অয়ার হাউস	৬০৲
বিবিধ	৩৶০
সমষ্টি	১৮৮৫৸৩

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	২০৩৸০
হাল	২৬।০
বিজ্ঞাপন	৫৮৲
মাশুল	১৫/০
অগ্রিম	২১/০
সমষ্টি	৩০৫।৶০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৬৭॥০
কাগজের মূল্য	৪৪॥৶৯
দপ্তরী	৩৩৶০
অক্ষর বিক্রয়	৭॥০
অন্যান্য	॥৶০
সমষ্টি	১৫৩।৶৯

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৯৸৶০
গচ্ছিত	৭৷৵০
মাশুল	২৸০
কমিশন	৵৬
গীতারহস্য	৩০৬৲
ঐ মাশুল	১১।০
সমষ্টি	৩৩৭৷৵৬
সর্ব্বসমষ্টি	২৬৮২।৵৯

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্য	৬০৲
গায়ক	১৮৩৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	২৭৷০
হিসাবরক্ষক	৭০৲
বেহারা	৪৪৲
মেথর	১০৲
সরঞ্জামী	৫৷৬
মাশুল	১৭।৵৬
Electric	২১৷৵০
আলো মেরামত	৸০
Tax	৬৭৷৵৬
কেরোসিন	৩৸৬
ঋণশোধ	৮৯৮৷০
হাওলাত প্রদান	৬৬৷০
বারবরদারী	১৮৸৵০
পাখাটানা	২৲
ড্রেণ পরিষ্কার	৬৲
পূর্ত্তকার্য্য	১১।৶৬
চাঁদা আদায়ের কমিশন	৷০
বিবিধ	৪৶০
সমষ্টি	১৫১৫৸৶৬

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	১০১৵৯
দপ্তরী	৪৲
মাশুল	২৫৷৵৯
কর্ম্মাধ্যক্ষ	২৩৸০
হিসাবরক্ষক	৫৫৲
বেহারা	৮৲
মূল্য আদায়ের কমিশন	২৪৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	৪৲
মূল্য ফেরৎ	২৶০
প্রবন্ধ	২০৵০
সমষ্টি	২৬৭৸৵৩

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	৭৪৸৶৬
কম্পোজিটর	২৫৫৸৵৬
প্রেসম্যান	১০০৲
ইঙ্কম্যান	৫৭।৵০
কাগজতোলা	২৷৶০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	২৫৸০
হিসাবরক্ষক	৫৫৲
বেহারা	৮৲
জলপানি	।৶০
প্রুফকাগজ	৫।০
ছাপিবার কাগজ	১০৬।৶০
কালি	৬৵০
শিরীষ	৩৵৬
তৈল	২৸৵৩
রুল ঢালা	১৶৩
অক্ষর ক্রয়	১৯৷৯
দপ্তরী	৪৩৵০
মাশুল	।৵৬
তামাক	২৵০
লেই জন্য ময়দা	৷৵৬
বিবিধ	৭৸৩
সাজিমাটি	১৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৬৵৬
দড়ি	৷৵০
ব্রাস	৷৵৬
লাইসেন্স	১২৲
সমষ্টি	৭৯১৸৬

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	১৵০
পুস্তক ক্রয়	৸৵০
দপ্তরী	৩৲
অন্যান্য	৷৵৬
মাশুল	৩৵০
গীতারহস্যের মূল্যবাবত	৭৭৲
ঐ মাশুল	৯৷৵০
ঐ কমিশন	২১৷০
ঐ দপ্তরী	৯৫৲
ঐ বিবিধ	২৷০
সমষ্টি	২১৫৬
সর্ব্বসমষ্টি	২৭৯৫৷৵৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ঢাকা অনাথ-আশ্রম

পূজার কাপড়

দেয়ং ক্ষুধিতায় ভোজনম্ বস্ত্রহীনায় বস্ত্রম্।

নিবেদন—

অনাথকে সাহায্য করা মহাপুণ্য। শারদীয় উৎসবের সময় আমাদের বালক-বালিকা ও শিশুদের সকলের কত আনন্দ! সকল ঘরেই নূতন কাপড় আসিবে, পথের ভিখারীও বাদ যায় না। এমন সময় 'ঢাকা অনাথ আশ্রমের' চারি মাসের শিশু হইতে ১৬ বৎসরের ১২টী বালক ও ২২টী বালিকার কথা কি আপনারা ভাবিবেন না? আপনারা না দিলে তাহারা কোথায় পাইবে? এই দান করিয়া পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক-বালিকাদের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা ও ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হউন, এই প্রার্থনা।

নিম্নে কাপড়ের মাপ ও বালক বালিকাদের সংখ্যা দেওয়া গেল।

সাড়ি	১০	হাত	সেমিজ প্রমাণ	ও বডিস	=৫টী মেয়ের
ঐ	৯	"	ঐ ১ গজ	ঐ	৫টী মেয়ের
ঐ	৮	"	ঐ ৩০ ইঞ্চি	ঐ	৬টী মেয়ের
ঐ	৭	"	ঐ ২৪ "	ঐ	২টী মেয়ের
ঐ	৬	"	ঐ ২০ "	ঐ	২টী মেয়ের
ঐ	৬	"	ফ্রক বা ঘাগরি মাঝারি		২টী মেয়ের
ধুতি	৯	"	পাঞ্জাবি বা হাফসার্ট		২টী ছেলের
ঐ	৮	"	ঐ	ঐ	৪টী ছেলের
ঐ	৭	"	ঐ	ঐ	৫টী ছেলের

রুমাল, ফ্রক টুপি চারি মাসের একটী খোকার

গত পূজায় 'আবেদন' প্রকাশ করাতে যে সমুদয় সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য দাতাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা হইতেছে। দাতাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মল্লিক (ডিলমা রংপুর) ২৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পত্নী (ঢাকা, কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে) ৫৲, শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় (ত্রিবেণী, হুগলি) ১০৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু, B. C. S. (ঢাকা, পূজার মিষ্টির জন্য) ১০৲, শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র (ঢাকা) ২৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল (ঢাকা, লক্ষ্মী-পূজার মিষ্টির জন্য) ১০৲, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় (বাগাচড়া) ১৷০, শ্রীযুক্ত তারিণীমোহন নিয়োগী (কিশোরগঞ্জ) ২৲, Miss O. E. Briem (জলপাইগুড়ী) ২৲, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবিনোদ চৌধুরী (পটিয়া, চট্টগ্রাম) ২৲, শ্রীমতী সরযূবালা সেন, (শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন-পত্নী, শ্রীহট্ট) ১৲, শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দাস (লোকনাথ-বস্ত্রালয়, ঢাকা) ২৲, শ্রীমতী সুবালা দত্ত (চট্টগ্রাম, পিতার 'রায় সাহেব' উপাধি উপলক্ষ্যে) ১০৲, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বাহেরিয়া (কলিকাতা) একশত টাকার অধিক মূল্যের উনত্রিশ খানা কম্বল, দুইথান ড্রিল কাপড় এবং একথান গরম কাশ্মিরা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল (ঢাকা) প্রত্যেক বালিকার জন্য সাড়ী ও বালকের জন্য ধুতি এবং ছোট ছেলেদের জন্য ফ্রক ইত্যাদি ২৬, শ্রীযুক্ত বি, কে, রায় (বড়ঘর বরিশাল) একখানা ধুতি, শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন (ডাঃ এস, বি, দত্ত চট্টগ্রাম) একটি বডিস, একটি ইজার ও একটি নিমা, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ (ঢাকা) উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে সাড়ী ও ধুতি, শ্রীযুক্ত রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুর (ঢাকা) প্রত্যেক বালকের হাফ সার্ট ও হাফ প্যাণ্ট এবং প্রত্যেক বালিকার বডিস এবং ছোটদের ফ্রক এবং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ দয়া করিয়া ৮ খানি মশারি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ছেলেদের জামা, পায়জামা ও মেয়েদের সেমিজের প্রয়োজন হয়। এইজন্য দুইথান ড্রিল কাপড়ের আবশ্যক। শীত নিকটবর্ত্তী, মোটা খদ্দর এবং গরম কাপড় (নূতন বা পুরাতন) পাঠাইলে বিশেষ সাহায্য হইবে। অর্থ বা বস্ত্র আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ, অরফেনেজ রোড, বক্সিবাজার, ঢাকা; এই ঠিকানায় অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রেও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে। বিনীত শ্রীশশাঙ্ককুমার ঘোষ (রায় বাহাদুর) সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা অনাথ-আশ্রম।

বিজ্ঞাপনী

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমানে ৮৫ বৎসরে চলিতেছে)

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৵০ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৷৵০।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।০ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণ এবং জীবনীসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রকাশের জন্য রচনাদি ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৫ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	৬৲	প্রতিমাসে।
"	½ "	৪৲	"
"	¼ "	২৲	"

মলাটের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনসংগ্রহকারিগণকে উপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়।

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেণ্ট হইলে টাকায় ।০ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

Reg. No. C. 412.

Tattwabodhini Patrika

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮। ১৮৪৯ শক

১০১১ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। কার্ত্তিক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
} আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

১০১১ সংখ্যা

১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০। অঞ্জলি—সত্যস্বরূপ দেবতা।

১। তুমি অজর ও অমর। তুমি ধ্রুব সত্য সনাতন। তোমার জন্ম নাই; তোমার জরা নাই, তোমার মৃত্যুও নাই। আমরা যখন উপলব্ধি করি যে, আমরা তোমার সন্তান, তখন আমরাও অমরণ-ধর্ম্মা হইয়া যাই এবং তোমার সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হই। তোমার একবিন্দু প্রেমই আমাদিগকে কৃমিকীটের অবস্থা হইতে এই দুর্লভ মানব জন্মে উপনীত করিয়াছে। তোমারই এক-বিন্দু প্রেম আমাদিগকে দেবত্বের পথে পরিচালিত করিতেছে। জীবনপথে তুমিই আমাদের রক্ষক। কর্ম্মের পথে তুমিই আমাদের সহায়। তোমার আদর্শে যে সমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজই সভ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত হয় এবং সেই সমাজই জগতের আদর্শ হইয়া উঠে।

২। তুমি গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ ও পুরাণ পুরুষ। বাহিরে তোমার সন্ধান করিলে আমরা তোমাকে খুঁজিয়া পাই না। তুমি হৃদয় গুহার অন্তরতম গহ্বরে বসিয়া আছ, সেখানে সন্ধান করিলেই তোমার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ের নিভৃত কোণে বসিয়া প্রত্যেককে পরিচালিত করিতেছ। তোমার ইঙ্গিত ধরিয়া যে ধর্ম্মপথে চলে, তাহাকে তুমিই অভয় প্রদান কর, তাহাকে তুমিই রক্ষা কর।

৩। তোমারই তেজ স্থূল জগতের মধ্যে ন্যস্ত থাকিয়া সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। তোমারই তেজ আমাদের প্রত্যেকের আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের আকারে অভিব্যক্ত হয়। তোমারই তেজ সেতুস্বরূপ হইয়া দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ ধারণ করিয়া আছে। তুমিই মহাসত্য, তাই বিশ্বজগত সত্য হইয়া আছে। তুমিই এই জগতের প্রাণ। তুমিই এই জগতে প্রাণ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, সেই প্রাণ অবলম্বনে জীবজন্তুসকল প্রাণধারণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। তুমি যেমন সাধু ভক্তের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া তাহার আনন্দবর্দ্ধন কর, সেইরূপ পাপী-তাপীর রুদ্ধ হৃদয়কবাট ভগ্ন করিয়া সেখানেও তোমার বিমল জ্যোতি প্রবেশ করাও ও তাহার অন্ধকার বিদূরিত কর।

৪। যে তোমাকে অন্তরে পিতামাতা বলিয়া প্রত্যক্ষ করে; যে তোমাকে সকল ঐশ্বর্য্যের

অধীশ্বর বলিয়া দেখিতে পায়, সে অচিরেই দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করে। যে তোমার প্রিয়কার্য্য বলিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকে, সে সহজেই দুস্তর দুঃখসাগর অতিক্রম করে। তুমি তাহাকে শ্রীসম্পদলাভের গুপ্তমন্ত্র প্রদান কর।

৫। তুমি ওষধিসমূহে বলরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি বনস্পতিসমূহে উত্তাপরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তোমারই ইচ্ছাতে বিচিত্রবর্ণ ও বিচিত্রগন্ধ পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া আমাদিগকে নিত্য আনন্দ প্রদান করিতেছে। তোমারই আদেশে শতবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা বিদূরিত করিতেছে। তুমিই আমাদের জ্ঞানদাতা। তোমারই আদেশে পিতামাতা সন্তানগণকে জ্ঞানশিক্ষা দেন। তুমি আমাদের গৃহে গৃহদেবতা হইয়া অবস্থিতি কর। আমাদের পরিবারস্থ লোকেরা যেন বংশানুক্রমে ভক্তিভরে তোমার চরণপূজা করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

১১। অঞ্জলি—জ্ঞানস্বরূপ দেবতা।

১। তোমার শাসনে সূর্য্য পৃথিবী হইতে একগুণ রস গ্রহণ করিয়া দশগুণ প্রদান করে এবং রাত্রিশেষে স্বীয় আশ্চর্য্য প্রভা দ্বারা দ্যুলোককে প্রভান্বিত করিয়া তোলে। সূর্য্যের তেজে সুরনর সকলেই তেজসমন্বিত হয়। সূর্য্যের ভিতর দিয়া তোমারই জ্ঞানজ্যোতি নিত্য নূতনভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

২। অগ্নির ভিতরেও তোমাকেই নিত্য স্বপ্রকাশ দেখি। অগ্নির উত্তাপের ভিতর দিয়া তোমারই বলক্রিয়া নিত্য প্রকাশ পায় এবং আমরাও তাহারই সাহায্যে নিত্য নূতন কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। তুমি অমর ও অক্ষয়। তোমার মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই। আমরাও তোমারই জয়গান করিয়া অমরণধর্ম্মা হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

৩। তুমি আমাদের অগ্রণী। আমাদের সকল কর্ম্মে তোমার আসন সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি আসিয়া সেই আসনে অধিষ্ঠান কর, আমরা সকল অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে তোমার চরণপূজা করিতে ইচ্ছা করি। তোমার জ্ঞানজ্যোতি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া যে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, শ্রীসম্পদ ধনরত্ন অচিরে তাহার হস্তগত হয়।

৪। তুমিই আমাদের সকলের মধ্যে প্রেমবন্ধনরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তাই আমরা মৈত্রীকেই আমাদের ব্যবহারের নিয়ামক করিবার চেষ্টা করি। তুমি আমাদের সকলকে মৈত্রীর দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ কর, যাহাতে আমরা আমাদের সমবেত চেষ্টায় অনন্যসাধারণ শ্রীসম্পদ ও কল্যাণের অধিকারী হইতে পারি। তুমি আমাদের পরিবারে দীর্ঘায়ু, যশস্বী, কৃতী, দাতা ও তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান পুত্রকন্যা প্রেরণ কর, যাহাতে তাহারা তাহাদের সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া জগতে তোমার পবিত্র নাম সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়া ধন্য হয়।

৫। আমাদের পরিবারে সন্তানেরা যেন পিতামাতার অবাধ্য না হয়; তাহারা যেন তোমার আদেশ, ইঙ্গিত ও শাসন অমান্য না করে এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে যেন সর্ব্বদা নিরত থাকে। তুমি সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তোমার সেই অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র দিয়া আমাদের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন কর, যাহাতে আমরা আপনাদিগকে তোমার সন্তান বলিয়া গৌরব করিতে পারি। তোমারই শাসনে আকাশে অগণিত গ্রহতারকা ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। তোমারই শাসনে মানবেরা ধর্ম্মের পথে কর্ত্তব্যের পথে ছন্দে ছন্দে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে।

আবর্ত্ত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দেব! নাথ! প্রভো! এই কি সেই তব
মধুর হিরণ্য সংসার?
এ যে দেখি দয়াময় আবর্ত্ত মহা—
শুধুই হেথা হাহাকার!
ধনীজনে কোথাও বিলাসের ভরে
ফেলিতেছে বিলাসের বাস;
কুটীরে জীর্ণ কোথা দুখীজনে ফেলে
মর্ম্মভেদী আকুল শ্বাস।

বিলাসের হিল্লোল আসিছে ভাসিয়া
সন্ধ্যায় বিলাসের সাথে ;
তারি মাঝে দেখি হলাহল বিষম—
বাধিছে অনন্তের পাথে ;
দুঃখশ্বাসতপ্ত আসি' দূর হতে
হানিছে হৃদয় আমার—
সাগরতরঙ্গ আছাড়িয়া যেমন
পাষাণে পড়ে বারবার।
এই ঘোর আবর্ত্ত—সংসার-প্রান্তরে
তুমি হে দেব কর্ণধার ;
তুমি প্রভু অমৃতসার !

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

দিন-রাত আমাদিগকে সংসারের নানা স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কত মায়া মমতা, প্রলোভন, আসক্তি আমাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে আছে ; এক-একটা সময় আসে যখন সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে যায়, সমস্ত আবরণ অপসৃত হয়, আত্মার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়। কি ভাবে যে এই প্রকাশ হয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু আত্মার স্বরূপ একদিন আমার কাছে বাস্তব হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ হতে পারে না। আমার চিত্ত-দুয়ারে আমার জীবনবিধাতা দিন-রাত দাঁড়িয়ে আছেন। জ্ঞান-চক্ষু যখন পরিষ্কার থাকে, হৃদয় যখন নির্ম্মল থাকে, প্রাণ-মন যখন একাগ্র থাকে, তখন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় ; আর যদি অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবে থাকি, মনের মধ্যে কলুষচিন্তা জাগ্রত থাকে, আমি দিন-রাত স্বার্থের পেছনে দৌড়াই—তাঁকে কি করে দেখব ? এইরূপ অবস্থায় সামান্য আঘাতে ছটফট করি, শোকের মধ্যে দিশেহারা হই, রোগ-যন্ত্রণাকে অসহ্য মনে করি, কিন্তু যাঁরা স্থিত-প্রজ্ঞ, তাঁরা কিছুতেই বিচলিত হন না। তাঁরা নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে দিনরাত আনন্দে বিভোর। সমস্ত কামনা তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন। দুঃখে তাঁরা বিহ্বল হন না, সুখের প্রতি তাঁদের আসক্তি নাই। মমতা, ভয়, ক্রোধ সমস্তের হাত হইতে তাঁরা মুক্ত। সংসারের মধ্যে থেকে এইরূপ অবস্থা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, অথচ যদি শান্তি লাভ করতে হয়, জীবন-টাকে সমস্ত সংগ্রামের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে সংকল্প থাকে, তাহলে এই স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ না করিলে আর উপায় নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন :—

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

"কচ্ছপ যেমন স্বীয় অঙ্গ বাহির হইতে সঙ্কুচিত করিয়া দেহমধ্যে রাখে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সেইরূপ যখন ইন্দ্রিয়-গণকে ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল হইতে সর্ব্বদা প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।"

ইন্দ্রিয়গণের বিনাশ হইবে না, অথচ তাহাদিগকে পূর্ণ বশীভূত করিতে হইবে। অথবা যদি ইন্দ্রিয়গণকে কেবল মাত্র অভিলাষ সাধনে নিবৃত্ত রাখা যায়, তাহা হইলেই যে নির্ব্বেদ লাভ হয় তাহা নহে। আমার সামনে কোনরূপ প্রলোভন নাই, সুতরাং আমি প্রলোভনের অতীত এ কথা বলা যায় না। কখন্ যে কি রকম প্রলোভনের মধ্যে পড়া যায়, বলা যায় না। কেহই জোর করে বলতে পারেন না যে, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করেছেন। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে রিপু লুক্কায়িত থাকে, সুবিধা পাইলেই আপনার কার্য্য করিতে থাকে। কত সাধুর জীবন সামান্য অনবধানতার জন্য বিনষ্ট হইয়াছে। পশ্চিমে সামান্য মেঘ দেখা দিল, মনে করিলাম উহাতে আর কি হইবে, কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আবির্ভাব হইল যে সমস্ত উড়াইয়া লইয়া গেল, কিছুই সামলাইতে পারা গেল না। যতক্ষণ আমরা বিষয়ের পশ্চাতে ঘুরিব ততক্ষণ বিনাশ আমাদিগকে অনুধাবন করিবে। গীতায় তাই বলা হইয়াছে,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ
সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ
কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ
সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো
বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

"বিষয়চিন্তারত ব্যক্তির বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ ; ক্রোধ হইতে সদসৎ বিবেকের নাশ হয়, তাহা হইতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং তাহা মৃত্যুর তুল্য।"

সুখের সামান্য ফুৎকারে জীবনের অনন্ত বিপদের সম্ভাবনা, একটার পর আর একটা বিপদ পর পর আসিতে থাকে, সহজে আর প্রতিরোধ করা যায় না, সুতরাং এই সংগ্রামের মধ্যে উপায় কি ? তখন উপায়—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য
যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

"যোগী ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া ভগবৎপরায়ণ

হইয়া অবস্থান করেন, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

যিনি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পেরেছেন তিনি নির্লিপ্ত ভাবে বিষয়ভোগ করেন, সংসারে সমস্ত কাজ করেন, দেহরক্ষা করবার জন্য যা-কিছু আবশ্যক সব করেন, কিন্তু তিনি তাতে ডুবে থাকেন না। তাঁর বিষয়-বুদ্ধি আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ। কর্ম্মফলের জন্য তিনি কর্ম্ম করেন না, তিনি খাটেন ভগবানের আদেশে, সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে যখন ভগবানের প্রেরণা অনুভব করা যায়, তখন পরাজয়ে দুঃখ নাই, কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কার নাই।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে॥

"হে ধনঞ্জয়, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, (অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া) যোগে অবস্থিতি করিয়া কর্ম্ম কর; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।"

আমি নিজে কিছু করিতেছি না, আমার শক্তিতে কিছুই হয় না, ভগবান আমার দ্বারা সব করাইতেছেন, সুতরাং কি বলিয়া কর্ম্মফল আশা করিতে পারি। ইহা জানিয়াও যাঁহারা ফল আশা করেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র। আমরা সংসারে কতজন আছি বলিতে পারি যে, বিষয়-সুখে আমাদের আসক্তি নাই, আমরা ফলাভিলাষ না করিয়া কর্ম্ম করিতেছি? সেই জন্য আমাদের দুঃখ, সেই জন্য আমাদের সংগ্রাম। আর যিনি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছেন তিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

যেমন নানা নদীকর্ত্তৃক আপূর্য্যমান হইয়াও যে সমুদ্র সমভাবেই থাকে, এতাদৃশ সমুদ্রে অন্য জল প্রবেশ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহাতে মিশাইয়া যায়), সেইরূপ ভোগে নির্ব্বিকার যে মুনিতে কামনা সকল প্রবেশ করে (অর্থাৎ তাহাতে লীন হয়) তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। ভোগ-কামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না। বিষয়লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরমানন্দ উপভোগে ব্যস্ত, ইন্দ্রিয় তাঁহার দাস, ইহারা তাঁহাকে ক্ষণস্থায়ী সুখের অন্বেষণে লইয়া বেড়ায় না, পরন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্থায়ী আনন্দের সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সমস্ত জ্ঞান ভগবদারাধনায় নিযুক্ত; তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সখার ন্যায় সেই ব্রহ্মপ্রেমের আয়োজন করিয়া দেয়। সংসারে থাকিয়া শান্তিলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে এইরূপ সাধনা করিতে হইবে। সংসারের মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়িলে আমাদের দুঃখ বাড়িয়া যাইবে। পরমদেবতার চরণে সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়া, বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে পারিলে হৃদয় প্রসন্ন হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে ইহা সম্ভব নয়, সেই জন্য আত্মজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। দুদিনের সংসারে আসিয়া মনে করি—আমরা বুঝি এই সৃষ্টির কর্ত্তা, আমরা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু পদে পদে দেখিতেছি এই ধারণা কত ভুল। আমার জন্ম, আমার মৃত্যু—কিছুই আমার অধীন নয়, আমার জীবন আমার অধীন কি করিয়া হইবে? এ সমস্ত যে অনন্ত জীবনের তরঙ্গ! লীলাময় ভগবান্ তাঁর জীবনসমুদ্রে কত লীলা করিতেছেন, তাই আমরা সংসারে আসিয়া আনন্দলাভ করি। তাঁর লীলার কথা ভুলিয়া গিয়া যখন আমাকে বড় মনে করি, তখন আমার মৃত্যু; তখন শোক আমাকে গভীর অন্ধকারে লইয়া যায়। আমরা যদি ভগবানের ইচ্ছাকেই আমাদের মধ্যে বরণ করিয়া লইতে পারি, তবে আমাদের জীবনের সকল জ্বালাযন্ত্রণা তিনি জুড়াইবেন, দিব্যজ্ঞান তিনি দিবেন, ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাম তিনিই থামাইবেন। আমার নিজের করিবার কিছুই নাই। তাঁর চরণে প্রার্থনা করি, এই জ্ঞানে তিনি আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

সমাজচ্যুতি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

একটি সমাজ বিগঠিত হইবার পরে উক্ত সমাজের বিশেষত্ব, পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এবং দোষকারী কেহ সমাজের মধ্যে আসিয়া যাহাতে আরও দোষ করিতে না পারে বা অপরকে তাহার অনুবর্ত্তী করিয়া না তোলে তাহার জন্য ঐ দোষীকে সমাজ হইতে বহিষ্করণের প্রয়োজন হয়। সমাজে থাকিয়া সে যে যে সুবিধা ভোগ করিত, তাহাতে তাহাকে ব্যাপক কালের জন্য বঞ্চিত করা হয়। অধিকন্তু তাহাকে সাজা দিয়া অপরকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, এবং দোষী যাহাতে আপনাকে ভবিষ্যতে পরিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারে তাহার জন্যও তাহাকে অবসর দান করা হয়। কিন্তু এইরূপ শাসনদণ্ড পরিচালন যে সকল সময়ে পক্ষপাতিত্যবিহীন হয় বা হইত তাহা বলা যায় না। আজকাল সমাজের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেহ কাহাকে মানিতে চাহে না, সমাজের অধীন হইয়া থাকিতে চায় না। সুতরাং সমাজ হইতে বহিষ্করণপ্রণালী পূর্ব্বকালে সম্ভবপর হইলেও এবং এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে হিতকর হইলেও বর্ত্তমান যুগে তাহা কঠিন হইয়া পড়ি-

য়াছে। এই প্রণালীর বিদ্যমানতা অশিক্ষিত সমাজে আজও রহিয়াছে।

এই একঘরে করিবার নিয়ম প্রাচীন সময়ে সকল দেশে বিদ্যমান ছিল। বাইবেলের Old Testament পাঠে বুঝা যায় যে, হীব্রুগণ কোন কোন নগরের অধিবাসীগণকে এবং কোন কোন ক্ষুদ্র জাতিকে একেবারে একঘরে করিয়া রাখিতেন। য়িহুদীগণের টালমড (Talmud) নামক তদ্দেশীয় স্মৃতিগ্রন্থে এইরূপ ব্যবস্থার পরিচয় মিলে। এমন কি বিখ্যাত দর্শনকার স্পিনোজাকেও (Spinoza) এই দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালের খৃষ্টীয়মণ্ডলীর ভিতরেও এইরূপ একঘরিয়া করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহা হইতে যে কতকটা শুভ ফল উৎপন্ন হইত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পদ্মপুরাণে আছে, "মহাপাপো পাপাখ্যাযুক্তঃ পতিত উচ্যতে" ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পাপে লিপ্তকে পতিত কহে। পরাশরে আছে "কলৌ পততি কর্ম্মণা" কলিতে লোকে কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়। গৌতম বলেন, "দ্বিজাতিকর্ম্মভ্যঃ হানিঃ পতনং পরত্র চাসিদ্ধিঃ" ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহার বিহিত কর্ম্ম হইতে পরিচ্যুতি তাহার পতন, ইহা হইতে পারলৌকিক অসিদ্ধিও ঘটে। "স্বধর্ম্মং যঃ পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং সমাচরেৎ। অনাপদি স বিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥" যে নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শান্তির সময়েও পরধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পতিত বলেন। অন্যায় কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা করিলেই যে তাহার পাতিত্য হয়, তাহা নহে; কিন্তু ঐ ইচ্ছা যখন কার্য্যে পরিণত হয় তখনই পাতিত্য।

প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গের দিকে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে জনসাধারণকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্রকারগণের বিপুল চেষ্টা। এই প্রবৃত্তিমার্গকে সংযত ও বশীভূত করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধের প্রয়োজন। আচরণকে নিজ নিজ তর্ক-যুক্তির উপর ফেলিয়া না দিয়া শাস্ত্রকারগণ কতকগুলি আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। এই সকল আপ্তবাক্যই সমাজকে প্রথম অবস্থায় শাসন করে এবং উহাতে তাহার প্রকৃত কল্যাণ সাধন হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলোকে ও যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শক্তি নিতান্ত নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বল ছিল বলিয়া মনে হয়।

সমাজ হইতে বহিষ্করণ ভাবের কয়েকটি প্রতিশব্দ আছে। বহিষ্কার, অর্থাৎ সমাজ হইতে বহিষ্কার, পরিত্যাজ্য—সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য, অসম্ভাষ্য—কথা কহিবার অনুপযুক্ত, অসংভোজ্য—অপাংক্তেয়, একত্র ভোজন করিবার অযোগ্য, অসংবাহ্য—বিবাহ সম্বন্ধে গ্রথিত হইবার অনুপযুক্ত, নিরবসিত—জন্মাবধি একঘরে।

নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রধানতঃ পাতিত্য ঘটত। (১) যাহারা ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যাহাদের যথাক্রমে ১৬, ২২ ও ২৪ বৎসরের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার হয় নাই। ইহারা ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞ ও কৃচ্ছ্রাদি সাধনান্তে আবার নিজস্থান অধিকার করিতে পারে। (২) যাহারা শূদ্রাণীকে বিবাহ করে। (৩) যাহারা পিঁয়াজ পক্ষীমাংস ও নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে। (৪) ব্রাহ্মণ হইয়া যাহারা ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিহার করিয়া কৃষিবৃত্তি বা বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে। (৫) যাহারা চণ্ডালী বা অন্ত্যজ জাতিতে বিবাহ করে। (৬) যাহারা ভগিনীর বিবাহে সাহায্যদানে অনিচ্ছুক ও পুত্র হইয়া বিধবা মাতার অলঙ্কার অপহরণকারী। (৭) নাস্তিক—বেদে অবিশ্বাসী। (৮) যাহারা কর্ত্তব্যবিমুখ অথবা যাহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া উপপাতক আছে। যাহারা উপপাতকী তাহাদিগকেও জাতিভ্রংশকর বলা হইয়াছে। গোবধ, অন্যান্য নিম্নজাতির যাজনক্রিয়া, সতীত্বনাশ, পিতামাতা ও গুরুত্যাগ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে নিজের বিবাহ, পত্নী ও পুত্র-বিক্রয়, অধ্যাপনার জন্য অর্থগ্রহণ, চিকিৎসাব্যবসা, ব্যভিচার, যন্ত্রের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন, কাষ্ঠের জন্য জীবন্ত বৃক্ষ ছেদন, নিজ স্ত্রীকে বেশ্যাকার্য্যে নিয়োগ, অন্য জাতির অন্নগ্রহণ, চৌর্য্য, ঋণপরিশোধে অপ্রবৃত্তি, অপবিত্র পুস্তক পাঠ, নটের (অভিনয়ের) ব্যবসা, মদ্যপায়ী স্ত্রীজাতির সংসর্গ, স্ত্রীবধ, পুত্রবধ, বৈশ্যবধ ও ক্ষত্রিয়বধ, বেদনিন্দা, ব্রাহ্মণকে আঘাত, মক্ষিকার ও অখাদ্য জীবের প্রাণগ্রহণ, বিশ্বাসঘাতকতা, অনৈসর্গিক সঙ্গম ইত্যাদি।

শাস্ত্রে উপরের কথিত সর্ব্ববিধ পাতক ও উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে এবং উহার প্রসরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন পাতকীর পক্ষে সত্যসত্যই সুকঠিন। প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তাহাদের আবার সমাজে প্রবেশের অধিকার থাকিত। কিন্তু কয়েকটি মাত্র পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যেমন পুত্রকন্যাঘাতী, স্ত্রীঘাতী, আশ্রিতের প্রাণঘাতী ইত্যাদি। পতিতগণ নানাবিধ সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। পতিতগণ মৃত হইলে কেহ তাহাদের অশৌচ গ্রহণ করিত না বা করে না কিংবা কেহ তাহাদের উদ্দেশে জলগণ্ডূষ দান করে না। তাহারা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে তাহারা আহূত হয় না। তাহারা শৈব সম্প্রদায়ে গৃহীত হয় না। কোন পুরোহিত তাহাদের যাজকতা করে না। অপরাধী বলিয়া তাহাকে সকলে গণ্য করে।

প্রাচীন কালে এইরূপে দেশে ও সমাজে শান্তি রক্ষিত

হইত এবং লোকে নিরুপদ্রবে বাস করিতে সক্ষম হইত। সে কাল চলিয়া গিয়াছে, আজ-কাল আইন-কানুন আদালতের দিন। ইহার সাহায্যে কতকগুলি পাপী দণ্ড পায়, কিন্তু নৈতিক পাপী রাজার দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। আজকাল স্বাধীন চিন্তার দিন, ফলে স্বেচ্ছাচারের মাত্রা বিবর্দ্ধিত হইয়া হিন্দুজাতির আভ্যন্তরীণ বিনয় ঔদার্য্য ধর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতি গুণের খর্ব্বতা সাধিত হইতেছে। একঘরের ভাব পল্লীগ্রামে কতকটা পরিমাণে আজও বিরাজমান, কিন্তু উহার দায় হইতে ধনী ও প্রভাবশালীগণ বিনির্ম্মুক্ত। তাই দিন দিন মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণের অভাব এদেশে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের লোকের সমাজ নাই। কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে; ফলে সহরে পাপের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। আমরা পরিশেষে একথা বলিতে চাই যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের ভয় ও পরলোকে শাস্তির ভয় মানুষকে এদেশে ধর্ম্মভীরু করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণ রক্ষায় সমাজের ভয় এদেশে মনুষ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। তাই বলিতে চাই যে, সমাজকে উপেক্ষা করিলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য।* অবশ্য জ্ঞানের ও যুক্তির মর্য্যাদা রাখিয়াও অনেক দূর পর্য্যন্ত সমাজরক্ষা চলিতে পারে।†

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঠিকা গাড়ী—ধর্ম্মতলার মোড়ে।

ঠিকা গাড়ীর মজা দেখা যাইত ধর্ম্মতলার মোড়ে, যেখানে এখন চারিদিক হইতে আসিয়া ট্রামগাড়ী থামে, তাহারই কাছে। এখানে পূর্ব্বে একটা মস্ত পুকুর ছিল। যতদূর মনে পড়ে, কার্জ্জন গার্ডেন নামক বাগান প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই সেই পুকুরটী ভরাট করা হইয়াছিল। ফরওয়ার্ড কাগজের কোন লেখক বলেন যে, এখানে সেকালের ভদ্রলোকেরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা সত্ত্বেও একই গাড়ীতে উঠিবার বিষয়ে কিরূপে পরস্পরকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইত। কারণ ছিল—গ্রীষ্মকালে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ঠিকাগাড়ীর কাঠগড়ার মধ্যে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বদ্ধ থাকিয়া ধাক্কা খাইতে খাইতে একত্র চলা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার ছিল, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও কল্পনাতেও আসিতে পারে না।

ধর্ম্মতলার মোড় হইতে, উহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রধানত চারিটী দিকে ঠিকা গাড়ী যাতায়াত করিত—ভবানীপুর, খিদিরপুর, বাগবাজার এবং শ্যামবাজার। হয়তো একটা গাড়ীতে ভবানীপুরের এক যাত্রী উঠিয়াছে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী গাড়ীতে খিদিরপুরের এক যাত্রী উঠিয়াছে। তখন এ গাড়োয়ান উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে চীৎকার করিতেছে—ভবানীপুর—ভবানীপুর—আসুন মহাশয়—৪ পয়সায় ভবানীপুর; তাহার চীৎকারের উপর চীৎকার করিয়া অপর গাড়ীর গাড়োয়ান হাঁক দিতে লাগিল—খিদিরপুর—খিদিরপুর কে যাবে—৪ পয়সায় খিদিরপুর। এই রকম চীৎকার করিয়া যাত্রী ধরাধরি ব্যাপারের অধিকার লাভের জন্য পাহারাওয়ালা মহাপুরুষদিগকে অবশ্য প্রতি যাত্রার নিয়মিত প্রণামী দিতে হইত।

চার জন এক মুখের যাত্রী পাইলে গাড়োয়ানেরা খুবই আহ্লাদিত হইত। কিন্তু যদি দেখিল যে, সে সময়ে একমুখের তিনজন যাত্রী ছাড়া চতুর্থ একজন পাওয়া গেল না, তখন গাড়োয়ান বেচারা কি করে—অগত্যা বাধ্য হইয়া গাড়ীর এলোমেলো সারির মধ্য হইতে নিজের গাড়ীটা কোন রকমে বাহির করিয়া লইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়া দুইটীকে পৃষ্ঠে একবার এদিকে একবার ওদিকে ছিপছিপে চাবুকের দ্বারা উ—উ—শব্দ করিতে করিতে কসিয়া মার দিতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে সম্মুখের পাদানিতে পা ঘসিতে ঘসিতে ঐউ—উ—শব্দ করিতে লাগিল; আবার উহারই মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিল—আর একজন ভবানীপুর। যদি ভাগ্যক্রমে আর একটী আরোহী জুটিল, তবে গাড়োয়ানেরও সৌভাগ্য এবং সেই আগন্তুক যাত্রীরও সৌভাগ্য—বিনা দ্বিধায় আগন্তুক যাত্রী নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ৪ পয়সার স্থলে ৩ পয়সা হাঁকিয়া বসিল, গাড়োয়ানও নাই-মামা অপেক্ষা কাণা-মামা ভাল, এই ন্যায় অনুসারে ৩ পয়সাতেই তাহাকে ভবানীপুরে পৌঁছাইয়া দিতে স্বীকার করিল।

ভবানীপুর এখনকার মতই তখনও বড় বড় উকীলের বাসস্থান ছিল; খিদিরপুর হইয়া কালীঘাট যাওয়া সুবিধাজনক ছিল; বাগবাজার চিত্রেশ্বরী ঠাকুর, মদনমোহন ঠাকুর এবং অনেক সাধুসন্ন্যাসীর বাসস্থান ছিল; এবং শ্যামবাজারও ভবানীপুরের মত অনেক বড় বড় উকীলের বাসস্থান ছিল।

গাড়োয়ানেরা পুলিশকে যথারীতি নজর সেলামী দিবার ফলে নির্ভয়ে কোচবাক্সে ও গাড়ীর ছাদে নির্দ্দিষ্ট

---

* সমাজের অতিরিক্ত অধীনতা স্বীকার করিলেও যে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য, লেখক সেদিকটা একটু স্পষ্টভাবে দেখাইলে ভাল হইত। ত. স.

† উড়িষ্যা ও বিহার জর্ণেল, ১৯২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়ের Ostracism in ancient Indian Society নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী আরোহী উঠাইত। অনেক সময়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া দুইটা গাড়ী টানিতে না পারিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া যাইত। তখন তাহাদের উপর গাড়োয়ানদের মহা ক্রোধ উপজাত হইত এবং তাহার ফলে তাহারা ঘোড়াদের উপর সুমিষ্ট আত্মীয়তাত্মক মধুময় সম্ভাষণের সঙ্গে চাবুকের দণ্ডাঘাত দ্বারা যে প্রহার বর্ষণ করিত, তাহা দেখিলে পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু আরোহীরা এক পদও নড়িত না—কারণ তাহারা পয়সা দিয়াছে। আর নামিলেই বা তাহারা দূরদূরান্তরে যাইবে কিরূপে—আর তো গাড়ী পাইবে না?

হয়তো একই দিকের দুইটা গাড়ি একই মুখে চলিতেছে তখন হয় তো অল্প অল্প তাড়ি বা ধান্যেশ্বরী খাইয়া প্রফুল্লচিত্ত হইবার ফলে সহসা দুইটি গাড়োয়ানেরই মনে পরস্পরের সহিত টক্কর দিবার ইচ্ছা সমুদিত হইল—কাহার গাড়ী আগাইয়া যায়। তাহাদিগকে আর পায় কে?—উ—উ—উ—উ; কেবল এই শব্দ আর চাবুক হইতে ছিপের আওয়াজ শোনা যাইতেছে—বেচারী ঘোড়াগুলি মরিয়া হইয়া ছুটিতেছে, সহসা দুইটা গাড়ীতে ধাক্কা লাগিল—দুইটাই উল্টাইয়া পড়িল। আরোহীগণ তো এতক্ষণ প্রাণ হাতে করিয়া নীরব ছিলেন, কিন্তু এখন তো আর চলিল না—নামিয়া পড়িয়া গাড়োয়ান-দিগকে গালাগালি দিতে দিতে পদব্রজেই কোন প্রকারে গৃহে ফিরিলেন। এ সকল দৃশ্য এখন আর তত দেখা যায় না—সম্পূর্ণ যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। এখন এক তো ট্রামগাড়ী হইয়াছে, তাহার উপর পুলিশের কড়াকড়িও একটু বাড়িয়াছে; আর সর্ব্বোপরি, গাড়োয়ানরা তেমন তেমন গোলমাল করিলে মোটর ট্যাক্সি বা মোটর বসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই হইল—অনেক দূরে পড়িলেও জানি যে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে বস্ বা ট্যাক্সি যাহা হোক একটা পাওয়া যাইবেই।

রাস্তার বিপদ।

সেকালে ঠিকা গাড়ী কেন, ঘরের গাড়ীতে গেলেও, এমন অনেক স্থান ছিল, যেখানে যাওয়া নিরাপদ বিবেচিত হইত না। তন্মধ্যে দুই তিনটী স্থান গুণ্ডামির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—হ্যালিডে ষ্ট্রীট ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড়, বড়বাজারের আফিঙ্গের চৌরাস্তা ইত্যাদি। একবার আমরা সঙ্গীত শিক্ষা করিতে বসিয়াছি, সঙ্গীতশিক্ষক ৺ক্ষুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিলেন—"এইমাত্র সকালে প্রায় ৮টার সময় একদল গুণ্ডা বড়বাজারের এক বড় দোকান হইতে একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিয়া গেল—সকলেই হতভম্ব!" পুলিশ অবশ্য ঘটনা ঘটিবার পর যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করিয়াছিল, কিন্তু শোনা গেল যে, ঘটনা ঘটিবার সময় কোনও পাহারা-ওয়ালাকে অকুস্থলে উপস্থিত দেখা যায় নাই। একবার হ্যালিডে ষ্ট্রীট—যাহা ক্রমে সেন্ট্রাল (পরে চিত্তরঞ্জন) আভেনিউ অংশে পরিণত হইয়াছে—হ্যালিডে ষ্ট্রীট দিয়া আমার এক কাকা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো ও জুড়িতে চড়িয়া তিন চার জন বন্ধুর সহিত গড়ের মাঠের হাওয়া খাইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। মলমলের কামিজ তাঁহার গায়ে ছিল, তাহারই বুকপকেট হইতে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছিল। হ্যালিডে ষ্ট্রীটের মোড়ে যেমন গাড়ী পৌঁছিয়াছে, অমনি কোথা হইতে একজন গাড়িতে চড়িয়া তাহার কার্য্য-সম্বন্ধে আরোহীগণকে ভাবিবার অবসর না দিয়াই ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া লইয়া উধাও হইয়া গেল! খিদির-পুরের পুলের উপর দিয়াও সেইরূপ সন্ধ্যার পর হাঁটিয়া বা গাড়ীতে যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। সেখানে জাহাজের খালাশি ও কেল্লার গোরারা দাঁড়াইয়া থাকিত এবং অবসরমত পথিকদিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত—তাহার আর কোন প্রতীকার হইত না। বেহালার সুপ্রসিদ্ধ ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রতি বুধবার আদি-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পর রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময় এই পুলের উপর দিয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। একবার তাঁহার গাড়ী গোরারা আক্রমণ করিয়াছিল। সেকালে গোরাদের কাছ হইতে শত হস্ত দূরে থাকাই প্রচলিত প্রথা ছিল। যদি কেহ গোরাকে তাহার অত্যাচারের বিনিময়ে কসিয়া ঘা কয়েক মারিতে পারিত এবং তাহার ফলে গোরা যদি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিত বা ভূমিবিলুণ্ঠিত হইত, তবে গোরার সেই শাস্তিদাতার নামে জয়জয়কার পড়িয়া যাইত। বেচারাম বাবুর দেহে যথেষ্ট বল ছিল এবং মনে প্রচুর সাহস ছিল। তিনি সঙ্গে একটা আধমনী মোটা ডাণ্ডা রাখিতেন। সেই ডাণ্ডার সাহায্যে তিনি গোরাদিগকে ভাগাইয়া দিয়া অক্ষতদেহে গৃহে ফিরিয়াছিলেন। এই রকম গুণ্ডামির গল্প প্রায় প্রতিদিনই শোনা যাইত। হিন্দুমুসলমানের বিরোধের পর যেমন দিনকতক কথায় কথায় ছোরা-মারামারির ব্যাপার চলিয়াছিল, সেকালে বিশেষ বিশেষ পাড়ায় সারা বৎসর ধরিয়াই সেই রকম ব্যাপার চলিত। লোকমুখে এবং সেকালের খবরের কাগজে সেই সকল মারামারির বিবরণ দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত আকারে পরি-বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইত। কাজেই আমাদের অভিভাবকরা ভয়ে শুকাইয়া যাইত এবং আমরা সহজে সেই সমস্ত পল্লীর ভিতর দিয়া গাড়ী লইয়া যাইতে দিতাম না।

পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মশিক্ষা। *

(আচার্য্য ৺শিবনাথ শাস্ত্রী)

প্রাচীন ভারতের আচার্য্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সাধারণ মানবের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের জন্য যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কর্ম্ম ও দেব-দেবীর পূজাদি রাখিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মকে জ্ঞানিগণের জ্ঞানালোচনা ও সংসার-নির্লিপ্ত সাধকগণের ধ্যান-ধারণার জন্য রাখিয়াছিলেন। এইরূপে কর্ম্মপথ ও জ্ঞানপথ নামে দুই পথ সৃষ্টি হইয়া সমান্তরাল ধারার ন্যায় বহিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে আমরা যে উচ্চ ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধন ও প্রচার করিতেছি, তাহাকে তাঁহারা মানবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সাধনের উপযোগী মনে করেন নাই। তাহার এক প্রধান কারণ এই ছিল যে, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রধানতঃ আত্মার পরমাত্মা রূপেই সাধন করিয়া ছিলেন। উপনিষদ উপদেশ করিয়াছেন :—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

অর্থ—সকল অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, সকল সচেতনের যিনি চৈতন্য, একাকী যিনি বহু প্রাণীর কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, যে ধীরেরা সেই পরব্রহ্মকে আত্মস্থ বলিয়া দেখেন, তাঁহারাই শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

উপনিষদের এই উপদেশের মধ্যে অতি গভীর অর্থ নিহিত আছে। তাহা এই, ঈশ্বরকে মানব সচরাচর তিন স্থানে দেখিতে পারে। প্রথম প্রকৃতিরাজ্যে, দ্বিতীয় প্রাণীজগতে, তৃতীয় মানবসংসারে। প্রকৃতিরাজ্যে যদি তাঁহাকে দেখিতে যাই, তাহা হইলে তাঁহাকে অনিত্যের মধ্যে নিত্যরূপে দেখিতে পাই; কারণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল রূপসকল এক অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় মহাসত্তা বা মহাশক্তিকেই ব্যক্ত করে। তিনি প্রকৃতির অনিত্য রূপসকলের মধ্যে নিত্য।

তৎপরে চেতনরাজ্যে যখন প্রবেশ করি, তখন চেতনা গতি বা জীবন আমাদের চিত্তকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এই চেতনা গতি কবে কি প্রকারে বিশ্বরাজ্যে প্রবেশ করিল? কোথা হইতে কোন্ প্রক্রিয়াতে বিবর্ত্তিত হইল? ইহা বিজ্ঞানের মহা প্রশ্ন, ইহা চিন্তাশীল সাধকের গভীর চিন্তার বিষয়। সাধক ইহার উৎপত্তির প্রকার ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, কিন্তু তিনি জ্ঞাননেত্রে ইহা দেখিতে পান যে, যে মহাসত্তা জড়ের অনিত্য রূপ-সকলের মধ্যে নিত্যরূপেই রহিয়াছেন, সেই মহাসত্তাই সচেতন জীবের মধ্যে পরম চৈতন্যরূপে বাস করিতেছেন।

তৎপরে মানবসংসারে তাঁহাকে দেখা। মানবসমাজের অভ্যুত্থান ও পতনের মধ্যে, সহস্র ব্যক্তির সহস্র প্রকার কর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কে কাম্য বস্তু-সকল বিধান করিতেছেন? কে অন্যান্য প্রাণীর গতি নিয়মিত করিতেছেন, কে ধর্ম্মকে স্থাপিত রাখিতেছেন? উত্তর—বিধাতা। যিনি জড়রাজ্যে নিত্যশক্তি-রূপে বিরাজিত, যিনি চেতনরাজ্যে চৈতন্যরূপে বিরাজিত, তিনিই মানবসংসারে বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ঋষিগণ বিরত হইলেন না; তাঁহাদের প্রধান কথা এই বলিলেন যে, এই পরম বস্তুকে আত্মস্থ করিয়া অর্থাৎ আত্মার পরমাত্মারূপে দেখিতে হইবে।

ইহাই প্রাচীন ভারতের প্রধান সাধনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। পরব্রহ্মকে আত্মার পরমাত্মারূপে সাধন করিতে হইবে। তাঁহাকে আত্মার পরমাত্মারূপে সাধন করিতে গিয়া এদেশীয় সাধকগণ ক্রমে তাঁহার অপর ভাব-গুলিকে পশ্চাতে ফেলিলেন। তাঁহাকে আত্মস্থরূপে দেখিতে হইলে আত্মনিবিষ্ট হইতে হয়, আত্মনিবিষ্ট হইতে হইলে চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হয়। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিতে হইলে বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইতে হয়, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও বিবিক্তসেবী হইতে হয়। এইরূপে একটী হইতে অপরটী, সেটী হইতে আর একটী, এইরূপ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সাধনপ্রণালীর কি ফল তাহা আমরা ভারতীয় ইতিবৃত্তে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা মানবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে হেয় বোধে বর্জ্জন করিয়াছে, মানব-সমাজের দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই এবং মানব-সমাজকে বিবিধ দুর্গতিতে নিমগ্ন দেখিয়াও আত্মতৃপ্ত থাকিয়াছে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অনুভব করিলেন যে ভারতের এই উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবকে সমাজবিমুখতা হইতে উদ্ধার করিয়া সামাজিকতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি সেই সংকল্প করিয়া ভারতের বহু কালপ্রচলিত বেদান্তধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মপূজাকে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ফল এই হইল যে,

* ১৯০৭ সাল, ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার মাসিক-সমাজের উপাসনা কালে সাধারণব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশ।

সেই পরম পুরুষের যে সকল রূপ ভারতীয় জ্ঞানিগণের সাধনে পশ্চাতে পড়িয়াছিল তাহা আবার জাগিয়া উঠিল, অর্থাৎ ব্রাহ্ম সাধকগণ আবার তাঁহাকে জড়রাজ্যে নিত্য শক্তিরূপে, চেতনরাজ্যে চেতয়িতারূপে, মানবসংসারে বিধাতারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। এখন আমাদের ঈশ্বর চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; প্রকৃতির প্রকৃতিরাজ্যের ভীমকান্ত রূপের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতেছি, জীবনের বিবিধ চেষ্টার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতেছি, মানবসমাজের উত্থান ও পতন, বিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতেছি, আবার আত্মমন্দিরে হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ ব্রহ্মরূপেও তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছি।

বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টিকে কি প্রসারিতই না করিয়াছে! আমরা অনুভব করিতেছি, সমুদ্রকূলবর্ত্তী বালুকণা যে নিয়মে বিধৃত হইতেছে সেই নিয়মে গ্রহ উপগ্রহ সকলও বিধৃত হইতেছে। যে শক্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম পদার্থের মধ্যে কার্য্য করিতেছে সেই শক্তিই ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্রতম পদার্থের মধ্যে কার্য্য করিতেছে।

সেইরূপ অপর দিকে যে জ্ঞান ও যে প্রেম সমগ্রভাবে সমুদয় মানবসমাজকে রক্ষা করিতেছে, সেই জ্ঞান ও প্রেম ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানবকে রক্ষা করিতেছে। এখন আর মানবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ধর্ম্মের সাধন-ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ধ্যান-ধারণাই প্রত্যেক মানবাত্মার উচ্চ-ধর্ম্মভাব সাধনের একমাত্র উপায় ছিল। এখন যে ধ্যানধারণার প্রয়োজনীয়তা অল্প হইয়াছে, তাহা নহে; বরং বর্ত্তমান সভ্যতায় সহস্র প্রকার বিক্ষেপকারী কারণের মধ্যে ধ্যান-ধারণাকে ধর্ম্মসাধনের উপায়রূপে দৃঢ়তর মুষ্টিতে ধরা আবশ্যক। কিন্তু প্রভেদ এই মাত্র ঘটিয়াছে যে ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র আর কেবলমাত্র ভিতরে নহে, তাহা ভিতরে ও বাহিরে। মানবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধক নহে বরং সহায়।

ইহা এক মহৎ পরিবর্ত্তন। এখন যদি আমি সমাজ-বিমুখ হইয়া কেবল ধ্যান-ধারণাতে নিমগ্ন থাকি, আমার ধর্ম্ম অঙ্গহীন ও আমার সাধন আংশিক হইবে; যে মহা ধর্ম্মভাব আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে এবং দিন দিন অধিকতররূপে অধিকার করিতেছে, তাহার চক্ষে ইহা হীন বলিয়া গণ্য হইবে। এখন আমরা অনুভব করিতেছি যে আমাদের প্রত্যেককে উঠিতে হইলে জনসমাজকে লইয়া উঠিতে হইবে, জনসমাজকে তুলিবার চেষ্টাতেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি।

জনসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিলেই অনুভব করা যাইবে, যে সেই সমাজই আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত যাহার অধিকাংশ নরনারীর অর্থ অপেক্ষা পরমার্থে অধিক অনুরাগ এবং তাহার ফলস্বরূপ তাহারা ভোগের ন্যায় ত্যাগের জন্যও প্রস্তুত, এবং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে।

অর্থ হইল প্রধানভাবে ও প্রধান যত্নে ধনমানাদির অনুসরণ করা, পরমার্থ হইল প্রধানভাবে ও প্রধান যত্নে সত্য, ন্যায়, মঙ্গলভাবের অনুসরণ করা। যে চিত্তে পরমার্থানুরাগ জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা ভোগের সময় ভোগে থাকিয়াও ত্যাগের সময় ত্যাগকে বরণ করিতে পারে; এবং প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পথে না গিয়া স্বাভাবিকরূপে নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তির সংযমের পথে গিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই, ব্যক্তিগত হৃদয়ে এই পরমার্থানুরাগ কিরূপে উদ্দীপ্ত হইতে পারে? সহজ উত্তর—সত্য, ন্যায় ও মঙ্গলভাবের আধার সেই পরম পুরুষে প্রীতি জন্মিলেই পরমার্থে অনুরাগ জন্মে। আবার প্রশ্ন—ব্যক্তিগত হৃদয়ে সেই পরম পুরুষের প্রতি কিরূপে প্রীতি জন্মিতে পারে? এই স্থলে পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। যেটা মানুষের হাতের কাছেই আছে, যেটা মানুষ অবশ্যম্ভাবীরূপেই পাইবে, যেটা শতদ্বার দিয়া তাহার কাছে আসিবেই আসিবে, সেটার উপদেশের প্রয়োজন নাই; যেটা জীবন-সংগ্রামে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা, যেটা চক্ষের পশ্চাতে পড়িবার সম্ভাবনা, সেই বিষয়েই শিক্ষার প্রয়োজন। মানুষের ক্ষুধা হইলেই সে আহার অন্বেষণ করিবেই—তাহাকে উপদেশ দিতে হয় না, তুমি খাইও। আবার যে পুত্রটী ঘরে আছে, প্রাতে উঠিলেই যার মুখ দেখি, যার সুখ দুঃখের বিষয় ভাবিতে হয়, তার জন্য এ উপদেশের প্রয়োজন নাই—ছেলেটীকে ভুলিও না; যে সন্তানটী দূরদেশে আছে, তাহার প্রতি কর্ত্তব্যই স্মরণ করাইতে হয়। সেইরূপ দেখিতে পাই, মানবজীবনের শত সংগ্রামের মধ্যে, বিশেষত: বর্ত্তমান কালের শত আকাঙ্ক্ষায় শত প্রতিঘাতের মধ্যে মানব-চিত্তে অর্থটাই প্রবল হইয়া পরমার্থটা পশ্চাতে পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং বলিতে হয় এরূপ সামাজিক শিক্ষার উপায় কর, যাহাতে পরমার্থটা পশ্চাতে পড়িয়া না যায়। অনিয়ন্ত্রিত ভোগস্পৃহা বর্ত্তমান সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ। ইহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের আবশ্যকতা স্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই, বরং এরূপ সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে শিখায়। বর্ত্তমান সময়ে মানবের উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলো চরিতার্থতার শত-সহস্র উপাদান হাতের নিকটে উপস্থিত, এখন এরূপ সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে নিবৃত্তির দিকে মানবমনের গতি হয়।

এই প্রকার সমাজিক শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা করিলেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করা যায়। গৃহ-পরিবারে বালকবালিকা যখন বর্দ্ধিত হয় তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থ অপেক্ষা পরমার্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিতে ও সেই পরম পুরুষে প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। তৎপরে সামাজিকভাবেও লোকশিক্ষার এরূপ সকল উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মানুষের এই পরমার্থবুদ্ধি প্রবল হইতে পারে।

একটী কথা অতি চিন্তাশীল লোকেরও মুখে শুনিয়াছি, সেজন্য এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা বলেন ধর্ম্মবিশ্বাস মানব-চিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, ধর্ম্মবিশ্বাস মূলে না থাকিলে মানুষ প্রকৃতভাবে নীতি বা সাধুতা, বা নরসেবা, বা স্বদেশ-প্রেম কিছুরই উপর দাড়াইতে পারে না। তুমি মানব-জীবনের যে বিভাগেই কার্য্য করিতে যাও না কেন, অসত্যের সহিত সত্যের, অন্যায়ের সহিত ন্যায়ের বিবাদ উপস্থিত হইবেই হইবে। তুমি যে অসত্যের বা অন্যায়ের সহিত সংগ্রামে দাড়াইবে, তোমার দৃঢ়নিশ্চয় কি যে সে সংগ্রামে সত্য ও ন্যায় জয়যুক্ত হইবেই হইবে? আর এ দৃঢ়নিশ্চয় যদি না থাকে তুমি কিরূপে স্থির থাকিতে পার? তুমি যখন সে সংগ্রামে স্থির থাকিতেছ, তখন সুনিশ্চিত যে তোমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন আছে যে, মানব-জীবন কেবল ভৌতিক শক্তি ও নিয়ম সকলের দ্বারা শাসিত হইতেছে না, কিন্তু অন্তরালে আরও কোন নৈতিক শক্তি আছে, যাহা অনিবার্য্যরূপে ও অমুল্লঙ্ঘনীয়রূপে সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে। এতটা স্বীকার করিয়াও তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মের সামাজিক সাধন বা সামাজিক প্রসর আবশ্যক নহে। ধর্ম্মকে গোপনে নির্জ্জনে, ব্যক্তিগতভাবে সাধনের জনাই রাখা উচিত। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে ধর্ম্মের সামাজিক সাধন ও প্রচার দ্বারা জনসমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইয়া থাকে। ধর্ম্মকে সামাজিকভাবে সাধন ও প্রচার করিতে গেলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়, এবং ধর্ম্ম মানব সমাজের মিলনের ভূমি না হইয়া বিচ্ছেদের কারণ হয়। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বিগণ যতই তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মকে সমগ্র মানবের অবলম্বনীয় বলিয়া ঘোষণা করুন না কেন, চরমে তাঁহাদের ধর্ম্ম জগতে ঘোর বিরোধ উৎপন্ন করে এবং মানবকুলের মধ্যে এক নূতন অশান্তির কারণ আনয়ন করে; এইরূপে শাক্য ঈশা প্রভৃতি সকলেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মকে সমগ্র মানব-জাতির অবলম্বনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু চরমে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম মানবকুলের মধ্যে একতা স্থাপনে সাহায্য না করিয়া ঘোর বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে।

ইঁহাদের উক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু মানবসমাজের উন্নতির নিয়ম এই যে, যে সকল সত্যকে বিস্মৃত হইয়া মানবসমাজ ভ্রম ও কুসংস্কারের মধ্যে বদ্ধ থাকে, তাহা হইতে তাহাকে তুলিবার জন্য যখন নব সত্যের নব ভাবে প্রচার আরম্ভ হয়, তখন চিরাগত সংস্কারের সহিত, তাহার বিরোধ উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। বিরোধই মানবচিত্তকে উত্তেজিত করে, সত্যবিশেষের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে, এবং ক্রমে সেই ভাবাপন্ন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে সুরাপান যাহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের নিকট সুরাপানের বিরুদ্ধে কথা কহিলে, বিরোধ উৎপন্ন হওয়া অনিবার্য্য; তাহা বলিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত হইলে হইবে না, বিরোধ সত্ত্বেও সুরাপানের দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে, সুরাপানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে হইবে, সুরাপাননিবারিণী সভাকে প্রবল রাখিতে হইবে। এরূপ করিয়াই সুরাপানকে সংযত করা সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত আপত্তি যদি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হয় তবে সুরাপাননিবারিণী সভাও রাখা কর্ত্তব্য নয়। এইরূপ যাঁহারা হোমিওপ্যাথি সম্মত চিকিৎসা-প্রণালীকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, এলোপ্যাথি পথাবলম্বীদিগের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উৎপন্ন হওয়া অনিবার্য্য, তাহা বলিয়া কি তাঁহারা স্বীয় অবলম্বিত চিকিৎসাপ্রণালী প্রচার করিবেন না? আর যদি সম্প্রদায়িকতার ভয়ে না করেন, জগতে সত্যের প্রচার হইবে কিরূপে?

ধর্ম্মের সামাজিক সাধন ও শিক্ষার প্রণালীরও প্রয়োজন আছে, তাহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, অদৃষ্টবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের চিরপোষিত মতসকল হিন্দুসমাজের আপামর-সাধারণ, কৃষক, শ্রমজীবী, চিরদুঃখী সকল শ্রেণীর নরনারীর মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। কিরূপে এই সকল মতের বহুলপ্রচার হইল? উত্তর, এই, হিন্দু আচার্য্য ও গুরুগণ চিরদিন পাঠ, গান, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রজাসাধারণোপযোগী প্রচার প্রণালী দ্বারা স্বীয় স্বীয় মত ও ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছেন। যে বিষয়ে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন সে বিষয়ে অপরে কেন কৃতকার্য্য হইবে না? অপর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের যৌবনের প্রারম্ভে আমরা কতিপয় ব্যক্তি স্বদেশ-প্রেমের সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; জাতীয় মেলা প্রভৃতি করিয়া কবিতাপাঠ ও বক্তৃতাদি করিতাম। এখন

ঘরে ঘরে স্বদেশ-প্রেমে উদ্দীপ্ত নরনারী দেখিতেছি। জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে আমাদের জনসাধারণের ভাব এতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পাড়ল? প্রচারের চেষ্টাতে কি নহে? প্রচারের চেষ্টাতে স্বদেশপ্রেম যদি বালক-বৃদ্ধের মধ্যে জাগ্রত হইতে পারে ধর্ম্মভাবের প্রচারচেষ্টাতে কেন তাহা হইবে না?

অতএব ইহা নিশ্চিত যে নরনারীকে অর্থ অপেক্ষা পরমার্থে আস্থাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইলে গৃহপরিবারে ও সমাজে ধর্ম্মকে সাধন ও প্রচার করিবার উপায় করিতে হইবে। আবার পুনরুক্তি করি বয়োবৃদ্ধিসহকারে নরনারী অর্থ অপেক্ষা পরমার্থকে, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিকে শ্রেয় জ্ঞান করিবে ইহা যদি দেখিতে চাও, তবে গৃহ-পরিবারে ও সমাজে ধর্ম্মকে এরূপভাবে স্থাপন কর, যাহাতে ধর্ম্মভাবের হাওয়ার মধ্যে সকলে বর্দ্ধিত হয়। এই হাওয়া শব্দটার উপর জোর দিতেছি। কারণ ধর্ম্মের সত্য ও নিয়মসকলের বিষয়ে মুখে মুখে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা ধর্ম্মের হাওয়ার মধ্যে সন্তানদিগকে বর্দ্ধিত করিতে পারার মূল্য অধিক বলিয়া মনে করি।

এই ধর্ম্মের হাওয়া কিরূপে জন্মিতে পারে? ঐ মারওয়ারীপটীতে গিয়া দেখ, তথাকার বালকগণ কিরূপে বিষয়বাণিজ্যের হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা দশ বার বৎসরের বালকটীকে দোকানঘরের দ্বারে বসাইয়া দিয়াছে, সে সেখানে বসিয়া সমস্ত দিন ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনা, দর-দস্তুর সুদ-আসলের হিসাব দেখিতেছে; তৎপরে ঘরে যখন যাইতেছে, সেখানে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের মুখে সেই প্রকার আলাপ শুনিতেছে; খেলিবার সঙ্গীদের সঙ্গে যখন মিলিতেছে তখন কার পিতার দোকানে কত বিক্রী, কাদের কত লাভ, সে কি অবস্থা হইতে উঠিয়া কত টাকা করিয়াছে এই সকলই শুনিতেছে; ইহাকেই বলে ব্যবসার হাওয়া; ইহা কি বিচিত্র যে সেই বালক পাকা ব্যবসাদার হইয়া উঠিবে?

এখন প্রশ্ন এই গৃহপরিবারে ও সমাজে কিরূপে পরমার্থিকতার হাওয়া রাখা যায়? কিন্তু এ প্রশ্নে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হাওয়াবিহীন ধর্ম্মোপদেশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনের জন্য কিছু বলি। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ উপন্যাসলেখক ডিকেন্স তাঁহার এক গ্রন্থে এক গুরুমহাশয়ের ছবি দিয়াছেন। গুরুমহাশয়টীর মফঃস্বলে এক বালকদিগের বোর্ডিংহাউস আছে। তিনি বালকসংগ্রহের জন্য লণ্ডনে আসিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া প্রথম পক্ষের বালকটীকে বোর্ডিংহাউসে দিতেছেন। তাহাকে গুরুমহাশয়ের হাতে দিয়া গিয়াছেন। সে ভয়ে ভয়ে মুখ বুজিয়া বসিয়া আছে; তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে; চক্ষে জল আসিতেছে; গুরুমহাশয় দুধে জল মিশাইয়া ও দুইখানি বিসকুট দিয়া তাহাকে খাইতে দিয়াছেন, তাহাতে তার পেট ভরে নাই; সে গুরুমহাশয়ের টেবলস্থিত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের প্রতি ঘন ঘন ক্ষুধার্ত্তদৃষ্টিপাত করিতেছে। গুরুমহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, পারিয়া তাহাকে নিজ আহারের মধ্যে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু তিনি নিজের মুখে এত বড় একখণ্ড মাংস পুরিয়াছেন যে তাঁহার বাক্যগুলি ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। তিনি বালকটীর দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দেখ, এ জগতে জ্ঞানলাভ করিতে গেলে প্রথম শিখিবে লোভ দমন করা।" এই উপদেশ যেমন উপহাসের বিষয়, তেমনি যদি গৃহপরিবারে বা সমাজে ধর্ম্মের হাওয়া না থাকে, তাহা হইলে অনেক মৌখিক ধর্ম্মোপদেশ উপহাসের বিষয় হইয়া যায়। মনে করুন, একজন ভদ্রলোক দিনের মধ্যে একবার তাঁহার সন্তানগণকে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিয়ম করিয়াছেন। সদা সত্যপথে থাকিবে, অসত্য বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবে না; ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শী চক্ষু ভুলিবে না, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া থাকেন। একদিন কোনও ধনীর বাগানের মালী প্রভুর বাগানের কতকগুলি ভাল ভাল গাছ চুরি করিয়া বিক্রয় করিতে আসিল। সেই ভদ্র গৃহস্থটী সন্তাদরে ভাল ভাল গাছ পাইয়া একেবারে ভুলিয়া গেলেন ও কিনিতে বসিলেন। তখন সমাগত একটী যুবক তাঁহাকে আস্তে আস্তে বলিল, "মহাশয়! আপনি কি বুঝতে পারছেন না ও চুরি করে গাছ বেচছে, ও গাছ নিলে চুরির প্রশ্রয় দেওয়া হয়!" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ও গাছ কিরূপে সংগ্রহ করেছে তা আমি দেখতে গেলাম কেন? আমার গাছের প্রয়োজন ও গাছ এনেছে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" এই কথোপকথন তাঁহার সন্তানবর্গের সমক্ষে হইল। সকলেই ভাবিতে পারেন ইহার পরে সন্তানদের প্রতি তাঁহার দৈনিক উপদেশের ফল কি হওয়া সম্ভব।

তাই বলিয়াছি ধর্ম্মের মৌখিক উপদেশের তত প্রয়োজন নাই, গৃহপরিবারে ও সমাজে ধর্ম্মের হাওয়া থাকার যত প্রয়োজন। কিন্তু আবার প্রশ্ন—সে হাওয়া কিরূপে জন্মে? সংক্ষেপে উত্তর,—সমাজের বালকবালিকাগণ যদি গৃহপরিবারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পায়, যদি পিতমাতা আত্মীয়স্বজনের চরিত্রে পারমার্থিকতার অর্থাৎ স্বার্থের উপরে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন দেখিতে পায়, যদি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের আলাপআচরণে সেই পারমার্থিকতা অনুভব করে, যদি সমাজে তাহারা সর্ব্বদা পারমার্থিকতার উপদেশ পায়, পারমার্থিকভাবে অগ্রসর

ব্যক্তিদিগকে সম্মানিত দেখিতে পায়, যদি তাহারা এরূপ ব্যক্তিগণের সংস্রবে আসে, তবেই তাহারা পারমার্থিকতার হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, এবং ধর্ম্মভাব স্বাভাবিকরূপে তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করে।

এস্থলে একটী কথা স্মরণে রাখিবার উপযুক্ত। গৃহপরিবার মধ্যে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় গৃহস্থিত শিশুরা তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিলেও তাহা দেখা ও তাহাতে উপস্থিত থাকা, পরোক্ষভাবে তাহাদের ধর্ম্মভাবকে পোষণ করিয়া থাকে; তাহারা এই চিন্তাতে বর্দ্ধিত হয় যে জীবনের একজন প্রভু আছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া জীবন ধারণ কর্ত্তব্য নহে। আমরা বালককালে নিজ নিজ গৃহে কত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতাম, তাহার আমোদের অংশের সহিত যোগ দিতাম, তাহার ধর্ম্মের দিক বুঝিতাম না। কে বলিবেন যে তদ্দ্বারা আমাদের ধর্ম্মভাব গঠন করে নাই? আমি যখন শিশু, তখন দেখিতাম যে আমার প্রপিতামহ মহাশয়, শতবর্ষীয় বৃদ্ধ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা, পাঠ, নামগান, স্তুতি বন্দনা প্রভৃতিতে কাটাইতেন, আবার সায়ংকালে সূর্য্যাস্ত হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জপ করিতেন। আমি তখন তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতাম না; কিন্তু কে বলিবেন যে আমার পক্ষে তাহা বৃথা গিয়াছে? আমার প্রপিতামহের স্মৃতি আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে, এবং কত সময় আমাকে লজ্জা দিয়াছে। গুরুজনের এই ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয়, জীবনের নানা পরিবর্ত্তন ও নানা ঘটনা আমাকে আস্তিক্যতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অতএব গৃহপরিবারে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে অবহেলা করা কোনও গৃহস্থের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। অদ্য এই পর্য্যন্ত—পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু পরে বলিব।

আত্মসংযম।

(জনৈক শিক্ষক)

মনে কর, কোন পল্লীগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছ। সেখানে কি দেখা যায়? প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাড়ী বাগান প্রভৃতির চারি ধারে বাঁশের বা গাছের বেড়া দিয়াছে। কারণ কি? যাহাতে পল্লীবাসীদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধবিবাদ না আসে, যাহাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্থানটুকু অধিকার করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের গরু ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তুগুলিকে ঐ বেড়ার সীমার মধ্যে রাখিয়া দেয়, যাহাতে তাহারা অন্য কাহারও ক্ষেতে গিয়া শস্যাদি না নষ্ট করে। গরু প্রভৃতিকে যদি বা কেহ মাঠে চরিবার জন্য মাঠে ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহাদের সঙ্গে এক রাখাল বালক প্রেরিত হয়—সে দৃষ্টি রাখে, যাহাতে সেগুলি চরিবার স্থান ছাড়া অন্য কোথাও না যায়। তাহা না করিলে গরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি অপরের ক্ষেতে গিয়া সেই ক্ষেতের ধান কড়াই প্রভৃতি শস্য খাইয়া ক্ষেত্রস্বামীর বিস্তর লোকসান করিতে পারে। সভ্যসমাজে প্রত্যেকেরই উচিত, বেড়ার দরজা বন্ধ রাখা, যাহাতে কাহারও জীবজন্তু বাহির হইয়া গিয়া অপরের অনিষ্ট করিতে না পারে।

অনেক সময়ে বেড়া দিবার ফলে লোকের চলাচলের এক আধটু ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সহরে বেশ ভাল ভাল রাস্তা ও পাদপথ থাকাতে তেমন বিশেষ কোনই অসুবিধা হয় না। আর পল্লীগ্রামে বা সহরে, মাঠে ক্ষেতে পড়িলে বেড়াবন্দীও থাকে না, আর চলাচলে কোন বাধাও ঘটে না। সেখানে রাস্তা ছাড়িয়া একটু এদিকে ওদিকে গেলেও কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু মনে কর, ক্ষেতে ধান ফলিয়া আছে; আমরা তো ক্ষেতের উপর দিয়া চলিতে গিয়া অনায়াসে সেই সমস্ত ধান পদতলে মাড়াইয়া নষ্ট করিতে পারি। কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য নহে। অল্পবুদ্ধি বালকেরা অনেক সময়েই নষ্ট করিবার জন্যই অপরের সামগ্রী নষ্ট করিয়া সুখ পায়। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, অপরের যে কোন সামগ্রী হৌক, ঘরের কোন কিছু হৌক বা ক্ষেতের শস্যই হৌক, নষ্ট করা উচিত নয়। কেবল অপরের সামগ্রীই বা কেন, নিজেরও দ্রব্য বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। ক্ষেতের বেড়া থাক বা নাই থাক, ঘরে তালা দেওয়া থাক বা নাই থাক, পরের দ্রব্য লইব না বা নষ্ট করিব না, এইভাবে চলিতে গেলেই আত্মসংযম করা উচিত অর্থাৎ উচিত-অনুচিতের বিচার করিয়া মনের অন্যায় প্রবৃত্তিকে চাপিয়া রাখা উচিত এবং শুভবুদ্ধিতে আমরা যে পথ দেখি, সেই পথেই আপনাকে চালানো উচিত।

মানুষের বোঝা উচিত যে, আত্মসংযমের একটা মর্য্যাদা আছে। বিলাতের একটী বিদ্যালয়ে সাবেক ধরণে জানালাগুলি লোহার গরাদে দিয়া আটকানো থাকিত—উদ্দেশ্য এই যে, ছেলেরা দুষ্টামি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে না বলিয়া "স্কুল পালাইতে" পারিবে না। এখন, সেই স্কুলে একবার আগুন লাগিল। জানালাগুলি গরাদেবন্ধ থাকিবার কারণে একটা কামরা হইতে দুইটী ছেলে বাহির হইতে না পারিয়া পুড়িয়া মারা গেল। তখন কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন যে, সমস্ত গরাদে খুলিয়া ফেলা হইবে এবং ভবিষ্যতে ছাত্রগণের উপর এটুকু বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তাহারা মুক্তিলাভ করিলেও স্কুলের সীমার ভিতরেই থাকিবে, সীমা ছাড়িয়া যাইবে না।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। পরীক্ষা চলিতেছিল। যাহার পরীক্ষা সমাপ্ত হইতে লাগিল, তাহাকে পরীক্ষক পরীক্ষার গৃহেই বসাইয়া রাখিলেন, যাহাতে সে বাহিরে গিয়া অন্যান্য ছাত্রকে প্রশ্নগুলি বলিয়া দিয়া পরীক্ষাকে পণ্ড করিয়া না দেয়। আমারও পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর পরীক্ষাগৃহে আমাকেও বসিয়া থাকিতে হইল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আমার তৃষ্ণা লাগিল। তখন বাহিরে গিয়া জলপান করিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য পরীক্ষক মহাশয়ের নিকট অনুমতি চাহিলাম। তিনি বিনা বাধায় কাহাকেও কোন প্রশ্ন বলিব না, এই কথা গ্রহণ করিয়া আমাকে বাহিরে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রকে বাহিরে যাইবার অনুমতিদানে অস্বীকৃত হইলেন। অন্যান্য ছাত্রেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পরীক্ষক বলিলেন—"আমি জানি যে, সে ব্রাহ্ম; সে যখন বলিতেছে প্রশ্ন কাহাকেও বলিবে না, তখন সে কখনই বলিবে না, কারণ ব্রাহ্মেরা কখনও মিথ্যা কথা বলে না।" বলা বাহুল্য যে, পরীক্ষকের কথার যাথার্থ্য আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর, কিন্তু পরীক্ষক মহাশয়ের সেই কথায় আমার যে আত্মমর্য্যাদা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরজীবন আমার জীবনকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে এবং আমরণ করিবে।

কি শারীরিক, কি মানসিক, সকল বিষয়েই আমাদের আত্মসংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। পশুপক্ষীদের আত্মসংযম নাই, কাজেই আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে খাঁচায় বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু মানুষকে ঐ প্রকার গৃহের খাঁচায় বন্ধ করিলে তাহার আত্মমর্য্যাদার মূলোচ্ছেদ করা হয়। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির আত্মসংযম নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা নিজেদের হিংসাপ্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে না,—হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাহিতে পারে—সেই কারণে তাহাদিগকে বন্ধ রাখা দরকার; সেই প্রকার হিংস্রপ্রকৃতি অসভ্য মানবগণকেও বন্ধ রাখা দরকার, কারণ তাহারাও নিজের প্রকৃতিকে যথাযথ সংযত করিতে শিক্ষা করে নাই। কেবল অসভ্য মানবই বা বলি কেন, আমরা যে আপনাদিগকে সভ্য সমাজের লোক বলিয়া বড় বড়াই করি, আমাদেরও মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা লোভ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া অপরকে অনায়াসে হত্যা করে। এই কারণেই তো ফৌজদারী আদালতের সৃষ্টি এবং সেখানে প্রায় নিত্যই এই প্রকার ঘটনা বিচারার্থ আনীত হয়। তবে, এটুকু বলা যাইতে পারে যে, সাধারণত আমরা সিংস্র জানোয়ারদের মত এতটা হিংস্রক নই যে, আমাদিগকে সর্ব্বদা গরাদে-দেওয়া খাঁচার ভিতরে বন্ধ রাখা দরকার হয়।

কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণার উপর এবং মনের রিপুগণের উপর সংযম প্রকাশ করা আবশ্যক। বাহির হইতে অন্য লোকের চাপানো বন্ধন অপেক্ষা সকল ক্ষেত্রেই আত্মসংযম অর্থাৎ স্ব ইচ্ছায় সেগুলিকে সংযত করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। একথা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, ধনে বা মানে বড় হইলেও ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মানসিক রিপুসকল কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। কথা-কাটাকাটি হইতে রাগ আসিল, রাগের ঝোঁকে পরস্পর পরস্পরকে সাংঘাতিক আঘাত করিল, এমন কত ঘটনাই তো প্রতিদিনই দেখা যায়, শোনা যায়।

আমি এমন পেটুক দেখিয়াছি, যিনি আহারের নিমন্ত্রণ পাইলে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না এবং আহারে বসিয়া অসম্ভবমত আহার করিতেন। তাঁহাদের উদরটী চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়ের একটী ভাণ্ডাররূপে গঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেকালে ধনী লোকেরা বন্ধুবান্ধবকে আমোদ দিবার জন্য এই প্রকার দুই-একটী লোককে গৃহপালিত জানোয়ারের মত বাড়ীতে রাখিতেন। ঐ সকল গৃহপালিত নরাকার জীব-সকল সম্বন্ধে যখন প্রশংসা করা হইত যে অমুক লোক এক আসনে বসিয়া পনেরো গণ্ডা লুচি, এক হাঁড়ি সন্দেশ, দশ সের রসগোল্লা, এক সের পাঁটার মাংস ইত্যাদি খাইতে পারেন, তখন তাঁহারা আহ্লাদে আটখানা হইতেন। একবার "লগন্‌সার" সময়ে উপরোক্ত পেটুকের তিনটী নিমন্ত্রণ আসে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে। তাঁহার খাওয়া দেখিবার ও দেখাইবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে বসানো হইল। তিনিও তাঁহার দশমনী উদর ও বিল্বাকৃতি গোল ক্ষুদ্র মস্তক লইয়া মহা আনন্দে আহারে বসিলেন। সাধারণ লোকের তিন জনের আহার তিনি অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়া সর্ব্বশেষে এক হাঁড়ি রসগোল্লার দ্বারা তাঁহার ভোজনব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। এই মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৈকালে আর এক বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন এবং রাত্রিকালে তৃতীয় এক বাড়ীর নিমন্ত্রণে গেলেন। হায় রে! তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই তৃতীয় নিমন্ত্রণই তাঁহার শেষ নিমন্ত্রণ হইবে—যমন যে তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া ছিল। পরদিবস আমাদের নিকট সংবাদ আসিল, অমুক ব্যক্তি তিনটী নিমন্ত্রণ খাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! আমরা তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কত গুণী জ্ঞানী লোকও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা সংবাদ রাখি যে, আমাদের বাল্যকালে এক বৎসরের মধ্যে সাত-আটটী ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী ব্যক্তি এই কলিকাতা সহরে রক্তবমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

আত্মসংযম বাল্যকাল অবধিই অভ্যাস করিতে হয়। প্রত্যেক বিষয়েই আপনাকে পরীক্ষা করিতে হয় যে, আমি অন্যায় কোন কিছুর বশীভূত হইতেছি কি না; প্রত্যেক দিনই পরীক্ষা করিতে হয় যে আমি আহারাদি বিষয়ে এবং লোভ ক্রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সংযত হইতে পারিয়াছি কি না। সময় থাকিতে সংযম অভ্যাস করিলাম না, আর মনে করিব যে আর একটু বড় হইলে সকল বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিব, সেটা সম্ভব নয়, সেটী শুধু কল্পনা মাত্র। সংযম অভ্যাস করিবার জন্য কেবল যে অন্যায় কাজই ছাড়িতে হয়, তাহা নয়; সময়ে সময়ে, আমার যে খাদ্য অতি প্রিয়, যে কার্য্যটী অতি প্রিয়, শুধু সংযম অভ্যাসের জন্য, তাহাও পরিত্যাগ করিলে উপকার হয়। আজকাল প্রায় সকল চিকিৎসকই স্বীকার করেন যে, উপবাসের দ্বারা আমাদের দৈহিক সংযম অভ্যাস হয় এবং তাহার ফলে শারীরিক স্বাস্থ্য সাধনে যথেষ্ট উপকার হয়। হয় তো সহজে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না—আমরা তিন ভাই ছিলাম; আমাদের বয়স তখন আন্দাজ ১৪ বৎসর—তখন একবার আমরা স্থির করিলাম যে সংযম অভ্যাসের দ্বারা আমাদিগকে দৃঢ় হইতে হইবে। যেমন স্থির করা, অমনি কি আহারে কি ব্যবহারে, সকল বিষয়েই শুদ্ধাচার ও মিতাচার অবলম্বন করিলাম। সেই সঙ্গে স্থির করিলাম যে দেবতারাও যখন নিদ্রা যান না, তখন আমরাই বা দিনে বা রাত্রে নিদ্রার ক্রোড়ে সুখমগ্ন হইয়া রাত্রির সময়টা বৃথা নষ্ট করিব কেন? আর, ঘোড়ারা যখন ছোলা খাইয়া এত দৃঢ় হয় যে, তাহারা সমস্ত দিন দৌড়াইতে পারে এবং রাত্রেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়, আমরাই বা তাহা করিব না কেন? বোধোদয় পড়িয়া তখন জ্ঞান হইয়াছিল যে, ঘোড়ারা একবারও বুঝি শয়ন করে না। কিন্তু এখন অবশ্য দেখি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ উক্তিটী ভুল। যাই হৌক, আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গোণা-গুন্তি সাতটা দিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত কাজ করিয়াছিলাম—একটীবারও বসি নাই এবং রাত্রেও বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই; এবং ঐ সাতটা দিন কেবল ভিজা ছোলা আমাদের খাদ্য হইয়াছিল—বেশী খাইতাম না, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যখন

যেটুকু দরকার হইত, সেইটুকু মাত্র খাইতাম। তাহার ফলে এইটুকু মনে আছে যে, শরীর ও মন খুবই ভাল ছিল, কাজ অনেক বেশী করিতে পারিয়াছিলাম এবং ভগবান সর্ব্বদাই অন্তরাসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। ইহা অনেকে পাগলামী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। আমিও কাহাকেও এরূপ করিতে উপদেশ দিই না— আমি কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে এই বিষয়টী উল্লেখ করিলাম।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঐ বয়সে মাংস খাইতে অনেক ছেলেরই লোভ হয়। আমারও যে লোভ ছিল না তাহা নহে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে মাংসাহার বর্জ্জন সহায় জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম। পুরো একটী বৎসর মাংস খাইলাম না। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইলেও পরে ঠিক উল্টা হইল— মাংস ও পেঁয়াজের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতাম না। যাই হৌক, মাংস ছাড়িবার ফলে পরীক্ষায় দেখিলাম যে, একটী দিনের জন্যও সামান্য একটু সর্দ্দিরও আক্রমণ সহ্য করিতে হয় নাই।

আত্মসংযমের অভাবের দৃষ্টান্ত বিলাতী অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, শুধু কথা-কাটাকাটির ফলে ইংলণ্ডের রাজা হেনরি ২য় মস্ত জ্ঞানী টমাস-আ বেকেটকে খুনই করিলেন। আর একজন ইংলণ্ডরাজ হেনরি ১ম অতিমাত্রায় মৎস্যবিশেষ আহারের ফলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দেশে বিদেশে মদ্যপানের ফলে কত ভাল ভাল লোকের যে জীবন নষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। আমার মনে পড়ে আমার বাল্যকালে একবৎসর মাসখানেকের ভিতর প্রায় ছয় সাত জন কলিকাতার ধনী মানী বড়লোক পরলোক গমন করিলেন শুনিলাম।

ছেলেরা যেমন সময়ে সময়ে ব্যায়ামে বা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা দেখাইয়া গৌরব অনুভব করে, সেইরূপ কি শারীরিক কি মানসিক সকল বিষয়ে আত্মসংযমের পারদর্শিতা দেখাইয়া যাহাতে গৌরব অনুভব করে, সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু আত্মসংযম করিতে হইবে বলিয়া যে শরীরকে জখম করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মশাস্ত্র শরীরকে জখম বা অন্যায়রূপে দুর্ব্বল না করিয়া সংযম সাধনের উপদেশ দিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিবদ সার আইজাক নিউটন কিরূপ আত্মসংযম সাধন করিয়াছিলেন শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার ডায়মণ্ড নামে একটা কুকুর ছিল—কুকুরটী নিউটনের কাছে হীরার টুকরো ছিল। এখন নিউটন কয়েক মাস যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করিয়া একটী বিষয়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া কাগজপত্র তাঁহার পড়িবার টেবিলে রাখিয়াছিলেন এবং সেই টেবিলের উপর একটী বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন ডায়মণ্ড কুকুরটী কেমন এক খেয়ালের বশে সেই টেবিলে শুইতে গিয়া বাতিটী উল্টাইয়া ফেলিল এবং তাহার ফলে সেই হিসাবের কাগজপত্রগুলি পুড়িয়া গেল। নিউটন তাঁহার কাগজগুলির এই দশা দেখিয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"ডায়মণ্ড, ডায়মণ্ড, তুমি জান না যে তুমি কি ক্ষতিটা করিলে।" শুনিয়াছি, রোমের সম্রাট জুলিয়স সীজর বড় রাগী ছিলেন। তিনি নিজের রাগকে সংযত করিবার চেষ্টায় রাগ আসিলেই সহসা কোন কিছু না করিয়া এক দুই করিয়া কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিতেন। কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিবার মধ্যে রাগ অনেকটা সংযত হইয়া আসিত, তখন সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার সময়ে, কি যুদ্ধে, কি বিদ্যায়, কি ধনে, কি মানে সকল বিষয়ে তাঁহার সমান দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অভ্যাস ও চেষ্টার দ্বারা আত্মসংযম বিষয়েও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ ছিলেন না।

ইহা মনে করিও না যে, যে রিপুগুলি বাহিরে প্রকাশ পায়, সেইগুলির সম্বন্ধেই কেবল সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। যে রিপুগুলি অন্তরে প্রকাশ পাইয়া গুমরাইতে থাকে, সেগুলি সম্বন্ধেও সংযম অভ্যাস করা খুবই কর্ত্তব্য। এই অন্তরে গুমরানো রিপুগুলিই শরীর ও মনের উপর বেশী রকম অত্যাচার করে—শরীর ও মনকে একেবারে শুকাইয়া দেয়। আসল কথা এই যে, এমনটী অভ্যাস করিবে যে, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি

বাহিরেও প্রকাশ পাইবে না, অন্তরেও প্রকাশ পাইবে না—মনেতে সেগুলি উঠিতেই দিবে না। আমাদের উচিত, আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট সর্ব্বদাই প্রসন্নমুখে উপস্থিত হওয়া—আমাদের বিষাদ ও বিরক্তির কথা তাঁহাদের শুনিতে ভাল লাগে না, ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। সেইরূপ আমাদের উচিত—আমাদের প্রত্যেকের নিজের কাছে প্রসন্ন থাকা। নিজের কাছে প্রসন্ন না থাকিলে সহজে অপরের কাছে প্রসন্নমুখে উপস্থিত হওয়াও সম্ভবপর হয় না।

কেবল বড় বড় বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিলে চলিবে না; ছোটখাটো বিষয়েও সংযম অভ্যাস করা উচিত। যেমন নিজের কাছে প্রসন্ন না হইলে অপরের কাছে প্রসন্ন থাকা সহজ হয় না, সেইরূপ ছোটখাটো বিষয়ে সংযম অভ্যাস না করিলে বড় বিষয়ে সংযম করা সহজ হয় না। অনেকের অভ্যাস আছে—কোন নূতন লোক দেখিলে তাহার দিকে হাঁ করিয়া একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে; কেহ পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে অনেকেই হাসিয়া খুন হয়। এগুলি বড়ই বর্ব্বরতার পরিচায়ক। ভদ্রসমাজে চলিতে গেলে, সভ্যভব্য বলিয়া নাম বজায় রাখিতে গেলে, এই সকল ছোটখাটো বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। মনে কর তোমার দিকেই যদি কেহ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিই কি প্রকার অসোয়াস্তি বোধ কর; তুমিই পড়িয়া গেলে লোকেরা যদি হাসিয়া উঠে, তাহা হইলে তোমারই মনের অবস্থা কি রকম হয়। এই সমস্ত ভাবিয়া তোমার সকল বিষয়ে সংযত হইয়া চলা উচিত। দাসদাসীরা তাহাদের কাজকর্ম্মে একআধটু ভুলভ্রান্তি করিলে একেবারে তেলেবেগুনে চটিয়া উঠিবে না, বিরক্ত হইবে না। তাহাতে নিজেরই ক্ষতি। তাহাদের ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই ভাবে চলিলে সময়ে তোমরা ঘরের উপযুক্ত কর্ত্তা উপযুক্ত গৃহিণী হইতে পারিবে।

কুড়ানো গান।

[লোচনদাসের অনুকরণে]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অকূলের তরী
ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি'—
মুখে বল তার নাম রে।
(আর) হৃদয়নন্দন ভকত-প্রাণধন
ভুবনমোহন নাম হে ॥
একবার ডাকো না তারে
বলি, বন্ধু বলে ডাকো না তারে—
বিপদতারণ রিপুনাশন
বলে ডাকো না তারে;
দীনবন্ধু বলে ডাকো না তারে।
ডকলে শমনজয়ী হবি—
বন্ধু বলে ডাকো না তারে
দীনবন্ধু বলে ডাকো না তারে।
(আর) কখন্ বা মরবি, কেমনে তরিবি ?
তোরে বিষম শমনে ডাকে—
ঐ দেখ্ দাঁড়ায়ে আছে—
শিয়রে শমন দাঁড়ায়ে আছে—
কালদণ্ড হাতে লয়ে
শিয়রে শমন দাঁড়ায়ে আছে।
ধন দিয়ে বুঝি যমকে জিনিবি ?
যম কি ছাড়িবে তোরে ?
(তখন) বড় জাতি বলে কভু না মানিবে—
বাঁধবে আপন জোরে—
তারা আপন জোরে বেঁধে নেবে—
তারা কারো দোহাই মানবে না ভাই
আপন জোরে বেঁধে নেবে।
(আর) স্ত্রী পুত্র বধূ যতনে পালিছ—
সকলি নিমের তিতা—
মরণ-সময়ে হাতে গলে বাঁধি
মুখে আলি দিবে সীতা।
তারা এই করিবে, তারা তোমার এই করিবে—
যাদের যতনে পালিত কর,
তারা তোমার এই করিবে।
(আর) কিছু না ভাবিলি কি কাজ করিলি—
ত্যজিলি আপন সুখে ?
দাস অধম কহে এ বচন
মরিলি আপন দোষে।
কেন ভজলি না ভাই
একবার হরি বল্লি না ভাই

বলি, বলব বলে ভবে এলি
বিষয়মদে ভুলে গেলি ;
একবার হরি বল্লি না ভাই—
ডাকলে শমনজয়ী হরি—
একবার হরি বল্লি না ভাই ॥

Selections from the "Hinduism"

OF SJ. SUKUMAR HALDAR.

Hindu religion, antiquity of—No nation on earth can vie with the Hindoos in respect to the antiquity of their religion and the antiquity of their civilization.

(Count M. Bjornstjerna).

The general opinion of ancient as well as modern times is unanimons in considering the Hindus as one of the earliest, if not, in fact, the oldest civilized nation in the world.

(Heeren's Asiatic Nations)

Greece, India in—The traces of Hindu Philosophy which appear at each step in the doctrines professed by the illustrious men of Greece, abundantly prove that it was from the East came their science, and that many of them, no doubt, drank deeply at the primitive fountain. (A Frenchman).

Mr. E. Pococke in his "India in Greece" or "Truth in Mythology," gives a thoroughly convincing demonstration of the fact that the civilization of the west was derived from the East. In Greece itself the author finds tangible proofs, chiefly of a linguistic character, of an Indian colonization. After describing the state of society in Greece during the Homeric age, Mr. Pococke goes on to say—"The whole of this state of society, civil and military, must strike every one as being eminently Asiatic ; much of it specifically Indian. Such it undoubtedly is."

Hindu kings, reign of, Pliny's estimate of—Pliny states that from the days of Father Bacchus to Alexander the Great, the Hindu Kings were reckoned at one hundred and fiftyfour, whose reigns extended over 6451 years.

Vedas and Vedanta, age of—Count Bjornstjerna finds the age of the Vedanta to be 2000 years B. C., and that of the first book of the Vedas to be at least 800 years older. "In so remote an age the Hindoos already possessed written books of religion."

Hindu civilisation, antiquity of—The stones and bricks of India furinsh irreststible proof of the high antiquity of Hindu civilizaton. * * * This subject has been dealt with with characteristic ability by Dr Mittra in his archaeological works. He shows that references to architecture occur in the great grammatical work of Panini, which, according to Dr. Goldstucker, was composed between the 9th and 11th centuries before Christ.

Ramayana and Mahabharata, antiquity of—The ages of the Ramayana and the Mahabharata have not yet been satisfactorily settled ; but it is admitted on almost all hands, that those works existed long before the reign of Asoka, very probably before the date of Buddha himself, and they abound in descriptions of temples, two-storied buildings, balconies, porticoes, triumphal arches, enclosing walls, flights of stone masonry steps in tanks, and a variety of other structures, all indicative of a flourishing architecture in the country.

Indo Aryans Vol. I, p 19.

India, Greeks in.—It is a noteworthy fact that the Greeks, in the earliest ages, came to India to learn the arts and the sciences. Nor are proofs wanting. Classical scholars are aware that Pythogoras obtained his knowledge of the true solar system in India.

History, want of, by the Hindus—If we
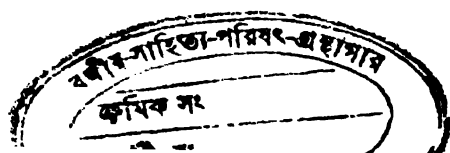
consider the political changes and convulsions, which have happened in Hindusthan since Mahmud's invasion and the intolerant bigotry of many of his successors, we shall be able to account for the paucity of its national works on History, without being driven to the improbale conclusion, that the Hindus were ignorant of an art which has been cultivated in other countries from almost the earliest ages. Is it to be imagined that a nation, so highly civilised as the Hindus, amongst whom the fine arts, architecture, sculpture, poetry, and music, were not only cultivated, but taught and defined by the nicest and most elaborate rules, were totally unacquainted with the simple art of recording the characters of their princes, and the acts of their reigns? * * * Immense libraries, in various parts of India, are still intact, which have survived the devastation of the Islamite.

Col-Tod—Introduction to the Rajastan.

Mahabharata, antiquity of—The Mahabharata, in the course of its thousand verses, nowhere alludes to Buddhism and Buddha and must therefore, and on other grounds not worth naming here, date from before the birth of Sakya.

Indo-Aryans Vol, I, p, 38,

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ৩০শে অক্টোবর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রার্থনা-প্রকোষ্ঠে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জনাকীর্ণ স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর প্রসঙ্গাধীন দুই চারিটি কথার অসঙ্গতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। স্বর্গীয় মহাত্মার আদর্শ জীবন সম্বন্ধে কোনওরূপ অপ্রকৃত কথার প্রচার সর্ব্বথা অনিষ্টকর। উপস্থিত যুবকমণ্ডলীর যাঁহারা শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবিতকালে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, স্বর্গীয় মহাত্মার সম্পর্কে তাঁহাদের সংস্কার সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই আদর্শজীবনের উপকারিতা তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারিবেন না বলিয়া মনে হয়। আর যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কোনওরূপ ভ্রমপূর্ণ কিম্বদন্তীর দ্বারা ভ্রান্ত সংস্কারে পতিত না হন তাহার আবশ্যকতা বোধ করি বলিয়াই, অপ্রীতিকর হইলেও সেই কয়েকটি ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন জন্য এই প্রতিবাদ পত্রস্থ করিতে সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি।

সেই সভায় একজন দেশবিখ্যাত বক্তা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত একটি গুপ্তসমিতিতে প্রবেশলাভ করিবার সময়ে ঐ সমিতির মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্রে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নিজ স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন। উক্ত বক্তা প্রতিজ্ঞাপত্রের বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে "স্বায়ত্তশাসন" কথাটির উল্লেখ ছিল এবং বক্তা আরও বলিয়াছিলেন যে, ঐ "স্বায়ত্তশাসন" কথাটি শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত।

"স্বায়ত্তশাসন" কথাটির ইতিহাস অন্যরূপ। ভারতবন্ধু মহাপ্রাণ লর্ড রিপনের রাজপ্রতিনিধিত্বকালে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে Local-Self Government Bill ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে শাস্ত্রীমহাশয়ের মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ কাগজে "আত্মশাসন" পদটি, Self-Government এর অনুবাদরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য বাঙ্গলা কাগজেও ঐ অনুবাদ গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতেছিল। সেই সময়ে এই সম্পর্কে বান্ধবের স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "আত্মশাসন" শব্দের অসঙ্গতি দেখাইয়া চারুবার্ত্তায় এক পত্র প্রকাশ করেন এবং "Self-Government"এর অনুবাদ কল্পে "স্বায়ত্তশাসন" কথাটি ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। চারুবার্ত্তা সেকালে ভাষাসম্পদে সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া চারুবার্ত্তা স্বায়ত্তশাসন পদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ঐ পদটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রচলিত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে হয়ত আর একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। হয়ত অনেকেই জানেন না যে সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট গেজেট বাঙ্গলায় বাহির হইত। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সরকারী অনুবাদক। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের জন্য তিনি "Self-Government" কথাটি "স্বতন্ত্র" শব্দ দ্বারা অনুবাদ করেন। এখন ঐ শব্দটির এই অর্থে ব্যবহার আর বড় একটা দেখা যায় না। এই সব কথা তেমন গুরুতর না হইলেও বাঙ্গলা শব্দের উৎপত্তির ইতিহাসে এই সব আলোচনার প্রয়োজন লঘু বলিয়া উপেক্ষিত হওয়া ঠিক নহে। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে শ্রদ্ধাস্পদ বক্তার ঐরূপ উক্তিতে ঐতিহাসিক অসঙ্গতি (anachronism) ঘটিয়াছে। ১৮৭৬ খৃঃ অঃ তিনি যে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন

তাহাতে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের উদ্ভাবিত শব্দের ব্যবহার থাকিতে পারে না। আর বক্তা যে শাস্ত্রীমহাশয়কে "স্বায়ত্তশাসন" পদের উদ্ভাবক বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন সে কথাটিও ঠিক নহে।

আর একজন বিখ্যাত বক্তা উপস্থিত যুবকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অনেকেই হয়ত অবগত নহেন যে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকার শিরোদেশে যে দুই পংক্তির সংস্কৃত শ্লোকটি* মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, উহা শাস্ত্রীমহাশয়ের রচনা। উক্ত শ্লোকটিতে সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টতা অতি দক্ষতার সহিত প্রকটিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু উহা শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত নহে। আমার বিশ্বাস ছিল ব্রাহ্মসমাজের বয়স্ক সভ্য মাত্রেই অবগত আছেন উক্ত শ্লোকটি স্বর্গীয় গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ধর্ম্মতত্ত্বের মটোরূপে রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত মূল সূত্রগুলি এমন সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদরূপে আর কোথাও নিবদ্ধ হয় নাই, একথা খুবই সত্য। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের কর্ম্মবহুল জীবন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মের কর্ম্ম ব্যাখ্যানে এত অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত ও জড়িত রহিয়াছে যে তাহার প্রসার বাড়াইবার জন্য অন্যের কৃতিত্বের সাহায্য গ্রহণের অবকাশ বা আবশ্যকতা নাই। প্রাচীন পুরাণে এক একটি আদর্শ পুরুষে সমসাময়িক সমস্ত গৌরবান্বিত কার্য্যকলাপ আরোপিত হইয়া এক-একটি অলৌকিক বীর বা অবতারের পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিত। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ সত্যের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সত্যের ক্ষুণ্ণতায় বা অপলাপে কাহারও মর্য্যাদা বা কৃতিত্বের হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকাই উচিত। আমার মনে হয়, দেশপ্রসিদ্ধ বক্তাদ্বয় অতর্কিত ভাবেই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন মাত্র। তবে ঐরূপ ভ্রম সামান্য হইলেও ভবিষ্যৎবংশীয়েরা ঐরূপ ভ্রম-প্রমাদে অপ্রকৃত কথার উদ্বুদ্ধ না হন সেই উদ্দেশেই আমার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধেয় বক্তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ নাই এবং তাঁহাদের বক্তব্যের কোনওরূপ সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

সেদিনকার সভাপতিমহাশয় সর্ব্বশেষে সংক্ষেপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সমালোচনার ভাবে শাস্ত্রীমহাশয়ের পদ্যরচনা সম্বন্ধে প্রথম বক্তার মন্তব্যের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। বলিতে দুঃখ হয় শাস্ত্রীমহাশয়ের পদ্যরচনার প্রভাব বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ কার্য্যকারী, ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নেতাদের কেহ কেহ হয়ত তাহা সম্পূর্ণ অবগত নহেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের পুস্তকাদি প্রকাশ হইবার পর এপর্য্যন্ত যতগুলি কবিতা সংগ্রহ, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, শাস্ত্রীমহাশয়ের কোনও না কোনও প্রাণস্পর্শী কবিতা তাহার প্রায় সবগুলিতেই স্থান পাইয়াছে। রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সভাপতি মহাশয় অন্যান্য বক্তাদের সমালোচনায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যদি সময়ে কুলাইত, সভাপতি মহাশয় উল্লিখিত ভ্রম কয়টিরও নিরসন করিয়া দিলে আর আমার এই প্রগল্‌ভতা প্রকাশের প্রয়োজন হইত না। আশা করি আমার এই দীন নিবেদনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া দেশমান্য বক্তাদ্বয় আর সুধী পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৪। অনুগত
শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী।

* সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

তোমারি নামে

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তোমারি নামে জাগিল প্রাণ
তুমি মোর শান্তি সাধনধন
সকল দিশি নাম ধ্বনিছে তব নিরন্তর।
চন্দ্র সুরয গ্রহ তারাগণ শতেক ছন্দে
গাহে ধ্বনিয়া গগনে—শোনে অবাক যত দেব নর॥
দীননাথ দীনবন্ধু দিবানিশি
তোমা ডাকে সেবক—তুমি হে সন্তাপহরণ।
দাও মোরে শুভ সম্পদ দুঃখবিনাশন—
জগনাথ জগজীবন জগততারণ॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণীদেবী।

৩ ৪ + ০ ॥ ২ ০ ৩ ৪
II সা রা। গরা গা I ম্মা পা। পা পা। পা পা। ধর্ম্মা গা। গা রা। গা ঋপা I
তো মা ঃ রি না ০ মে জা গি ল প্রা ০ ণ ০ তু মি

\+ ॰ ২ ॰ ৩ ৪ + ॰
I না ধা । পা পা । ঃ হ্মাঃ ধা । র্সা -া । না ধা । না ধা I পা পা । পঃ॰ ধ॰ হ্মা ।
মো ॰ র শা ॰ ॰ ন্তি সা ॰ ধ ন ধ ন স ক ল ॰ ॰

২ ॰ ৩ ৪ + ॰ ২ ॰
। গা রা । রন্া রা । সা ন্া । ধ্া ন্া I সা রা । গা পা । রা গা । রা সা II
দি শি না ॰ ম ধ্ব নি ছে ত ব নি য় ॰ ॰ সু র

\+ ॰ ২ ॰ ৩ ৪ + ॰
। {পহ্মা ধা । পা র্সা । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা না । ধা না I র্সা র্রা । র্গা র্গা ।
চ ॰ ন্দ্র সূ র্য্য গ্র হ তা রা গ ণ শ তে ॰ ক

২ ॰ ৩ ৪ + ॰ ২ ॰
। র্রনা র্রা । র্সা -া । (-া -া । -া -া] পহ্মা ধা । পা র্সা । -া -া । -া -া ।
ছ ॰ ন্দে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ চ ॰ ন্দ্র সূ ॰ ॰ ॰ ॰

৩ ৪ ৩ ৪ + ॰ ২ ॰
। -া -া । র্সা র্সা) } I না ধা । না ধা I পা -া । পা হ্মা । গা গা । পা রা ।
॰ ॰ র্য্য জ গা হে ধ্ব নি য়া ॰ গ গ নে শো নে অ

৩ ৪ + ॰ ২ ॰
। গা পা । হ্মা ধা । না ধা । পা পা । রা গা । রা সা II
বা ॰ ॰ ॰ ক্ষ য় ত দে ॰ ব ন র

\+ ॰ ২ ॰ ৩ ৪ + ॰
{ পা -া । পা হ্মগা । হ্মগা হ্মপা । পনা ধা । পা পা । -া পা I পহ্মা ধা । না র্সনা ।
দী ॰ ন না ॰ থ দী ॰ ন ব ॰ ন্ধু দি ॰ বা নি

২ ॰ ৩ ৪ + ॰ ২ ॰ ৩
। র্সা র্সা । না ধা । না ধা । পপা -া । পা পা । পা ধা । ধা না । র্সা না । ধা পা ।
॰ শি তো ॰ ॰ মা ॰ ॰ ডা কে সে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

৪ + ॰ ২ ॰ ৩ ৪
। হ্মা গা I গা গা । গা রা । গা পা । গা রা । ন্া রা । -া সা } I
ব ক তু মি ॰ হে স ॰ ন্তা প হ র ॰ ণ

\+ ॰ ২ ॰ ৩ ৪ + ॰
I {পা -া । পা ধা । পা র্সা । র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা না ।
দা ॰ ও মো ॰ রে শু ভ স ॰ ম্প দ হু ॰ খ বি

২ ॰ ৩ ৪ + ॰ ২ ॰
। র্সা র্রা । র্রা র্গা । র্রা না । র্রা র্সা} I র্সা না । ধা না । ধা পা । পা রা ।
না ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ শ ন জ গ না ॰ থ ॰ জ গ

৩ ৪ + ॰ ২ ॰
। গা হ্মা । পা ধা I পা হ্মা । গা রগা । পা হ্মা । গা রা III
জী ॰ ব ন জ গ ত তা ॰ র ণ ॰

স্মরণ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

১৭৯১ শকের ১লা মাঘ হইতে ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত আদি-ব্রাহ্মসমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হয়, তাহা "দশোপদেশ" নামে গ্রন্থাকারে পর বৎসর প্রকাশিত হয়। যাঁহারা ঐ উপদেশ দেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, অথচ তাঁহারা এক সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত ছিলেন। ঐ কয়েক জনের মধ্যে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (যাঁহার উপাধি বিদ্যারত্ন ছিল), শম্ভুনাথ গড়গড়ি, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই ৬ জনের পরিচয়-দান নিষ্প্রয়োজন, কেন না তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) বিশেষ একজন সুশিক্ষিত ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান ছিল। তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। তিনি কলিকাতা ট্রেজরি বিল্‌ডিংএ জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভরত শিরোমণির সাহায্য লইয়া কুল্লুকভট্ট-কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ মনুসংহিতার একটী সংস্করণ ১৭৮৮ শকে বাহির করেন। বঙ্গভাষায় ও বঙ্গা-ক্ষরে ইহাই বোধ হয় মনুসংহিতার প্রথম সংস্করণ। মহর্ষির সহিত তাঁহার নামের ঐক্য থাকায় মহর্ষি তাঁহাকে 'সখা-বাবু' এই আখ্যা প্রদান করেন। সমাজেও তাঁহাকে সকলে ঐ নামে অভিহিত করিতেন। মনস্তত্ব বুঝিবার তাঁহার শক্তি ছিল। তিনি কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রাচীন গায়ক বিষ্ণুবাবু পরলোক গমন করিলে, তাঁহার রচিত "কি গান গাহিলে বিষ্ণু" পত্রিকাতে বাহির হয়। তিনি বর্ষীয়ান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিকটতম ভ্রাতা হরনাথ ঠাকুর অধ্যয়নশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হরনাথ বাবু তাঁহার নিজের পাঠাগার হইতে অনেকগুলি পুস্তক আদিব্রাহ্মসমাজে দান করেন। সখাবাবুর পুত্র অক্ষয়কুমার ঠাকুর হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন। তিনি অকালে মৃত হন। সখাবাবু ১৮১৯ শকের ১৬ই পৌষ পরলোক গমন করেন।

শ্রদ্ধেয় ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার W. C. Bonerjeeর খুল্লতাত ছিলেন। তিনি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর রামপুর বোয়ালিয়া অঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে ওকালতী করিয়া ও সরকারী উকীল হইয়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিয়া পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আসেন। এখানে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনি বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি নিয়মিত-ভাবে রামপুর বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত উপদেশ দান করেন, তাহা "বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ" নামে গ্রন্থাকারে ১৮৬৯ শকাব্দে উক্ত ব্রহ্ম-সমাজের সম্পাদক গুরুদাস সেনের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ পাঠে ভৈরববাবুর গবেষণার ও নিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজে ও ভবানীপুর-উৎসবে মধ্যে মধ্যে বেদীর আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি মুখেও বেশ বলিতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় মিলিত। তিনি দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত সুশ্রী লোক বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায়ই নয়নগোচর হইত না।

শ্রদ্ধেয় নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ করি-বার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি উপাসনার সংস্কৃত মন্ত্রগুলি ও তাহার বাঙ্গালা অর্থ অতি মধুররূপে পড়িতে পারিতেন। আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে নীলমণিবাবুর ডাক পড়িত। কি আদিব্রাহ্মসমাজে কি ভবানীপুর-সমাজে কি বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বেদীতে দেখিতে পাইতাম। তিনি কলিকাতা গরাণহাটার একটু উত্তরে আহিরীটোলা অঞ্চলে বাস করিতেন। অনেক দিন ধরিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৮০৮ শকের পৌষমাসের শেষাংশে আমার পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পরিণত বয়সে তাঁহার দেহান্তর হয়।

শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইনি পরে হেম-চন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিয়া বিখ্যাত হন। সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিরস্ত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। বঙ্গভাষা ও সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। পরে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজে মিলিত হন। ১৭৮৮ শকের মাঘোৎসবে সন্ধ্যার উপাসনায় তাঁহাকে বেদীতে আচার্য্যরূপে দেখিতে পাই, এবং ১৭৮৯ শকে তিনি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ শকে মহর্ষি তাঁহার পিতার যে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করেন তাহার আচার্য্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং পুরোহিত বিদ্যারত্ন ছিলেন; এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্যাখ্যান পাঠ করেন। ১৭৯১ শকে বিদ্যারত্নের নাম আর দেখিতে

পাই না, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। উহার কয়েক বৎসর পরে ১৭৯৭ শকের ১লা আশ্বিন তারিখে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পরলোকান্তে বিদ্যারত্ন তাঁহার স্থান অধিকার করেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিদ্যারত্নের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে; এবং তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহঃ সম্পাদক হইয়া ইহার পরিচালন করিতে থাকেন। তিনি ১৮২৮ শকের ২৪শে অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করেন।

শ্রদ্ধেয় চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহার নাম ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে আজকাল বিলুপ্ত হইলেও এবং তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইয়া পড়িলেও, এক সময়ে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ নিবিড় ছিল। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান শকের "প্রবর্ত্তকের" ভাদ্রসংখ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে। উহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইনি ইং ১৮৪১ সালে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে হুগলী কলেজের স্কলারসিপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইনি সুবিখ্যাত মহেন্দ্রনাথ সরকার, রাজচন্দ্র দত্ত এবং ইংরাজি ভাষায় বেরিনি সাহেবের সংস্পর্শে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া চিকিৎসাব্রতে ব্রতী হন। এই ব্রতে চিকিৎসা দ্বারা তিনি দীনদরিদ্রগণের সেবাতেও আত্মনিয়োগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী হইয়া উঠেন। চন্দননগর-ব্রাহ্মসমাজের মূলে তিনি ছিলেন। তাঁহার নিজ বাটীতে একবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। মহর্ষি উহাতে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে চন্দ্রশেখর বাবুর উৎসাহের জয়চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। তাঁহার চেষ্টাতে চন্দননগরে Weekly Literary Club এবং একটী পাঠাগার গড়িয়া উঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ দান করেন। শিক্ষাপ্রচার উদ্দেশে ১৮৬০ সালে ইনি চন্দননগরে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় ক্রমিক উন্নতিলাভ করিয়া গড়বাড়ী ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া আজও বিরাজমান। ইং ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৩ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়। তিনি সাহসী ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। লোকহিতৈষণা তাঁহার ব্রত ছিল। স্বদেশপ্রেম তাঁহার জীবনের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিত। চন্দননগরে নূতন হাওয়া প্রবর্ত্তনের তিনি অগ্রদূত ছিলেন।

হায়! যাঁহারা এক সময়ে জীবন্তভাবে পূর্ণ অনুরাগের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এই ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা প্রচারই যাঁহাদের জীবনের এক মহা লক্ষ্য ছিল, একে একে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পরিচয় ক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া এই জীবনসন্ধ্যায় তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত ও আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিলাম। তাঁহারা যে লোকেই থাকুন তাঁহারা যে অকপট প্রেমভক্তির বিকাশ লইয়া এখান হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন, তাহাতে শাশ্বত ব্রহ্মানন্দের ভিতর তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

সংবাদ।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তন।—পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিয়া গত ১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি গত ২৭শে আষাঢ় এখান হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ মান্দ্রাজে যান; তথা হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে সিঙ্গাপুর; তার পর মালয়, সুমাত্রা ও যাভা হইয়া বালী দ্বীপে গমন করেন। এই বালী দ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহাদের মধ্যে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রচার ও আদর-আপ্যায়ন খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বীপপুঞ্জের যখন যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন পাইয়াছেন। এই গৌরব শুধু ইঁহার একার নহে—ইহা সমগ্র বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের প্রাপ্য। ভগবান ইঁহাকে বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণের পথে আরও অগ্রসর করুন।

সম্মানপ্রাপ্তি।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, গত শারদীয় অবকাশে ডিব্রুগড়ে যে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলন হইয়া গেল, তদুপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে আপনাদের মধ্যে পাইয়া তত্রত্য উৎসাহী ও উদ্যোগী যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের এই প্রবীণ নেতাকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ অবহেলা করেন নাই। ডিব্রুগড় হইতে মিত্রমহাশয় 'খাসিয়া মিশন' পরিদর্শনের জন্য চেরাপুঞ্জী গমন করিলে খাসিয়া পাহাড়ের ব্রাহ্মমণ্ডলী সমবেতভাবে তাঁহাকে একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। সমগ্র জীবন ভরিয়া যাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস ও স্বদেশপ্রেমের অম্লান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার সেই আদর্শজীবনকে যদি আমরা শ্রদ্ধা করিতে ও সম্মান করিতে শিখি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ নিঃসংশয় কল্যাণবর্ত্তী হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ মিত্রমহাশয়ের এই সম্মানপ্রাপ্তি তাই আমাদের অন্তরে আশা ও আনন্দ বহন করিয়া আনিয়াছে।

পূর্ণিমাসম্মিলন।—এবার শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আহূত হইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আশ্রমভবন রাঁচি—'শান্তিধামে' গমন করিয়াছিলেন। তথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গিরিশীর্ষস্থ সার্ব্বজনীন উপাসনা-মন্দিরে এতদুপলক্ষ্যে গত ২৩শে আশ্বিন হইতে ২৭শে আশ্বিন পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী প্রত্যহ সায়ং-উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অপরাহ্ণ হইতেই বহু নরনারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আশ্রমদর্শনার্থী হইয়া এখানে সমবেত হইতেন। ইঁহারা কোনও সমাজবিশেষের লোক নহেন; অথচ এই সুন্দর স্থানটীর এমনই মাহাত্ম্য যে, এখানে আসিলে মন স্বভাবতই উপাসনাশীল হইয়া উঠে। এখানে আয়োজনের দ্বারা প্রয়োজনকে, উপলক্ষ্যের দ্বারা লক্ষ্যকে অনর্থক ভারাক্রান্ত হইতে হয় না; অনেক সময় স্বয়ং প্রকৃতিই বাগ্মী হইয়া উদ্বোধন ও উপদেশ-দানে প্রবৃত্ত হন, কোন মানবীয় বাণীর আর আবশ্যক হয় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গিরিশীর্ষের এই বিশ্বজনীন উপাসনা-মন্দিরটী ভগবৎরসপিপাসুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ; ইহার যাত্রীসংখ্যা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া উঠুক।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

আশ্বিন মাস, ১৮৪৯ শক।

আয়	১১২৯৷৶৹
পূর্ব্বস্থিত	২০১৩
সমষ্টি	১৩৩০৷৶১
ব্যয়	১১২৮৵৹
স্থিত	২০২৷৵৹

জায়ঃ—

নগদ	২৷৵৹
স্থায়ী আমানতের রসিদ	২০০৲
	২০২৷৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২০০৲
হাওলাত আদায়	১৯৲
ঋণগ্রহণ	৫৬০৷৶৹
সস্পেন্স	৪০০৲
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	২৩৲
সমষ্টি	১০০২৷৶৹

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৪২৷৵৹
হাল	৬৲
বিজ্ঞাপন	১৪৲
মাশুল	২৮৵৹
সমষ্টি	৬৫৷৹

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	২৮৲

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৸৹
গীতারহস্য	৩৩৲
সমষ্টি	৩৩৸৹
সর্ব্বসমষ্টি	১১২৯৷৶৹

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাঠের	২০৲
গায়ক	১৫৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বেহারা	১২৲
মেথর	২৲
সরঞ্জামী	২৵৹
মাশুল	।৵৹
Electric	২৮৶৹
Tax	৬৭৷৵৬
কেরোসিন	৷৶৹
ঋণশোধ	৬৩০৷৹
পার্ব্বণী	১৲
হাওলাত প্রদান	৫৩৲
বায়বরদারী	২৷৵৬
বিবিধ	৶৹
সেভিংসব্যাঙ্ক	২০৲
সমষ্টি	৮৪৪৷৶৹

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	৬৯৷৵৹
দপ্তরী	২০৵৹
মাশুল	২৷৵৫
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
মূল্য আদায়ের কমিশন	৫৷৹
প্রবন্ধ	৫৲
সমষ্টি	১১৭৸৬

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৩৲
কম্পোজিটর	৫৩৲
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	১২৲
কাগজতোলা	৬৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
অপরের কাগজ	৩৵০
প্রেসের তৈল	১৵০
কলটানা	।৩
তামাক	।৬
লেই জন্য ময়দা	৵৬
বিবিধ	।০
সমষ্টি	১৩৩।৵৩

পুস্তকালয়।

মাশুল	৮৶৬
গীতারহস্যের মূল্যবাবত	১৩৮০
ঐ কমিশন	২৷০
ঐ দপ্তরী	১৫৲
সমষ্টি	৩২৵৬
সর্ব্বসমষ্টি	১১২৮৵৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ভ্রমসংশোধন।

গত ভাদ্রসংখ্যা পত্রিকায় আদি-ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার যে কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় সংখ্যক নির্দ্ধারণে ভ্রম থাকায় সংশোধিত নির্দ্ধারণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, তাঁহার এই পত্রের প্রত্যুত্তরে অধ্যক্ষসভা হইতে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিত হউক; এবং এখন অবধি আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ বাবতে তাঁহার পাথেয় ১০৲ টাকা প্রতিমাসে নিয়মিত দেওয়া হউক।"

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক
সভাপতি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতে ৭টার পরে উপাসনা, অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী মত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ কর্ত্তৃক রচিত এবং 'আলো ও ছায়া' গ্রন্থ-রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ মহোদয়া লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, বাঁধাই সুন্দর। কলিকাতা ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে ও ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী পুস্তকালয়ে এই পুস্তক প্রাপ্তব্য। ইহা গ্রন্থকারবিরচিত হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ২৪শ সংখ্যক পুস্তক। ইহার এক খণ্ড আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দার্শনিক গ্রন্থখানির সমালোচনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাহা করা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরু-ভাই সুবিদ্বান্ স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় (ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পিতা) ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব বিবৃত করিয়া একখানি সুবৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মধামে নীত হন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু তদীয় পিতৃদেবের সঙ্কল্পের অনুসরণ করিয়া এই "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" নামক দার্শনিক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদর্শন, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বসমাজ এবং সর্ব্বমানবের সমন্বয় ও সম্মিলনের প্রকৃষ্ট পন্থা দেখিতে সমুৎসুক, তাঁহারা ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করুন। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের এরূপ সরল ও সরস ব্যাখ্যান বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম, এ কথা বোধ হয় আমরা অসঙ্কোচের সহিত বলিতে পারি। গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ যার-পর-নাই সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়া সকলের পক্ষে সহজবোধ্য ও সুগম করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা গ্রন্থকারের স্বল্প তপস্যার ফল নহে। কি প্রাচ্য এবং কি পাশ্চাত্য দর্শনসমূহের ও সেই সকলের ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনী, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চূর্ণিকা ইত্যাদির সম্মুখীন হইলে সাধক মাত্রেরই মনে এক ঘোর বিভীষিকার সঞ্চার হয় এবং অনেকের মনে এবম্প্রকার প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই সকল পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া আমাদের সেই প্রিয়তমের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইব, উপনিষৎ যাঁহাকে "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র

বাবু স্বীয় তপস্যাবলে সাধক মাত্রেরই মন হইতে সে বিভীষিকা দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ বড়ই মনোরম ও বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী, এতদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ কি বস্তু তাহা এক্ষণে পৃথিবীর কাহারও অবিদিত নাই। পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ মহোদয়া স্বীয় ভূমিকায় ইহার ইতিকথা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত আছে। মানবজাতির সঙ্কটবিমোচনের অমোঘ উপায় এই ব্রাহ্মধর্ম। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্ম মানবমাত্রেরই পিতা মাতা, আমরা সকলেই তাঁহারই সন্তান। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। যেখানে যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত আছে, সেখানে সেখানে এই গ্রন্থ স্থান লাভ করুক। তাহা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়া প্রচারিত হউক।

ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা জ্ঞানধর্ম্মোন্নতি।
লভিয়া বিশাল বিশ্ব লভুক সুগতি॥

ভারতবর্ষবাসীর হিতৈষী—কার্ত্তিক, ১৩২৪।

আর্ট ও সাহিত্য—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত; মূল্য ১৲ টাকা।

আর্টের খাতিরে আর্ট ও Realistic বা প্রত্যক্ষ-দ্যোতক আর্টের দোহাই দিয়া এক্ষণে যে সকল পূতিগন্ধপূর্ণ দুর্নীতিপ্রবণ অশ্লীল সাহিত্য বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে ও সমাজমধ্যে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত করিতেছে প্রকৃত আর্ট হিসাবে সে সকলে সাহিত্যের গৌরব কিছুমাত্র নাই—ঐরূপ সাহিত্য সাধারণতঃ পরকীয়া প্রেমের ঝাঁঝালো মনমোহিনী রসে ভরপুর হইয়া পাঠকগণের প্রাণের মাঝে গোলাপী নেশার মত একটা উন্মাদনা আনিয়া দেশের ও সমাজের মহা অকল্যাণের হেতু হইতেছে। ইহারই প্রতিপন্নের জন্য এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে, ভগবানের "সত্যং শিবং সুন্দরং" সত্য-শিব-সুন্দর মূর্ত্তিই আর্টের কেন্দ্র অর্থাৎ সত্য বা স্বাভাবিকতাই আর্টের পত্তনভূমি বা প্রাণ, শিব বা জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধনই আর্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অসুন্দর যাহা কিছু তাহা অন্তরালে রাখিয়া সৌন্দর্য্যটুকুই চক্ষের সমক্ষে বেশ করিয়া ফুটাইয়া তুলাই আর্টের চাতুর্য্য। গ্রন্থকারের কথায় বলিতে হইলে "আর্টের ভিত্তি যেমন সত্য, আর্টের অন্তরঙ্গ যেমন মঙ্গল, আর্টের বহিরঙ্গ তেমনি সৌন্দর্য্য।" যে আর্টে এই তিনটী বিষয়ের একত্র সমাবেশ হইবে সেই আর্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট। এবং তিনি যে যে গ্রন্থের যে যে স্থানে এই তিন আদর্শের বিচ্যুতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন সে সে স্থানে চাবুক কষিতে ত্রুটী করেন নাই—সে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাই হউক আর রবীন্দ্রনাথের লেখাই হউক—অন্য পরে কা কথা। দেশের হিতকল্পে যাহা বুঝা যায় তাহা সাহস সহকারে এরূপ বলিবার ক্ষমতার জন্য আমরা গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। গ্রন্থকারের মূল কথা এই যে ভারতের উন্নতি করিতে হইলে সংযম চাই, ধৈর্য্য চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই। ব্রহ্মচর্য্যের উপর ভারত যতটুকু দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, ততটুকুই এই পুণ্যভূমি প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এখনকার কথায় বলিতে হইলে জার্ম্মান সুলভ বা জাপানি সুলভ কঠোরতা, দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা চাই। এবং প্রকৃত আর্ট হিসাবে সাহিত্য লিখিত হইলে ঐ কার্য্যের সহায়ক হইবে। আর্ট হিসাবে আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থকারের আদর্শে অনেক সর্ব্বজনপ্রশংসিত নাটকও "সত্যং শিবং সুন্দরং" নিয়ম মধ্যে পড়ে কি না বুঝা কঠিন। "সত্যং"টা আর্টে থাকে কি না তাহা গ্রন্থকার আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে ভাল হইত। সত্যং যে স্বাভাবিকতা—তাহা কোন্ অর্থে? আমাদের মতে গ্রন্থকার তাঁহার আর্ট ও সত্য, আর্ট ও মঙ্গল এবং আর্ট ও সৌন্দর্য্য এই তিন অধ্যায়ে দুই একখানি উৎকৃষ্ট নভেল ও নাটক লইয়া তাহার বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিলে পাঠকের বুঝিতে সুবিধা হইত—সত্য অর্থে তিনি কি বুঝিতে চাইতেছেন * * * *

বাঙ্গলার প্রত্যেক যুবক যুবতীর এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে আনন্দ ও উপদেশ একাধারে পাইবেন। যাঁহারা প্রৌঢ় তাঁহারা এ গ্রন্থের সমস্ত কথা স্বীকার না করিলেও বঙ্গ-উপন্যাস লেখায় যে সংযমের আবশ্যক হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবেন। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক মনে করি।

হিন্দুপত্রিকা—১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ৫।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ সিকা।

"সন্ধ্যায়" পুস্তকখানি তাঁহার নিজের চিন্তা এবং ভাবধারার পবিত্র উৎস—প্রত্যেক পূতচেতা পাঠকই তাঁহার এই ভগবচ্চরণোন্মুখী ভাবের পীযুষপানে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদক—চিন্তাশীল লেখক এবং ভাবুক।

তাঁহার ভাষা ভাব বড় হৃদয়গ্রাহী। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর হইয়াছে। "সন্ধ্যায়" কয়েকখানি পারিবারিক চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০।

কাজের লোক—অক্টোবর, ১৯২৭।

চিন্তাশীল লেখকের স্বচ্ছ প্রাণের এক-একটি ভাব জীবনসন্ধ্যায় লেখা। প্রত্যেক ভাবটি যেন শিশুর ভাষায় শ্রীভগবানের চরণতলে নিবেদিত। এই উচ্চাঙ্গের পুস্তকখানির রসাস্বাদন করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কলিকাতা—৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাতৃমন্দির—আশ্বিন, ১৩৩৪।

Sandhya By Kshitindranath Tegore Price Re 1-4as.

"Alone to the Alone." The clue to the contents of the book under review should be sought in the preceding sentence which occur in the author's preface. The pure and serene thoughts that silently creep upon the author's mind at the close of the day are here beautifully enshrined in rhythmic prose. Such a book is not be found in plenty in our literature. A perusal of the book cannot but have a chastening effect upon the mind. The mind becomes purged of all unclean thoughts and of the worries of daily life when one takes up the book and browses through it even at random. We are glad to commend the book to all lovers of good literature.

Forward—11-10-26.

"It is another nicely got up volume from the pen of Srijut Khitindranath Tagore. We have been highly pleased on reading this book containing a number of thoughtful gems. It has not only a high class literary flavour, but a flight of spiritual imagination throughout the book. These are so many poetries written in prose and one sees before his very eyes while reading it, the author deeply merged and become one with every object of nature."

The East Bengal Times 1-10-27.

গ্রন্থকার তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস গদ্যে লিখিয়া এই গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা ভাল, স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে। তবে লেখকের আত্ম-সুখ-দুঃখের কথা এত অত্যধিক মাত্রায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকসাধারণের তাহা চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। উচ্ছ্বাস—উচ্ছ্বাস হইলেও পরের উদ্দেশ্যে তাহা বলিতে গেলে তাহার মাত্রা থাকা আবশ্যক। ইহার ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকারের ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের চিত্র আছে

হিতবাদী—১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

Jnan O Dharmer Unnati or Sermons On the Progress of Knowledge and Religion By Maharsi Devendra Nath Tegore, Published by the Adi Brahmo Samaj.

Babu Kshitindranath Tagore has laid not only the adherents of the Brahmo religion but also the whole reading public irrespective of religion or creed under a deep debt of gratitude by collecting and editing the invaluable sermons delivered by his revered grandfather. A spirit of fervent religiousness glows in every page of the book. It is mainly devoted to illustrating and elucidating the gradual steps by which the Indo Aryans attained to a supremely high conception of God. The utterances of the Maharsi of revered memory are wonderfully rich in profundity of information, scientific, astronomical and theological. The editor deserves wellmerited thanks for giving them a durable form.

Forward—11-10 26.

Pravati By Kshitindranath Tagore, Price 12as.

Kshitindranath Tagore, the Editor of "Tatwabodhini" is not unknown to the Bengali reading public. He has made his mark not only as an efficient journalist but also as a man of letters of no mean order. The book under review may be regarded as a colection of lyrics in prose. As the title of the book clearly indicates here are enshrined in rhythmic prose the reflections of the dawn, reflections that are likely to come uppermost to the mind of a devotee. The reflections have all freshness and charm of the dawn. The book is a store house of pure thoughts expressed in the most simple and elegant style. We can confidently assert the book under review will be read with ample delight by all lovers of pure literature,

Forward—11-10-26.

ঢাকা অনাথ-আশ্রম

পূজার কাপড়

দেয়ং ক্ষুধিতায় ভোজনম্ বস্ত্রহীনায় বস্ত্রম্।

নিবেদন—

অনাথকে সাহায্য করা মহাপুণ্য। শারদীয় উৎসবের সময় আমাদের বালক-বালিকা ও শিশুদের সকলের কত আনন্দ! সকল ঘরেই নূতন কাপড় আসিবে, পথের ভিখারীও বাদ যায় না। এমন সময় 'ঢাকা অনাথ আশ্রমের' চারি মাসের শিশু হইতে ১৬ বৎসরের ১২টী বালক ও ২২টী বালিকার কথা কি আপনারা ভাবিবেন না? আপনারা না দিলে তাহারা কোথায় পাইবে? এই দান করিয়া পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক-বালিকাদের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা ও ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হউন, এই প্রার্থনা।

নিম্নে কাপড়ের মাপ ও বালক-বালিকাদের সংখ্যা দেওয়া গেল।

সাড়ি	১০	হাত	সেমিজ প্রমাণ	ও বডিস=	৫টী মেয়ের
ঐ	৯	"	ঐ ১ গজ	ঐ	৫টী মেয়ের
ঐ	৮	"	ঐ ৩০ ইঞ্চি	ঐ	৬টী মেয়ের
ঐ	৭	"	ঐ ২৪ "	ঐ	২টী মেয়ের
ঐ	৬	"	ঐ ২০ "	ঐ	২টী মেয়ের
ঐ	৬	"	ফ্রক বা ঘাগরি মাঝারি		২টী মেয়ের
ধুতি	৯	"	পাঞ্জাবি বা হাফসার্ট		২টী ছেলের
ঐ	৮	"	ঐ	ঐ	৪টী ছেলের
ঐ	৭	"	ঐ	ঐ	৫টী ছেলের

রুমাল, ফ্রক টুপি চারি মাসের একটী খোকার

গত পূজায় 'আবেদন' প্রকাশ করাতে যে সমুদয় সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য দাতাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা হইতেছে। দাতাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মল্লিক (ডিলমা রংপুর) ২৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পত্নী (ঢাকা, কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে) ৫৲, শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় (ত্রিবেণী, হুগলি) ১০৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু, B. C. S. (ঢাকা, পূজার মিষ্টির জন্য) ১০৲, শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র (ঢাকা) ২৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল (ঢাকা, লক্ষ্মী-পূজার মিষ্টির জন্য) ১৲, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় (বাগাচড়া) ៲১০, শ্রীযুক্ত তারিণীমোহন নিয়োগী (কিশোরগঞ্জ) ২৲, Miss O. E. Briem (জলপাইগুড়ী) ২৲, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবিনোদ চৌধুরী (পটিয়া, চট্টগ্রাম) ২৲, শ্রীমতী সরযূবালা সেন, (শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন-পত্নী, শ্রীহট্ট) ১৲, শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দাস (লোকনাথ-বস্ত্রালয়, ঢাকা) ২৲, শ্রীমতী সুবালা দত্ত (চট্টগ্রাম, পিতার 'রায় সাহেব' উপাধি উপলক্ষ্যে) ১০৲, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বাহেরিয়া (কলিকাতা) একশত টাকার অধিক মূল্যের উনত্রিশ খানা কম্বল, দুইথান ড্রিল কাপড় এবং একথান গরম কাশ্মিরা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল (ঢাকা) প্রত্যেক বালিকার জন্য সাড়ী ও বালকের জন্য ধুতি এবং ছোট ছেলেদের জন্য ফ্রক ইত্যাদি ২৬, শ্রীযুক্ত বি, কে, রায় (বড়ঘর বরিশাল) একখানা ধুতি, শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন (ডাঃ এস, বি, দত্ত চট্টগ্রাম) একটি বডিস, একটি ইজার ও একটি নিমা, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ (ঢাকা) উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে সাড়ী ও ধুতি, শ্রীযুক্ত রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুর (ঢাকা) প্রত্যেক বালকের হাফ সার্ট ও হাফ প্যান্ট এবং প্রত্যেক বালিকার বডিস এবং ছোটদের ফ্রক এবং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ দয়া করিয়া ৮ থানি মশারি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ছেলেদের জামা, পায়জামা ও মেয়েদের সেমিজের প্রয়োজন হয়। এইজন্য দুইথান ড্রিল কাপড়ের আবশ্যক। শীত নিকটবর্ত্তী, মোটা খদ্দর এবং গরম কাপড় (নূতন বা পুরাতন) পাঠাইলে বিশেষ সাহায্য হইবে। অর্থ বা বস্ত্র আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ, অরফেনেজ রোড, বক্সিবাজার, ঢাকা; এই ঠিকানায় অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রেও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে। বিনীত শ্রীশশাঙ্ককুমার ঘোষ (রায় বাহাদুর) সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা অনাথ-আশ্রম।

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462.

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ
অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ৯৮।

১০১২ সংখ্যা   ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

১৭৬১ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ
অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ৯৮।

১০১২ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯২। অঞ্জলি— উষায় অন্তরাত্মা দেবতা।

১। উষার আবির্ভাবে যেমন অরুণ তপন সকল পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, তেমনি তোমার মঙ্গলজ্যোতি আমাদের প্রত্যেকের আত্মার অন্তরতম প্রদেশও আলোকিত করিয়া তুলিতেছে। উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় তোমার তেজে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তোমার আহ্বানে আমরা সকলে নিদ্রোত্থিত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। তুমি আমাদিগকে পাপতাপ হইতে রক্ষা কর; তুমিই আমাদিগকে পালন কর।

২। তুমিই আমাদিগকে মেধা ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছ। আমরা যাহা কিছু ভাল কাজ করি, তাহা তোমারই কৃপায়। তাহার জন্য আমাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। অন্তরে গর্ব্ব উপস্থিত হইলে তুমিই আমাদের সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দাও। তোমারই নিহিত শুভবুদ্ধির প্রভাবে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিচার করিতে পারি এবং অকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে নিরত হই। তোমারই আশীর্ব্বাদে আমরা আমাদের অন্নবস্ত্র সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইতেছি। আমরা যখন জনহিতকর কার্য্যসাধনে বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হই, তখন তুমি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণিত কর।

৩। তোমাকে আমরা কি বলিয়া ডাকিব জানি না। তুমি পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা; তুমি পুত্রহীনের পুত্র, কন্যাহীনের কন্যা। তুমি বন্ধুহীনের বন্ধু; তুমি দুর্ব্বলের বল। তোমার স্নেহপ্রেমে আমাদিগকে বেষ্টিত রাখিলে শত্রুদিগের নিক্ষিপ্ত শত ভীষণ অস্ত্রও ব্যর্থ হইয়া যায়। তোমাকে অন্তরে লাভ করিলে আমরা দেবতাদিগের সহিত একাসনে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত হই। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা।

৪। তোমার নামে আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যেন আমরা উদ্‌যাপন করিতে পারি। যদি সেই উদ্‌যাপনের পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাহা অপসারিত করিয়া দিও। প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর সম্মুখে যেমন ধূলিরাশি মুহূর্ত্তকালও স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ আমাদের ব্রতনাশক শত্রুরাও তোমার মঙ্গলবায়ুর সম্মুখে তড়িৎবেগে পলায়ন করে।

৫। সূর্য্য যেমন অপর পদার্থসকলকে প্রকাশ করিবার সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে, তেমনি তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আপনাকেও স্বপ্রকাশ কর। জগতের কেন্দ্রে যেমন সূর্য্য অবস্থিতি করিয়া জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তুমিও সেইরূপ বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ থাকিয়া ব্রহ্মচক্রকে ধারণ করিয়া বিনাশ হইতে

রক্ষা করিতেছ। তুমি ভক্তগণের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থান। ভক্তেরা তোমার মধুরতা উপলব্ধি করিয়া তোমাকে রসস্বরূপ বলেন। তোমার সেই রসধারা প্রেমের আকারে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বজগতকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে।

১০। অঞ্জলি—ভক্তবৎসল দেবতা।

১। তুমি পরম সুন্দর। তুমি সকল শোভা সকল সৌন্দর্য্যের আকর। তোমার উজ্জ্বল অরূপ রূপের মাধুরী আমাদের প্রাণমন সকলই হরণ করিয়াছে। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ। তোমা হইতেই সকল জ্ঞানেরই উদ্ভব হইয়াছে। আমরাও তোমাকে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা স্পর্শ করি; তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। তোমার নিকট আমাদের কিছুই লুকায়িত নাই। আমরা যাহা ভাল কাজ করি বা ভাল চিন্তা করি, অথবা যে কোন মন্দ কাজ করি বা মন্দ চিন্তা করি, যাহা আমরা আমাদের পরম বন্ধু হইতেও লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করি, সে সকলই তুমি পুংখানুপুংখরূপে দেখিতেছ ও জানিতেছ। তুমি জানিতেছ যে, আমরা তোমারই আদেশ অনুসারে জগতের মঙ্গলসাধনরূপ তোমারই আদেশ পালনে নিরত আছি। তুমি আমাদিগকে শ্রীসম্পদে বিভূষিত কর।

২। তুমি অগ্নিতে, তুমি জলেতে, তুমি সমগ্র বিশ্বচক্রে প্রবিষ্ট হইয়া আছ; তুমি ওষধিতে, তুমি বনস্পতিতে, তুমি প্রাণীগণের মধ্যে এবং তুমি মানবাত্মার অন্তরে ওতপ্রোত হইয়া আছ। আমরা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাদের গৃহদেবতা, তুমিই জগতের মঙ্গলবিধাতা। রাজা যেমন প্রজাগণের মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন, আমাদের কল্যাণসাধনে তোমারও সেইরূপ অনিমেষ দৃষ্টি।

৩। যে ভক্ত অন্তরের ভক্তি দ্বারা তোমার চরণপূজা করে ও তোমার নাম সর্ব্বত্র প্রচার করে, ভক্তবৎসল তুমিই তাহার যোগক্ষেম বহন কর এবং তাহাকে শ্রীসম্পদে পরিবেষ্টিত রাখ। দিবসের আলোকে বা নিশার অন্ধকারে, সকল অবস্থাতেই তোমার স্নেহপ্রেম তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। ভক্তজনের অন্তরের কথা এবং অসাধু হৃদয়ের অন্তরের ব্যথা, তুমি সকলই জানিতেছ। ভক্তজনকে পুরস্কার দিয়া এবং অসাধুকে যথাযুক্ত দণ্ড প্রদান করিয়া উভয়কেই তুমি সমান স্নেহে তোমার দিকে আকর্ষণ করিতেছ।

৪। উষাকালে সাগরের পরপার হইতে উত্থিত হইয়া অরুণতপন যেমন প্রতিদিন নিত্য নবগীতে তোমারই মহিমা প্রকাশ করে, সন্ধ্যাকালের অন্ধকার আকাশে চন্দ্রতারকা ফুলের বেশে ফুটিয়া উঠিয়া তেমনই প্রতিদিন পূরবী ও ইমন রাগিণীতে নিত্য শত সুমধুর গীতে ভূলোক ও দ্যুলোককে মুখরিত করিয়া তোলে। অচেতন ভূধর সাগরেও তুমি যেমন স্বপ্রকাশ, সচেতন জীবজন্তুর অন্তরে এবং তোমার হিরণ্ময় আসন মানবাত্মাতেও তুমি তেমনই স্বপ্রকাশ। তোমাকে আমরা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবে মিলিতকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের ব্রত সফল কর।

৫। আমাদের গাভীগণকে প্রচুর দুগ্ধবতী কর, যাহাতে আমরা সন্তানগণকে দুগ্ধপান করাইয়া সবল ও তোমার পতাকাবহনের উপযুক্ত করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে সন্তানগণ প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করিয়া যথাযোগ্য পাত্রে তাহা দান করিয়া যশ ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারে। মনুষ্যেরা ভয়ে লোভে তোমাকে ছাড়িয়া স্বকপোলকল্পিত বহু দেবতাকে পূজা করিতে ধাবিত হয়। কিন্তু পরিণামে তাহারা ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিজের ভ্রম বুঝিয়া আবার তোমারই পথে ফিরিয়া আসে, তখন তুমি তাহাদিগকে আদরপূর্ব্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লও।

৬। তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমরা সফলকাম হইয়াছি। তোমাকে পাইয়া সকল ধনই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তোমার বলে আমরা বলীয়ান হইয়াছি। শত্রুগণ আমাদিগকে বলীয়ান ও তেজস্বী দেখিয়া ভয়ে ও ত্রাসে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। তোমার নামে আমরা শত্রুগণের ব্যূহমধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ক্ষণমধ্যে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিব।

ব্রাহ্মসমাজের ম্লানভাব ও তাহার প্রতীকার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ—যাঁহার নাম মহদ্‌ যশ, তাঁহার প্রতিমা নাই। যে ভগবান এই প্রকৃতির অণু পরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তাঁহার কীর্ত্তির, তাঁহার হস্তাক্ষরের পরিচয় পাইবার জন্য আমাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। তাঁহার নাম কোথায় না প্রতিধ্বনিত হইতেছে? কি হিমালয়ের উচ্চতম তুহিনাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গে, কি নৃত্যশীল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরবক্ষে, সর্ব্বত্রই তাঁহার যশ, তাঁহার নাম বিঘোষিত হইতেছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তের ছাপ জাজ্বল্যমান। এই যে সূর্য্য প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক সুরঞ্জিত করিয়া সমুদিত হইয়াছিল, আবার সন্ধ্যাকাল আগত হইতেই পশ্চিম সাগরে স্বর্ণরশ্মি ঢালিয়া দিয়া অস্তাচলে চলিয়াছে—ইহাতে কি তাঁহারই মঙ্গলভাব, তাঁহারই শুভ ইচ্ছা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে না? দিবারাত্র যদি ভাস্কর

প্রখর করণে এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিত, অথবা দিবারাত্র যদি এই ধরণীর মুখ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, তবে কোথায় বা এই প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য থাকিত, আর কোথায় বা এই অগণিত জীবজন্তুর অনুপম আনন্দলীলা থাকিত? তাঁহার মঙ্গলভাব কেবল বাহিরের এই প্রকৃতির মধ্যে নাই; আমাদের অন্তরে, আমাদের হৃদয়পটেও তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন; চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখ, অন্তরের গভীরতম প্রদেশেও তিনি তাঁহার শান্ত মঙ্গল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত আছেন। গভীর নিদ্রাতে আমরা যখন অভিভূত হই, তখনও যে দেবতা জাগ্রত থাকিয়া বিশ্বচরাচরকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আমরা যখন জাগ্রত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখনও সেই দেবতা আমাদের বন্ধুরূপে নিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অমঙ্গলের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে থাকেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমভাবে বর্ত্তমান। এখানেও তিনি আমাদের পিতামাতা সখা ও সুহৃৎ; ইহলোকের কার্য্য সমাপনান্তে যে লোকেই আমরা যাই সেই লোকেই অনন্তকাল ধরিয়া তিনি আমাদের পিতামাতা। চন্দ্র-সূর্য্য যেমন এই পৃথিবীর এক অংশের কার্য্য সমাপন করিয়া অপর অংশে সমুদিত হয়, আমরাও সেইরূপ নিশ্চয়ই ইহলোকের কার্য্য সমাপনান্তে অন্য কোন লোকে সমুদিত হইব। কিন্তু ইহা স্থির জানিও যে, কোনও কালেই আমরা আমাদের পিতামাতা সখা ও সুহৃৎ ভগবানের রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে পারিব না—তাঁহারই রাজ্যে তাঁহারই মঙ্গল শাসনে আমাদিগকে অনন্তকাল অবস্থিতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের অধিকার, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য, ইহাই আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের দান।

আমরা সূর্য্যোদয় অবধি কত প্রকার সুখভোগ করিতেছি; কতবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াছি; আবার এখন তাঁহারই অমৃতসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারই মধুময় নামের অমৃত উপভোগ করিতেছি। আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি অন্নপানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; আবার এখন আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে শান্তিসমুদ্রে ডুবাইয়া দিতেছেন। এই রজনীকালে সমস্ত স্তব্ধ—বিহগগণ নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তরুর সহিত নিলীন হইয়া রহিয়াছে; নক্ষত্ররাজি চিত্রার্পিতের ন্যায় ঈশ্বরের মহিমা নিরীক্ষণ করিতেছে; আর আমরা তাঁহার দর্শনলাভের জন্য লালায়িত হইয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়াছি। তাঁহার এই বহিঃপ্রকৃতির স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আমাদের হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা বিরচিত পবিত্র আসনে নামিয়া আসিয়া আমাদের হৃদয়ে অপার শান্তি প্রদান করিতেছেন, আমাদের অন্তরের অভাব কি সুন্দররূপে সমস্ত মোচন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! মাতৃমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তিনি স্বয়ং আমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আমরা যদি মানুষ হই, তবে তাঁহার স্নেহ আমরা প্রতি পদক্ষেপে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিব না। তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় তাঁহার প্রেমরসে প্লাবিত হইতেছে। এই যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আমরা বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিবার অধিকার পাইয়াছি; এই যে আজ পবিত্র সন্ধ্যাকালে তাঁহারই পবিত্র নামে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে—অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপলব্ধি কর, ইহার মধ্যে করুণাময়ী জননীর কত স্নেহ কত প্রেম কত করুণা প্রকাশ পাইতেছে।

দেশের মধ্যে কত পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সাধিত হইতেছে। আজ প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায় নবযুগে ব্রহ্মজ্ঞানের বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া দেশবাসীর প্রাণে নবজাগরণ আনয়ন করেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সেই আদিমকালে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কি অন্ধ বিশ্বাসই না ছিল—হিন্দু সাধারণের মধ্যে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে। স্বাধীনতার উৎস পরমপুরুষের মঙ্গলভাবে পরিপুষ্ট রাজা রামমোহন রায় সেই অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া বিজয় লাভ করিলেন—সেই অন্ধ বিশ্বাসকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। আজ তাহারই ফলে ভারতের সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষা এত প্রসার লাভ করিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—মেয়েদের কথা দূরে থাক, ছেলেরাও যদি সঙ্গীত চর্চ্চা করিত, তবে সাধারণ পিতামাতার বিশ্বাস হইত যে উহারা অধঃপতনের পথে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজই উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, বরঞ্চ ইহার বিপরীতে, সুভাব সঙ্গীতের দ্বারা পুত্রকন্যার হৃদয় সমুন্নত হয়, গৃহে শান্তি আসে, সুখ আসে। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ পিতামাতারা কেমন উৎসাহ সহকারে তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। এখন আর, কি পুত্র কি কন্যা, কাহারও বিদ্যাশিক্ষার পথে কেহই অর্গল প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না। এখন

সকলেরই এই একই ইচ্ছা যে, দেশ হইতে অজ্ঞানের অন্ধকার কিরূপে বিদূরিত হয়। বটবৃক্ষের শরীর হইতে মূলসকল যেমন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নূতন নূতন বৃক্ষের জন্মদান করে, সেইরূপ সেই অপ্রতিম পরমাত্মার করুণা শতধারে আমাদের আত্মাতে নামিয়া শতবিধ অভাব পূর্ণ করে। ভারতের তিনিই গৃহদেবতারূপে অবস্থিতি করিয়া ভারতবাসীকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতেছেন, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

তৈলাভাবে যেমন দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, নানা কারণে লোকের অভাবে, অর্থের অভাবে, যত্নের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ আজ নির্ব্বাণোন্মুখ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল অভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখি যে, স্বার্থপরতার অতিবৃদ্ধিই ইহার মূলে। স্বার্থসাধনের জন্য আমরা নানা প্রকার অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব; পরে যখন তাহার জন্য ভগবানের রৌদ্র দণ্ড আসিয়া আমাদিগকে নিপীড়িত করিতে থাকিবে, তখন নিমগ্নপ্রায় জীব যেমন নিজেকে ভাবিবার অবসর দেয় না যে, সম্মুখস্থ খড়-কুটো তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে কি না, অথচ তাহারই শরণাগত হইতে ধাবিত হয়, সেইরূপ সেই দণ্ডনিপীড়িত ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া দণ্ড হইতে নিষ্কৃতির আশ্বাস দিয়া সত্যমিথ্যামিশ্রিত যে যাহাই বলে সে তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া যায় এবং তাহার ফলে স্বভাবতই ভগবান হইতে, সুতরাং ভগবৎপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেও দূরে সরিয়া যায়। সে বোঝেনা যে, পাপতাপ যতই আমাদিগকে আচ্ছন্ন করুক না কেন, ভগবান প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই সমস্ত পাপতাপ তাঁহার বজ্রাগ্নি দ্বারা ভস্ম করিয়া করুণাবারি বর্ষণে আমাদিগকে শীতল করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সর্ব্বত্রই যে তাঁহারই রাজ্য, তিনি যে সকল স্থানে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তখন, পাপতাপেই যদি বা দগ্ধ হই, বিষাদের ঘন অন্ধকারেই যদি বা নিমগ্ন হই, বিপদ-আপদের যন্ত্রে পড়িয়া যদি বা নিষ্পিষ্ট হই, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইহার উহার তাহার আশ্রয় লইবার জন্য ধাবিত হইয়া লাভ কি? সরল অন্তরে শিশুর মত, বালকের মত যদি আমরা দৌড়িয়া গিয়া আমাদের ভুলভ্রান্তি সমস্তই সেই পরম পিতামাতা ভগবানের চরণে নিবেদন করি, তবে তিনি কি আমাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন? কখনই নয়—কখনই নয়। তিনি নিশ্চয়ই তখন আমাদের অন্তরের সঞ্চিত ধুলিরাশি মার্জিত করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিবেন—তিনি ছাড়া প্রকৃত শান্তি দিতে দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া বিষয়সমূহ অর্জন করিলে ছুটিও না। তাঁহাকে সকল কর্ম্মের কেন্দ্রে রাখিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্যরূপে সংসারের হিতজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

অন্যোন্য সাহচর্য্যই হইল বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম। কেবল তোমার আমার মধ্যে নয়, কেবল ভারতের এ-অংশে ও-অংশের মধ্যে নয়, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এমন একটা মেলামেশার জোয়ার-ভাঁটা খেলিতেছে যে, পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ না করিলে, পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত কাহারও কোনও কার্য্যে সাফল্য লাভ করা সুদূরপরাহত। একথা যে কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খাটে বা সামাজিক ক্ষেত্রে খাটে তাহা নহে, এ কথা ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধেও সর্ব্বতোভাবে সত্য। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সেই আদিম কালে, যখন ব্রহ্মোপাসকেরা যথার্থ ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মিলিত হইতেন, পরস্পরের সম্পদে বিপদে একাত্মভাবে সুখী দুঃখী হইতেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া কি বল ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল; ব্রাহ্মসমাজের অগ্নিকেন্দ্র হইতে জ্ঞানের, ভাবের ও কর্ম্মের অগ্নিকণাসকল চতুর্দ্দিকে কিরূপ ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র ভারতভূমিতে জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল। আর আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই ভ্রাতৃভাবের অভাবে, সেই অন্যোন্যসাহচর্য্যের অভাবে, ব্রাহ্মসমাজ কি প্রকার মলিন নিস্তেজভাব ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু নির্ভর হও—নির্ভয় হও। তাঁহার অভয় বাণী আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তাঁহার মঙ্গল-শঙ্খের সুমঙ্গল ধ্বনি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে—মিলনের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। ভগবান যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া তাঁহার নিজের ধর্ম্ম সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই বঙ্গদেশে, এই ভারতে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে ব্রাহ্মধর্ম্মকেও তিনি জগত হইতে অন্তর্হিত হইতে দিতে পারেন না এবং সেই ব্রাহ্মসমাজকেও বিনষ্ট হইতে দিবেন না। কে জানিত যে, রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যভার তাঁহার পরিবারের সম্পূর্ণ বহির্ভূত আর একজন মহাত্মা স্বেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইবেন? কে জানিত যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যভার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্বেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া ভারতের দিকে দিকে প্রসারিত করিবেন? সেই প্রকার, কে জানে যে, ভগবান কাহার হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিস্তেজভাব দূর করিবার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিবেন? কিন্তু এই পবিত্র অধিকার লাভের জন্য আমাদিগের প্রত্যেককেই তপস্যা করিতে হইবে, জাগ্রত থাকিতে হইবে, সচেষ্ট

থাকিতে হইবে—নিষ্কর্ম্মা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সেই পবিত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-লাভের আশায় থাকিলে কোনই ফল হইবে না—তাহা পাইলেও ধারণ করিতে পারিব না।

যাঁহাদের অন্তরে ভগবানের পবিত্র তেজকণা ধারণ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহারা অগ্রসর হউন, তাঁহারা মিলিত হউন, সংহত হউন—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া ধর্ম্মের পথে, অমৃতধামের পথে যাত্রা সুরু করিয়া দিন। ভক্তগণ পরস্পরের মধ্যে পবিত্র ধর্ম্মবন্ধন স্থাপন করুন। দোমনা হইয়া সংশয়চিত্তে ব্রাহ্মসমাজে আসিলে চলিবে না, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সত্য ধর্ম্ম জানিয়া সাহসের সহিত তাহার উপদেশ-সকল পালন করিবার ইচ্ছা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে হইবে। তবেই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, প্রত্যেকের পরিবারে, প্রত্যেকের সমাজে, আমাদের এই পবিত্র ধর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে; তবেই আমরা আবার ভারতে স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড়িতে দেখিব। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের এই কথা মিথ্যা নয়—ইহা ধ্রুব সত্য যে, আমরা যদি সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, শ্রেয়ের পথে, এক পদও অগ্রসর হই, তবে ভগবান স্বয়ং আমাদিগকে সহস্রপদ আগাইয়া দিবেন।

যে নামেই হৌক, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অচিরে দেশবাসী সকলের হৃদয় অধিকার করিবে, চতুর্দ্দিকেই তাহার সুলক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যে অচিরে উন্নত আকার ধারণ করিয়া জগতবাসী সকলকেই আশ্রয় দিতে সমুদ্যত হইবে, তাহার ক্ষীণ আশারশ্মি আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেছে। আমাদের যিনি হৃদয়দেবতা, মানব মাত্রেই তাঁহার আরাধনা করিয়া জীবন ধন্য করিবে; সকল অনুষ্ঠানে, সকল কর্ম্মে তাঁহার আসন সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিবে; কেহই আর কপটাচরণ করিবে না; ভগবানের আসনে অন্য কাহাকেও বসাইবে না—তাঁহারই চরণে আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমুদয় হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিবার অধিকার ও অবসর পাইব, এই আশাতে আমরা আনন্দিত হইতেছি। আমাদের বাক্য সত্য হৌক, আমাদের কার্য্য সত্য হৌক। আমরা যেন সত্যস্বরূপ ভগবানের দাস, তাঁহার সন্তান বলিয়া গৌরব করিবার উপযুক্ত করিয়া আপনাদিগকে প্রস্তুত করি।

হে পরমাত্মন্! তোমাকেই একমাত্র সত্যস্বরূপ বলিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারি। তোমাকে বর্ণন করিতে গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়, তোমাকে ধারণা করিতে গিয়া মন প্রতিনিবৃত্ত হয়। তুমি অচিন্ত্য অনন্ত। আমাদের শক্তি নাই যে, তোমার মহিমা সুব্যক্ত করি। এই ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের অন্তরে তুমি আপনাকে আপনি প্রকাশ কর। আমাদের মুখ দিয়া তোমার যে সকল সত্য বাণী প্রকাশ করিলে, তাহার সত্যভাব এই ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দাও। আমরা তোমার প্রীতির উপর, তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আছি। জীবনের পথে তোমারই স্নেহপ্রেম রক্ষাকবচরূপে আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিয়া বিপদ-আপদ হইতে নিয়তই রক্ষা করিতেছে। আমাদের অন্তরে তোমার মঙ্গলভাব প্রকাশিত কর; আমরাও যেন তোমার মঙ্গলভাবের আদর্শে জগতের হিতসাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকি, সাধুভাব অবলম্বন করি। তোমাকে যেন আমরা পরম পিতা করুণাময়ী জননী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা সকলে তোমারই সন্তান বুঝিয়া পরস্পর যেন সাধুভাবে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হই। তোমার আবির্ভাবে আমাদের ম্লান উজ্জ্বল হৌক, হৃদয় প্রশস্ত হৌক, আত্মা সবল হৌক। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা বিপদ-কোলাহলের মধ্যে তোমার হস্ত দেখিয়া যেন বিভীষিকায় বিমূঢ় হইয়া না পড়ি। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যেন তোমারই নাম আমাদের অন্তর হইতে সমুত্থিত হয়। তুমিই দুর্ব্বলের বল, নির্ধনের ধন। দরিদ্রের প্রতি তোমার যেমন কৃপাদৃষ্টি, ধনীর প্রতিও সেইরূপ। যে সূর্য্য স্বীয় জ্যোতিতে উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গকে সমুদ্ভাসিত করে, সেই সূর্য্যই গভীর কূপের অন্ধকারও বিনষ্ট করে। তোমার করুণা দরিদ্রের কুটীরে এবং রাজপ্রাসাদে, সকল স্থানেই সমান বর্ষিত হইতেছে। তুমিই আমাদের এই দুর্ব্বল ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশিত হইয়া ইহাতে বলাধান কর, আমাদের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য বিদূরিত কর। তুমি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হও—আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হৌক।

—

রাজার অন্তরে বিদেশভ্রমণের প্রভাব।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সন্দর্শনার্থে দুইবার রাধানগরে গিয়াছিলাম। গঠনকার্য্য যেরূপ দ্রুতগতিতে চলিতেছে তাহাতে মূলমন্দিরটি শীঘ্রই পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার পরে যাত্রীনিবাস ও মন্দিরের চারিদিকের উদ্যান সংগঠন করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল এই উদ্যোগের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে না পাইলে এইরূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্পূর্ণ হইতে পারিত না। কলিকাতা হইতে রেল-পথ ও জাহাজ-পথের পর পানসিউলী হইয়া রাধানগরের নৌকা-

পথ দুর্গম। আমাদের দ্বিতীয় যাত্রায় নৌকা রাধানগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। নদীবক্ষে বিস্তূর্ণ বালুকা দেখা গিয়াছে। আমাদিগকে এক ক্রোশের অধিক পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিবার সময় নৌকা যখন ক্রমাগত বালুকাতে অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন সকলকে নৌকা হইতে জলে নামিয়া ক্রোশাধিক পথ নৌকাকে ঠেলিয়া আনিতে হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্‌জিনিয়ার প্রভাসচন্দ্র ঘোষ ও পাথরের গঠন-কার্য্যের জন্য দুই জন 'কচ্ছ' মিস্ত্রী। কেমন করিয়া রাজার অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার তথ্যানুসন্ধানেও আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে * স্থানীয় অবস্থার দিক দিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছি। উহাতে যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ছাড়া রাজার তরুণবয়সে বিদেশ-ভ্রমণও উহার অন্যতম বলবৎ কারণ বলিয়া স্পষ্ট ধারণা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদেশভ্রমণ না করিলে আমাদের চিত্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। রাজা অল্প বয়সে গৃহ-বিতাড়িত হইয়া হিমালয়প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি তিব্বতে উপনীত হইয়াছিলেন; এবং সেখানে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃতি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাব নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার পরে আরবি-ফার্সী ভাষা-শিক্ষা করিবার জন্য পাটনায় অবস্থান। সে সময়ে পাটনা সহর আরও সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং মুসলমানসাহিত্যশিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। অতঃপর রাজা উপনিষদ ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য কাশীতে গমন করেন। এইরূপে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী ও মতবাদীর সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরের ভাব ফুটিবার ও সুগঠিত হইবার যথেষ্ট অবসর হইয়াছিল। স্বদেশের বাহিরের আবহাওয়া অঙ্গে ও মনে না লাগিলে কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টী গ্রাহ্য কোন্‌টী যে পরিত্যাজ্য এ স্বাধীন চিন্তা অন্তরে ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা জীবনে সত্য সত্যই বড় বিরল। অবশ্য গৌরাঙ্গদেব-প্রমুখ কয়েক জন মহাপুরুষের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা নিজের দেশে বসিয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্বাধীন মত ঘোষণা করিবার আলোক ও শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেশপর্য্যটন গৌরাঙ্গদেবের মতপ্রচারের পরে ঘটিলেও এই দেশভ্রমণ তাঁহার ভক্তিমার্গকে পুষ্টি-দান করিয়াছিল, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

এই দেশ-বিদেশভ্রমণের ইঙ্গিত এবং ভাব হইতে স্থায়ীফলের আশা আমাদের দেশে তীর্থপর্য্যটনের বিধি-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ব্যাপার। দেশ বিদেশ না ঘুরিলে অন্তরের বদ্ধ ভাব সহজে নিরাকৃত হয় না। বলিতে কি, হিমালয়ভ্রমণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ঋষিপ্রকৃতি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা যেমন প্রথম বয়সে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তেমনি পাঠে প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহাকে আরও অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। সে সময় সংস্কৃত পুঁথি ছাপার আকারে বাহির হয় নাই। কিন্তু কি বিরাট অধ্যবসায়ের সহিত তিনি সংস্কৃত ধর্ম্মসাহিত্য-পাঠের ভিতরে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা রাজার প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্রের উপর তাঁহার কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য অধিকার জন্মিয়াছিল এবং উক্ত গ্রন্থে তাঁহার বিচারপ্রণালী কিরূপ শাস্ত্রসঙ্গত। তিনি শাস্ত্রের সাহায্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে এতবড় মহাপণ্ডিত, অথচ দেশীয় প্রচলিত মতবাদ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ভাবে ও চিন্তায় সত্য-দ্রষ্টা ঋষি, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তিনি বিষয়ী। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ও রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি চাকরী করিতেছেন ও ইংরাজী ভাষায় আরও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সতীদাহ-নিবারণ, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। দিল্লীর বাদসাহের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া বিলাতে যাইতেছেন। তিনি যে কেবল সংস্কৃত ধর্ম্ম-সাহিত্যে সুবিপুল অধিকার লাভ করিয়া প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিতেছেন, বেদান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তাহাই নহে; তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও প্রকাশ করিতেছেন, আবার তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার জন্মদান করিবার জন্য গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করিতেছেন, খৃষ্টিয়ানগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিবার জন্য গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষা অধ্যয়ন করিতেছেন, মিসনরিগণের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিতেছেন, গ্রীক ভাষার বাইবেল হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে ইংরাজী অনুবাদে বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে দশটী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে তাঁহার প্রতিভা মানুষী প্রতিভা নহে, উহা দৈবী প্রতিভা।

তিনি খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত মিশিতেন। ইংরাজ-দিগের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতেন, অথচ তিনি উপ-বীতধারী হিন্দু। তাঁহার জীবনে সারল্য, উদারতা ও বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। খৃষ্টকে সমুচিত শ্রদ্ধা দান করিতেন অথচ বেদান্ত-উপনিষদের উপর এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভেদদৃষ্টি তাঁহাতে ছিল না; তিনি ধর্ম্মকে বিশ্বজনীন মূর্ত্তি দান করিবার প্রয়াসী

* গত আশ্বিন-সংখ্যায় "রাজা রামমোহনের জন্মভূমি-পরিদর্শন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। অথচ আমরা তাঁহার শিষ্য-সেবক হইয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধিকে দূরীভূত করিতে চেষ্টিত হই না। আমাদের ইহাও স্মরণ রাখা চাই, রাজা রামমোহন যিনি বর্ত্তমান যুগে আমাদের আদিগুরু তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহার পরিহার করেন নাই। তাঁহার এই আদর্শটিকে অন্তরে সকল সময়ে আমাদের জাগাইয়া রাখা চাই।

সমাজ।

(জনৈক শিক্ষক)

তুমি বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াও—দেখিবে, গাছপালাগুলি নিজ নিজ দলে একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে। দেবদারু গাছ সকলেই দেখিয়াছ। তাহা হইতে যখন বীজ ছড়াইয়া পড়ে, আর সেই সমস্ত বীজ হইতে যখন ছোট ছোট গাছ বাহির হইয়া বাড়িতে থাকে, তখন যেন তাহাদের মুখে চোখে আনন্দ খেলিতে থাকে, তাহাদের অঙ্গ হইতে যেন হর্ষ ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। মায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া যেমন শিশুরা বাড়িতে থাকে, শুধু দেবদারু গাছ কেন, আমরা তো অনেক গাছ দেখিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের আশ্রয়ে থাকিয়া নিজ নিজ শিশু গাছগুলি কেমন বাড়িয়া উঠে। একবার আমি কয়েকটী দেবদারু চারা উঠাইয়া লইয়া পৃথক পৃথক স্থানে দূরে দূরে পুঁতিয়া দিয়াছিলাম—সব কয়টাই মরিয়া গেল। বিশেষ যত্ন লইলে হয়তো বাঁচাইতে পারিতাম। কিন্তু মূল গাছের নিম্নে যে সমস্ত চারা হয়, তাহাদের জন্য বিশেষ যত্ন না লইলেও তাহারা বাড়িয়া উঠে। ফুলগাছ সম্বন্ধেও দেখিয়াছি—একসঙ্গে, যখন ফুলগাছগুলি রাখা হয়, তখন খুব শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের শাখায় শাখায় ফুল বাহির হইতে থাকে। তাহার কারণ এই যে, মৌমাছি প্রভৃতি—এমন কি, বাতাসের দ্বারা একটীর পরাগ অপরটীর গর্ভে নীত হয়। ফুল ফুটাইবার জন্যও গাছগুলি পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে। কাছাকাছি না থাকিলে মৌমাছিরা ঐ প্রকারে পরাগ বহন করিতে পারিত না। কাছাকাছি থাকিয়া বাড়িয়া উঠা ভগবানের বিধান বলিয়া মনে হয়। কলাগাছের একটা 'তেউড়' বা মূল কোন ভাল যায়গায় বসাইয়া দাও, দেখিবে, সেই একই তেউড় হইতে গোছা গোছা গাছ বাহির হইতেছে। গাছের ব্যবহার একটু ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত গাছগুলি দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। দূর্ব্বাঘাস যেখানে হয়, সেখানে অন্য গাছপালা সহজে হইতে পারে না। এইরূপ দলবদ্ধ ভাবে থাকিতে দেওয়া ভগবানের অভিপ্রায় বলিয়াই মনে হয়। আমি পড়িয়াছিলাম, দূর্ব্বার শিকড়ে এমন এক বিষ আছে, সে বিষ দূর্ব্বা মাটির ভিতরে প্রক্ষেপ করে—অন্যান্য গাছ সেই বিষ সহ্য করিতে পারে না।

গাছপালার মধ্যেও যেমন দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাই, সেইরূপ জীব-জন্তুর মধ্যেও ঐরূপ প্রবৃত্তি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। বন্য জীব ছাড়িয়া দিয়া গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যেও কেমন দলবদ্ধভাব দেখা যায়। কুকুরগুলো কিরকম দলবদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতো সকলেরই দেখা আছে। মুরগী হাঁস প্রভৃতি পাখীরাও কেমন দলবদ্ধ হইয়া থাকে। দেখিয়াছি, যে সমস্ত পাখী কথা কয়, তাহাদের কথা ফুটাইবার জন্য স্বজাতীয় পাখীদের কাছাকাছি রাখিতে হয়। মহিষ, গরু—ইহারাও দলবদ্ধভাবে চরিতে পাইলে যে আরাম ও আনন্দ পায়, তাহা তাহাদের ভাবগতিক দেখিলেই বোঝা যায়। বন্য জন্তুদের দলবদ্ধ হইয়া থাকা আমরা সকলে প্রত্যক্ষভাবে না দেখিলেও গ্রন্থে পড়িয়াছি। অত বড় জন্তু যে হাতী, তাহারাও দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে ভালবাসে। সংস্কৃতসাহিত্যেও যূথবদ্ধ হাতীর কথা অনেক স্থলেই দেখা যায়। যূথভ্রষ্ট হাতীর করুণ কাহিনীও সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত দেখা যায়। সিংহ, ব্যাঘ্র, ইহারা পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব সহ্য করিতে না পারিলেও কাছাকাছি একটা ঘেরের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে। শেয়াল ও নেকড়ে বাঘেরা তো রীতিমত দলবদ্ধ হইয়াই থাকে, বেড়ায়।

দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার কারণের সন্ধান করিলে মনে হয় যে, আত্মরক্ষাই ইহার প্রধান কারণ। দলবদ্ধ হইয়া না থাকিলে আত্মরক্ষার সুবিধা হয় না, তাই সাধারণতঃ জীবজন্তুরা দলবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরকে বিপদের সময় সাহায্য করিতে ও রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। কথামালার একটী গল্প মনে পড়িতেছে—তিনটী বৃষ অর্থাৎ ষাঁড় একসঙ্গে থাকিত, বেড়াইত। একটী সিংহের ইচ্ছা হইতেছিল যে, তিনটী বৃষকেই ভক্ষণ করিয়া উদর পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু তিনটী বৃষ "একাট্টা" থাকাতে সিংহটা তাহাদিগকে হত্যা করিবার তেমন সুবিধা পাইতেছিল না। অবশেষে সিংহ কোনক্রমে তিন বৃষের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া দিল। তখন তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকিতে লাগিল—কেহ কাহাকেও বিপদে আপদে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। তখন সুবিধা বুঝিয়া সিংহটা একে একে এক একটা বৃষকে ধরিল, বধ করিল এবং মনের সাধে তাহার মাংসে উদর পূর্ত্তি করিল। আমরা জীবজন্তুবিষয়ক গ্রন্থে পড়িয়াছি যে, মহিষেরা যখন মাঠে দলবদ্ধ হইয়া চরিতে থাকে, তখন যদি তাহারা কোন বিপদের গন্ধ পায়,

অর্থাৎ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি আক্রমণ করিতে আসিতেছে, এতটুকু ইঙ্গিত পায়, তখনই তাহারা চকিতের মধ্যে শাবক ও মাদী বা স্ত্রী-মহিষদিগকে মধ্যস্থলে রাখিয়া পুরুষ বা মর্দ্দামহিষগুলো শিং উঁচাইয়া চতুর্দ্দিকে গোলাকার ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। সিংহব্যাঘ্র প্রভৃতি পরাক্রান্ত জন্তুরাও সে ব্যূহ ভেদ করিতে সাহস পায় না। এই প্রকার আমরা দেখিতেছি যে, হাঁসের দলে মুরগী আসিলে বা মুরগীর দলে হাঁস আসিলে থাকিতে দেয় না, তাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর ছাদে বা মাঠে দাঁড়াইলে, পাখীদের দলবদ্ধ ভাব খুব চোখে পড়ে। বকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিতেছে, কাকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিজেদের গাছে ফিরিতেছে। কেহই বিচ্ছিন্ন ভাবে ফিরিতে চাহে না। সকলেই যেন জানে যে বিচ্ছিন্নভাবে ফিরিলে কোথায় কোন্ অজানা স্থানে অজানা গাছে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, আর, হয় বাদুড়, না হয় শেয়াল প্রভৃতির কবলে গিয়া পড়িবে।

শুধু যে আত্মরক্ষার কারণেই জীবজন্তুরা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় তাহা নহে। ঐপ্রকার দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিবার ফলে পরিণামে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্প্রীতি জন্মে এবং তাহারা পরস্পরের সঙ্গ ভালবাসে ও আকাঙ্ক্ষা করে। কুকুরগুলো কিপ্রকার নিজেদের মধ্যে খেলা করে, তাহা তো অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই প্রকার সঙ্গপ্রীতি আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষার পরিণতি হইলেও, ইহার পরিণত অবস্থায় কোনও ফলাকাঙ্ক্ষার ভাব দেখা যায় না।

জীবজন্তুর মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া থাকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মধুমক্ষিকা। মৌচাকে মৌমাছিদের ডিম থাকে, ইহা তো সকলেই জানে। কিন্তু অনেকে জানে না ঐ সমস্ত ডিমগুলিকে কতকগুলি মৌমাছি যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইয়া লালনপালন করে; কতকগুলি মৌচাক প্রস্তুত করে; কতকগুলি মৌমাছি দ্বাররক্ষক হইয়া পিপীলিকা প্রভৃতি বহিঃশত্রুদের হাত হইতে মৌচাকটীকে রক্ষা করে; আবার কতকগুলি মৌমাছির কার্য্য হইতেছে শুধু মধু সংগ্রহ করা। এই প্রকারে সমস্ত মৌমাছি মিলিয়া মিশিয়া বিভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া কেমন একটী সুন্দর কর্ম্মকুশল দল গঠন করে। মৌমাছিদের মধ্যে আবার দলাদলি বেশ আছে। এক চাকের মৌমাছির দল আর এক চাকের মৌমাছির দলের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করে। লড়াইয়ের পর অনেক মৌমাছি মাটীতে মরিয়া পড়িয়া আছে দেখা যায়। যে দল হারিয়া যায়, সেই দলের মৌচাক হইতে মৌমাছিগুলি অন্যত্র উড়িয়া যায়। তখন সেই চাকটী বহিঃশত্রুরা সহজেই আক্রমণ করে ও ডিম মধু যাহা কিছু পায়, সমস্তই হরণ করিয়া নিজেরা খায় ও বাসায় লইয়া যায়।

মানুষ যদিও অন্যান্য জীবজন্তুদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তবুও মানুষ জীবজন্তু ছাড়া কিছুই নয়—অন্যান্য জীবজন্তুদের যেমন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে, মানুষেরও তাহাই আছে। এইজন্য সহজেই বোঝা যাইবে যে, মানুষও দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়। সাধারণতঃ মানুষের এক-একটী দলকে সমাজ নাম দেওয়া হয়। মানুষেরও সমাজবদ্ধ থাকিবার কারণ ঐ আত্মরক্ষা এবং পরস্পরের সঙ্গলাভের ইচ্ছা। বাল্যকালে আমরা অনেকেই রবিন্‌সন্ ক্রুসোর গল্প পড়িয়াছি। সেই গল্পে কেমন সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রবিনসন ক্রুশো একটা দ্বীপে একাকী পড়িয়া কিপ্রকার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল এবং শেষে সেই দ্বীপে ঘটনাচক্রে উপনীত এক অসভ্যকেও সঙ্গীরূপে পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল।

সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিলে মানুষের বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইত। জন্ম হইতেই তো মানুষ পরাধীন। মানুষের জননী যখন শিশুর জন্মদান করে, তখন তো তাহাকে তাহার স্নান-আহার প্রভৃতি সকল কার্য্যেরই জন্য আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহার নিজের এবং শিশুরও অসুখবিসুখে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সাহায্য না লইলে চলিতে পারে না। আমরা যদি প্রত্যেকে আপনাকে এক একটী কেন্দ্র বলিয়া ধরি, তবে সেই কেন্দ্র হইতে অগ্রসর হইতে হইতে নিজের নিজের দল বা সমাজে গিয়া পড়ি যথাঃ—

সমাজকে ছাড়িয়া আমাদের জীবনযাত্রাই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এক কথায় আমরা সমাজের একেবারে অতীত কিছুতেই হইতে পারি না; এমন কি, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকেও এক-একটী সমাজ গড়িয়া তাহারই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হয়। পরিবার মধ্যে আশ্রয় না পাইলে, পিতামাতা প্রভৃতির যত্ন না পাইলে অনেক সময় আমাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইত নিঃসন্দেহ। বিদ্যালয় স্থাপিত না হইলে আমরা অজ্ঞানেই পড়িয়া থাকিতাম। সহরের কর্ত্তৃপক্ষ না থাকিলে আমাদের গৃহের আশেপাশে আবর্জ্জনারাশি জমা হইয়া থাকিত এবং রোগবীজ ছড়াইয়া মৃত্যু আনিবার খুবই সহায়তা করিত। দেশের শাসকগণ থাকাতেই আমরা আইন-কানুন পাইয়া নিরাপদে বাস করি। এই সকল কারণে আমাদের

সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতেই হয়—না থাকিলে উপায় নাই বলিলেও চলে।

কলিকাতায় চলাফেরা।

(ট্রামগাড়ী)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ট্রাম খুলিবার ব্যবস্থা।

আমাদের সময়ে প্রথম ঘোড়ার ট্রাম খুলিবার বহুপূর্ব্বে, শুনিয়াছি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, যখন কলিকাতায় প্রথম প্রদর্শনী খোলা হয়, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় ঘোড়ার ট্রাম কোন এক কোম্পানি খুলিয়াছিল। কিন্তু তখন কলিকাতায় কেরাণীর সংখ্যাও কম ছিল, আফিসের সংখ্যাও কম ছিল,; আর, তখনকার লোকেরাও আজকালের ছেলেদের মত এত পরবশ ছিল না—সেকালে অনেকেই পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ অনায়াসে চলিয়া যাইত, পারতপক্ষে পয়সা দিয়া ট্রাম চড়িত না। কাজেই সে কোম্পানি দাঁড়াইতে পারিল না, লোকসান দিয়া উঠিয়া গেল। তাহার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে বর্ত্তমান "কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানি" ট্রাম খুলিবার আসরে নামিলেন। তখন ভদ্রলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও বাড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকে দোকানপসার ও অফিসের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই কেরাণী প্রভৃতি আফিসগামী লোকের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে, ঠিক সময়ে এই কোম্পানি আসিয়া নামিল। আমাদের বেশ মনে পড়ে, কোম্পানির মাটি খুঁড়িয়া বড় রাস্তার অভিমুখীন গলিগুলির মুখ বন্ধ করিবার জ্বালায় সেই সকল গলির গৃহবাসীরা আলাতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীরও গলির মুখ এই প্রকারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ বিস্তর আপত্তি করিলেন, তাঁহাদের কথা শোনেই বা কে? কোম্পানি হইল সাহেব কোম্পানি; আর আমরা হইলাম native nigger। তখনও ভারতবাসী "নেটিব" (native) নামেই পরিচিত হইত, তা তিনি যত বড়লোকই হউন না কেন; তখনও ভারতবাসী Indian বা ভারতবাসী নামে অভিহিত হইবার অধিকার ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। এই অধিকার তো সে দিন—বোধ হইতেছে, লর্ড ডফরিণের আমলে স্বদেশপ্রেমিক ৺নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রে বিশেষ আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীকে প্রদত্ত হইয়াছে। যাক্, সাহেব কোম্পানি নেটিভদিগের আবেদন নিবেদনের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। অবশেষে আমাদের বাড়ীর তদানীন্তন কর্ত্তা ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কোম্পানিকে উকিলের চিঠির দ্বারা ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবার ভয় দেখাইলে তবে কোম্পানি মাটি সরাইয়া গাড়ী যাতায়াতের পথ খুলিয়া দিয়াছিল। যাই হোক, নানা বিড়ম্বনার পর যখন ঘোড়ার ট্রাম খুলিয়া গেল, তখন জনসাধারণের মনে একটা আনন্দধ্বনি উঠিতে দেখা গিয়াছিল—কারণ, ঐ গাড়োয়ানদিগের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়াছিল, আর সস্তায় আরামে অনেকদূর পর্য্যন্ত যাতায়াত চলিত। আর, সময়েরও বাধাবাধি ছিল না—যখন ইচ্ছা কোথাও চলিলাম, আবার ইচ্ছামত বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের, এমন কি দরিদ্রলোকেদিগেরও পদযুগল ক্রমে অবশ বা পরবশ হইবার দিকে ছুটিয়া চলিল।

ট্রামের ঘোড়া।

আমরা সেই সময়ে শুনিয়াছিলাম যে, ট্রাম কোম্পানি, কি উদ্দেশ্যে জানি না, তাহাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিষটা, এমন কি টিকিট ছাপাইয়া আনাটা পর্য্যন্ত, বিলাত হইতে করাইয়া আনিতেছিলেন—এদেশে তাহারা একটা জিনিষও প্রস্তুত করায় নাই। অবশ্য, ইহার সত্যাসত্য আমার জানা নাই। কিন্তু ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার কারণ কোম্পানির অতিরিক্ত স্বদেশপ্রীতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল যে, যাহা কিছু খরচ হইবে, সেটা ইংলণ্ডে খরচ হইবে, ইংলণ্ডবাসীরা তাহা পাইবে। এতটা স্বদেশপ্রীতি যে প্রকৃত হিতজনক তাহা বলিতে পারি না—ইহাকে সরল বাংলা ভাষায় "একচোখে টেমি" বলা যায়, যাহার মূলমন্ত্র নিছক স্বার্থ অর্থাৎ নিজের পাতে ষোল আনা ঝোল টানা। ট্রামগাড়ী টানিবার জন্য কোম্পানি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ওয়েলার (Waler) ঘোড়া রাশি রাশি আমদানী করিলেন॥ ঘোড়াগুলি বেশ গাঁটাগোট্টা। শীতকালে তাহারা বিশেষ কোনই গোলযোগ করিত না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের কষ্ট দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যাইত না—আজকাল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে শকটবাহী মহিষদের কষ্ট যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই সেই ঘোড়াদের কষ্ট অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে এবং ভাদ্রের প্রখর তাপে কত ঘোড়া যে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মারা পড়িত তাহার ঠিকানা নাই। তদ্ব্যতীত নূতনভাঙ্গা ঘোড়াগুলি পিছনদিকে লাথি ছোড়া, যোতশিকলির বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকা, এই রকম কত খেলাই খেলিত। চালকের সম্মুখে যে লোহার চাদর থাকিত, সহসা ঘোড়া তাহাতে এক লাথি মারিল, আর আরোহীরা চমকাইয়া উঠিলেন। চালক হইতে প্রথম বেঞ্চ বেশী দূরে ছিল না, তাই অনেক সময়ে সম্মুখের

বেঞ্চের আরোহীরা ঘোড়ার লাথি দৈবাৎ মাথায় পড়িবার আশঙ্কায় অনেক সময়ে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হইতেন। বেচারী চালকেরই বড় মুস্কিল হইত—লাথি খাইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাকে ঘোড়ার যোত-শিকল খুলিয়া ঘোড়াকে যথাস্থানে সরাইয়া আবার সেই শিকলটা যথাস্থানে লাগাইয়া দিতে হইত। অনেক সময়ে এক একটা ঘোড়া কিছুতেই চলিতে চাহিত না। তখন সেটাকে খুলিয়া পশ্চাতে যে সমস্ত গাড়ী দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহারই কোন একটা হইতে একটা ঘোড়া খুলিয়া যুতিয়া দেওয়া হইত। কখনও বা তাহাতে ফল ফলিত, কখনও বা ফলিত না। তাহাতেও যদি না চলিত, তাহা হইলে আরোহীরা অনেক সময়ে চালককে প্রাণের সাধ মিটাইয়া গালি দিয়া নামিয়া পড়িতেন। পরে অনেক সময়ে নিজেরাও গাড়ী ঠেলিয়া চালাইবার বিষয়ে চালককে সহায়তা করিতেন।

ঘোড়ার ট্রামে কোম্পনীর লোকসান।

এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রাম কোম্পানি তাহাদের লাইনের রাস্তার মধ্যে মধ্যে এক এক টুকরা ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া কতকগুলি গাড়ি ও ঘোড়া রাখিবার এবং ঘোড়াদের জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেই আড্ডায় আসিলেই যোতা ঘোড়া খুলিয়া নূতন ঘোড়া যোতা হইত। যে রাস্তার মোড়ে ট্রাম লাইনের বাঁক আছে, সেই সমস্ত বাঁকে গাড়ী ঘুরাইবার জন্য এক একটী অতিরিক্ত ঘোড়া দাঁড় করান থাকিত, কিন্তু এরকম ঘোরালো ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। জল খাওয়াইবার ব্যবস্থাই হৌক আর যাহাই কেন হৌক না, গ্রীষ্মকালে ঘোড়াগুলো মরিতে ছাড়িল না—কাজেই কোম্পানির লোকসান না হইলেও লাভ খুব বেশী হইত না।

গ্রীষ্মকালে আরোহীদের অবস্থা।

গ্রীষ্মকালে ট্রামগাড়ীতে অফিসে যাতায়াতের সময় নিতান্ত স্বর্গসুখ যে পাওয়া যাইত না তাহা বলা বাহুল্য। সকলেই তো অফিসে যাইবার বা গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত, কাজেই বাধা থাকিলে কেহই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিত না, সকলেই গাড়ীতে উঠিবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগাইত—ঘোড়ার গাড়ি তো, তেমন জোরেও চলিত না। প্রত্যেক বেঞ্চে ৫ জনের বেশী বসিবার নিয়ম ছিল না—কিন্তু কে-ই বা শোনে সে নিষেধ? যদি ইতিপূর্ব্বে উপবিষ্ট ৫ জন আরোহী নবাগত কোন আরোহীকে বসিবার স্থান না দিল, তবে সে অপরের সুবিধা অসুবিধার প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া হয় তো সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে হয়তো একসারির আরোহী দুই বেঞ্চের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে দণ্ডায়মান আরোহীদিগের কল্যাণে উপবিষ্ট আরোহীদিগের যে কি অবস্থা হইত, তাহা ভুক্তভোগীর বর্ণনা করা অপেক্ষা পাঠকদিগের কল্পনাদৃষ্টিতে দেখাই ভাল। আজকাল ইলেকট্রিক ট্রামেও যে সময়ে সময়ে আরোহীদের এইরূপ দুরবস্থা হয় না, তাহা বলা যায় না। তবে সংবাদপত্রে লেখালেখির ফলে এবিষয়ে একটু বেশী কড়াক্কড় ব্যবস্থা হইতেছে।

ঘোড়ার ট্রামে আরাম।

ঘোড়ার ট্রামে যাহা কিছু আরাম ছিল, তাহা গ্রীষ্মকালের প্রভাতে হাইকোর্ট হইতে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে যাইবার গাড়ীতে। গাড়ীগুলির চারিদিক খোলা ছিল—দার্জ্জিলিং যাইবার রেলগাড়ীর মত। প্রভাতে ঐ গাড়ীতে গেলে সুন্দর দক্ষিণে মলয়বায়ু সেবন করিতে করিতে যাওয়া যাইত। সে সময়ে পূজ্যপাদ পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পার্ক ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার প্রদত্ত "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" বিষয়ক উপদেশগুলি লিখিয়া লইবার আদেশ পাইয়াছিলাম। কাজেই ঐ খোলা ট্রামে যাইতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিত—ঘোড়া থপথপ করিয়া একঘেয়ে ছন্দে চলিয়াছেই—যাইতে যাইতে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক কত তত্ত্ব যে মাথার ভিতর খেলিতে থাকিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি যে ট্রামগাড়ীতে যাইতাম, সেটা যেসকল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অন্তরে সম্ভ্রম ও সম্মানের অসঙ্গত ধারণা ছিল, তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু আমি ঐ প্রকার "ফোতো নবাবীর" আবাল্য বিরোধী ছিলাম বলিয়া তাঁহাদের অযাচিত বিধি নিষেধের উপদেশ কখনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতাম না।

কলের ট্রাম।

ধর্ম্মতলার মোড় হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত ট্রাম চলিত ধোঁয়া কলের সাহায্যে। তাহার পূর্ব্বে সহরের মধ্যে, ছোট হইলেও "কলের গাড়ী" চলিতে দেখি নাই। তাই উহা দেখিতে আমাদের বেশ মজা লাগিত। আমরা কয়েকটী ভাই মিলিত হইয়া একবার সেই গাড়ীতে চড়িয়া খিদিরপুর যাত্রা করিয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, মোটেই ভাল লাগে নাই—সেই মধ্যে মধ্যে বাঁশীর আওয়াজ, অতি জোরে চলিবার কারণে গাড়ীর সেকি উঠানামা ও ঘটাঘট শব্দ! এ সমস্ত আমার মত নীরবতাপ্রিয় লোকের যে মোটেই ভাল

লাগিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া, অত শীঘ্র লক্ষ্যস্থলে পৌছাইবার ভিতরে এতটুকু কবিত্ব ছিল না—উঠিলাম আর পৌছিলাম। কিন্তু ঐ পার্ক ষ্ট্রীটে যাইবার ওয়েলেসলি গাড়ী আমার বড় ভাল লাগিত—উহা অন্তরে বেশ একটু কবিত্ব জাগাইয়া তুলিত—মনে হইত, যেন কোন্ অনন্তের পথে চলিয়াছি! এইজন্য কাজের সুবিধা হইলেও এখনকার ইলেকট্রিক ট্রাম আমার বিশেষ ভাল লাগে না—ইহার সজোর চলনে একটা নিতান্ত কাঠখোট্টা স্বচ্ছন্দ ভাব ফুটিয়া বাহির হয়।

ইলেকট্রিক ট্রামের আবির্ভাব।

বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক ট্রাম আমাদের দেশে বেশ একটা নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছে। প্রথমে অনেকেরই ধারণাতে আসে নাই—আর তখন তো আজকালকার মত আমাদের দেশের ছেলেদের ভিতর বিজ্ঞানেরও বেশী চর্চা হয় নাই—তড়িৎশক্তির সাহায্যে অতবড় ট্রামগাড়ী মানুষসহ কি প্রকারে পরিচালিত হইবে। আমি যখন পূজ্যপাদ পিতামহদেবকে বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রস্তাব শুনাইলাম, তিনিও ক্ষণেকের জন্য ভাবিয়া পান নাই যে, উহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে। আমি বিলাতের সচিত্র সংবাদপত্র "লণ্ডন নিউজ" "গ্রাফিক" প্রভৃতিতে লণ্ডন প্রভৃতি সহরের পথে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলিবার ছবি দেখিয়াছিলাম; তাহাতে দেখিয়াছিলাম যে ট্রামগাড়ীর উপর দিয়া একটা তার চলিয়াছে। সেই ছবির বিবরণ বর্ণনা করাতে পিতামহদেব বলিলেন—"হাঁ তাহা সম্ভব", বৈদ্যুতিক ট্রামের আবির্ভাবে ঠিকাগাড়ীর দর্প একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। এই ট্রামে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন পৃথক্ পৃথক্ গাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে খুব বড়-লোক ও ধনী লোকদিগেরও ট্রামে চড়িবার বিরুদ্ধে কোন বাধা রহিল না। আমরা দেখিয়াছি, হাইকোর্টের জজ ও তদনুসরণে বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট হইতে ট্রামে চড়িয়া গৃহে ফিরিতেছেন। সম্ভ্রমরক্ষার কি সুন্দর উপায়! দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া যেখানে ৫ বা ৬ পয়সা, প্রথম শ্রেণীর ভাড়া সেইখানে ৭ বা ৮ পয়সা। এখন তো ভাড়া আরও কমিয়া গিয়াছে। মেথর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর যে সকল আরোহী দ্বিতীয় শ্রেণীতে যায়, তাহারা কি দুই এক পয়সা বেশী দিয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে পারে না? গেলে কে তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে? বর্ত্তমান গণতন্ত্রবাদের যুগে এপ্রকার বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না। আর ঐ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই প্রথম শ্রেণীতে যাইতে দেখা গিয়াছে। তবু সম্ভ্রমরক্ষার কি আশ্চর্য্য সামাজিক বিধান! ঐ যে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা দুই পয়সা বেশী দিলাম অর্থাৎ বেশী দিবার ক্ষমতা দেখাইতে পারিলাম, ইহাতেই আমার সম্ভ্রমরক্ষা হইল। আজকাল আবার ট্রাম কোম্পানি, মোটর ট্যাক্সি ও বাসের বাহুল্য বশত তাহাদের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ট্রামের ভাড়া অসম্ভব রকম কমাইয়া দিয়াছে। বেহালা যাতায়াতের ভাড়া মাত্র তিন আনা।

আড়গড়ার কথা।

বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রবর্ত্তন ফলে আড়গড়াওয়ালা-দের বিশেষ ক্ষতি হইল। যেখানে ভাল ভাল গাড়ী ও ঘোড়া বেশীরভাগ মাসভাড়া দিবার জন্য রাখা হইত, সেই সকল স্থানকে আড়গড়া বলা হইত। সেকালে কুক কোম্পানি, হার্ট ব্রাদার্স, ভেলাণ্ট কোম্পানি, ব্রাউন কোম্পানি প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় কোম্পানির প্রসিদ্ধ আড়গড়া ছিল। ঐ সমস্ত কোম্পানি গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবসায় করিয়া, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ওয়েলার ঘোড়ার আমদানি করিয়া বিস্তর লাভ থাইত। ইলেক-ট্রিক ট্রাম হওয়াতে তাহাদের লাভে বিশেষ আঘাত পড়িল। ঘোড়ার ট্রাম অপেক্ষা ইলেকট্রিক ট্রাম বেশ নিয়মিত চলাতে এবং দুই শ্রেণীর গাড়ী থাকাতে আফিসের সাহেব ও বাবুরা ট্রামেই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার উপর যখন সহস্র সহস্র মোটর গাড়ির আমদানি হইল, তখন আর আড়গড়াগুলি দাঁড়াইতে পারিল না। ভেলাণ্ট কোম্পানি তো উঠিয়া গেল। মিণ্টন কোম্পানি ভেলাণ্ট কোম্পানির ব্যবসায় কিনিয়া লইয়া অনেক দিন গাড়ী-ঘোড়ার আড়গড়া চালাইয়া শেষে মোটর গাড়ীর ব্যবসায় ধরিল। কুক কোম্পানি ও হার্ট ব্রাদার্স তাহাদের গাড়ীঘোড়ার আড্ডা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে সরাইয়া যথাক্রমে পার্ক ষ্ট্রীটের শেষে পূর্ব্বকোণে এবং বালিগঞ্জে উঠাইয়া লইয়া গেল। কুক কোম্পানি তদুপরি মোটর গাড়ি ও মোটর ট্যাক্সির ব্যবসায় আরম্ভ করিল। বহু পুরাতন ব্রাউন কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম পড়িয়া গিয়াছিল—তাহার ব্যবসায় এক ভট্টাচার্য্য ও তাহার ভ্রাতা কিনিয়া লইয়াছিলেন।

উপরোক্ত কোম্পানিগুলির কল্যাণে নির্দ্দিষ্ট দিনে—যে যে দিন তাহারা গাড়ীঘোড়া নীলামে বিক্রয় করিত—ধর্ম্মতলার পশ্চিম মোড় হইতে চাঁদনীবাজার পর্য্যন্ত 'মালুম' দিত যে এখানে গাড়ীঘোড়া বিক্রয় হয় বটে। বিশেষত কুক কোম্পানির আড্ডায় আরব্য ঘোড়া ও ওয়েলার ঘোড়া বিস্তর পাওয়া যাইত, এবং হার্ট ব্রাদার্সের আড্ডায় দেশী মজবুত ঘোড়া বিস্তর পাওয়া যাইত। ঐ কয়টী কোম্পানি সাহেব দালাল ও জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকদিগকে তাঁহাদের প্রয়োজনমত গাড়ী-ঘোড়া ভাড়ায় দিত। দেশীয় সাধারণ লোকদের আবেদনে তাহারা বড় একটা মনোযোগ দিত না। এই সমস্ত আড়গড়া হইতে যখন নূতন নূতন ঘোড়াকে রকম-

বেরকমের গাড়ীতে জুতিয়া "ভাঙ্গবার" জন্য বাহির করা হইত এবং দশ বারো জন সহিস সেই গাড়ীতে উঠিয়া ময়দান আর সহরের বড় বড় রাস্তার ভিতর দিয়া এক-টানে পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঘুরাইয়া আনিত, তাহা দেখিবার উপযুক্ত এক দৃশ্য ছিল।

দেশীয় আড়গড়া।

সেকালে একটা ঘোড়া মাসভাড়ায় লইলে ৭০, ৭৫৲ টাকা পড়িত। সকালে ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সেই ঘোড়া খাটাইতে পারা যাইত। ইংরাজ কোম্পানি যে সমস্ত গাড়ীঘোড়া দিত, তাহাতে সম্ভ্রম বজায় থাকিত— সেগুলি ঠিক ঘরের গাড়ী বলিয়া চলিত। কিন্তু দেশীয় আড়গড়া হইতে যে সমস্ত গাড়ীঘোড়া দেওয়া হইত, তাহা দ্বারা সম্ভ্রমও বজায় থাকিত না, আর কাজেরও বিশেষ ক্ষতি হইত। এই প্রকার ব্যবহারে ব্যবসায়েরও যে মহাক্ষতি হইত, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেন না। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে যে ব্রাউন কোম্পানি ছিল, সেটী 'ফেল' হইতেই আমারই সহপাঠী এক ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভাই সেই ব্যবসায়টী কিনিয়া লইলেন। আমার একবার মাসভাড়ায় গাড়ীঘোড়া দরকার হওয়াতে খোঁজ করিয়া দেখি যে, সাহেব কোম্পানিরা ১৫০৲ টাকার নীচে নামে না, আর আমি বাঙ্গালী বলিয়া আমার কথায় বড় বেশী কর্ণপাতই করিল না। তখন অগত্যা সহপাঠী বাঙ্গালীর আড়গড়ায় গেলাম। অনেক আদর আপ্যায়নের পর কাজের কথা আসিল। বন্ধুটী আমাকে একটী ব্রুহাম গাড়ী ও তদুপযুক্ত একটা ঘোড়া দিতে স্বীকার করিলেন মাসিক ৭৩৲ টাকা ভাড়ায়। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। কিন্তু তাহার পর যখন চালাইয়া পরীক্ষার সময় আসিল, তখন ঘোড়াটী মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধুর কাছে নালিশ করিলে তিনি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আর একটা ঘোড়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারও অবস্থা পূর্ব্বেরই মত। মাস-ভাড়াটী বন্ধু যথারীতি অগ্রিম লইয়াছেন কাজেই আমি তাঁহার হাতে। ঘোড়াগুলির এপ্রকার দুর্দ্দশার কারণ সহিসকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, খরচ বাঁচাইবার জন্য বন্ধুটী তাহাদের আহার্য্য দানাপ্রভৃতি অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়া ঘোড়াগুলিকে কঙ্কালসার করিয়া তুলিতেন, তাই তাহারা চলিতে পারে না। এই প্রকারে তাঁহারা ব্যবসায়ের মূলনীতির বিরুদ্ধে চলিয়া চটপট ফেল হইলেন।

বিলাতযাত্রার পুরাতনী।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

সাহিত্যক্ষেত্রে, বাঙ্গালা শিক্ষাবিচারে ও সমাজসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় আর একটী আদর্শকে আমরা দেখিয়াছি, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহার রচিত প্রথম ভাগ হইতে আমাদের শিক্ষা আরম্ভ, তাঁহারই রচিত 'সীতার বনবাস' পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হই, তাঁহারই রচিত উপক্রমণিকা পড়িয়া সংস্কৃত ভাষার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়, তাঁহারই রচিত ব্যাকরণকৌমুদীর চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়া এল-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত আর একটু জ্ঞান লাভ করি; এবং বি-এ পরীক্ষায় তাঁহারই সম্পাদিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" পাঠে সংস্কৃত নাটকের মাধুর্য্যের প্রথম আস্বাদন হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন বাঙ্গালা শিক্ষাবিভাগের ও সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় দৃঢ় করিবার জন্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ-ভ্রমণ ভিন্ন মনের সঙ্কোচ ঘুচে না। পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়, চোখে না দেখিলে তাহা বুঝান কঠিন। রাজা সেই সজীব দেশে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম পদবিক্ষেপ করেন এবং বিদেশযাত্রার বর্ত্তমান যুগের তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। তাহার পর যান রাজার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়। তিনি প্রথমবার নিজের খরচে দুইজন মেডিকেল কলেজের ছাত্রকে বিলাতে লইয়া গিয়া শিক্ষা দান করিতে চাহেন। কিন্তু সে বার কেহ রাজি হয় নাই। দ্বিতীয় বার বিলাত-যাত্রার সময় আবার তিনি ঐরূপ প্রস্তাব করেন। এইবার তাঁহার চেষ্টা সার্থক হয়। ১৮৪৫।৮ই মার্চ প্রফেসার গুডিবের সঙ্গে চারিজন ছাত্র বিলাতে গমন করেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের নাম সূর্য্য-কুমার চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র শীল, প্রাণনাথ বসু, দ্বারকা-নাথ দাস বসু। দ্বারকানাথ নিজের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া যান। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে বেশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

ইহাঁদের পরে যান মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান হইবার জন্য; তিনি বিলাত হইতে আমার পিতাকে ১৮৬৩ সাল ২৬শে নভেম্বর যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

UNIVERSITY HALL
Gordon Square,
LONDON W, C,
26 November, 1863.

নমস্কার ও প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন—

কতদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি; এতদিন পর্য্যন্তও তাহার উত্তর দিতে পারি নাই, এজন্য লজ্জিত

হইয়াছি। এখন আপনার পত্র খুলিয়া দেখি, তাহা কত প্রণয়পূর্ণ ও মধুরভাব পূর্ণ রহিয়াছে। আপনি যেমন আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন, আমিও তেমনি আপনাদের ফিরিয়া পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, আমি আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আগামী জুলাই মাসে আমাকে আর এক পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই স্বদেশে গমন করিতে পারিব। প্রথম পরীক্ষাই কঠিন, দ্বিতীয় পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। আইন, ভারতবর্ষীয় ভাষা, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি দ্বিতীয় পরীক্ষার অন্তর্গত। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গিয়া আমার যাহা কর্ম্ম-কাজ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি সকল অপেক্ষা উচ্চ এবং যে প্রথম কয়েকজন তাহাতে ভুক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে আমার নাম পতিত হয় নাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মধ্যে আমার ইচ্ছামত গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। আমি ইচ্ছামত মান্দ্রাজ ছাড়িয়া বোম্বাই গ্রহণ করিয়াছি। যদি ফিরিয়া যাইবার সময় বাঙ্গালা হইয়া যা'তে পারি, তবেই ত আপনাদের সঙ্গে দেখা হইবে। আমি বাটী যাইবার জন্য কয়েকদিনের অবকাশ প্রার্থনা করিব, দেখি তাহা কতদূর গ্রাহ্য হয়। যখন বোম্বাই কলিকাতার সহিত রেলওয়ে লাইন দ্বারা যুক্ত হইবে, তখন তাহারা এক ঘরের মতই হইবে, এই এক ভরসা আছে। আপনি আমার উপর যে আশা-ভরসা রাখিয়াছেন তাহার অল্পাংশেরও যোগ্য হইতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিব। আপনি লিখিয়াছেন আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অগ্নি এই শীতপ্রধানদেশে শীতল হৃদয়সকলকে প্রজ্বলিত করিয়া দিবে। এ শীতল দেশ বটে, কিন্তু লোকের হৃদয়ে অগ্নির অভাব নাই। যে সকল বিষয়ে এখানকার লোকেরা শীতল ও অসার, তাহাতে ইহাদিগকে উত্তেজিত করাও সহজ ব্যাপার নয়। অনেকের ভারতবর্ষের উপর নিতান্ত সাধুভাব, কিন্তু ভারতবর্ষের বিষয়ে তত্ত্ব রাখে এমন লোক অতি অল্প। ইংলণ্ড যদিও স্বাধীন দেশ, কিন্তু রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এমন লোক অপেক্ষাকৃত বিরল। উচ্চশ্রেণীর লোক যেমন উচ্চ ও সৌভাগ্যশালী, নীচ শ্রেণীর লোকেরা তেমনি নীচ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সুখ-দুঃখ উন্নতি-দুর্গতি অল্লাধিক সকল দেশেই মিশ্রিত, কিন্তু এ দেশ হইতে আমাদের ইউরোপের সভ্যতা-ভব্যতা অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। আমরা আমাদের দেশের প্রস্তরের মৃতভাব হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করি, তাহাতেই যখন আমাদের জীবনের স্রোত ফিরিয়া যায়, তখন ইউরোপে আসিয়া জীবিত লোকদিগের জীবিত ভাবের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়া আমরা কত শিক্ষা ও উন্নতি লাভ করিতে পারি। আমার মনে ছিল, যদি আমাদের মধ্যে একজন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমার দেশের শত শত পরিবার আপনাপন পুত্রদিগকে এখানে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রেরণ করিবে। আমার এই আশা কতদূর পর্য্যন্ত সফল হইবে বোধ করেন? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কি ইংলণ্ডে আসিবার এখন উদ্যোগ করিতেছেন না? ইংলণ্ড যে সিভিল সার্বিশ পরীক্ষার একমাত্র স্থান, ভারতবর্ষে পরীক্ষা দিবার যো নাই, এ নিয়ম কাহারও কাহারও মনে কঠিন বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে করিতে পারিবেন ইংলণ্ডে না আসিলেই বা আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা কি প্রকারে হইবে? যাহার মনে স্বাধীনতার অঙ্কুর নিহিত আছে, তাহার সে অঙ্কুর এদেশে আসিয়া প্রস্ফুটিত হইবে। আমাদের দেশের যে সকল অভাব যে সকল দুর্গতি, তাহার উপর যাহার চক্ষু ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে, এখানে আসিয়া তাহার সে চক্ষু একেবারে উন্মীলিত হইবে। দেশের মঙ্গল ও উন্নতিবিধান করিবার যাহার বাসনা আছে, তাহার সে বাসনা এখানে থাকিয়া শতগুণে প্রবল হইবে। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় চরিত্রের উপর যাহার বিদ্বেষ ও অসন্তোষ আছে, তাহা এখানে আসিলে সম্পূর্ণ দূরীকৃত হইবে। ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আপনি এখন কেমন আছেন, আপনারা ও ব্রহ্মানন্দ এখন কি করিতেছেন। সকল বিস্তারপূর্ব্বক লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রবাবুর এ আশা পূর্ণ হইয়াছিল। মনমোহন ঘোষ সত্যেন্দ্রবাবুর সহযাত্রী ছিলেন; তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত ও আনন্দমোহন বসু তাঁহার অনুগামী হইয়া এদেশে ফিরিলেন; এবং আমাদের দেশকে আইনে বিদ্যাবত্তার প্রভাবে আরও উন্নত করিয়া তুলিলেন। তারকনাথ বিলাতভ্রমণে যে উদারতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ফল শেষ বয়সে তিনি সর্ব্বস্ব-দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার বিপুল অর্থ বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠায় দান করিয়া গেলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিলিয়ান পরীক্ষা দিবার জন্য এ দেশ হইতে যাত্রা করিলেন। ১৮৭১ সালে ৭ই জুন তারিখের গেজেটে তাঁহাদের নাম পরীক্ষোত্তীর্ণ সিভিলিয়ান বলিয়া বাহির হইল। রমেশচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর

হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র বিদ্যার্থী হইয়া প্রতিবৎসর বিলাতে আমেরিকায়, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সে যাইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। রমেশচন্দ্র নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে, নিজের দেশের ধর্ম্মকে, নিজের তাঁবাকে, নিজের দেশের প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্যকে এক দিনের জন্য ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার রচিত এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ, তাঁহার বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত মূল ঋগ্বেদ ও তাহার অনুবাদ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ মোক্ষমুলারকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা নিজে লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া স্বাধীনতার যে ছবি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, উহা তাঁহার হৃদয়কে এত অনুবিদ্ধ করিয়াছিল যে তিনি এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পথ প্রদর্শন করিলেন এবং সমগ্র ভারতব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে বিলাতপ্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিলেন। বিলাতপ্রত্যাগত অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় হাতে কলমে—কেবল বক্তৃতায় নয়—দেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম যে বাহির হইতে আলোক আনিতে হইবে; বিদেশযাত্রা যদি ভাগ্যে না ঘটে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মগত ভাব ও আচার-অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে; এইরূপে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া জীবনকে আরও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কাহাকেও পরিবর্জ্জন নহে, কিন্তু সকলের সহিত মিলিয়া ধীর ও শান্তভাবে দেশের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, ধর্ম্মের সংস্কার সুসম্পন্ন করিতে হইবে; এইরূপে ভারতবর্ষকে নবভাবে দীক্ষিত, গৌরবান্বিত ও জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। জাগরণ চাই, আত্মমর্য্যাদা-বোধ চাই, দেশের মর্য্যাদা বুঝিবার অনুভব শক্তি চাই, আমরা যে ভারতবাসী, এভাব ব্যক্তিগত ভাবে জাগাইয়া তোলা চাই, বিলাস ও বিদেশীয় অসঙ্গত অনুকরণ পরিহার করা চাই, তবেই আমরা মিলিতভাবে একদিন জাগিয়া উঠিব।

Selections from the "Hinduism"

OF SJ. SUKUMAR HALDAR.

Hinduism, vicissitudes of—There are many indications which cannot be mistaken, that it (Hinduism) has undergone at different periods important alterations in both form and spirit.

Essays on the Religion of the Hindus Vol. II by Prof. H. H. Wilson,

Hindus before Manu Sanhita—We find the Hindus, at a period anterior to the institution of the caste system by the Indian Law-giver, a highly intellectual race, enjoying all the comforts and conveniences of an enlightened community; and paradoxical as it may appear, combining, in their daily life, a minimun of luxury with a maxinum of simplicity. We find them thoroghly religious, strictly sober, honest, peaceful, and charitable to a proverb. Even in open warfare, we find them observing an amount of fairness and justice which contrasts strikingly with the perfidious diplomacy which is the standing shame of modern civilised states. The contending belligerents, naturally agreed, on the eve of a srtuggle, to take no undue advantage of weapons or of odds, to attempt no surprises or ambuscades; they agreed upon themselves the time, the place and the manner of fighting, and faithfully observed the terms of a truce or a treaty. They were strictly methodical in their daily life, and spent several hours in study and religious contemplation. * * * Perhaps the most remarkable, and certainly the most wonderful, feature of the early civilisation of India was the co-existence of the apparently incongruous elements of extreme simplicity and high enlightenment.

Hindu Women before the Manu Sanhita—Women in those days, were not, as they are now, pent up within the four walls of the Zenana, but enjoyed every privilege in common with their partners. "Where women are dishonoured, all religious acts becomes fruitless," says the Law.

Military Science of the Ancient Hindus—All who read the ancient Hindu works on military science, such as the *Danda-niti*, cannot fail to be struck with the knowledge they possessed of the noble game of war.

It has even been satisfactorily proved that they knew the component parts of gunpowder, and made use of firearms, repeated allusion to which occurs in the epics. But they were accessible only to a limited few ; the multitude looked up to the *agni-vanas* as gifts from Heaven.

The Bengal Magazine, March 1881 and Isis Unveiled Vol. I. Ch. 14.

Hindus as found by the Greeks—The Hindus, it is evident, had still some virtues to show when the Greeks visited India.

Arrian speaks of them as brave soldiers, and represents them as sober, moderate and peaceful. They were held to be good farmers.

Strabo says, they were so honest as neither to require locks to their doors, nor writings to bind their agreements.

Hindus, of a century ago—Elphinstone, as a representative of the Anglo-Indian bureacracy, has many bad things to say of the Hindus. But he has the frankness to declare that their moral character—at all events, one prominent aspect of it—is far superior to that of the natives of Britain. He says—"It can scarcely be expected, from their climate and its concomitants, that they should be less licentious than other nations ; but if we compare them with our own, the absence of drunkenness and of immodesty in their other vices, will leave the superiority in purity of manners on the side least flattering to our self-esteem."

"Missionaries of a different religion, Judges, Police-Magistrates, officers of revenue or customs, and even diplomatists, do not see the most virtuous portion of a nation, nor any portion, unless when influenced by passion, or occupied by some personal interest." (History of India p. 214.)

Bishop Heber entertained what he himself called "a very favourable opinion" of the modern Hindus.

Niebuhr, who visited India a hundred and twenty years ago records his impression that the Hindus were "gentle, virtuous and laborious, and that perhaps of all men they were the ones who sought to injure their fellow-beings the least." Journal of the National Indian Association, June 1889.

Professor Monier Williams—I have found no people in Europe more religious—none more patiently persevering in common duties, none more docile and amenable to authority, none more dutiful to parents, none more faithful in service. * * * I doubt, however, whether the worst Indians are so offensive in their vices as the worst type of low, unprincipled Europeans. * * * They show greater respect for animal life than Europeans. They have more natural courtesy of manners, more filial dutifulness, more veneration for rank, age and learning and they are certainly more temperate in eating and drinking. (Modern India and the Indians, p. 88 and p. 128)

—

নিবেদন

(শ্রীপ্রিয়নাথ সেন গুপ্ত)

চোখে যখন আস্‌বে আঁধার
দিও তোমার আলো
করুণ আঁখি মেলো।

ক্ষুব্ধ মনের হাহাকারে
স্তব্ধ হ'য়ে রইব পড়ে
দিও তখন পরশ
করো শান্ত সরস।

দুঃস্বপনে গভীর রাতে
আঁখির পাতা উঠবে তিতে
তখন তুমি নাথ
এস শান্তি সাথ।
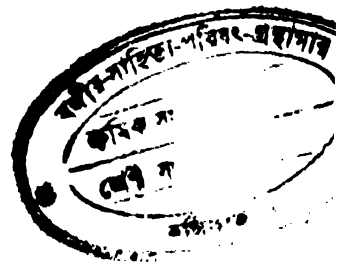
বিশ্বে যখনি সোহাগ-বাতি
জলবে কেবল হাস্য-ভাতি
রবে না মোর ঠাঁই
(তখন) তোমায় যেন পাই।
অভাজনের এ নিবেদন
করবে তুমি করবে পূরণ
এই মিনতি আজ
ওগো বিশ্বরাজ।

——

সংস্কার।

(শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়)

জীবমাত্রকেই জগতে থাকিতে হইলেই এক একটা দল বাঁধিয়া থাকিতে হয়। ইহা নিকৃষ্ট জীব পশুপক্ষীর পক্ষে যেরূপ সত্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পক্ষেও সেইরূপ সত্য। বাস করিবার গৃহ বা বাটি যেরূপ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার ও আলোবাতাসযুক্ত করা উচিত, যে সমাজে বা সমষ্টির মধ্যে বাস করা যায় তাহাকেও সেইরূপ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও উচিত। গৃহকে যেমন স্বাস্থ্যকর করিতে হইলে তাহার আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিয়া পুরাতন ও ভগ্নস্থানগুলিকে মেরামত করা ও প্রয়োজনমত নূতন জানালা-দরজা বসান দরকার, সেইরূপ সমাজের মধ্যে কালের চক্রে যে সব কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনা জমা হয়, তাহাকে দূর করিয়া, কোথাও বা নব নব চিন্তাধারার প্রবেশপথ করিয়া দিয়া ও কোথাও বা স্বেচ্ছাচারিতারূপ রন্ধ্রপথ বন্ধ করিয়া দিয়া, জগতের সঙ্গে চলিবার উপযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। নিজের বা দুই-চারজন আত্মীয়ের অসুবিধা হইতেছে বলিয়াই যদি কোনও একটি আচার বা নিয়মকে আমরা অযথা বাতিল করিতে থাকি, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমরা সকল সুনিয়মভ্রষ্ট হইয়া স্বেচ্ছাচারিতার গণ্ডীতে ঝাঁপাইয়া পড়িব। অন্যদিকে যদি কেবল ভাবপ্রবণতার বশে বা পুরাতনের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কোনও অন্যায় বা কুনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান না করি, তাহা হইলেও আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব এবং এই উভয় পথই সমাজের স্বাস্থ্যের ভীষণ শত্রু। সমাজসংস্কার করিতে হইলে ভগবদ্‌বিশ্বাসী, ত্যাগী ও সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজ যে পথে চলিয়াছে তাহা যে ধ্বংসের পথ, ইহা অনেকেই বুঝিয়াছেন এবং সংস্কারেরও যে অল্প-বিস্তর চেষ্টা হয় নাই ইহাও বলা যায় না, তবে তাহা এত ক্ষীণ ও অধিকাংশই এত ভ্রান্তিতে ভরা যে তাহার দ্বারা অতি অল্প উপকারই লাভ হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে অপকারও যে হয় নাই তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আমাদের সমাজভিত্তির তলদেশ পর্য্যন্ত জড়াইয়া গিয়াছে। ইহা দূর করিবার জন্য মহাত্মা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির মত শক্তিপরায়ণ, সহিষ্ণু ও সত্যাগ্রহীর প্রয়োজন। তবে যতক্ষণ তাঁহাদের মত লোকের সাক্ষাৎ পাইতেছি না, ততক্ষণ সাধ্যমত আমাদেরই, তাঁহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। 'সু এবং সত্য চিরকালই জয়লাভ করে, কিন্তু অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া' এই কথাটি আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। মুক্তাত্মা বুদ্ধদেব যে দিন 'নির্ব্বাণের' পথ আবিষ্কার করিয়া সমগ্র মানবকে সেই অমৃত বিতরণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিবার কত উপাদানই না সংগ্রহ হইয়াছিল। যেদিন মহাত্মা রামমোহন ঋষিদের যুগ-যুগান্তের ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর তপস্যার ফল উপনিষদের অমৃতময় বাণী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তিনি কি ব্যবহার তাঁহার দেশবাসীর নিকট (যাহাদের হিতের জন্য তিনি কত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন) পাইয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই অবগত আছেন। ভয় লইয়া কোনও কালে কোনও শুভ কার্য্যই সম্পাদিত হয় নাই। নির্ভয় হইয়া সকল লাঞ্ছনা, সকল ব্যঙ্গোক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এই নবীনের দলকেই এই কার্য্যে নামিতে হইবে। প্রত্যেক সৎকার্য্যেই ঈশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশীর্ব্বাদ আছে, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমাদের সমাজকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য-ঋষিগণ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যেই আভিজাত্যাভিমানী কতকগুলি লোক নিজেদের শ্রেষ্ঠতা ও জাত্যাভিমান বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি মিথ্যা আচার ও নিয়ম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, ফলে সমাজের মধ্যেও গ্লানি ও আবর্জ্জনা জুটিয়া গিয়াছে। সমাজকে শুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ ধর্ম্মকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ আমরা "ছুৎমার্গের" কথা উল্লেখ করিতে পারি। যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইতেছে যে অণু-পরমাণু সকলেই সেই বিশ্বস্রষ্টার অংশ সেই ধর্ম্মে তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের বিরুদ্ধে এতবড় ঘৃণা থাকিতেই পারে না যে, একজন মানুষ আর এক জন মানুষকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইয়া যাইবে। যে মহাত্মাদের বাণী এই যে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত সেই ভূমারই অংশ—অতএব ঘৃণ্য নহে, তাঁহাদের লেখনী যে মানুষকে এত [illegible] রূপে প্রচার করিতে পারে না, একথা [illegible]

আমাদের মনে হয় না। আমরা মিথ্যাকে পূজা করিয়া করিয়া এমনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছি যে, এই কুসংস্কার-গুলি আমাদের কি সর্ব্বনাশ যে করিতেছে তাহাও ভাবিবার শক্তি নাই। এখন একমাত্র সেই পরমপিতার দয়াই আমাদের সম্বল, তিনিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি ও শক্তি দান করুন।

প্রার্থনা

(শ্রীপ্রিয়নাথ সেন গুপ্ত)

অন্ধকারে খুঁজে মরি যবে চারিধার
অন্ধ হ'য়ে আসে আঁখি নাহি দেখি আর।
উজল প্রদীপ তখন ধরো তুমি তুলে,
উজলিয়া চারিদিক পথ দিয়ো খুলে।
অতীত ব্যথার কথা যবে আমি স্মরি,
অনুক্ষণ হিয়া মোর উঠে জরজরি'
মূর্চ্ছিত হৃদয় যবে এ দেহ অবশ,
বুলায়ো তখন তুমি সান্ত্বনা পরশ।
ঘনঘটা করি যবে আসে মোর সাঁঝ,
অলক্ষ্যে শুভদৃষ্টি দিও তার মাঝ।

ধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিক।

(শ্রীমনমোহন চক্রবর্ত্তী)

কোন কিছু জানা এবং কোন কিছু হওয়া এক দিকের কথা হইলেও দুইটী কথা ঠিক এক নহে। মা না হইয়া কোন নারী মাতৃস্নেহের যথাসম্ভব অনুভূতি অথবা জ্ঞান লইয়া শিশুপালন করিতে পারে এবং ভালবাসিতেও পারে, কিন্তু মা হইয়া যাহা মা পারেন, তাহার সঙ্গে তুলনা হয় না। সুতরাং উভয় এক জিনিষ নয়। মাতৃনারীর সহিত গর্ভস্থ ভ্রূণের একত্ব সম্বন্ধ ধরাবক্ষে আগমনের দিনে ছিন্ন হইলেও তাহা বিযুক্ত হইয়াও মাতা ও সন্তানের চির অবিচ্ছিন্ন স্নেহধর্ম্মে চিরযুক্ত। ইহার প্রকৃত কঠোর পরীক্ষা মায়ের সম্মুখে তাহার সন্তানবিয়োগে। মা না হইয়া মাতৃত্বের জ্ঞান লইয়া আত্মীয়ের সন্তান পালন করিলেও পালিত সন্তানের শোক আর গর্ভজাত সন্তানের শোকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এখানে মাতৃস্নেহের অনুভূতি আর মা হওয়া, এই দুয়ের তারতম্য সুস্পষ্ট অনুভবের বিষয়।

কোন বস্তু বা বিষয়কে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূলে বা তত্ত্বে প্রবেশ করিলে সেই বস্তু বা বিষয়কে জানার অর্থ কিছু পরিমাণে তাহার স্বরূপ লাভ করা বুঝাইতে পারে মাত্র কিন্তু ঠিক তাহা হওয়া বুঝায় না। ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ধর্ম্মের তত্ত্ব বহুলোক জানে, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, বুদ্ধি-বিচারসহকারে ব্যাখ্যা করিয়া লোককে উদ্‌বুদ্ধও করে, কিন্তু তাহা হইলেও সে লোক ধার্ম্মিক হইল এমন কথা বলা চলে না। তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞ অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বলিতে পারা যায়। ধার্ম্মিক বলিতে বুঝিতে হইবে, ধর্ম্মই প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে যার। জলের প্রকৃতি যেমন শীতলতা, ফুলের প্রকৃতি যেমন কমনীয়তা, অগ্নির প্রকৃতি যেমন উষ্ণতা, তেমনি ধার্ম্মিকের প্রকৃতি সত্যাশ্রয়িতা, দয়া এবং ক্ষমা। সত্যেতে ধর্ম্মের উৎপত্তি; এই সত্য হইতে সরলতা, পবিত্রতা, সাহসিকতা এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রভৃতি একে একে ধর্ম্মের বহু লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়া যে মানুষকে আশ্রয় করে, তাহারই ধার্ম্মিক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা—দয়াতে ধর্ম্মের আর একটী প্রকাশ। ইহা আর একটী প্রকৃতি। এই দয়ার বহু মূর্ত্তি। প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, করুণা, সহানুভূতি ও সমবেদনা দয়ারই বিভিন্ন প্রকাশ। এই দয়াতেই ধর্ম্মের বৃদ্ধি। তৃতীয় কথা ক্ষমা। ক্ষমা ধর্ম্মের আর এক প্রকৃতি অথবা স্বভাব। ধর্ম্ম আছে কিম্বা কেহ ধার্ম্মিক হইয়াছে, অথচ ক্ষমা নাই, ইহা বিসদৃশ। ক্ষমাতেই ধর্ম্মের স্থিতি। ক্ষমাবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে, দুর্ব্বল, দুঃস্থ, দুঃখী, নরনারীর ভ্রম-প্রমাদ, অবশ্যম্ভাবী শোক-তাপ এবং অপরাধের বিষয়ে কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতাকেই ইহার মূলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সূত্রে খৃষ্টের ঐ বড় উপদেশের কথা প্রাণে জাগে—"পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" এই ঘৃণারাহিত্যের মূলে মানুষের ক্ষমাবৃত্তির কথাই প্রকাশিত। চতুর্থ কথা—অসত্য, অক্ষমা এবং অপ্রেম অথবা নির্দ্দয়তাতেই ধর্ম্মের প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া যায় কিম্বা ধার্ম্মিকের পতন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

সুতরাং এই তিনটী প্রকৃতি বা তিনটী বৃত্তির বিশ্লেষণে ইহাই বুঝি, যে কোন অবস্থাতেই হউক ধার্ম্মিক কখনও সত্যের অপলাপ করিতে পারেন না। ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, বাক্যে কিম্বা নীরবতায়, কর্ম্মে কিম্বা চিন্তায় অসত্য কিছু করিতে পারেন না। ধর্ম্মজ্ঞ যিনি, তিনি সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত নন, সত্যাভিভূত নন, তিনি দুর্ব্বল, নিরাশ্রয়, সংসারের বিপদ-বিভীষিকায় পড়িয়া কখনো কখনো তাঁহাতে সত্যের অপলাপ সম্ভাবনা আছে। ধার্ম্মিকের দয়া স্বাভাবিক, সে দয়ার ভিতরে বিচারবুদ্ধি নাই। শিশুসন্তান জননীসন্নিকটস্থ হইলে জননীর স্তন্য-পীযূষ যেমন স্বতই ক্ষরিত হয়, ধার্ম্মিকের সম্মুখে, আর্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত ও দুঃস্থ উপস্থিত হইলেও তেমনি তাঁহার দয়াবৃত্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞের পক্ষে ইহা বিচারাধীন বিষয়। অনেক স্থলে

লইয়া, অনেক অনুসন্ধানান্তে তাঁহাকে দয়াবৃত্তির কার্য্য করিতে হয়। তাঁহার ভিতরে আত্মপ্রসাদই বা কোথায়? ধার্ম্মিকের প্রকৃতি ক্ষমাতেই স্থিতি করে। ধর্ম্মের ইতিহাস ক্ষমাধর্ম্মের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। দুর্ব্বল মানবের অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ধার্ম্মিকগণ অনায়াসে এবং অক্লেশে অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া ফেলিতেছেন। প্রাণের ভিতরে ইহাতে দ্বিধা অথবা বিতর্ক আসে না। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞের পক্ষে ইহা কথঞ্চিৎ সত্য ও সম্ভব হইলেও ধার্ম্মিকের ক্ষমার আদর্শ তিনি সম্যক্ অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিছুতেই তাঁহার সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন না; যদি কখনও বা অসম্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হইবে, তাহার ধার্ম্মিকতার মূলে ষোল আনা খাঁটিত্ব ছিল না। ধর্ম্মজ্ঞের পক্ষে সত্য হইতে পতনের পিচ্ছিল পথ সম্মুখে অনেক পরিমাণে প্রসারিত।

সংক্ষেপে এখানেই প্রবন্ধের সমাধান। জানার ভিতর দিয়া গেলে কতদূর যাওয়া যায়, হওয়া যায়, তাহা বুঝা গেল; কিন্তু ভগবান প্রাণে আসিয়া যখন সব করান তখনি গোল মিটিয়া যায়। যাহা করা যায় তার ভিতরেই সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রকাশিত; ধার্ম্মিকের স্বভাব বিভাসিত। ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া পথে বসিয়া আমরা যেন ধার্ম্মিকের আখ্যায় আর আত্মপ্রবঞ্চিত না হই।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

দেশমল্লার—তেওরা।

হৃদয়-কমল কে ফোটাবে—কে ফোটাবে?
—দীপ্ত প্রেমের তপন যে জন সেই ফোটাবে—সেই ফোটাবে!
তাঁরই অমল চরণ-পাতে হৃদয়-কমল ফুট্‌বে প্রাতে
স্পর্শে তাঁহার এই আবরণ, সেই টুটাবে—সেই টুটাবে।
এখন যে এই দুঃখ-নিশা কে ঘুচাবে—কে ঘুচাবে?
অশ্রুজলের বন্যাধারা কে মুছাবে —কে মুছাবে?
করিস্ নে ভয় মন রে আমার কাট্‌বে রে তোর দুখের আঁধার
ফুট্‌বে কমল অমল প্রাতে
তারে গন্ধে-শোভায় —সেই লুটাবে—সেই লুটাবে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি —শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মমা মা -রা। মা -পা। না -র্সা I নর্সা -র্রা র্সা। ণধা -পধা। পাঃ -রঃ I
হৃ দ য় ক • ম ল্ কে• • ফো টা• •• বে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রাঃ -পঃ মা। মগা -রগা। রা -া I না -া না। না -র্সা। র্সা -া I
কে • ফো টা• •• বে • দী • প্ত প্রে • মে র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সরা র্সরা ণা। ধা -া। পা -া। রা মা রা। মা -পা। ধা -ণা I
ত• প ন যে • জ ন সে ই ফো টা • বে •

১´ ২ ৩
I ধণা -র্সা ণা। ণধা -পধা। পা -রা II
সে• ই ফো টা• •• বে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
[র্রা -া]
II { না -া না। না -া। র্সনা -ধপা I না না -র্সা। র্সা -া। নর্সা -র্রা I
তাঁ র ই অ • ম• • ল্ চ র ণ পা • তে• •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ৩
I র্সা ণা -া। ধা -া। পা -ধা I মপা নর্সা র্রা। র্রা -া। (র্মর্জ্ঞা -া)} I র্রা -া II
হৃ দ য় ক ম ল ফু• •ট্ বে প্রা • তে • • তে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I না -া না। না -র্সা। র্সা -া I নর্সা -র্রা র্সা। ণধা -পধা। পা -া I
স্প • র্শে তাঁ • হা র্ এ• ই আ ব• •• র ণ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা মা রা। মা -পা। ধা -ণা I ধণা -র্সা ণা। ণধা -পধা। পা -রা II
সে ই টু টা • বে • সে• ই টু টা• •• বে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা মা -া। গা -া। রা -া I রা -া রা। রা -া। রা -া I
এ খ ন্ যে • এ ই দুঃ • খ নি • শা •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -মা মা। মগা -রগা। রা -া I রা -পা মা। মগা -রগা। রা -া I
কে • ঘু চা• •• বে • কে • ঘু চা• •• বে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা -া রা। মা -পা। ধা -ণা I ণা -া ণা। ণাঃ -ধঃ। র্সণা -ধপা I
অ • শ্রু জ • লে র ব • ন্যা ধা • রা• ••

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -ধা মা। পমা -মগা। গা -া I ণধা -পমা মা। মগা -রসা। রা -া II
কে • মু ছা • • বে • কে• •• মু ছা• •• বে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
[র্রা র্রা -না]
II {না না -া। না -া। র্সনা -ধপা I ধনা -র্সর্রা র্সা। না -র্সা। র্সা -র্রা I
ক রি স্ নে • ভ• • য় ম• • ন্ রে আ • মা র্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ৩
I র্সা -া ণা। ধা -া। পা -ধা। মা পনা -র্সর্রা। র্রা -া। (র্মর্জ্ঞা -া)} I র্রা -া I
কা ট্ বে রে • তো র দু খে• • র্ আঁ• ধা • র্ ধা র্

১´ ২´ ৩ ১´ ২ ৩
I না -া না। না -র্সা। র্সা -া I র্সরা র্সর্রা -ণা। ধা -া। পা পপা I
ফু ট্ বে ক • ম ল্ অ• ম ল্ প্রা • তে তারে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -ধা মা। গা -া। রা -া I রা মা রা। মা -পা। ধা -ণা I
গ • ন্ধে শো • ভা য় সে ই নু টা • বে •

১´ ২ ৩
I ধণা -র্সা ণা। ণধা -পধা। পা -রা IIII
সে• ই নু টা• • • বে •

তর্পণতত্ত্ব।

—ooo—

চন্দ্র ও পিতৃলোক।

"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ" রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না রত্নই সকলের অন্বেষণের বস্তু। সত্যের পক্ষেও এই কথা খাটে; সত্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করে না, অনেক যত্ন ও অনুসন্ধানের ফলে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সত্যের জন্য মানবের আগ্রহ এমনি যে, এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আপনার যত্ন ও চেষ্টায় যুগে যুগে মানব যে কত গুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! কালের স্রোতে কত আবিষ্কৃত সত্য অন্তর্হিত হইয়াছে এবং কত নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; পুরাকালে যাহা জানিত, হয়ত একালে আমরা তাহা হারাইয়াছি, আবার একালে আমরা যাহা জানি, হইতে পারে, তাহার অনেক সেকালে অবিদিত ছিল। অনেকের ধারণা এই যে বর্ত্তমান কালেই বুঝি বিজ্ঞান নূতন সত্যসমূহ আবিষ্কৃত করিয়া তাহার আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং প্রাচীনকাল বুঝি কেবলই কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। ইহা অমূলক। প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা যে বিজ্ঞানবলে পিরামিডের বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরগুলি যে ভাবে বসাইয়া গিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞান তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত। মৃতদেহ চিররক্ষিত করিবার উপায়ও মিশরবাসীরা না জানি কি বিজ্ঞানের বলে আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। ভারতের যোগবিদ্যা এক মহাবিজ্ঞান। মিশরে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য যে বিজ্ঞানচর্চ্চা হইয়া গিয়াছে, জীবিতের জীবন সম্বর্দ্ধণের জন্য ভারতে বিজ্ঞানের ততোধিক সাধনা হইয়া গিয়াছে। ভারতের যোগের কথা কাহারও অবিদিত নাই; প্রসিদ্ধ হরিদাস সাধু, ভূকৈলাসের যোগী ভারতের এই অবসান কালেও যোগবিজ্ঞানের কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য দিতেছেন।

আমরা এক্ষণে দেখি যে পাশ্চাত্যেরা আমাদিগের কতটুকু যশোগান করিতেছে এবং সেই টুকুর উপরেই আমাদের মতামত প্রধানতঃ নির্ভর করে। আমাদিগের শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি আচার প্রথা এবং ক্রিয়াকর্ম্মের বিষয় যতক্ষণ না পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একটা সুমীমাংসায় আসেন, ততক্ষণ আমরা তাহা কুসংস্কার বলিয়া অবহেলার চক্ষে দেখি; পরে যেই কোন জর্ম্মন-প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিত ঐ সকলের উপকারিতা বা উহাদের মধ্য হইতে কোন নিগূঢ় অর্থ প্রদর্শন করেন, অমনি আমরা তাঁহাদিগের পথানুসারী হইয়া দেশভক্ত হইয়া পড়ি। কোন দ্রব্য চক্ষের অতি নিকটে ধরিলে তাহা ভালরূপ দেখা যায় না; আমরাও এই কারণে স্বদেশের ভাল জিনিষ ভালরূপ দেখিতে পাই না, তাই প্রাচীন-কালের আবিষ্কৃত অনেক সত্য এক্ষণে লুপ্তপ্রায়;—পুরাকালের অনেক উপকারী আচার প্রথা এক্ষণে তিরোহিত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু কত যুগ যুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল দেশাচার প্রভৃতি আমাদের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, সে সকল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উহাদিগের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

হিন্দুদিগের তর্পণপ্রথা অতি প্রাচীনকালাবধি প্রচলিত, কিন্তু ইহা শীঘ্রই অন্যান্য প্রাচীন প্রথার ন্যায়, শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইবার চেষ্টা দেখিতেছে। তর্পণের প্রকৃত অর্থ আমাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন। তর্পণ প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি কেন যে করিতে হয় উহার অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি, উহা ধর্ম্মকর্ম্ম-রূপে কেনই বা দেশাচারে প্রবেশ করিয়াছে, এ সকল জানিতে না পারিলে জ্ঞানীসমাজে চিরকাল কুসংস্কার-মূলক বলিয়া অনাদৃত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।

প্রায় সকল জাতিরই মধ্যে মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার কোন না কোনরূপ রীতি আছে দেখা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি যে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শোক ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। মিশরবাসীরদিগের মধ্যে এইরূপ রীতিই ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় বা নিন্দনীয় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার মৃতদেহের গোর দেওয়া হইত না এবং মৃতদেহ গোর না দেওয়া আত্মীয় স্বজনের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ও দুঃখের বিষয় ছিল। বেদেও আমরা মৃতদেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত করিবার প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাই। সমাধি দিবার প্রথা যে শোক ও শ্রদ্ধা-মূলক, তাহা বেদসূক্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ঋগ্বেদের সংকুসুক ঋষি মৃতদেহ প্রোথিত করিবার কালে শোকার্দ্র চিত্তে বলিতেছেন;—

"হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমলস্পর্শা হয়েন।

"হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিও না * * * যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

"পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক।

তাহারা ইহার পক্ষে স্তম্ভপূর্ণ গৃহ স্বরূপ হউক ; প্রতিদিন এইস্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হউক।

"তোমার উপর পৃথিবীকে উত্থাপিত করিয়া রাখিতেছি ; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থুণা অর্থাৎ খুঁটি পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এইস্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন।

"* * * যেরূপ ঘোটককে রশ্মি দ্বারা রুদ্ধ করে তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম।"

বৈদিক যুগে যেরূপ মৃতদেহ প্রোথিত করিবার প্রথা ছিল, সেইরূপ অগ্নিদাহও প্রচলিত ছিল ; এই অগ্নিদাহই অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত ছিল। ভারতে কবর দিবার প্রথা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া অগ্নিদাহই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্ভবতঃ কবর বা সমাধি প্রথার উৎপত্তি ভারতে হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় একরূপ উহা স্বদেশ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে। হিন্দুর শ্রদ্ধা প্রদর্শনে দেহের অপেক্ষা আত্মারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তাই বোধ হয় মরণান্তে দেহ সংরক্ষণে আস্থা প্রদর্শন হিন্দুদিগের মধ্য হইতে প্রকৃত পক্ষে লোপ পাইয়াছে ; কিন্তু মৃত আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য অন্তরের নানা প্রার্থনা ও তদনুযায়ী আচরণ গুলি আজও পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

শ্রাদ্ধাদি বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্ম যেরূপ পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিশেষ অবসর, সেইরূপ প্রাত্যহিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অবসর তর্পণ। দৈনিক পালনীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের একাঙ্গমাত্র পিতৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞেরই আর এক নাম তর্পণ ;—'পিতৃ যজ্ঞস্তু তর্পণম্।' পিতৃ পিতামহ প্রভৃতির প্রতি নিত্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই তর্পণের আবির্ভাব। তর্পণের ধাত্বর্থ তৃপ্তি ; সংসারের যাবতীয় প্রাণীর তৃপ্তিই ইহার পরিধির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পিতৃগণের তৃপ্তিই ইহার মূল ও কেন্দ্রস্থল।

পিতৃগণের কথা মনে উদয় হইলেই, পিতৃগণ কোথায় এই স্বাভাবিক প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে চন্দ্রলোকের কথা আসিয়া পড়ে, কারণ পিতৃলোকের প্রথম সম্বন্ধ চন্দ্রের সহিত ;—সাধারণতঃ হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস যে চন্দ্রলোক পিতৃদিগের বাসস্থান। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস যে পিতৃপুরুষগণ মরণান্তর চন্দ্রলোকে প্রস্থান করেন। পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এ বিশ্বাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। তিনি বলেন, "পৃথিবী যেরূপ মনুষ্যের বাসস্থান চন্দ্রমণ্ডলও সেইরূপ পিতৃলোকের বাসস্থান সেই জন্যই চন্দ্রমণ্ডলের অন্য নাম চন্দ্রলোক ও চন্দ্রভুবন। সেই জন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন ;—

'চন্দ্রলোকে মহীয়তে চন্দ্রলোকং স গচ্ছতি'।" *

সম্ভবতঃ সংস্কৃতে চন্দ্র পিতৃলোক নামে অভিহিত হয় বলিয়া উক্তরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, অথবা হইতে পারে বেদসূক্তই এই বিশ্বাসের কারণরূপে বিদ্যমান। শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায় "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" "পিতৃগণের অধিষ্ঠান সোমের উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি স্বাহুতি হউক।" ইত্যাদি মন্ত্রই ঐরূপ বিশ্বাসের মূল হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু বেদমন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট না হওয়াতেই এই বিষম ভ্রমের উৎপত্তি। প্রাচীন ঋষিরা চন্দ্রসম্বন্ধে কিরূপ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া অনেকটা বুঝিতে পারি। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া একবাক্যে স্বীকার করেন, যে চন্দ্রলোকে জীবের বসতি নাই—চন্দ্র মৃত গ্রহ, এমন কি চন্দ্রে একটী প্রাণী কি তৃণ পর্য্যন্তও নাই, কেবল মৃত আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 'পুয়ে'র উক্তি হইতে নিম্নে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "The rocky and shattered soil of our satellite is perfectly bare, not a blade of grass grows there, not a flower opens. Totally deprived of water and air, life is an impossibility. A three-fold death would overtake the least animal that happened to alight there. In these cold and horrid realms of the moon everything is plunged in torpor and silence ; the echoes are mute, nothing alters the dull monotony of the heavens." "আমাদের এই চন্দ্রলোকের বিভগ্ন ও পার্ব্বত্যভূমিতে একটী পুষ্প এমন কি একটী তৃণের শীষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। জল এবং বায়ুর সম্পর্কমাত্র না থাকায়, জীবের প্রাণ ধারণ সেখানে অসম্ভব। একটী সামান্য প্রাণীও যদি সেখানে দৈবক্রমে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে অনিবার্য্য মৃত্যু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। চন্দ্রলোকের এই প্রাণহীন ভীষণ রাজ্যে সকলি মৃতবৎ নিস্তব্ধ।" এই জীবশূন্য আগ্নেয়পর্ব্বতাকীর্ণ ভীষণ মৃতগ্রহে পিতৃগণ দেহ পরিগ্রহ করিয়া বাস করেন, ইহা

* 'চন্দ্রলোকে মহীয়তে চন্দ্রলোকং স গচ্ছতি।' ইত্যাদি শ্লোকের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে অর্থে ইহার মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা ক্রমশঃ পাঠকদিগের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব।

কি প্রকারে হইতে পারে? বস্তুতঃও চন্দ্রলোকে পিতৃনামক জীবদিগের বাস নাই। প্রকৃত কথা এই যে শাস্ত্রে যে চন্দ্র পিতৃলোক নামে অভিহিত হইয়াছে তাহার অর্থ ইহা নয়, যে চন্দ্র পিতৃনামক জীবদিগের বাসভূমি; বস্তুতঃ চন্দ্র মৃতগ্রহ বলিয়াই হিন্দুরা উহাকে পিতৃলোক নাম দিয়াছেন। শাস্ত্রে যে অর্থে পিতৃলোক বলা হইয়াছে সে অর্থ না বুঝিয়া লোকে উহার সহজ সরলার্থ 'পিতৃদিগের আলয়' বলিয়া ভাবে। সংস্কৃতে পিতৃগেহ, পিতৃকানন ইত্যাদি যোগরূঢ় শব্দে শ্মশান বা প্রেতভূমি বুঝায়। পিতৃগৃহ প্রভৃতি শব্দের শ্মশান অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যদি বিশ্লিষ্টভাবে মূল শব্দার্থ ধরা যায় তাহা হইলে 'পিতৃদিগের আলয়' ইহাই বুঝায়। আর একটু বুঝাইয়া বলি;—পিতৃগেহ অর্থে শ্মশান হইল কেন? শ্মশান ভূমিতে পিতৃপুরুষগণ মরণান্তর সশরীরে বিচরণ করেন, এই অর্থে অবশ্য শ্মশানভূমির নাম পিতৃগেহ হয় নাই; মৃত পিতৃগণ শ্মশানে আনীত হইতেন বলিয়াই রূপকচ্ছলে জনশূন্য শ্মশানভূমির অন্যতর নাম পিতৃগেহ হইয়াছে। চন্দ্রও সেইরূপ জীবের আবাসশূন্য দগ্ধ শ্মশানলোক বলিয়াই রূপকচ্ছলে পিতৃলোক বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পিতৃলোক, পিতৃগেহ, পিতৃকানন ইত্যাদি শব্দগুলি শ্মশানার্থবাচক।

একপক্ষে শ্মশানলোক হিসাবে যেমন চন্দ্র পিতৃলোক পূর্ব্বে দেখা গেল, সেইরূপ আরেক পক্ষে অন্নদাতা হিসাবেও চন্দ্র পিতৃলোক শব্দবাচ্য। সংস্কৃত ভাষার একটী বিশেষত্ব এই যে ইহার একটী শব্দ কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া পরিধিস্বরূপে নানাদিকে নানা অর্থ প্রসারিত করে। পিতা পাতা বা পালনকর্ত্তা; এই অর্থে চন্দ্র ওষধিপতি হিসাবে পৃথিবীর পিতৃলোক। পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে অন্নাদি দ্বারা পালন করে, চন্দ্রও সেইরূপ ব্রীহ্যাদি ওষধিদ্বারা পৃথিবীকে পালন করিতেছে। যে পুরাকালে চন্দ্রলোকের পিতৃলোক বলিয়া নামকরণ হইয়াছে, সেকালের ইহা ধারণা ছিল যে চন্দ্রই ধান্যাদি ওষধিসমূহের জীবনস্বরূপ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।"

"আমি রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ব্রীহ্যাদি ওষধি সকল পরিপুষ্ট করিতেছি।" এই কারণে সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রের ওষধিপতি ওষধিনাথ ইত্যাদি নামের বাহুল্য দেখা যায়। চন্দ্র যে ওষধিপতি নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। পৃথিবীর যে রস বা জলীয়াংশ দ্বারা ওষধি প্রভৃতি জীবিত আছে এবং বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই জলীয়াংশের উপরে চন্দ্রের যথেষ্ট আধিপত্য আছে; তাই পূর্ব্বোক্ত গীতার শ্লোকটীতে চন্দ্রকে 'রসাত্মক' বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। জলীয়াংশের উপরে চন্দ্রের আধিপত্য থাকায় সমুদ্রের স্ফীতি এবং নদীর জোয়ার, চন্দ্রের উপরেই বেশী পরিমাণ নির্ভর করে। শুদ্ধ পৃথিবীর জলীয়াংশ নহে—আমাদের শরীরের জলীয়াংশ বা রসধাতুও চন্দ্রের আধিপত্য স্বীকার করে, এই জন্য কোন কোন তিথিবিশেষে চন্দ্রের কারণে শরীরস্থ রসের ন্যূনাধিক্য হইয়া নানা রোগোৎপাদনের কারণ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে চন্দ্র মৃত বা শ্মশানগ্রহ বলিয়া যেমন পিতৃলোক, সেইরূপ পৃথিবীর অন্নপতি হিসাবেও পিতৃলোক নামের যোগ্য।

বাস্তবিক কিন্তু চন্দ্রের সহিত শ্মশানের ও অন্নের কি জানি কেন একটা গভীর রহস্যময় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। পৌরাণিক ইতিহাসেও ইহার ছায়া দেখিতে পাই। দেখ, ভারতের রাজত্ব যখন চন্দ্রবংশীয় কুরুকুলের হস্তে তখন ভারতমাতা একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা, অন্যদিকে সেইরূপ শ্মশানভাবাপন্না। যে সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং মণিপুর হইতে কাবুল ও গান্ধার পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সুসভ্য চন্দ্রকুলের সুশাসন উপভোগ করিয়া শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে অন্যদিকে কুরুক্ষেত্রের গৃহবিবাদরূপ করালাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সত্য সত্যই ভারতকে রাশমুণ্ডপরিপূর্ণ শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। পূর্ব্বযুগে পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ভারতের যে শোচনীয় অবস্থা করিতে পারেন নাই, চন্দ্রবংশীয় গৃহবিবাদে অতি সহজেই তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই অবধি অন্নক্ষেত্র ভারত ধ্বংসাবশেষ শ্মশানে পরিণত। জানি না ভারতের রাজকুল কৌরবগণের চন্দ্র হইতে উৎপত্তি বলিবার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, কিন্তু ফলে যাহা দেখিতেছি তাহাতে এইটুকু মনে হয় যে চন্দ্রের প্রভাব যাহার উপর পড়িয়াছে তাহার পরিণাম যেন শুভ নয়। চন্দ্রের সহিত শ্মশানের সম্বন্ধ ও অন্নের সম্বন্ধ আমরা আরেকটী আখ্যানে দেখিতে পাই। শিব শ্মশানবাসী বলিয়া নিত্যই তাঁহার কপালে চন্দ্র বিরাজ করে। এক দিকে শশিমৌলী শিব যেমন শ্মশানবাসী অন্যদিকে সেইরূপ শিবভার্য্যা পার্ব্বতী অন্নপূর্ণা। তবেই পাঠক দেখিতেছেন যে যেখানে চন্দ্র সেইখানেই, অন্ন ও শ্মশানের ঘনিষ্ঠ যোগ।

শিবের কপালে চন্দ্রের আখ্যান হইতে আমরা শিবের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হই। পাঠক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবেন। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র অধিকাংশ সময় ঈশানকোণে অবস্থান করে। ভারতের উত্তর-পূর্ব্বকোণে ভূটানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে শিবের অধিষ্ঠান ছিল বলিয়াই উত্তর-পূর্ব্বকোণের নাম শিবের নামেই ঈশানকোণ হইয়া থাকিবে। ভূটান নামটী 'ভূতস্থান' হইতে খুব সম্ভবতঃ আসিয়াছে। শিবের

অনুচর ভূতগণ ভূটিয়াগণ ভিন্ন আর কেহই নহে, শিবের কৈলাস-পুরী তিব্বতের আধুনিক লাসাপুরী বলিয়াই মনে হয়। লাসা নামটী কৈলাস শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। ঈশানকোণের শ্মশানবৎ পার্ব্বত্য প্রদেশে শিব ভূতগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেন এবং কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র সেই ঈশানকোণেই অবস্থান করে বলিয়া রূপকচ্ছলে শিবের কপালে চন্দ্র কল্পিত হওয়া অসম্ভব নহে। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে যে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা যায় তাহারও কারণ চন্দ্রের সহিত শ্মশানের সম্বন্ধ।

আমরা এপর্য্যন্ত দেখাইলাম যে চন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন আখ্যানগুলি সত্য মূলক। কোনটী বা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত কোনটী বা ঐতিহাসিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্র অন্নপতি এবং শ্মশানলোক এই দুই কারণেই পিতৃলোক নামের যোগ্য; প্রাচীনকালে এই দুই কারণেই চন্দ্র পিতৃলোক নামে অভিহিত হইত। আগামীবারে দক্ষিণ দিক ও চন্দ্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের কথা স্ফুটতররূপে প্রমাণিত হইবে। *

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থপরিচয়।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।—তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য কাগজের মলাট, ৩৲ টাকা। কাপড়ে বাঁধাই ৩৸০ আনা;

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বঙ্গসাহিত্যের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই সুবিখ্যাত গ্রন্থখানির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কোনও দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে মহর্ষিদেবের ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী উনচল্লিশটী পরিচ্ছেদে তিনি স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। কপিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে আজন্ম বর্দ্ধিত ও লালিত-পালিত হইয়াও কেমন করিয়া অতর্কিতে তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল পিপাসা প্রদীপ্ত হইল, অতঃপর কিরূপেই বা অধ্যয়ন, অন্বেষণ চিন্তা, ধ্যান, ভ্রমণ ও নির্জ্জন প্রকৃতির শান্ত সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার অন্তরে জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সঞ্চার হইল এবং দীর্ঘকালের পিপাসা পূর্ণ হইয়া তৃপ্তির অপূর্ব্ব সার্থকতায় জীবন ভরিয়া গেল, এই গ্রন্থে সেই সব অপূর্ব্ব কাহিনীর অমৃতময় বর্ণনা আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করিয়া তাহার সমগ্র স্বত্ব তাঁহার প্রিয় শিষ্য ৺ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দান করিয়া যান। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মহর্ষিদেবের জীবন-কালেই স্বকীয় পরিশিষ্টের সহিত ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। অনন্তর মহর্ষিদেবের তিরোধানের পর শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্দ্ধিতায়তন পরিশিষ্টের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫।৬ বৎসর হইল, উক্ত সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় পুস্তকখানির বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে লোকের পুস্তক কিনিবার অত্যধিক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই পুস্তকখানি বঙ্গবাসীর কত প্রিয়। যাহা হউক, এই তৃতীয় সংস্করণে শাস্ত্রীমহাশয়ের পরিশিষ্টকে একেবারে বর্জ্জন করা হইয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ২২০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক নবতর সুবিস্তীর্ণ পরিশিষ্ট ইহার সহিত সংযোজন করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টে তিনি আত্মজীবনীতে উল্লিখিত বিবিধ ঘটনা, স্থান, কাল, বস্তু ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে আত্মজীবনীর অনেক অস্পষ্ট স্থল যে সুস্পষ্ট ও সুবোধ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহা ব্যতীত পাঠসৌকর্য্যার্থ 'পত্রশীর্ষে পরিচ্ছেদসংখ্যা, ঘটনার বৎসর, মহর্ষির বয়স ও সেই পত্রে বক্তব্য বিষয়; পরিচ্ছেদারম্ভে সংক্ষেপে বিষয়পরিচয়, পত্রমূলে নানা বিষয়ের ফুটনোট, গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে আত্মজীবনীতে উল্লিখিত কালের একটী সময়সূচী ও মহর্ষির বংশলতিকা এবং গ্রন্থশেষে একটী বর্ণানুক্রমিক নামসূচী যোজিত হইয়াছে।' এবারের এই সব নূতনত্বে গ্রন্থখানির উপযোগিতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এদিক্ দিয়া বিচার করিলে বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহারে আমাদের কেবল একটীমাত্র কথা বলিবার আছে। মহর্ষিদেবের আত্মচরিতের ভাব ও ভঙ্গি বড় সহজ ও সরল। হিমালয়সঞ্চারী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় উহা যেমন স্বচ্ছ তেমনই সহজ গতিশীল; কোথাও তত্ত্ব ও তথ্যালোচনার আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া অনর্থক পাণ্ডিত্যপ্রকাশের চেষ্টা করা হয় নাই। জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলি ভগবানের প্রতি প্রেমে ও বিশ্বাসে যেমন উজ্জ্বল, তাঁহার প্রতি নির্ভরতার সুরে তেমনই ছন্দোময়।

---

* 'পুণ্য' আশ্বিন, ১৩০৪ সাল।

আত্মচরিতের এই অপূর্ব্ব ভঙ্গির সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্ট ও পাদটীকার পাণ্ডিত্যময় গবেষণা কেমন যেন একটু বেসুরা ঠেকে। মহর্ষির লেখার সহিত সম্পাদকের টীকাটিপ্পনী মিলাইয়া পড়িতে গেলে অধিকাংশ ভক্তিমান্ পাঠকের প্রতিপদে ছন্দপতন ঘটিবার সম্ভাবনা। এইজন্য আমাদের মনে হয়, সম্পাদকের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাটী গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট না হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলেই যেন ভাল হইত। যদিও অন্যান্য লেখকরচিত মহর্ষিদেবের সুবৃহৎ জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি সকল পাঠকের পক্ষে উহা সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলিয়া প্রিয়নাথ শাস্ত্রীমহাশয়কৃত মহর্ষিদেবের বাকী ৪২ হইতে ৮৭ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবনীটী এই সঙ্গে মুদ্রিত হইলে সাধারণের পক্ষে মহর্ষিদেবকে সমগ্রভাবে জানিবার সুবিধা হইত।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে "দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান" সঙ্গীতটী মহর্ষিদেবের রচিত। সে সম্বন্ধে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পত্রটী অবিকল প্রকাশ করিলাম—

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫।১বি, বারাণসী ঘোষের
সেকেণ্ড লেন,
Jorasanko
Calcutta

শান্তিধাম,
সোমবার

স্নেহাস্পদেষু,
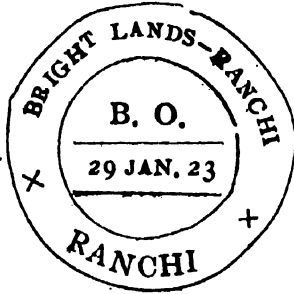
"দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান" আমিই আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনার মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত করি—মহর্ষি আমাকে একদিন বল্লেন, "তুমি এ গান কোথায় পেলে? এ যে আমার প্রার্থনা।"

এর থেকে মনে হয়, তাঁরই রচিত। * * *

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডিমাই ৮ পেজী আকারে ৮৶০+৪৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মহর্ষিদেবের অশীতিবর্ষ বয়সের একখানি মূল্যবান্ হাফ-টোন চিত্র সংযুক্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

—

সংবাদ।

ব্রাহ্মসম্মিলন—বিহার এবং উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলনের সম্পাদক আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠাইয়াছেন :—

আগামী ২৮এ, ২৯এ এবং ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে গিরিধি নগরে সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইবে। সকল ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশেষতঃ এই প্রদেশবাসী ব্রাহ্মগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগস্থাপন করা এবং এই প্রদেশবাসী সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই দুই উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদিগের সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের সকলকেই আমরা সমাদরে আহ্বান করিতেছি। স্থানান্তর হইতে সমাগত পুরুষ ও মহিলাদিগের বাস ও আহারাদির বন্দোবস্ত সম্মিলন হইতেই করা হইবে, কিন্তু তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনেন এই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পীড়া।—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজের একজন আজীবন হিতৈষী বন্ধু ও প্রবীণ আচার্য্য। ইঁহার ভক্তি ও প্রীতিমূলক অযাচিত সেবা ও সাহায্য পাইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ চিরদিন উপকৃত ও কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি ইনি মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রতি অত্যধিক ভক্তি বশতঃ গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যে দুইবার রাজার জন্মভূমি রাধানগর পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনীতে তাহার যে দুইটী বিবরণী প্রকাশিত হয়, আশাকরি পাঠকগণ তাঁহার সেই ভক্তিপূত ও অনুসন্ধিৎসাবহুল ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষবার রাধানগর পরিদর্শনে দুর্বিপাক বশতঃ তাঁহাকে অত্যধিক শৈত্য ও পথক্লেশ সহ্য করিতে হওয়ায় গত ৩০শে আশ্বিন সোমবার বাড়ী ফিরিয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন; এবং বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতা বশতঃ এপর্য্যন্ত তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইয়াই থাকিতে হইয়াছে। কয়েকদিন উপর্য্যুপরি ভাল থাকিবার পর হঠাৎ আবার অল্প জ্বর প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি এই সংবাদ পাইয়া আমরা বিশেষ চিন্তিত হইলাম। ভগবান তাঁহাকে সত্বর নিরাময় করিয়া তুলুন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান।—সঞ্জীবনী পত্রে প্রকাশ যে, রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ে পূজ্যপাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "শান্তিধাম" নামক প্রাসাদোপম একটী গৃহ আছে, যেখানে তিনি জীবনের শেষ ভাগ শান্তিতে অতিবাহিত করেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উইলের সর্ত্ত অনুসারে ঐ বাড়ীতে একটী হোমিওপ্যাথি হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় খুলিবেন স্থির করিয়াছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ বাড়ী ও তাহার গৃহসজ্জা এবং বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়াছেন। এই সংবাদ সর্ব্বাংশে নির্ভুল নয়। আমরা অবগত হইলাম যে, শান্তি-

ধাম হইতে নামিয়া বামদিকের সমতল ক্ষেত্রে তিনি একটী বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বাড়ীটি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে দিয়া যান, ও সেই সঙ্গে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন সেটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়রূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা দেবী সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে এই চিকিৎসালয়ের ভার দিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং আদিব্রাহ্মসমাজ তাঁহার যেরূপ প্রাণের বস্তু ছিল, তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, উক্ত সম্পত্তি অপর কাহারও হস্তে দিবার পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এবিষয়ে আদিব্রাহ্মসমাজকে কিছু জানানো হয় নাই—জানাইলে উহার ভার গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে আদিব্রাহ্মসমাজ কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না।

ভ্রমসংশোধন।

গত আশ্বিন-সংখ্যা পত্রিকায় ১৩৮পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের উপর দিক হইতে গণনায় অষ্টাদশ পঙ্‌ক্তিতে ভ্রম থাকায় উহার পরিবর্ত্তে "রাজার পিতার বিবাহ তাঁহার পিতার অনুরোধে বংশজের ঘরে হইয়াছিল" এইরূপ হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ-অধ্যক্ষসভার

কার্য্যবিবরণ।

২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার।

গত ২১শে অগ্রহায়ণের আহ্বান-পত্র অনুসারে আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল-গৃহে গত ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) প্রাতে ৯ঘটিকার সময় অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন—

১। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২। " হরিপদ ত্রিবেদী।
৩। " পাঁচুগোপাল মল্লিক।
৪। " ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। " সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
৬। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবনায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত ২৯শে শ্রাবণের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ ভ্রমসংশোধন সহ উপস্থিত করা হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২। আগামী All-India Thiestic Conference, madresএর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে ২০শে নবেম্বরের প্রাপ্ত পত্র পঠিত হইল। এই পত্রের সারমর্ম্ম আদিব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র উত্তর পাওয়া গিয়াছে। সেই উত্তরগুলি আলোচিত হইয়া স্থির হইল—

(১) ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি-এস-সি এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে উক্ত কনফারেন্সে উপস্থিত থাকিতে সম্মতি প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে প্রতিনিধিস্বরূপে প্রেরণ করা হউক। আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় উহাঁদের যাতায়াত বা অন্য কোন ব্যয় বহন করা সম্ভব হইবে না। তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ ব্যয়ে আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যসম্পাদনের জন্য যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

(২) উহাঁদের মধ্যে যিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে সম্পাদক মহাশয়কে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করা হোক; তাহা না দেখাইলে আদিব্রাহ্মসমাজ উক্ত প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন বিশেষ বিষয় এবারে আলোচনার জন্য না উপস্থিত করিলেই ভাল হয়, কারণ তাহাতে বিরোধ-বিবাদ আসিবার সম্ভাবনা।

(৪) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবনায় এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদীর সমর্থনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করিলে তাঁহাকে, এবং তাঁহার স্বীকৃতি না পাইলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরীকে সভাপতিপদে বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(৫) উক্ত কনফারেন্সের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ নিম্নলিখিত চাঁদা পাওয়া গিয়াছে—

(ক) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত ২৲
(খ) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৲

ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক এবং সময়মত এই বাবতে যাহা সংগৃহীত হইবে, তাহা কনফারেন্সের অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক মহাশয়কে প্রেরণ করা হউক।

৩। ১৮৪৯ শকের বজেট আলোচিত হইল। ভবিষ্যতে প্রতিবৎসর আরম্ভের পূর্ব্বেই সেই বৎসরের বজেট আলোচিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় আমরা আগামী বৎসরের বজেট আগামী চৈত্রমাসের মধ্যে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি। বর্ত্তমান শকের বজেট আলোচিত হইয়া দেখা গেল—সর্ব্বমোট আয় অপেক্ষা সর্ব্বমোট ব্যয় ৯৪৲ টাকা অতিরিক্ত হইতেছে। আমাদের অনুরোধ যে, আয় বাড়াইয়া বা খরচ কমাইয়া যাহাতে এই অতিরিক্ত ব্যয় না হইয়া আয় ও ব্যয় অন্তত সমান হয় তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় ও কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করুন।

৪। ব্রাহ্মসমাজের আগামী শতবার্ষিক উৎসব কোন্ বৎসরে হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইল। শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী ৬ই ভাদ্র ১৮৫০ শকে শতবার্ষিক হওয়া সমর্থন করিলেন। অবশিষ্ট উপস্থিত সভ্যগণ একবাক্যে ১১ই মাঘ ১৮৫১ শকে উক্ত উৎসব হওয়া সমর্থন করিলেন।

৫। গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের পুত্রগণকে বিক্রয় প্রভৃতির অবশিষ্ট ফেরত দেওয়া এবং বিক্রয়ের ও পুস্তকের হিসাব দেওয়া সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় যে পত্র পাঠাইতেছেন, তাহা উপস্থিত করা হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পত্র ও হিসাব গৃহীত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক বার্দ্ধক্যের কারণে অধ্যক্ষ-পদত্যাগ জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল। স্থির হইল, তাঁহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধুকে আমরা ছাড়িতে পারি না।

সভাপতি
শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

কার্ত্তিক মাস, ১৮৪৯ শক।

আয়	১০৭৮॥/৪
পূর্ব্বস্থিত	২০২॥/০
সমষ্টি	১২৮১৶৪
ব্যয়	১০৬৫৶১
স্থিত	২১৫৸৶১

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আনুষ্ঠানিক দান	১৲
এককালীন দান	৫৩/৪
হাওলাত আদায়	৩৪৲
ঋণগ্রহণ	২৯০৴০
সস্‌পেন্স	৪০০৲
সমষ্টি	৭৫৮৶৪

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	১৫৸০
হাল	৫৲
বিজ্ঞাপন	৮৲
মাশুল	১/০
সমষ্টি	২৮/০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	২০॥/০
মাশুল	।০
গীতারহস্য	৮৪৲
ঐ মাশুল	৩৸০
গীতার গচ্ছিত আদায়	১৮৩৸০
সমষ্টি	২৯২৷/০
সর্ব্বসমষ্টি	১০৭৮॥/৪

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্য	৭০৲
গায়ক	৪০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বেহারা	১২৲
মেথর	২৲
সরঞ্জামী	৸৶৬০
মাশুল	।৶০
Electric	৪৶৬
কেরোসিন	॥৶০
পূর্ত্তকার্য্য	৫০৲
ঋণশোধ	৪৬১৸/১০
পার্ব্বণী	১।০
বারবরদারী	১॥৴০
বিবিধ	২।/০
সমষ্টি	৬৬২৶১০

তত্ত্ববোধিনী।

মাশুল	৪/৩
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বিজ্ঞাপনের টাকার কমিশন	॥০
সমষ্টি	১৯৸/৩

যন্ত্রালয়।

কম্পোজিটর	৫৩৲
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	১২৲
কাগজতোলা	৬৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
জলপানি	৶০
কালি	৸৶০
তৈল	॥০
কুলঢালা	।৩
মাশুল	/৬
তামাক	।/৩
লেই জন্য ময়দা	/৬
বিবিধ	।৶০
	১০৮৸৬

পুস্তকালয়।

কমিশন	৩৸০
অন্যান্য	৴৬
গীতারহস্যের মূল্য	৫০।০
ঐ মাশুল	৩৶০
ঐ কমিশন	৭৩৲
ঐ দপ্তরী	১০৸০
ঐ বিজ্ঞাপন	২৬৲
গীতারহস্য পাঠান	১০৭৲
সমষ্টি	২৭৫।/৬
সর্ব্বসমষ্টি	১০৬৫৶১

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হিতৈষণাগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিরচিত। ৫।১ বি, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্, "হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি কাপড়ে বাঁধান, ছাপা সুন্দর, ১৩৭ পৃষ্ঠায় পূর্ণ মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকখানি ভক্ত-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে দোলায়িত চিন্তা-সাগর। ইহার সীমার দিকে ভক্ত এবং অসীমের দিকে ভগবান্—মধ্যে ভাব-সমুদ্র।

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ—১৩৩৪।

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য এবং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নব প্রকাশিত "সন্ধ্যায়" পুস্তক-খানি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। পুস্তকের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সূত্রে জীবনের বহু ব্যথা, বিষাদ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ, ব্যর্থতা ও পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে সরল শান্ত মনের বহু ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সাধক, উপাসক এবং আত্মদৃষ্টি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ এই সরল তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ক্ষিতি বাবুর সমস্ত লেখাই সরল প্রাঞ্জল সহজবোধ্য। এ পুস্তকেও তাহারই পরিচয় পাইলাম।

ব্রহ্মবাদী, কার্ত্তিক—১৩৩৪।

পুস্তকখানি একখানি গদ্যে লিখিত পদ্য পুস্তক। ইহা লেখকের জীবনব্যাপী সাধনার ফল। লেখক নানা পারিবারিক ঘটনা-স্রোতের মধ্য দিয়া বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথের অচ্ছেদ্য যোগ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সাহিত্যভাণ্ডারে এইরূপ গ্রন্থ খুব অল্প। গ্রন্থকার এবিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়া পারিবারিক ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতি সাহিত্য-সেবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। তবে মূল্য কিছু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। অতএব যাহাতে এই ভক্তিরসোচ্ছ্বসিত গদ্যময় পদ্যখানির রসোপভোগে পাঠকসাধারণ বঞ্চিত না হন, তজ্জন্য ইহার মূল্য কিছু হ্রাস করিয়া দেওয়াই উচিত।

কায়স্থ-সমাজ, আশ্বিন—১৩৩৪।

This book is written in prose, but it is all poetry, which shades over now and then into religious enthusiasm. The author is deeply enamoured with nature. When the light of his own ideal falls on her she becomes all heart to him and sympathizes with all his joys and sorrows. Moreover he tries to discover in the unconscious language of nature tidings of a better world, and vistas on universal restoration.

The author knows how to clothe in poetical language the almost childlike, but earnest and heart-felt emotions that assail him of an evening, when he sits on the solitary shore and contemplates the sea. The dark night that gathers around him, the moonshine that plays on the glittering waves, the loud call of the deep, all these and other phenomena embody the hopes and fears of the human heart, that wants to rest, at the end of the dreary journey, on the bosom of the divine mother.

Most refreshing however are the feelings the author expresses at the remembrance of his dear ones. How humble and contrite he feels in these moments as if he had understood too late the divine depths of a mother's heart. What an appealing cry when at the end of the chapter, where he depicts the love for his mother, he utters the words : "May I deserve, in all my future re-births to be born again by thee."

Such a prayer shows us that the author, at the decline of his day, does not yet see the end of his journey. Hence the vague tremor of pessimism that runs through this beautiful work. We would fain join with the author in his praises of the divine mother, were not dark mythology hovering in the background of his conception. Could we but substitute the vision of the divine mother our faith reveals, we would thereby raise to a higher level the pious prayers of the author,

The Light of the East, November—1927.

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" নামক গ্রন্থখানি পড়িলাম। ইহাতে পঞ্চদশী কথায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মবাণী অতি স্বচ্ছ এবং সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর ভাষার বিশেষত্বই এই যে তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের ভিতরে হৃদয়ের পরিচয় খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা এইরূপ সহৃদয়তা পূর্ণ হওয়াই একান্ত উচিত। বড় বড় কথা অনেকেই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রাণ স্পর্শ করে না এই জন্যই যে, তাহার পশ্চাতে লেখকের হৃদয় থাকে না। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়া যে কথা বলা হয়, তাহা "বোধির" ভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছায় না ; কারণ মানুষ মাথা দিয়া চিন্তা করে, আর হৃদয় দিয়া বাঁচে। সাহিত্য হিসাবেও আলোচ্য গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্য আছে।

ভারতবর্ষ, ভাদ্র—১৩৩১।

——

Tatthabodin Patrika Reg. No. C. 462.

১০১৩ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। পৌষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ
পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ৯৮।

১০১৩ সংখ্যা	১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে	চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

আত্মপ্রসারণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শোন—শোন—হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—ভেরী অবিশ্রাম বাজিতেছে—তাঁহার বিজয়ভেরীর সুমঙ্গল ধ্বনি ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। সুরনর যক্ষরক্ষ—সকলেই অবাক—নির্ব্বাক হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে। এই ধ্বনির আগমনে অন্য সকল ধ্বনিই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কি সুমিষ্ট সেই ধ্বনি! সুমিষ্ট ভেরীর সুগম্ভীর ধ্বনি নিস্তব্ধতাকে গম্ভীরতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতেছে।

ঐ ভেরীধ্বনি কেন? উহা কিসের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে? জগতবাসী আর যে সহ্য করিতে পারিতেছে না—সংসারের ক্ষুদ্রতা, অধর্ম্ম, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া—সংসারের সকল পাপতাপ ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য মানবের মহাপ্রাণ হইতে একটা আকুল প্রার্থনা সমুত্থিত হইতেছে। ঐ ভেরীধ্বনি তাহারই বিজয়বার্ত্তা আনিতেছে। ঐ দেখ—মানবের চির-উন্নতিশীল আত্মা আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে—মহাশূন্যের শত স্তর ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—ভগবানের চরণস্পর্শ লাভ করিবার জন্য—তাঁহার চরণে আপনাকে বলিদান করিয়া মহাশূন্যকে পূর্ণ করিবার জন্য। ঐ ভেরীধ্বনি তাহারই বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। ঐ ভেরীধ্বনিকে ডুবাইয়া একবার কোটিকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া বল—জয় ভগবানের জয়—জয় পুরুষোত্তমের জয়!

চারিদিকেই একটা কঠোর অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। সংসারে এ কি বিপরীত ব্যবস্থা—লোকে চাহিতেছে খাদ্য, তাহাকে দেওয়া হইতেছে উপলখণ্ড! লোকে চাহিতেছে তৃপ্তি, তাহাকে দেওয়া হইতেছে অতৃপ্তির অগ্নি-জ্বালা! লোকে চাহিতেছে জীবন, তাহাকে দিতেছ মরণের ভীষণ দাহ; লোকে চাহিতেছে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তোমরা দিতেছ ন্যায়ের নামে অন্যায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। মানবের প্রাণ চায় সুবিচার, তোমরা তাহাকে দিতে চাও বিচারের নামে অত্যাচার ও অবিচার!

ভুল করিও না। মানুষ কাষ্ঠ নয়, পাষাণ নয়—মানুষ উন্নতিধর্ম্মা। মানুষের মূল এই সংসারের গভীর অন্তস্তলে নিহিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ঐ ঊর্দ্ধে—ভগবানের স্বর্ণ-সিংহাসনের অভিমুখে। মহাদেবের যে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি জাগ্রত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মদনের কামানল ভস্ম করিয়া দিয়াছিল, মানবেরও সেই ঊর্দ্ধ দৃষ্টিই স্বীয় তেজে ক্ষণেকের মধ্যে সংসারের অধর্ম্ম, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার সকলই দগ্ধ করিয়া দিবার জন্য, ভস্মীভূত করিবার জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। ইহা সত্য—ধ্রুব সত্য—মানুষের ঐ ঊর্দ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অসত্য ও অধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারিবে না, অবিচার ও অত্যাচার পরাভব

স্বীকার করিবে। মানবের মহাপ্রাণের অন্তরে এতদিন ঋষি নরোত্তম নিদ্রিত থাকিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন; আজ সেই ঋষি নরোত্তম জাগ্রত হইয়া ভগবানের অপরাজিত বিজয়পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ ভেরীধ্বনি আজ তাহারই বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে।

অসীম গগনতল হইতে ঐ ভেরীর সবল ও সুমঙ্গল অনাহত ধ্বনি ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতেছে—ধীরে ধীরে সংসারে নামিয়া আসিতেছে। ঐ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এই সুসম্বাদ সংসারে বিঘোষিত হইতেছে যে,—স্বর্গরাজ্যের ন্যায় ও ধর্ম্ম এই সংসারেও বিজয়লাভ করিবে—ন্যায় ও ধর্ম্মের সূত্রে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এক মহামিলন সাধিত হইবে।

মানুষ অজর, অমর। অমরণধর্ম্মা ভগবান হইতে মানুষের জন্ম—অমৃতপুরুষের সন্তান হইল মানুষ। মানবের জরা কোথায়—মৃত্যু কোথায়? মানুষ সুপ্ত থাকিতে পারে, মোহের ঘোরে ক্ষণকাল লুপ্তচৈতন্যের মত "বিঘোরে" পড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সত্য করিয়া বলেন যে, মানুষের জরা নাই—মৃত্যু নাই। সুপ্ত অবস্থায় অন্তরাত্মা বলসঞ্চয় করে—তাহার পরে সে নবভাবে জাগিয়া উঠে—নূতন তেজে গর্জ্জিয়া উঠে। তাহার সেই নবজাগ্রত তেজের সম্মুখে সানুচর অধর্ম্ম ক্ষণেকেরও জন্য দাঁড়াইতে পারে না—সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অধর্ম্ম কোথায় যে পলায়ন করে, তাহা কেহ জানিতেও পারে না।

আসিয়াছে—সময় আসিয়াছে। তাই ভারতের মানুষ, আজ দেখি, সকল দোষের আকর আলস্য ও ঘুমঘোর অঙ্গ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। ভারতবাসীর মহাপ্রাণে এতদিন যে ঋষি নরোত্তম ধ্যানস্থ ছিলেন, আজ তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাই আজ ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে; তাই আজ ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অগ্নিময় স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। আজ আর খাদ্য চাহিলে কেহ সহজে উপলখণ্ড দিতে সাহস করিবে না, তৃপ্তি চাহিলে অতৃপ্তির দহনে জ্বলিতে হইবে না, জীবন চাহিলে মরণ পাইবে না।

ঋষি নরোত্তম আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুপ্তিসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। প্রাচীন জীর্ণ গৃহ। গৃহের ছাদে অঙ্গনে, গৃহের মেজেতে দেওয়ালে—চারিদিকে বহু পুরাতন অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বনস্পতি রাশি রাশি মূল শাখা পত্র বিস্তার করিয়া সমস্ত গৃহটিকে জরাজীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—মূল গৃহটি উহাদের কল্যাণে অনেকটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। উপকথায় যেমন শোনা যায় যে, রাক্ষসেরা রাক্ষসপুরীতে কোন রাজকন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেলে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য সদাজাগ্রত প্রহরী নিযুক্ত রাখিত, সেইরূপ ঋষি নরোত্তমকে এই প্রাচীন অন্ধকার ও রুদ্ধ গৃহে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য জানি না কে দুইটী প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছিল—মায়া ও প্রথা। কোথায় কোন্ ফুটা দিয়া প্রভাতের নবীন আলোক ঋষির নয়নে নিপতিত হইবে, কোথায় কোন্ অদৃশ্য গহ্বরের ভিতর দিয়া নবভাবের জীবনপ্রদ মলয়বায়ু আসিয়া ঋষির অন্তরে নবজীবনের স্পন্দন আনয়ন করিবে, তাহারই সন্ধানে ঐ দুইটী প্রহরী সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত—সন্ধান পাইলেই শতবিধ আগাছার শুষ্ক জীর্ণ শাখাপত্র আনিয়া সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত।

কিন্তু সমস্ত গগন ভুবন ভরিয়া যখন প্রভাতের নবীন আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যখন দিকে দিকে নবভাবের মলয় বায়ু নূতন জীবনের সুমঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া চলিতেছে, তখন ঐ দুই বৃদ্ধা প্রহরী—মায়া ও প্রথার সাধ্য কি যে, তাহারা নবীন আলোকের বা জীবনপ্রদ মলয়বায়ুর প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ করে।

কি জানি কি প্রকারে কোন্ ফুটার ভিতর দিয়া প্রভাতের নবীন আলোকের একটি রেখা ঐ অন্ধকার গৃহের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়া ঋষি নরোত্তমের নয়নে নিপতিত হইয়াছে; কি জানি কোন্ ফাটের ভিতর দিয়া সুবিমল প্রভাতের মলয়বায়ু প্রবেশ করিয়া ঋষিবরের সুগঠিত দেহ স্পর্শ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জীবন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। ঐ দেখ—চাহিয়া দেখ—ঋষি নরোত্তম সুপ্তোত্থিত জলহস্তীর ন্যায় সিংহবিক্রমে জাগিয়া উঠিতেছেন—মায়া ও প্রথা প্রহরীদ্বয়ের শত কৌশল, শত মায়াজাল, শত বাক্‌চাতুরী তাঁহাকে আঁধার ঘরের রুদ্ধ বাতাসে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

আজ ঋষি নরোত্তমের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সম্মুখে নূতন জগত খুলিয়া গিয়াছে—তাহার সম্মুখে উন্নতির নিত্য নব দৃশ্যসমূহ প্রকাশিত হইয়া তাহাকে উন্নতির সুপ্রশস্ত রাজপথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। ঋষি নরোত্তমের প্রেরণায় ভারতবাসী শ্রেয়ের পথ, মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া, শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভারতবাসী বিদেশীয়ের পদধূলি লাভেরও অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ সেই ভারতবাসী বিদেশের যেখানে যাইতেছে, সেইখানেই অতুল সম্মান অর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিতেছে।

নব নব ভাবের নবীন আলোকের স্পর্শ লাভ করিয়া—এবং নব জাগরণের মদিরা পান করিয়া নবযুগের তরুণ যুবক আজ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—ভারতবাসী আজ

উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। নূতন আকাশে মুক্তি লাভ করিয়া—নূতন বাতাসের সোমরস পান করিয়া তরুণ ভারতবাসী আজ পুরাতন কোন কিছুর—প্রাচীনতার জীর্ণ প্রাচীরের বাধা—কিছুমাত্র সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্বাধীনতার যে মদিরাপানে মত্ত হইয়া ফরাসি-বিপ্লবের প্রারম্ভে ফরাসি জাতি প্যারিসের সর্ব্বপ্রধান কারাগার ভাঙ্গিতে ছুটিয়া গিয়াছিল, আজ তরুণ ভারত-বাসীও সেই স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া পুরাতন যাহা কিছু, প্রাচীন নামধারী যাহা কিছু, সকলই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া প্রলয়সাধনের আস্বাদ লাভের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতেছে—প্রলয়ের ধ্বংসলীলার অবসানে সংসারের সমস্ত অবিচার অত্যাচার, সমস্ত অধর্ম্ম ও অন্যায়েরও বুঝি লীলাবসান হইবে।

কিন্তু না—জগতের ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করে না। পুরাতন যাহা কিছু সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমারই কর, অথবা নূতন একটা কিছু গড়, তাহাতে বেশী কিছু আসিবে না যাইবে না—তাহারই ফলে যে অধর্ম্ম ও অন্যায় ফুৎকারে অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে। আসল কথা এই যে প্রতি জনের আপনাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মকে যদি দাঁড় করাইতে হয়; সত্য, ন্যায় প্রভৃতিকে যদি ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়; যদি ধরাধামে স্বর্গরাজ্য নামাইয়া আনিতে চাও, তবে আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোল। ইতিহাস এই সত্যই ঘোষণা করে। পুরাতন আপনাকে জ্বালাইয়া দাও—ত্যাগের শ্মশানে দগ্ধ করিয়া এস—নিষ্কলঙ্ক সুবর্ণের পবিত্র আভা লইয়া শ্মশান হইতে ফিরিয়া আইস। প্রত্যেকে আপনাকে নূতন করিয়া গড়িলেই সংসারে ধর্ম্মরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অটল হইবে, সংসার সোনার সংসার হইবে।

এখনকার সংসারের অর্থ—খুব নীচ স্বার্থের আবর্জ্জনা সঞ্চয়; এখনকার সংসারের অর্থ—নিজের ভিতর নিজের অনলে লুকাইয়া থাকা। আবর্জ্জনার পূতিগন্ধবাষ্পে আমার সংসার যে অসার হইয়া উঠিবে, সেদিকে দৃষ্টিই নাই। ঘরের ভিতর অঙ্গার বাষ্প জমাইয়াই যাইতেছি—তাহার ফলে শীঘ্রই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িব, সে দিকে দৃষ্টিই নাই। বাহিরের অক্সিজেন গৃহের মধ্যে না আনিলে গৃহ যে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে, তাহা যে ভুলিয়া গিয়াছি।

কিন্তু ঐটুকুতেই এত—ঐটুকুই ভুলিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে—ভগবানের এমনই বিধান যে, স্বার্থ ও পরার্থে মেলামেশা করাইয়া লইতে হইবে। তাঁহার রাজ্যের অধিবাসী একা তুমি নও। কোটি কোটি মানব, অগণ্য জীবজন্তু তাঁহার বিশ্বরাজ্যের অধিবাসী। কাজেই সকলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ, তোমার স্বার্থে সকলের স্বার্থ। সকলকে তোমার জন্য ভাবিতে হইবে, তোমাকে সকলের জন্য ভাবিতে হইবে। পরের সুখে তোমাকে সুখী হইতে হইবে, তোমার সুখে অপরের সুখী হইতে হইবে; পরের দুঃখে তোমাকে দুঃখী হইতে হইবে, তোমার দুঃখে অপরের দুঃখী হইতে হইবে।

এইটির অপর নাম আত্মপ্রসারণ। এই আত্মপ্রসারণই হইল সকল সত্য ধর্ম্মের মূল। ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ—যাঁহারাই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন; তাঁহারাই আপনাকে ত্যাগের শ্মশানে দগ্ধ করিয়া অমৃতসাগরে স্নান করিয়া নূতন মূর্ত্তিতে এই সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান যেমন বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, আমাদেরও প্রত্যেককে সেইরূপ পরস্পরের মধ্যে অন্তরে অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। ইহাকেই সমবেদনা বলে—ইহার অতিরিক্ত সমবেদনা বলিয়া কিছুই নাই। এই সমবেদনার উপরেই ভগবানের প্রিয়-কার্য্যসাধন দাঁড়াইয়া আছে। তাই এই আত্মপ্রসারণই সত্যধর্ম্মের এক অঙ্গ।

ভগবানকে তুমি ভালবাস? তুমি বলিতে চাও যে তুমি সত্যধর্ম্মের অপর অঙ্গের সাধক? বলিও না—বলিতে পার না, যদি না তুমি আত্মপ্রসারণে যত্নবান হও। তাঁহাকে ভালবাসিলেই সকল বিষয়েই তাঁহাকে আদর্শ করিতে হইবে। কাজেই তাঁহারই আদর্শে আমাদিগকেও সকলের মধ্যে প্রাণে প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে—সকলের মধ্যে আত্মপ্রসারিত করিতে হইবে। তুমি আত্মপ্রসারণের সাধক হও, সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ভগবানের যথার্থ উপাসক হইয়া পড়িবে—ভগবৎপ্রীতিতে তুমি স্বতই ডুবিয়া থাকিবে।

এই সত্যই ঋষিরা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে "এক মাত্র ত্যাগের দ্বারাই মানব অমৃত উপভোগ করে"। আমিও এই সত্য তোমাদিগকে দিলাম—তোমরা ইহা গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কর, যাহাতে প্রতি মানব ইহা অন্তরে গ্রহণ করে। এ সংস্কার, সে সংস্কার, এত বিভিন্ন সংস্কারের চেষ্টায় বৃথা ঘুরিতে হইবে না। আত্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সকল সংস্কার সুনিষ্পন্ন হইবে—ভগবানের জয় জয়কার।

দেশাত্মবোধ।

(জনৈক শিক্ষক)

কতকগুলি লোকের সাধারণ কতকগুলি বিষয় থাকে, যেগুলিকে অবলম্বন করিয়া তাহারা মিলিত হয়। এই

প্রকার মিলিত হইবার ফলেই সঙ্ঘ বা সমাজের উৎপত্তি হয়। অল্প কয়েকজন লোকের মিলনকে সংঘ বলা যায়। এবং বহু লোকের মিলনকে সমাজ বলা যায়। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সংঘ বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করিতে বাধ্য হই। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, নিজেকে কেন্দ্রে রাখিয়া নিজেদের সংঘ বা সমাজকে কি প্রকারে সম্প্রসারিত করি। নিজের পরেই হইল নিজের পরিবার। পরিবার শব্দের অর্থ যাহা দ্বারা আমরা পরিবৃত হই, অর্থাৎ যাহারা আমাদিগকে স্নেহে ও প্রেমে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রাখে। পরিবারের পর হইল সংঘ এবং সংঘের পরে সমাজ।

সংঘ ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি বিষয় সাধারণ না থাকিলে চলিতে পারে না। সাধারণত ভারতবাসীরা ধুতি চাদর পরিবে। আবার আজকাল এক দল হইয়াছে, যাহারা ইংরাজদিগের অনুকরণে "হ্যাট কোট" পরিধান করে। হিন্দুদিগের মধ্যে গোহত্যা পাপ বলিয়া গণ্য, মুসলমানদিগের মধ্যে শূকর-হত্যা পাপ বলিয়া গণ্য। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, ইংরাজদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ভাবভঙ্গী চালচলন আছে; আবার আমাদেরও মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ভাব, সাধারণ চালচলন আছে। এই সংঘ ও সমাজের মূলভাব বেদের একটী মন্ত্রে সুন্দর-ভাবে বলা হইয়াছে—সেই মন্ত্রটী ভারতবাসীমাত্রেরই মুখস্থ করা উচিত। মন্ত্রটী এই—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বং সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

মন্ত্রের অর্থ এই—তোমরা সকলে একসঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত হও। তোমাদের সংকল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, সংঘ ও সমাজের মূলপ্রাণস্বরূপ কতকগুলি সাধারণ বিষয় থাকিতেই হইবে। এই "সাধারণ বিষয়" এর অর্থ এই যে, সেই সকল বিষয় দুষ্প্রাপ্য বা বহুমূল্য হইবে না—সেই বিষয়গুলি সেই সংঘ বা সমাজের সকল লোকেরই সহজলভ্য হইবে এবং সকলেই সেগুলি ব্যবহার করিবার অধিকার হইবে। যদি বলি, একটা সাধারণ মাঠ পড়িয়া আছে, তাহার অর্থ এই যে, সেই মাঠে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যাইতে পারে, তাহা কাহারও নিজস্ব নহে; উহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সকল অধিবাসীরই সাধারণ অধিকারের বস্তু। খোঁজ করিলে এই প্রকার সাধারণ অধিকারের অনেক বস্তুর সন্ধান পাইতে পারিবে।

এইবারে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, প্রত্যেক সংঘ বা সমাজের এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে সেই সংঘ বা সমাজের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। সেই সকল বিষয় সাধারণ অধিকারের বস্তু হওয়াতেই সংঘ বা সমাজের উৎপত্তি। এক পরিবারের পিতামাতা এক, ঘর-দুয়ার এক, বাগান-পুকুর এক। এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষক এক, শিক্ষা দিবার যন্ত্রাদি এক, খেলিবার উপকরণ এক। এই প্রকার নানা বিষয় সমান অধিকারে থাকাতে, কোন পরিবারের প্রশংসা বা নিন্দা করিলে, সেই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ণে সুখ বা হৃদয়ে আঘাত প্রদান করে। সেই প্রকার কোন বিদ্যালয়েরও প্রশংসায় সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বড়ই আনন্দ লাভ করে এবং নিন্দায় বড় উত্তেজিত হইয়া উঠে।

একই সহরের বা একই দেশের লোক, যাহারা একই শাসনের অধীনে থাকে, তাহারা একই পুলিশ, একই বিচারক, একই রাস্তাঘাট জল আলো প্রভৃতির সাধারণ অধিকার ভোগ করে। এই সকল বিষয়ে সাধারণ অধিকার যাহারা ভোগ করে, তাহাদিগকে লইয়াই এক একটী সংঘ বা সমাজ গঠিত হয়। প্রাচীন কালে এক একটী সহরের চারিদিক প্রাচীরের দ্বারা ঘেরাও করা হইত, কারণ নিকটবর্ত্তী সহরগুলির অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা মারামারির ভাব লড়াইয়ের অবস্থা জাগিয়া থাকিত। কাজেই প্রত্যেক সহরের অধিবাসীরা অপর সহরের অধিবাসীদের অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজেদের সহরকে প্রকাণ্ড প্রাচীরের দ্বারা ঘিরিয়া রাখিত। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের ঐপ্রকার এক একটী সহরে যাহারা বাস করিবার এবং তাহার আশ্রয় লাভের অধিকারী হইত, তাহাদিগকে সেই সেই সহরের "স্বাধীন পুরুষ" বলা হইত। এখনও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে "সহরের স্বাধীনতা" প্রদানের প্রথা বজায় রাখা হইয়াছে। এই প্রথা আজ পর্য্যন্ত বজায় থাকাতে বোঝা যাইতেছে যে, সেকালে ইউরোপের লোকেরা নিজ নিজ সহরের অধিবাসী হইবার অধিকার কিরূপ মূল্যবান বিবেচনা করিত। আজকাল আর এ-সহরের সঙ্গে ও-সহরের লড়াই লাগে না; এখন প্রত্যেক সহরের ভিতরে যাহাতে শান্তি বজায় থাকে তাহারই ব্যবস্থা করা হয়। তাহারই জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

কেবল ধরপাকড় করা বা দাঙ্গাফ্যাসাদ থামানোই

পুলিশের কাজ নয়। রাস্তায় যাহাতে রাশি রাশি চলতি গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে, পথিকদের মধ্যে কোনও রকম ধাক্কা-ধাক্কি না লাগে, হারানো ছেলের তত্ত্বাবধান লওয়া, চুরি ধরা এবং চোরাই মালের সন্ধান লইয়া তাহার উদ্ধার করা ও মালিককে প্রত্যর্পণ করা, এসমস্তও পুলিসের কর্ত্তব্যের মধ্যে। সেকালে একটা কোন চুরি-চামারি হইলে মহা সোরগোল তোলা হইত। কিন্তু এখন আর সে রকম সোরগোল করা হয় না। এখন চুরি-চামারি হইলে তুমি আস্তে আস্তে থানায় গিয়া সংবাদটী লিখাইয়া দিলে। তখন পুলিসের লোকেরাই নানা উপায়ে তাহার সন্ধান লইতে থাকে। ভাবিয়া দেখ, যদি আমরা প্রত্যেকেই এমন সচ্চরিত্র ও নির্ঝঞ্ঝাটে লোক হই যে, পুলিসের লোকের কোনপ্রকার সংস্রবেই আসিতে না হয় তাহা হইলে কি সুখের হয়।

এক সহরে বাস করিলে অনেকগুলি সাধারণ বিষয়ের অধীন হইয়া আমাদের চলিতে হয়। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। মনে কর, রাস্তা। রাস্তাগুলি এমন হওয়া চাই যাহাতে সহরের সকল অধিবাসীই সেগুলি সমান ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। আমি যদি নিজের টাকা খরচ করিয়া সেই রাস্তা প্রস্তুত করি, তবে আমার এই প্রকার দাবী করিবার অধিকার লাভের চেষ্টা স্বাভাবিক যে, আমি যখন নিজের টাকায় রাস্তাটী করিয়াছি, তখন অপর অপেক্ষা আমারই সর্ব্বপ্রথম ও বিশেষভাবে ঐ রাস্তা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে বা থাকা উচিত। কিন্তু রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ প্রকার পার্থক্য ঘটিতে দিলে সহরবাসীদের মধ্যে বড়ই অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। সেই জন্য সহরবাসীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সাধারণের চলাফেরার রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করা হয়। ট্যাক্স যাহা আদায় করা হয়, তাহা বলপূর্ব্বক এই চাঁদা আদায় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নিজের বাসপল্লী বা সহরের প্রতিষ্ঠানসমূহের যত্ন লইলেই প্রকৃত পল্লীহিতৈষণা প্রকাশ পায়। ছেলেদের সত্যকার পেটের কথা যদি বাহির করিতে পারা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তাহারা অন্য সহর বা পল্লী অপেক্ষা নিজেদের সহর বা পল্লী ভালবাসে; নিজেদের সহর-পল্লীর পুলিস ড্রেন প্রভৃতির বন্দোবস্ত ভাল বলিয়া যে তাহারা ভালবাসে তাহা নয়; নিজের নিজের সহর বা পল্লীর গলি-ঘুঁজি প্রত্যেকের পরিচিত বলিয়াই তাহার প্রতি ভালবাসা ধাবিত হয়। তাহাদের ভালবাসার আর একটী প্রধান কারণ এই যে, তাহারা নিজ নিজ বাসস্থানের প্রতিবাসী মানুষদিগকে জানে, পরস্পরের মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব স্থাপিত থাকে। এই কারণে প্রতিবাসীদিগের জন্য লোকেরা এক-আধটু কাজ করিতে পারিলে, তাহাদের কিছু উপকার করিতে পারিলে লোকেরা খুশী হয়। বালকদিগের কর্ত্তব্য যে, তাহারা বড় হইলে স্থানীয় শুভ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাহাদের সযত্ন লক্ষ্য রাখে। সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদের পল্লী বা সহরের অধিবাসী, সকলেরই সুবিধা ও মঙ্গল সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সহরের প্রশংসা করিতে অগ্রসর হওয়া এবং অপরের নিকট প্রশংসা শুনিলে গর্ব্ব অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু শুধু গর্ব্ব অনুভব করিলেই হবে না—সহরটীকে প্রশংসালাভের উপযুক্ত করিয়া দাঁড় করাইবার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, শুভ প্রতিষ্ঠান-সমূহের অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে, তবেই না সত্য সত্য আমরা গর্ব্ব করিবার অধিকারী হইতে পারিব। মনে কর, এই কলিকাতা সহরে তোমার পল্লীতে একটা ফুটবলের ক্লাব আছে। ফুটবল খেলার ফলে ছেলেদের শারীরিক উন্নতি হয়। সুতরাং, কোন বাধা না থাকিলে, তোমার সেই ক্লাবের সভ্য হওয়া উচিত এবং ফুটবল খেলায় উৎসাহ প্রকাশ করা উচিত। যাহাতে তোমার ক্লাবের সভ্যেরা খেলায় জয়লাভ করে, অবশ্য অন্যায় পূর্ব্বক ফাঁকি দিয়া নহে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের স্কুল বা বিদ্যালয় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কাহার না ইচ্ছা হয় যে, প্রত্যেকের নিজের নিজের স্কুল সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে? আমরা সকলেই শুনিলে খুসী হই যে, আমাদের স্কুল হইতে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, ক্রিকেট খেলায় বা ফুটবল খেলায় জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুধু মুখে খুসী দেখাইলে চলিবে না যে, আমাদের স্কুল অমুক অমুক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; আমাদের দেখিতে হইবে যে, শ্রেষ্ঠ হওয়ার সম্বন্ধে আমরা কি কি সাহায্য করিয়াছি। যদি কোনই সাহায্য না করিয়া থাকি, তবে মুখে সুধু খুসী দেখাইয়া লাভ কি? স্কুল শ্রেষ্ঠ হওয়াতে যদি স্কুলে ছুটী দেওয়া হয়, তবে ছাত্রদের মনে স্কুলের উপর খুব একটা টান হইবার কথা, দরদ বসিয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিদেশীয় বৈজ্ঞানিক উপন্যাস-লেখক জুল্‌স্ ভার্ণের একটী গল্প আছে। ফ্রান্সের একটা সহর যেন ঘুমন্ত হইয়া পড়িয়াছিল—অধিবাসীদের প্রাণে কোনও প্রকার উৎসাহ-উদ্যমের সাড়া পাওয়া যাইত না। এই রকম বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছিল। অবশেষে সেই সহরে এক ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সহরে কিছুকাল বাস করিয়া সহরের অভাবগুলি ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নানাবিধ নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কার্য্যে লাগাইয়া অভাবসমূহ দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। সহরবাসীদিগকে বলিলেন যে, গ্যাসের কারখানা খুলিয়া সহরকে বিনামূল্যে গ্যাস বিতরণ করিবেন। নাগরিকগণ আহ্লাদের সহিত সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। কারখানা নির্ম্মিত হইল, সহরের প্রত্যেক গৃহে পাইপ বসানো হইল। তারপর ডাক্তার সকলকে জানাইলেন যে, সাজসরঞ্জামগুলি আসিয়া পৌঁছিলেই গ্যাস বিতরণের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবেন।

ইতিমধ্যে তিনি খাঁটি অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া সেই সমস্ত পাইপের ভিতর দিয়া তাহাই চালান দিতে লাগিলেন। এখন ইহা জানা কথা যে খাঁটি অক্সিজেন নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিলে উত্তেজনা স্বভাবতই আসে। কাজেই ঐ সহরে ধীর সুস্থির অধিবাসীরা অজানত অক্সিজেন নিশ্বাসে গ্রহণ করিবার ফলে উত্তেজিত হইতে লাগিল, তাহাদের ঢিমা চালচলন ছাড়িয়া স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া জোর গলায় ও তাড়াতাড়ি নাকে-চোকে-মুখে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল "এ কি ঘুমন্ত প্রাচীন জীর্ণ সহরে আমরা বাস করিতেছি!" তখন তাহারা না বলিয়া থাকিতে পারিল না যে, কি উপায়ে সহরের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। এমন সময়ে, জনৈক নাগরিক বলিল যে টাউন হলে কিছু দূরবর্ত্তী প্রতিবাসী সহরের সঙ্গে এই সহরের দাঙ্গা-কলহের একটা বিবরণ রক্ষিত আছে। নাগরিকগণ তখন সেই বিবরণ বাহির করিয়া পড়িল। পড়িয়া তাহারা খুব ক্ষেপিয়া উঠিল এবং তখনই সেই প্রতিবাসী সহরে গিয়া সহরবাসীদের সঙ্গে মারামারি করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল। অস্ত্রশস্ত্র যাহার যেখানে যাহা ছিল, বাহির করিয়া মারামারি করিতে বহির্গত হইল। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে তাহাদের সেই উত্তেজনা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল—তাহাদের ভিতর হইতে অক্সিজেনের প্রভাব দূর হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহারা ভাবিতে লাগিল আর বলাবলি করিতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ তাহারা কি কুকর্ম্ম করিতেই না উদ্যত হইয়াছে। অবশেষে নিজেদের সহরে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল—সকলে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ডাক্তার সেই সহর হইতে চলিয়া গিয়াছেন। নাগরিকগণ তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। ডাক্তার শুধু অক্সিজেনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা ও পরীক্ষা করিতেছিলেন যে, উহার নিশ্বাস লইলে কি ফল হয়।

এই গল্প হইতে বুঝা যাইবে যে, এক সহরের অধিবাসীরা অপর এক সহরের অধিবাসীদের সহিত মারামারি করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার প্রয়াস কিরূপ অসার! দাঙ্গাকলহ মারামারি কাটাকাটি দ্বারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা নিজেদের সহরের ভাল ভাল কার্য্যের ফলে উন্নতিসাধনের প্রতি যত্ন করাই কি প্রকৃত কল্যাণকর নয়? প্রত্যেক নাগরিক প্রত্যেক পল্লীবাসীর কর্ত্তব্য—রাস্তাঘাট প্রভৃতি যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণ, সেই সকল বিষয়ের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা এবং শুভ প্রতিষ্ঠানসমূহের সমুচিত অনুষ্ঠান করা।

জয়পুর-কথা।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে জয়পুর একটী 'Oasis'। কথিত আছে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। নৈসর্গিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের মিলনও অতি দুর্ল্লভ। কিন্তু জয়পুরে নৈসর্গিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য হরগৌরীর ন্যায় একত্র বিরাজ করিতেছে। জয়পুর প্রাকৃতিক শোভার আবাসভূমি। রাশি রাশি বালুকাস্তূপ ও পর্ব্বতাবলী নীলিমা চুম্বন করিতেছে। অসংখ্য প্রস্তরবিনির্ম্মিত প্রাসাদ ও মন্দিরাবলী নগরীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

হেথায় বহেনা গঙ্গা বহেনা যমুনা,
উন্মাদিতে কলস্বরে কবির কল্পনা।

তথাপি অনন্ত-যৌবনা প্রকৃতি চারিদিকে অনন্ত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে। জয়পুরের উপত্যকা নির্ঝরিণী উদ্যান ও পর্ব্বতাবলী প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে অধিকতর নির্জ্জনপ্রিয় করিয়া তুলে। বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে। কখন নীল আকাশে শুভ্র মেঘখণ্ড চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কখন বর্ষাস্নাত নব পল্লবের উপর সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতেছে; জলদের সঘন গর্জ্জনে অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরীরা প্যাখম ধরিয়া চারি দিকে নৃত্য ও কেকারবে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত করিতেছে; অসংখ্য বন্য কপোতেরা কাল মেঘের ন্যায় মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অতি বৃদ্ধ পিতামহেরাও বিকট চীৎকার করিয়া লাফালাফি করিতেছে। নিদাঘের প্রচণ্ডোত্তাপোৎপীড়িতা প্রকৃতিও সবুজ সাড়ি পরিয়া পর্ব্বতাবলী আলিঙ্গন করিতেছে।

জ্যোৎস্না-বিভাসিত রাত্রিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন শত শত নরনারীর

কণ্ঠধ্বনিতে নগরী প্রতিধ্বনিত হয়। এখানে "গলতা" নামে একটী পবিত্র নির্ঝরিণী আছে। প্রত্যহ শত শত রমণীদিগকে এক-এক ঘটী ইহার পবিত্র জল মস্তকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে যাইতে দেখা যায়। বাঙ্গালী রমণীর মত এখানকার রমণীরা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকে না। এখানকার রমণীরা সদা স্বাধীন বিহগের মত "মুক্ত পক্ষে শূন্য বক্ষে" রাস্তা ঘাটে অকুণ্ঠিতভাবে গান গাইয়া বেড়ায়। সকল সময়েই রাজপুত-রমণীদিগের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। এখানকার নরনারীদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন ইহাদের জীবন একটী 'prolonged idyll' বা দীর্ঘ সুখ-স্বপ্ন। "ঘাট" নামে একটা উপত্যকা আছে। এখানে অনেকগুলি বালুকাস্তূপ ও নির্ঝরিণী আছে। এ জায়গাটা এখানকার পুরুষদিগের আমোদ-প্রমোদের স্থান। "আমের" বা অম্বর জয়পুরের প্রাচীনতম রাজধানী। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। মহারাজ মানসিংহের সময় এই অম্বর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। অম্বর নগর একটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অম্বরপ্রাসাদ বাদশা আকবরের প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত। অম্বরপ্রাসাদের সহিত একটী কিম্বদন্তী আজিও জড়িত আছে। এইরূপ কথিত আছে, যখন সম্রাট আকবর শুনিলেন যে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার প্রাসাদের অনুকরণে অম্বর নগরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তখন তিনি উহা দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এক রাত্রির মধ্যে মহারাজা মানসিংহ ঐ শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলীর উপর plaster বা চূর্ণ লেপ করাইয়া দিলেন। এখনও ঐ সুধাধবলিত হর্ম্ম্যাবলী বর্ত্তমান আছে। বিগত খৃঃ শতাব্দীতে মহারাজা জয়সিংহ, দেওয়ান বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সাহায্যে স্বীয় নামে জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

"জয়সিংহ পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥"

মহারাজা জয়সিংহ একজন জগৎবিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। কাশী দিল্লী ও জয়পুরে তাঁহার মানমন্দির সকল আজিও বিদ্যমান আছে। এইরূপ কথিত আছে, মহারাজা মানসিংহ যশোহর হইতে "শীলাদেবী" নামে একটী কালীমূর্ত্তি আনিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শীলাদেবীর সেবার্থে কতকগুলি পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণও আনিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিরা আজও বঙ্গদেশীয় বলিয়া অহঙ্কার করেন। কিন্তু এক্ষণে ভাষা ও পরিচ্ছদে তাঁহাদের ও এদেশীয় লোকদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহাঁদের অনেকেরই মন্দির আছে। সুপ্রসিদ্ধ "গোবিন্দজী'র মন্দিরও ইহাঁদের হাতে; গোবিন্দজীর মন্দিরের জন্য জয়পুর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। কথিত আছে মহারাজা জয়সিংহ জয়পুর প্রতিষ্ঠা করিয়া গোবিন্দজীর নামে উৎসর্গ করেন। জয়পুরের রাজবংশ লবকুশের বংশ হইতে উৎপন্ন। ইহারা সূর্য্যবংশোদ্ভব, সুতরাং ইঁহারা সূর্য্যোপাসক। "গলতা" পর্ব্বতে সস্ত্রীক সূর্য্যদেবের মন্দির আছে।

এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা রাজপুতদিগের জাতীয় ভাব সকল বিনষ্ট করিতে পারে নাই। কথিত আছে একদা জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজপুতকে "ভিত্তিস্থাপনের" জন্য আহ্বান করা হয়। অনেক নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোকও "ভিত্তিস্থাপন" দেখিতে উপস্থিত হন। যথাসময়ে তাঁহাকে পাশ্চাত্য প্রথানুসারে 'কর্ণিক' দিয়া ভিত্তির প্রথমে ইষ্টক সন্নিবেশ করিতে বলা হয়। তিনি মহাক্রোধে তলোয়ার খুলিয়া বলিলেন, "আমি কি রাজমিস্ত্রী ?"

জয়পুরের অন্তর্ভুক্ত রিন্তাম্বর নামক একটি ঐতিহাসিক দুর্গ আছে। একটি লোমহর্ষণ ও শোচনীয় স্মৃতি আজিও এই দুর্গের সহিত জড়িত আছে। দিল্লীশ্বর বাদশা আলাউদ্দিনের সময় রাজপুতরাজ হাম্বীর রিন্তাম্বর দুর্গে বাস করিতেন। সেই সময়ে মহীমসা নামক জনৈক রাজ-বিদ্রোহী রাজা হাম্বীরের আশ্রয় গ্রহণ করে। বাদশা মহীমসাকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হাম্বীরের প্রতি আদেশ করেন। কিন্তু হাম্বীর এইরূপ রাজপুত রীতিগর্হিত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। সুতরাং বাদশা আলাউদ্দিন তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রিন্তাম্বরের কেল্লার নীচে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। রাজা হাম্বীর যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার রাণীদিগকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "নীল নিশান নত হইলে জানিবে আমরা পরাজিত হইয়াছি।" ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা হাম্বীর বিজয়ী হইলেন। কিন্তু হায় জয়োল্লাসের মধ্যে ঘটনাক্রমে নীল নিশান মুহূর্ত্তের জন্য নত হইল। হাম্বীরের রাণী ও কন্যারা তাঁহার পরাজয় ভাবিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। হাম্বীর জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া রিন্তাম্বরে প্রবেশ করিলেন, আর তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণকে চিতানলে প্রজ্বলিত দেখিয়া আপনিও প্রাণত্যাগ করিলেন।*

---

* 'পুণ্য'।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

গান্ধারী—আড়াঠেকা।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া।
তোমারি মধুরে সকলি মধুর তব পুণ্যগন্ধ পড়িছে ঝরিয়া
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস দিতেছে আমারে পাগল করিয়া।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১ ২´ ৩ •
মা মা। পা -া -া র্সা I র্সা -া র্রা -া। র্সর্র্জ্ঞা া- র্রা -া। র্জ্ঞর্সা -া র্রা ণর্সা।
আ জি কে • • ম ধু • • • • • • • • • • • • • • •

১ ২´ ৩ •
ণা -া দা -া I ণা দা পা -া। ণমা -া মা পা। মপা দা পা মা।
• • • • • • র • • • সু বি ম• • ল প্রা

১ ২´ ৩ •
পা মজ্ঞা -া রা I -া জ্ঞসা -া -া। ণ্া সা মা -া। জ্ঞমা জ্ঞমপা -া মা।
• তে • • • • • • ম র ম • • • • • • • বাঁ

১ ২´ ৩ •
পা -া পা -া I -া পা দা র্সা। র্সা -া র্রা -া। র্সর্র্জ্ঞা -া র্রা -া।
শ • রী • • উ ঠি • ল • • • • • • • • • •

১ ২´ ৩ •
র্জ্ঞর্সা -া র্রা ণর্সা I ণা -া দা -া। ণা দা পা -া। -া মমা -া -া।
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

১ ২´ ৩ • ১
মা পা মপদা -া I পা মপা -া মজ্ঞা। -া রা -া জ্ঞসা। -া রা মা মা। পা -া
বা জি য়া• • • • • • • • • • • • • • আ জি কে •

২´ ৩ •
মা পা I পদা ণা দণর্সা ণা। র্সা ণর্সা র্সা -া। র্সা -া ণা -া।
আ জি না • ••• মে ত •• ব • ও • হে •

১ ২´ ৩ •
র্সা র্রা র্সর্র্জ্ঞা -া I র্রা -া র্জ্ঞর্সা -া। র্সা র্সা র্রা ণর্সা। ণা -া দা -া।
প্রি • য়• • • • • • • • ত ম • • • • • •

১ ২´ ৩ •
ণা দা পা -া I দমা -া মা পা। দা র্সা র্সা -া। র্রা -া র্সর্র্জ্ঞা -া।
• • • • •• • শ ত ন ব গা • • • • • • • •

১ ২´ ৩ •
র্রা -া র্জ্ঞর্সা -া I র্রা ণর্সা ণা -া। দা -া ণা দা। পা -া মমা -া।
• • • • • • •• • • • • • • • • • • ন্

১ ২´ ৩ ০ ১
মা পা মপা দা I পা মা পা মজ্ঞা। -া রা -া জ্ঞসা। -া রা মা মা। পা -া
উ ঠি ছে০ ফু টি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি কে ০

১ ২´ ৩ ০
মা মা I মা জ্ঞমপা মা পা। -া পা -া পা। দা র্রা র্সাঃ র্রঃ।
তো মা রি ০০০ ম ধু ০ রে ০ স ক ০ লি ০

১ ২´ ৩ ০
ণর্সা ণা -া দা I -া ণা দা পা। -া দমা -া মা। পা মপা দা পা।
ম ধু ০ ০ ০ ০ ০ র ০ ০০ ০ ত ব পু০ ০ ণ্য

১ ২´ ৩ ০ ১
মা পা মজ্ঞা -া I রা -া সা -া। ণ্া সা মা -া। জ্ঞমপা মা পা -া। পা -া
গ ০ ন্ধ ০ ০ ০ ০ ০ প ড়ি ছে ০ ০০০ ঝ রি ০ য়া ০

২´ ৩ ০
পা মা I ণদা ণা দণর্সা ণা। র্সা -া র্সা -া। র্সা ণা র্সর্রা র্সর্রজ্ঞা।
সু ম ন্দ ০ ০০০ বা তা ০ স ০ তো মা রি ০ ০০০

১ ২´ ৩ ০
-া র্রর্মা র্জ্ঞা -া I র্রা -া র্জ্ঞর্সা -া। র্রা ণর্সা ণা -া। দা -া ণা দা।
০ নি০ শ্বা ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
পা -া মমা -া I মা পা দা র্সা। -া -া র্সা র্রা। র্সর্রজ্ঞা -া র্রজ্ঞা র্মজ্ঞা।
স ০ ০ ০ দি তে ছে ০ ০ ০ আ ০ মা০০ ০০০ ০০

১ ২´ ৩ ০
র্রা -া র্জ্ঞর্সা -া I র্রর্সা র্রর্সা র্রণা -া। দা -া পদা ণদা। পা -া দমা -া।
০ ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ রে ০ ০০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
মা পা মপা দা I পা মা পা মজ্ঞা। -া রা -া সা। -া রা মা মা। পা -া।
পা গ ল০ ০ ক রি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি কে ০

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১

মোটরের উৎপাত।

ট্রামগাড়ী প্রবর্ত্তনের ফলে ঠিকা গাড়ী ও পাল্কীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, মোটর গাড়ি, মোটর-ট্যাক্সি, মোটর লরি ও ব্যস প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে উহাদের সেই দুর্দ্দশা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সকল মোটরচালিত যানবাহনের সাধারণ চলিত নাম হইতেছে "মোটর"। মোটরের আবির্ভাবে কাজের লোকের খুবই সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ফলে, শুধু কলিকাতা অথবা বড় বড় সহরে নয়, এখন ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই, এমন কি সুদূর শান্তিপূর্ণ পল্লীগ্রামেরও মর্ম্মদেশে বিলাতী চঞ্চলতা খরবেগে প্রবেশ করিতেছে। ইহার পরিণাম যে কি, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা দেখিয়াছি যে, অন্তত উড়িষ্যায় ইহার ফলে পল্লীবাসীদিগের মকদ্দমাপ্রিয়তা তরতর করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। আবার এই মকদ্দমা-প্রিয়তার ফলে "মামলতকার"দিগের (ইংরাজীতে যাহাদিগকে tout বলে) সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা-

দিগের কার্য্যই হইতেছে আত্মীয়স্বজনের পরস্পরের মধ্যে, জমিদার-প্রজার মধ্যে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে গুপ্তশত্রুরূপে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অকারণে বিবাদবিসম্বাদ লাগাইয়া দিয়া সেই সম্বন্ধে একপক্ষের তদ্বিরকারক হইয়া দুপয়সা রোজগারের চেষ্টা করা। ইহার ফলে দারিদ্র্যও বাড়িতেছে এবং মানুষের মন ঘোর অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে এবং বিপ্লববাদে পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহা রুদ্ধ করিবার উপায় কি?

মোটরে কাজের সুবিধা হইলেও তাহার উৎপাতে রাস্তাধারের গৃহবাসীগণ এবং পথিকগণ সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত ও শশব্যস্ত। রাস্তাধারের গৃহবাসীগণ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন যে, কখন্ কোন্ তোয়াক্কায় তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া রাস্তার বাহির হইবে আর মোটরচাপা পড়িবে। পথিকেরাও রাস্তার এপার হইতে ওপারে যাইতে গেলেই বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন যে, দেখিতে দেখিতে কখন একটা মোটর হুস করিয়া ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। এরকম ভয় পাইবার কারণও আছে। এক তো, আজকাল পূর্ব্বের মত মোটর গাড়িগুলো আওয়াজ দেয় না—আজকালকার মোটর গাড়ির নির্ম্মাণপ্রণালীর লক্ষ্যই হইতেছে আওয়াজ না দেওয়া। অনেক সময়ে জানাই যায় না যে, মোটর আসিতেছে কি না। হয় তো পথিক হইতে যখন পাঁচ ছয় হাত দূরে মোটর, তখন সহসা তাহার শিঙ্গাটা বাজিয়া উঠিল। পথিক হতভম্ব হইয়া ঠিক করিতে পারিল না যে, সে কোন্ দিকে সরিয়া পড়িবে, এবং হয়তো ইতস্তত করিতে করিতেই চাপা পড়িয়া গেল।

আর একটা বড়ই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে—ট্রামগাড়ীর সঙ্গে মোটরের টক্কর দেওয়া। অনেক সময়ে মোটর গাড়ী ট্রামের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া নিজেরও সর্ব্বনাশ করে, আর আরোহীদের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। এদিক থেকে একটা ট্রামগাড়ি যাইতেছে, ওদিক হইতে একটা ট্রামগাড়ি আসিতেছে। এখন একটা মোটর গাড়ির চালক ভাবিল যে, সে ঐ দুইটা ট্রামগাড়ি পাশাপাশি আসিতে না আসিতে উহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঝট্ করিয়া বাহির হইয়া আগাইয়া যাইবে। এক-আধটু গণনার ভুলে মোটরগাড়ি বাহির হইতে পারিল না, আর দুইধার হইতে ট্রামগাড়ি আসিয়া পড়িল। মোটরের উপর দুইটা ট্রামগাড়ির প্রবল ধাক্কা লাগিয়া গেল। ট্রামগাড়ি দুইটা লাইন হইতে ছটকাইয়া পড়িল আর মোটরগাড়ীখানি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। আরোহী ও চালকের মধ্যে কেহ বা নিহত হইল আর কেহ বা আহত হইল; এখন তো ঘোড়ার ট্রাম নয়—কাজেই মোটরের ধাক্কার ট্রামগাড়ির বড় বেশী কিছু অনিষ্ট হয় না।

মোটরের উৎপাত হইতে কেবল মানুষ কেন, ট্রাম কেন, ঘোড়াগাড়িও রক্ষা পায় না। মোটরচালকেরা এমন ভাবে চালায় যে, কথায় কথায় ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কা থাকে। মোটর একমাত্র ভয় করে মহিষের গাড়ীকে। চোরের নাই বাটপাড়ের ভয়—মহিষের গাড়ীর ভাঙ্গিবার চুরিবার গোটাকয়েক বাঁশ ছাড়া বেশী কিছু নাই, আর মহিষগুলো গাড়ী প্রভৃতির আঘাতে মরিতে জানে না।

আজকাল কলিকাতায় মোটরগাড়ির সংখ্যা দেখিয়াছি মনে হয় কুড়ি হাজারের উপর, মোটর ট্যাক্সির সংখ্যা হইবে দুই হাজারের কাছাকাছি, মোটরবাসের সংখ্যা হইবে প্রায় পাঁচশত এবং মোটরলরির সংখ্যা হইবে দুই তিন শত। এই অবস্থায় পুলিশপাহারার কড়াক্কড় না থাকিলে কত যে দুর্ঘটনা হইত তাহা বলা যায় না। কড়াক্কড় সত্ত্বেও দুর্ঘটনার সংখ্যা বড় কম হয় না। আজকালকার নিঃশব্দ মোটরগাড়ীতে চড়িয়া খুব দূর দূরান্তরে যাইতে অবশ্য খুবই আরাম আছে—ট্যাক্সিতেও যে নাই, তাহা বলিতে পারি না। এবার মহাত্মা ফোর্ডের কারখানা হইতে খুব ভাল মোটরগাড়ি বাহির হইয়াছে—দাম মাত্র অনধিক দেড় হাজার টাকা। তিনি বলেন যে, জগতের অন্তত অর্দ্ধেক লোককে (every second manকে) মোটর চড়াইবেন—কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

মোটর আর কাহাকেও ভয় করুক বা নাই করুক, অন্তত দুইটা জিনিষের কাছে সে খুব জব্দ থাকে—একটা হইতেছে ট্রামগাড়ী, অপরটা হইতেছে কলিকাতার বর্ষা। ট্রামগাড়ীর সঙ্গে যদি ধাক্কাধুক্কি লাগে, তবে একে ট্রাম-কোম্পানি খাস বিলাতি ইংরাজ কোম্পানি, তায় আবার ট্রামগাড়ী নির্দ্দিষ্ট লাইনের উপর দিয়া চলিতেছে; সুতরাং মোটরের চালকের পক্ষে সাক্ষ্যবল খুব প্রবল না হইলে ট্রামচালক নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইবারই অধিক সম্ভাবনা এবং মোটরের চালক ও মালিকেরই ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবার সম্ভাবনা।

কলিকাতায় বর্ষার জল বাহির হইবার এমনই সুন্দর ব্যবস্থা আছে যে, একপসলা ভারী জল হইলেই রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া যায়। সে জলে ঘোড়াগাড়ি, রিক্স প্রভৃতি কষ্টেসৃষ্টে হইলেও কোনপ্রকারে চলিতে পারে। কিন্তু মোটরগাড়িগুলির কল খুব নীচে থাকায় প্রায়ই অনেক সময়ে সেই কলের ভিতর জল ঢুকিয়া যায়; তখন আর কল চলিতে চায় না। কাজেই বর্ষার সময় অনেক দিনই দেখা যায় যে, রাস্তায় চলিতে চলিতে অনেক মোটর দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তখন, সাগরের

মধ্যে দ্বীপের মত, অন্তত ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপগুলির মত এখানে একটা, ওখানে একটা এই ভাবে অনেকগুলি মোটর সুদৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায়। সুখের বিষয় যে, সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন এই জলদাঁড়ানো দূর করিবার চেষ্টায় একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

সেকালের গাড়ি-ঘোড়া।

ঘোড়াগাড়ির আমলে যে রকম একটা সুন্দর দৃশ্য দেখা যাইত, মোটরগাড়ির আমলে সেরকম দৃশ্য আর দেখা যায় না। এই বড় বড় ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, ফীটনগাড়ীগুলো দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুদৃশ্য আরব্য ঘোড়া বা ওয়েলার ঘোড়া লাগান আছে; প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বড় বড় গাড়িতে জুড়ি ঘোড়াই যোতা হইত—রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঘোড়াগুলো ঠকাঠক পা ফেলিতেছে, আর মাথা নাড়িতেছে। গাড়িগুলিও এত বর্ণে রঞ্জিত, আর ঘোড়াগুলিও যে কত বর্ণের তাহার ঠিকানা নাই—সাদা জুড়ি, লাল জুড়ি, কালো জুড়ি আবলগ জুড়ি ইত্যাদি। ঘোড়াগুলোকে আরও সুদৃশ্য করিবার জন্য তাহাদের মাথায় দুইপার্শ্বে কাণের দিকে হয়তো ছোট ছোট ঝালোর লাগানো হইয়াছে; বর্ম্মা টাটু হইলে তাহাদের গলায় দুইপার্শ্বে সাজের সঙ্গে ঠুংঠুংকি ঘণ্টা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোচমান পরিয়াছে চুড়িদার পায়জামা, তদুপরি চাপকান এবং মাথায় তকমাবিশিষ্ট শামলা; সহিসেরা হাঁটুতে বাঁধা পায়জামা, তদুপরি চাপকান এবং মাথায় ঐরূপ শামলা। ক্রমে সহিসদের চাপকান পরিবর্ত্তন হইয়া কোটে পরিণত হইল—সেটা দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও তাহাদের লাফানো ঝাঁপানো দৌড়ঝাঁপের বেশী উপযোগী হইয়াছিল।

বাবুরা গাড়ীতে যেই উঠিতে যাইতেছেন, অমনি কোচমান সহিস সকলেই একেবারে মাথা নোয়াইয়া "শ্রীবাভজাভিরামং" মত্ত মত্ত সেলাম ঠুকিল। সেলাম পাইয়া বাবুদের বুক দশহাত ফুলিয়া উঠিল—আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত হইল। বাবুরা যেই গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, অমনি একদিকের সহিস জোরে আওয়াজের সঙ্গে পাদানি উঠাইয়া বন্ধ করিল এবং দুই সহিসই ওড়াক করিয়া গাড়ীর পিছনে উঠিল। গাড়ি ফটক পার হইতে না হইতে উচ্চস্বরে দরকারে অদরকারে "হেইয়ো"—করিয়া কি হাঁক, এবং চলিবার পথেও মধ্যে মধ্যে সেই প্রকার হাঁক—এখন যেমন মোটরগাড়িগুলো দরকারে অদরকারে শিঙা বাজায়। সহিসদের সেই হাঁক শুনিয়া আশেপাশের বাড়ীর লোকেরা জানিতে পারিত যে, বাবু বাহিরে যাইতেছেন বা বাড়ী আসিতেছেন। তাহা একপ্রকার ছিল মন্দ নয়—হায়! এখন আর সে নবাবীদৃশ্য দেখিবার আশা করা বৃথা। এখন সমস্ত মোটরগাড়ীই দেখিতে প্রায় একই রকম—বড় একঘেঁয়ে। প্রায় সকলগুলিরই আচ্ছাদন কেম্বিস (Canvass) কাপড়ে প্রস্তুত। খুব ধনী লোকের কয়েকখানি গাড়ির ভিতরটা নানাবিধ সাজে সাজান থাকে বটে, কিন্তু তাহা বাহিরের লোকে কে-ই বা দেখিবে? এই সকল ধনীলোকের গাড়ীর আরোহীগণ যখন রাত্রে গাড়ীর ভিতরকার বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়া দেন এবং সেই আলো যখন তাঁহাদের মুখচন্দ্রে নিপতিত হয়, তখন জানি না তাঁহারা তাহাতে কি তৃপ্তি লাভ করেন এবং জানি না, দর্শকেরাই বা ক্ষণেকের জন্য তাঁহাদের সেই আলোকদীপ্ত মুখচন্দ্র দেখিয়া কতদূর কৃতার্থ হন।

মোটর সাইকেল।

মোটর গাড়ীগুলির উৎপাতে তো বাঁচি না—তাহার উপর মোটর সাইকেলের জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ। বাইসিকেল বা দ্বিচক্র যানে একটা চলিবার যন্ত্র বা মোটর লাগাইয়া দিলেই মোটর সাইকেল হইল। তাহার সেই পটপটা ধ্বনিতে সময়ে সময়ে ঘোড়াগুলো চমকাইয়া উঠিয়া ঘোড়াগাড়ীর আরোহী ও কোচমান প্রভৃতিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তোলে। এই পটপটা ধ্বনি হইতে উড়িষ্যা ও বেহারের অধিবাসীরা ইহাকে 'ফটফটিয়া' বলে। মধ্যবিত্ত অনেক লোক মোটর সাইকেল রাখিতে চান—কারণ এই যে, ইহার লাইসেন্স করিবার দর্শনী কম লাগে, রেলগাড়ীতে দেশবিদেশে সহজে লইয়া যাওয়াও যায়, আর ভাড়াও কম লাগে। এই মোটর সাইকেলের সঙ্গে একটা বসিবার বাক্স লাগাইয়া দিলেই একটী বন্ধুও সঙ্গে যাইতে পারে বা হাটবাজারের জিনিসপত্রও সঙ্গে আনা যাইতে পারে। দুইটী কারণে ইহার তেমন "চল" হইতেছে না। একটী হইতেছে, বাইসিকেলের তুলনায় ইহার দাম বড় বেশী—কোথায় ৫০৲ থেকে ১০০৲ বা ১৫০৲ টাকা, আর কোথায় ৭০০৲ থেকে ১০০০৲ টাকা। দ্বিতীয়টী হইতেছে, সকলে ইহার কলকারখানা বুঝিতে পারে না;

মোটর গাড়ীর আবির্ভাবে সম্ভ্রমের প্রাচীন ধারণার অন্তর্দ্ধান।

মোটর গাড়ীর আবির্ভাবে সম্ভ্রমের ধারণা, বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে, সবই উল্টাইয়া গিয়াছে। আমরা যখন স্কুলে পড়িতে যাইতাম, তখন আমাদের গাড়িতেই আমাদের ভগ্নীরাও স্কুলে যাইতেন। সে সময়ে স্কুলের ছেলেরা তঁহাদের প্রতি এমন এক আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে দেখিত যে মনে হইত তাহারা জীবনে তাহাদের মাতা, ভগ্নী বা কন্যাকে দেখে নাই। তখনকার সাধারণ ধারণা ছিল মনে হয় যে, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর ছাড়িয়া পদব্রজে দূরে

থাক, গাড়ীতে চড়িয়াও বাহিরে বাহির হইলেই তাহাদিগকে কামদৃষ্টিতে না দেখিলে জীবন সার্থক হয় না। এই প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখেও কর্ত্তব্যবোধে ব্রাহ্মসমাজ ছেলেমেয়েদিগকে স্কুলে দিতেও বিরত হন নাই বা মহিলাদিগকে যথাযুক্ত স্বাধীনতা দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

বহুকাল যাবৎ এই ভাবে অনেক কষ্টে স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম কোন প্রকারে বজায় রাখা হইত। কিন্তু স্ত্রীলোকেরাও যে পূজার্হ, মাতৃবুদ্ধিতে তাহাদিগকে দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত হিন্দুধর্ম্মের এই মহাসত্য অন্তঃসলিলভাবে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভিতরে স্বাভাবিকভাবেই কার্য্য করিতেছিল সন্দেহ নাই। অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় সভ্যদিগের সংস্থাপিত দাসাশ্রম ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবাব্রত জনসাধারণের অন্তরে মানবসেবার এক নবতর ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বিগত অর্দ্ধোদয়ের পুর্ণযোগ উপলক্ষে এই কলিকাতায় প্রায় ১২ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান উপলক্ষে সমাগত হইয়াছিল। তখন ঐ নারীদিগের পূজার্হতার মহাসত্য এবং মানবসেবার মহাব্রত, এই উভয়ভাব মিলিত হইয়া সহসা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই সময়ে স্বেচ্ছাসেবকদিগের ভিতর দিয়া যুবক ও বালকদিগের অন্তরে মাতৃভাবের একটা প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা প্রকাশ্য ও স্বাধীনভাবে কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ হইলেন। মহিলাদিগের প্রতি যুবক, এমন কি, বালকদিগেরও, কামদৃষ্টিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেন মন্ত্রের বলে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আজকাল প্রকাশ্য ও নির্ভীকভাবে মহিলাদিগের রাস্তায় চলাফেরা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

অবশেষে যেটুকু বাধা ছিল, মোটর গাড়ীর আবির্ভাবে সেটুকু বাধাও ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা দেখিয়াছি, অতিরক্ষণশীল হিন্দুপরিবারের বধূ মোটর নিজে চালাইতেছেন; সিদ্ধেশ্বরীতলায় আসিবামাত্র মুহূর্ত্তের জন্য মোটর একবার দাঁড় করাইয়া গাড়িতে বসিয়া বসিয়াই সিদ্ধেশ্বরীর উদ্দেশে এক প্রণাম ঠুকিয়া আবার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিলেন। অপর দিকে দেখি, কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়েরই বালিকা ও প্রৌঢ় স্ত্রীলোকেরা আজ কাল স্কুলে, সমাজে অনেকটা অবাধে যাতায়াত করেন।

বর্ত্তমানে ভদ্রমহিলাগণ ট্রামগাড়ীতে এবং মোটর ব্যসেও যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ট্রামগাড়িতে বা মোটর ব্যসে যাতায়াত বর্ত্তমান অবস্থায় মহিলাদিগের সম্ভ্রমরক্ষায় উপযোগী বলিয়া মনে করি না, সুতরাং পছন্দ করি না। কিন্তু পদব্রজে বা মোটরগাড়িতে মহিলাদের গতিবিধি কেন বন্ধ করা হইবে তাহার কারণ দেখি না। ট্রামে বা মোটর ব্যসেও যদি কতকটা স্থান মহিলাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল যানে যাতায়াত মহিলাদিগের সম্ভ্রমনাশক হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষত, আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমরা কালের গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিব না—কালোহি বলবত্তরঃ। মহিলাদের যখন আর সে "পর্দ্দার" ব্যবস্থা আবশ্যক হইল না, বরঞ্চ তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইল, তখন অগত্যা অল্পে অল্পে পাল্কী ও তাহার ঘেরাটোপের ব্যবস্থাও অন্তর্হিত হইয়া গেল; মহিলাদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা করিয়া রাখিবার প্রথাও উঠিয়া গেল। অধিক কথা কি, যে মুসলমানদিগের নিকট আমরা কঠোর অবরোধ বা জেনানা প্রথা ধার করিয়া লইয়াছি, আজ অনিবার্য্য প্রয়োজন বশত সেই মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান বিচরণক্ষেত্র তুরস্ক, আফগানস্থান প্রভৃতি স্থান হইতেও "পর্দ্দা" প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে—necessity has no law—প্রয়োজনের নিকট আইন-কানুন খাটে না।

এরোপ্লেন বা বিমানযান।

আমরা যে কেবল মোটরগাড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছি তাহা নয়। এই তো সে দিন কয়েকটী ভদ্রমহিলা, অবশ্য আমরা যাঁহাদিগকে অগ্রেসরা বা more forward বলিতে পারি, তাঁহারা বিমান-যানে (Aeroplane) চড়িয়া দমদমা হইতে কলিকাতার উপরে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। আমাদের পিতৃপিতামহদের কেহ কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন যে, বাঙ্গালী মেয়েরা, সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কুলবধূরা বিমানযানে অকুতোভয়ে কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিবেন? দেখা যাক, ইহার পরেও আমাদের অদৃষ্টে আরও কি আছে?

বলদ ও মহিষগাড়ি।

মোটরলরি বা বোম্বাই গাড়ি বলদ ও মহিষগাড়িকে এবং মোটর গাড়ি ও ট্যাক্সি ঠিকাগাড়িকে অনেক পরিমাণে হটাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হটাইতে পারে নাই—এখনও প্রায় হাজার দুইতিন ঠিকাগাড়ী কলিকাতার রাস্তাঘাটে আরোহী ও মালপত্র লইয়া চলাফেরা করে। ঠিকা গাড়িকে যদি বা অনেকটা হটাইয়া দিয়াছে, কিন্তু বলদগাড়ী বা মহিষশকটকে বিশেষ স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বলদগাড়ীই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছিল। সহসা দেখি, কলিকাতায় দুই একটা মহিষযোতা গাড়ির আবির্ভাব হইল। প্রথম প্রথম মহিষযোতা গাড়ী দেখিয়া এতই ভয় হইত যে, আমরা তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে সাহস করি-

তাম না। আর ভাবিতাম যে এতবড় মহিষজোড়াকে শকটওয়ালা চালাইবে কি প্রকারে? বলদেরা মহিষ অপেক্ষা সহজে বশ মানে, কিন্তু মহিষেরা গ্রীষ্মকালে যখন রৌদ্র-তাপে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, তখন তাহাদিগকে সামলানো বিষম দায়। আজকাল মহিষদের বড় কষ্ট হয়, এই অছিলা ধরিয়া কয়েকজন ইংরাজ মহিষগাড়ি কলিকাতা হইতে তুলিয়া দিবার জন্য আড়েহাতে লাগিয়াছেন—তাঁহাদের অভি-প্রায় এই যে, একটা দরখাস্তে হাজার হাজার, প্রধানত ভারতীয়, লোকের স্বাক্ষর করাইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আইন প্রণয়নের অনুকূলে পেশ করিবেন। অনেকে সন্দেহ করেন যে, এই বলদ ও মহিষের প্রতি অতিরিক্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ইংরাজেরা কোন না কোন প্রকারে মোটর-গাড়ীর কারখানার সহিত সংলিপ্ত আছেন। বলা বাহুল্য, একথা তাঁহারা অস্বীকার করেন। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানরাই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় মহিষ প্রবর্ত্তিত করে। মহিষের গাড়ীতে গাড়োয়ানদের একটু সুবিধা আছে। বলদের গাড়িতে যেখানে সাধারণত অনধিক ২০ মণ বোঝা যাইবে, মহিষের গাড়িতে সেখানে অন্তত ৩০ মণ বোঝা স্বচ্ছন্দে লওয়া যাইতে পারে—অনেক সময়ে গাড়োয়ানরা ৪০ মণেরও কাছা-কাছি মাল চাপাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এক বোঝাইতে বলদগাড়ি অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ মজুরি লাভ হইল; এখন ইচ্ছা করিলে একদিন ঘরে বসিয়া তাড়ি খাইয়া মাদল বাজাইলে চলিতে পারে। এখন মহিষের শকট কলিকাতার সর্ব্বত্রই ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই প্রকার মহিষশকট ছাইবার আর একটী কারণ বোধ হয় যে, মহিষ অপেক্ষা বলদগুলি গোবসন্তের মড়ক লাগিলে শীঘ্র আক্রান্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোটরলরি দ্বারা শকটগাড়ী বিতাড়িত না হইবার কারণ আমার মনে হয় যে লরিগুলি চওড়া হইবার কারণে গলিঘুঁজির ভিতরে প্রবেশের সুবিধা পায় না, শকটগুলি সে সুবিধা-টুকু পায়। লরির দ্বারা শকট গাড়ী পরাহত হইলে আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক অনাহারের কবলে পড়িবে এবং বিদেশের অনশনক্লিষ্ট লোকেরা খাইয়া পরিয়া বাঁচিবে?

নিদ্রা।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়)

শ্রান্তি ক্লান্তি শোক তাপে হৃদয় বিকল,
মানব লভিয়া নিদ্রা পায় নব বল।
হৃদয়ের তন্ত্রীচয় বেসুরা যখন,
অবশ উত্যক্ত ক্লান্ত ভাবগ্রাহী মন—
অপরের সুখ দুঃখ বেদনা মিনতি,
পারে না জাগাতে যবে প্রাণে অনুভূতি,
অলস শিথিল অঙ্গ, কর্ম্মে স্পৃহাহীন,
অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি বদন মলিন,—
তখন আসিয়া নিদ্রা অবসর স্মরি,
তাপিত প্রাণের তাপ লয়ে যায় হরি'।
কিন্তু শুধু তাপ হরি' সন্তুষ্ট সে নয়,
তাহার গুণের কভু তুলনা না হয়।
বিরহিণী পতি তার স্বপ্ন-ঘোরে পায়,
অপুত্রক পুত্র তার দেখিবারে ধায়,
জ্ঞানী লভে আত্মজ্ঞান, দরিদ্র রতন,
আশার অরুণ ছটা দেখে অকিঞ্চন।
গবেষণা করি যার অর্থ নাহি হয়,
সুন্দর মীমাংসা হয় সুষুপ্তি সময়।
অত্যাচারী দুরাচার পাষণ্ড দুর্জ্জন,
তাহার প্রভাবে দেখে শিয়রে শমন।
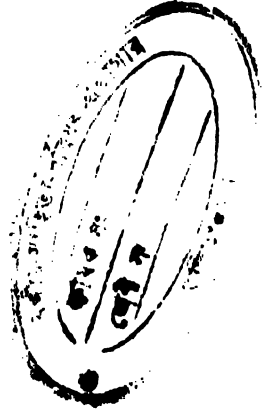
Selections from "Hinduism."

(By Sukumar Haldar.)

Beliefs, Alien, dealing with—In dealing with alien beliefs, our endeavour must be, not simply to refrain from injustice of word or deed, but also to do justice by an open recognition of positive worth.—(Herbert Spencer).

Conquered race and religious rectitude—A conquered race should never aspire to a better condition than that of more abject bondsmen so long as their religious and moral rectitude does not reach a standard sufficiently high to command the respect of their masters.

God and his teachers—

God sends his teachers into every age
and clime,
With revelations suited to their growth."
(Lowell)

Hinduism, Present, what it is—Hinduism is not only a social oganisation resting upon caste; it is also a religious federation based upon worship. As the various race elements of the Indian people have been welded into caste, so the simple old beliefs of the Veda, the mild doctrine of

Buddha and the fierce rites of the non-Aryan tribes have been thrown into the melting pot, and poured out thence as a mixture of alloy and dross to be worked up into the Hindu gods. (The Indian Empire—W. W. Hunter).

HINDU SCIENCE AND LITERATURE, EUROPEAN ANTIPATHY TO—Those who are aware that there is any literatuie, philosophy, science or poetry among this singular people, either disdain all inquiry as to its character or value, with the sweeping condemnation of oriental extravagance and hyperbole ; or look upon it with suspicious animosity as impiously pretending to an antiquity higher then the Bible, and as having furnished feeble indeed but offensive arguments against revealed religion. So strong is this fealing of contempt, of jealousy or of indifference that the later volumes of the Asiatic Researches have not fouud any bookseller who would venture to republish them in England. (Quarterly Review Septr, 1841).

HINDUISM, EXOTERIC—Exoteric Hinduism today has scarcely a single element of unmixed good to boast of. The rites of religion and the ceremonials of society scarcely exhibit a single aspect which is in any way calculated to impress favourably a superficial foreign critic. To these, indeed, are due in a great measure the thousand woes that are telling on the present generation of Hindus.

INDIA, DEGRADATION OF AND ITS CAUSE—Unfortunately, there has been no religious and moral advancement in India at all commensurate with the vast amount of intellectual progress that has been achieved. On the contrary, India has perceptibly deteiiorated in this respect. To the want of a strong moral back-bone, so to speak, the present political degradation of India and its thousand miseries are mainly due.

OM, MEDITATION ON—Meditation on the syllable 'OM' consisted in a long continued repetition of that syllable with a view of drawing the thoughts away from all other subjects and thus concentrating them on some higher object of thought of which that syllable was made to be the symbol. The concentration of thought EKAGRATA or one-pointedness, as the Hindus call it, is something to us almost unknown.Our minds are like kaleidoscopes of thoughts in constant motion ; and to shut our mental eyes to everything else while dwelling on one thought only, has become to most of us almost as impossible as to apprehend one musical note without harmonies. The loss may not be altogether on our side, yet a loss it is.* (The Sacred Books of the East Vol I.)

RELIGION. ESSENTIAL FOR HAPPINESS—There can be no true happiness when its essential elment—the salutary influence of religion is wanting.

RELIGION, BASIS OF SOCIETY—The religion is "The basis of civil society, and the source of all good and of all comfort."—(Edmond Burke)

RELIGION OF HINDUSTHAN, ITS, ANTIQUITY—The religion of Hindusthan is in a sense as old as its snowy mountains. It is practically impossible to determine the period of its origin, and to trace its growth, development, ramification and decline. The Christian scholar is ill fitted for the task. He cannot conceive of a period anterior to 4004 B. C. which was "the beginning" when God created "the heaven and the earth." The Hindu, on the other hand, with all his fervour, and enthusiusiasm, would look back, to find its origin through a vista of countless ages, to the very dawn of creation.

SACRED BOOKS OF THE EAST—The sacred books of the East are no longer a mere bluff for the invectives of missionaries or the sarcasms of philosophers. They have at least been recognised as historical documents, aye, the most ancient documents in the history of the human mind, and as paleontological records of an evolution that begins to elicit wider and deeper sympathies than the nebular fromation of the Planet on which we dwell for a season, or the organic development of that chrysalis which we call man. (Maxmuller)

TRANCE—Even that third state of being, which the Indian sage recognises as being rightly between the sleep and the waking, aud describes imperfectly by the name of Trance, is unknown to the children of the

northern world; and few but would recoil to indulge in, regarding its peopled calm as the MAYA or delusion of the mind (Bulwer Lytton)

HINDUISM MOST TOLERANT RELIGION

Believing as I do in the influence of heredity being born in a Hindu family, I have remained a Hindu, I should reject it if I found it inconsistent with my moral sense or my spiritual growth. On examination I have found it to be the most tolerant of all religions known to me. Its freedom from dogma makes a forcible appeal to me in as much as it gives the votary the largest scope for self-expression. Not being an exclusive religion, it enables the followers of that faith not merely to respect all the othet religions. but it also enables them to admire and assimilate whatever may be good in the other faiths. Nonviolence is common to all religions but it has found the highest expression and application in Hinduism (I do not regard Jainism or Buddhism as separate from Hinduism). Hinduism believes in the oneness not of merely all human life but in the oneness of all that lives. Its worship of cow is, in my opinion, its uniquec contribution to the evolution humanitarianism. It is a practical application of the belief of in the oneness and, therefore, sacredness of all life.—(M. K. Gandhi—
The Message.)

বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

(শ্রীপঞ্চানন রায় কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদিত)

বীজ বপন

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজনীতিজ্ঞগণের অন্যতম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বপ্রেমিক চার্লস গ্রাণ্ট "গ্রেটবৃটনের এসিয়াস্থ প্রজাপুঞ্জের সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ" নামক তদীয় বিখ্যাত নিবন্ধে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়গণের শিক্ষাসংক্রান্ত অবস্থার উন্নতি বিষয়ে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু তখন অর্থও যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল কর্ম্মীর সংখ্যাও তেমনি অল্প ছিল। গ্রাণ্ট সাহেবের চীৎকার "অরণ্যে রোদন" হইয়া দাঁড়াইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গালা দেশে প্রাথমিক দেশীয় শিক্ষা প্রচলিত হয়। মিঃ ইলারটন ঐ সময়ে মালদা সহরে কয়েকটী দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ মে নামক জনৈক পাদরী, চুঁচড়ার ওলন্দাজ-দুর্গে তাঁহার আদি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ষোল এবং উহাদের ছাত্রসংখ্যা ৯৫১ হইয়া দাঁড়ায়। শীঘ্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঐ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা হইল ছাব্বিশটী। ইহা ছাড়া চুঁচড়া হইতে ছয় মাইলের মধ্যে আরও দশটী বিদ্যালয় ছিল। মিঃ মে ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ প্রতি তিন মাসে খাটবার করিয়া ঐ সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস ঐ বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক ছয়শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে তদীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে লেখেন যে "নগণ্য হইলেও মহনীয় গ্রাম্য শিক্ষক-শ্রেণীর (পাঠশালাসমূহের গুরুমহাশয়গণের) দাবীই এই বিতর্কে সর্ব্বাগ্রগণ্য।"

শিক্ষকগণের জন্য বিদ্যালয়

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল ২১৩৬ এবং গ্রাম্য শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় (নর্ম্মাল স্কুলগুলির মতই 'গুরুট্রেনিং স্কুল) উন্মুক্ত হইল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ছত্রিশটী বিদ্যালয় ও উহাদের ছাত্রসংখ্যা হইল তিন সহস্র। মিঃ মের মৃত্যুর পর, মিঃ পিয়াসন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। মিঃ মের কার্য্যকারিতা এতদূর অনুরাগ উদ্রিক্ত করিয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মার্কিন বন্ধুগণ বঙ্গদেশে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি চার্লস লসিংটন তাঁহার "কলিকাতার ধর্ম্ম ও পরোপকারমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাসে" (History of Calcutta Religious and Benevolent Institutions) বলেন যে "এই বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই উত্তরকালে ব্যাপকভাবে উচ্চতর শিক্ষা প্রচার হওয়া সম্ভব হইয়াছিল—ইহা নিশ্চিত বলা যায়।" এই বিদ্যালয়গুলি বেল ও ল্যাঙ্কাস্টার প্রচলিত পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইত। মিঃ মেই প্রথম ঐ পদ্ধতিসমূহ প্রচলন করিয়া সফলতা লাভ করেন। সরকার বাহাদুর কালনা ও চন্দননগরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন ও হারলী নামক পাদরীদ্বয়ের সাহায্যগ্রহণ করেন। দলে দলে ছাত্র আসিয়া বিদ্যালয়সমূহে যোগদান করিতে লাগিল বটে কিন্তু পথপ্রদর্শকগণের উদ্যম অনুসৃত হইল না। তথাপি দেশীয় ভাষায় তাঁহারা জ্ঞানের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন—তাহারই ফল বাঙ্গলার ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ।

এই আদিম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য বাঙ্গলা

ভাষায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচিত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন ও হারলীর পরিচালনাধীনে চুঁচড়ায় সতেরটী বিদ্যালয়ে দেড় হাজার ছাত্র এবং বাঁকীপুরে বারটী বিদ্যালয়ে ১২৬৬ জন শিশুছাত্র হইয়াছিল; সরকার বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মাসিক আট শত মুদ্রা ব্যয়ে মাদ্রাজের পদ্ধতিতে এইগুলি পরিচালিত হইত। ডাঃ বেলের "বিদ্যালয়গঠনসম্বন্ধীয় উপদেশ" অনূদিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা এইগুলিতে ছাত্রগণ দ্রুত শিক্ষালাভ করিতে পারিত। সুতরাং কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর্স এই সকলের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

প্রথম বিদ্যালয়

মিঃ মে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের অগ্রদূত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথমভাগে—যখন নাম মাত্র আয়ে dissenting minister রূপে তিনি চুঁচড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন—বিনা বেতনে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে আবৃত্তি-লিখন ও গণিত শিখাইবার উদ্দেশ্যে বাসভবনেই প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথম দিন ষোল জন ছাত্র বিদ্যালয়ে যোগদান করিল। আগষ্ট মাসের ভিতরেই ছাত্রসংখ্যা অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহটীতে স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হইল না। চুঁচড়ার কমিশনার মিঃ ফর্বসের সাহায্যে দুর্গের ভিতরে (এখনও বর্ত্তমান) একটী প্রশস্ত কক্ষ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অক্টোবরের প্রারম্ভে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল ৯২; ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চুঁচড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রামে তিনি একটী শাখা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী জুন মাসে—তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টার পর এক বৎসর অতীত না হইতেই—তিনি ষোলটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ৯৫১ জন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়সমূহে যোগদান করে।

বাঙ্গালীদের কুসংস্কার মিঃ মের কার্য্যের প্রারম্ভকালে কতকটা বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালাসমূহের গুরুমহাশয়েরাই ছিলেন সেই সকল বাধা সৃষ্টি করিবার মূল। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, মিঃ মে তাঁহার ছাত্রগণকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে ইচ্ছুক। এইরূপ একটা ভীতি কতক লোকের মনে ইতিপূর্ব্বে জাগিয়াছিল। যাহা হউক তাঁহার সুকৌশলে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শীঘ্রই সমস্ত অবিশ্বাস দূর হইয়াছিল। গুরুমহাশয়দিগের প্রতিবন্ধকতা সুচিরস্থায়ী হইল না, কারণ নূতন প্রণালী অনুযায়ী শাখা-বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় কতকগুলি অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়া উঠিল; মিঃ মে অনেক সময় গুরুমহাশয়দিগের ভিতর হইতেই ঐ সমস্ত শিক্ষক সংগ্রহ করিয়া লইতেন।

সরকারী সাহায্য

মিঃ ফর্বস্, মিঃ মের কৃতকার্য্যতা ও বাঙ্গালী জাতির সহিত ভাবের আদানপ্রদানের সুন্দর আদর্শ-প্রণালীর দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মিঃ ফর্বস্ সুশৃঙ্খলে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাহায্য-প্রদান বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, মিঃ মের কার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ছয়শত টাকা সাহায্য অর্পিত হইল। কয়েকজন বাঙ্গালী কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিঃ মের বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কিছু কমিয়া যায়। ঐ বিদ্যালয়গুলি কতকটা বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন ও কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আচরণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, মিঃ মের বিদ্যাদানপদ্ধতি যেমন কাহারও চিরন্তন সংস্কারে আঘাত করে না তেমনি দুরূহ শিক্ষাপদ্ধতি হইতে ইহা উন্নততর প্রণালীতে পরিচালিত। এই পদ্ধতিতে আশাতীত ফল লাভ হইতে লাগিল।

দুর্গের ভিতর শিশুছাত্রগণের যোগদান অসুবিধাজনক হওয়ায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টী চুঁচড়া হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থানান্তরিত করা হইল। অনন্তর মিঃ মে বিদ্যালয় ও ছাত্রগণের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া—১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২১৩৬—শিক্ষকগণের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার কল্পনার প্রসার ও শিক্ষাদান পদ্ধতির স্থায়িত্বের জন্য ইহা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য কয়েকজন যুবককে শিক্ষানবিশরূপে গ্রহণ করা হইল। তাঁহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত কোন খরচ লওয়া হইত না। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন 'সর্দ্দার পোড়ো'র কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া মিঃ মের নিকট বিশেষ ভাবে শিক্ষা পাইলে পর, তাঁহারা গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রেরিত হইতেন। অনন্তর সেই সেই বিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাদান-প্রণালী নিখুঁত ভাবে শিক্ষা করিবার পর, তাঁহারা শিক্ষাদান কার্য্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

বর্ণগত কুসংস্কার

বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ এবং আরও দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যেকে এক-একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা তিলকচাঁদ পরে তাঁহার বিদ্যালয়টী পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন। সর্ব্ব প্রথম অবস্থা হইতেই এই একটী বিষয় লক্ষ্য হয় যে, যে সমস্ত ছাত্র বিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করিয়া-

ছিল তাহাদের একতৃতীয়াংশ ব্রাহ্মণ। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ-বালকেরা অন্যজাতীয় বালকগণের সহিত একই মাদুরে (ছাত্রগণ মাদুরে উপবেশন করিত, এখনও গ্রাম্য পাঠশালাগুলিতে বড় বড় মাদুর ব্যবহৃত হয়) উপবেশন করিতে চাহিত না। শিক্ষকগণও প্রথমতঃ একই রকম আপত্তি উত্থাপন করিতেন। এই কুসংস্কার ক্রমশঃ দুরীভূত হইয়া যায়।

মিঃ মে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ঐ সময় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ছত্রিশটী এবং তিন হাজারের উপর বাঙ্গালী ছাত্র ঐ বিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান একত্র একই ভাবে মিঃ মের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও বিজ্ঞতা উপলব্ধি করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মিঃ পিয়ার্সন, মিঃ হার্লের সহকারিতায় তুল্য শক্তি প্রয়োগে ও সদ্বিবেচনা সহকারে কার্য্যভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

খৃষ্টীয় প্রচারকগণের সম্পর্কীয় প্রাথমিকশিক্ষা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত দুইটী বিদ্যালয়কে লইয়া কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে আরম্ভ হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা দাঁড়ায় দশ এবং ছাত্রসংখ্যা হাজার, মাসিক ব্যয় ২৪০৲ টাকা। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্টকে তদীয় কার্য্যের প্রারম্ভে যথেষ্ট বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে উৎসাহ সহকারে এই জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল যে, কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট তাঁহার ছাত্রগণকে জাহাজে করিয়া বিলাতে লইয়া যাইবার মতলব করিতেছেন। তখন কোন পুস্তকে যীশুখৃষ্টের নাম মাত্র উল্লেখ থাকিলেও তাহা পাঠ করা নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্দ্ধমানে পাঁচটী গ্রাম্য পাঠশালা ছিল। ঐসকল পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা—পাছে পাদরীরা তাঁহাদের পাঠশালা ভাঙ্গাইয়া লন—এই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট গ্রামের যোগ্যতম বাঙ্গালীদের ভিতর হইতেই তাঁহার শিক্ষক শ্রেণী বাছিয়া লইতেন এবং এইরূপেই তিনি প্রতিবন্ধকতার বিপক্ষে জয়লাভ করিলেন—ঐ পাঁচটী পাঠশালাও শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল।

বাঙ্গালীর দৈন্য।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বচনসর্ব্বস্ব বলিয়া বাঙ্গালীজাতির যে কলঙ্ক আছে, তাহা দিন দিন যে বিধৌত হইয়া যাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজকাল অনেকে নানারূপ ব্যবহারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। শিক্ষাভিমান খর্ব্ব করিয়া অনেকে শিল্পবাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতেছেন। চরকার সাহায্যে হাতে কাটা সুতা এবং বস্ত্রবয়ন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যে এমন একটি সময় আসিয়া পড়িয়াছিল যে, সৌখীন বিদেশীয় দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই আমাদের চক্ষে লাগিত না। আমরা বিদেশজাত দ্রব্যের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিদেশীয় পরিধেয় বস্ত্র এবং বিদেশীয় সস্তা শীতের গাত্রবস্ত্র আমাদের সমস্ত অভাব মোচন করিত। আমরা একদিনের জন্যও চিন্তা করি নাই যে দেশীয় শিল্প উৎসাহ ও কাট্‌তির অভাবে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সহস্র সহস্র লোক নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে। এতদিন পরে চিন্তাস্রোত দেশের কল্যাণের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে অনুকূল বায়ু বহিতেছে। আমরা বিদেশের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া এসব কথার আলোচনা করিতেছি না; আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যদি মোটা বস্ত্র পরিধান করিলে অন্যান্য নরনারী তাহাদের অন্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারে, তবে কেন না আমরা তাহাদের সহায় হইয়া দাঁড়াইব? আমরা কেবল লবণবস্ত্রের কথা বলিতেছি না, বিদেশ হইতে কোটি কোটি মুদ্রার মূল্যে যে গণনাতীত প্রকারের পণ্যদ্রব্য আমদানি হইতেছে, আমরা চেষ্টা করিলে ঐ সকল দ্রব্যের অধিকাংশ এদেশে কি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি না? অনাবশ্যকীয় বিলাতী সামগ্রী কি পরিহার করিতে পারি না? বিদেশ হইতে কল-কব্জা আনাইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশীয় শ্রমের সাহায্যে অনুরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া লইয়া গার্হস্থ্য অভাব বিমোচন করিতে পারি না? হইতে পারে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি যাহা এদেশে প্রস্তুত হইবে তাহা বিদেশের মত সৌখীন হইবে না, কিন্তু তাহাতে কি? কাজ চালাইবার পক্ষে উপযোগী হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল। আমাদের দেশকে ভাল বাসিতে হইবে, দেশীয় দ্রব্যাদিকে ভাল বাসিতে হইবে, দেশের লোককে ভাল বাসিতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা সমুন্নত হইতে পারিব না। দেশীয় রেসম পশমের বস্ত্রাদিকে আমরা আদর করিতে পারিলাম না, বিদেশজাত কৌষেয় ও লোমজাত বস্ত্রাদি আমাদের মনোহরণ করিয়া ফেলিয়াছে। ঢাকাই বস্ত্র, কাশ্মীর ও অমৃতসরের শীতবস্ত্র আমাদের নিকট অনাদৃত, বিদেশীয় পরিচ্ছদে আমরা গৌরব অনুভব করি। ধনাঢ্যের গৃহসজ্জা অধিকাংশই বিদেশীয়, দেশীয় দ্রব্যের সেখানে স্থান নাই। ইহা অপেক্ষা চিন্তাহীনতার আর কি পরিচয় দিব? ভারতের মত হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে আর কোথাও

নাই। আমরা আমাদের বিবেচনার দোষে তাহাকে আরও নিরন্ন করিয়া তুলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে আমরা পাপ সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি। আমাদের ঔদাসীন্যে দৈন্য ও দারিদ্র্যকে আমরা আরও বিপুল করিয়া তুলিতেছি। জানি না কবে আমাদের এই মহাপাপ খণ্ডিত হইবে। কবে আবার দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে সৌভাগ্য-শ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারিব।

এমন একটি সময় আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে ধনীর গৃহে নিরতিশয় অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা কুলপরম্পরাগত ভূরিব্যয় খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছেন, বহুকষ্টে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বে পূজা-পার্ব্বণে তাঁহারা অকাতরে অন্নদান করিতেন, কত অনাথা উদরপূর্ত্তি করিবার অবসর পাইত। হায়! অধুনা যে তাঁহাদের মোটার গাড়ী, বিদেশীয় দ্রব্যের বিরাট আয়োজন। তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের হৃদয় কত সরস ছিল, তাঁহারা দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। প্রজাবর্গের সহিত তাঁহাদের কি মধুময় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আজকাল তাঁহারা হৃদয়হীন হইয়া পড়িতেছেন। ভুলিয়াও পল্লীভূমি পরিদর্শন করিতে আজকাল তাঁহারা বিমুখ। যদি বা কখন যান বিদেশোচিত শিকার ব্যপদেশে অসংখ্য পশু-পক্ষী নিহত করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। প্রজাবর্গ তাঁহাদের দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়। তাহাদের সহিত মেলামেশা করা নিজ গৌরবের হানিজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরা অভাবের তাড়নে আজকাল মৃতপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাবনার তাড়নে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে তাঁহারা ইহলোক হইতে দলে দলে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। দরিদ্রের অবস্থা দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা অনেকটা নিজের দোষে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইহার প্রতীকার দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিবিধান, উৎসাহদান এবং অন্যতম প্রতীকার নিজের ও নিজ পরিবারের বিশুদ্ধিতা রক্ষা ও সংযম শিক্ষা। হায়! কত লোক বিদেশীয় মাদক সেবনে হৃতসর্ব্বস্ব ও অকালে গতপ্রাণ হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে!

এই ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যে যখন আমরা দেশীয় মূলধনে ও দেশীয় শ্রমের সাহায্যে কোন স্বাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখি, আমাদের অন্তর পুলকিত হইয়া উঠে। উদাহরণ স্বরূপ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত The Bengal Chemical and pharmacuetical works Ld. যাহা কলিকাতা মাণিকতলাতে ডাক্তার পি, সি, রায় মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই বিশেষ সহায়তায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে তাহার নাম করা যাইতে পারে। এগার বিঘা জমির উপরে এই কারখানা চলিতেছে। ১৮৯২ সালে পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া এই ব্যবসায় সূত্রপাত হয়। এক্ষণে ইহার মূলধন তিন লক্ষ টাকার অধিক। অসংখ্য ডাক্তারী যন্ত্র ও ঔষধ পরিষ্কৃত অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে প্রস্তুত হইতেছে। উহার এক অংশে মুদ্রাযন্ত্র, আর এক স্থানে কাষ্ঠ চেরাই হইয়া বাক্স প্রস্তুত হইতেছে। এই কারবারের যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই ঐখানে নির্ম্মিত হইতেছে। বিলাত হইতে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহাদের মনপ্রাণ ইহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। শ্রম বিভাগ করিয়া উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন এবং শিল্পদানে অপরাপর শ্রমিকগণকে দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। সকলেই আপনাপন কর্ম্মনিরত। অতীব সাবধানতার সহিত তাঁহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধান করিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। বলা বাহুল্য, এই কারখানা হইতে প্রস্তুত অস্ত্র, পরিমাপক যন্ত্র ও ঔষধাদি বাজারে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং শত শত লোক তাহাদের জীবিকা এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আপনাদের দৈন্য দূর করিতেছে।

এইভাবে যদি দেশের নানা স্থানে অসংখ্য কারবারের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে দেশের দৈন্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু চাই সকলের আগ্রহ ও উৎসাহ এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য অদম্য চেষ্টা। বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইবার আবশ্যকতা আছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু 'হাতে কলমে' কার্য্যে পরিণত করাতেই প্রকৃত চরিতার্থতা ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ধর্ম্ম ও নীতি

(৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পাণ্ডিত্য

স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় স্বভাবের বলে
পুরুষ পাণ্ডিত্য লভে শাস্ত্রশিক্ষা-ফলে।

—মৃচ্ছকটিক ৪ অঙ্ক।

গুণের শ্রেষ্ঠতা

গুণের অর্জ্জনে নর হইবেক সদা যত্নবান।
গুণহীন ধনী হ'তে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান ॥
পুরুষ গুণেতে যত্ন করিবে সদাই,
গুণের অপ্রাপ্য বস্তু হেথা কিছু নাই।

গুণের উৎকর্ষবলে শশাঙ্ক যেমন,
অলঙ্ঘ্য শত্রুর শির করিলা লঙ্ঘন ॥
গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়,
সুযশ-কুসুম, আর মূলটি বিশ্বাস,
নিজগুণে ফল ধরে,—এ হেন বৃক্ষের পরে
সুহৃদ-বিহঙ্গ সবে সুখে করে বাস ॥
—ঐ ঐ

আশ্রয় দান

জয়লক্ষ্মী, আর যত মিত্র-বন্ধু
ত্যজে সে অধমে,
—লোক-উপহাস্য হয়,
যে ত্যজে শরণাগত জনে ॥
পর-উপকারী জন, ভীতজনে করে যদি
অভয় প্রদান,
যায় যাক্ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদা
তার গুণগান ॥ —ঐ ঐ

ধর্ম্মসঞ্চয়

অজ্ঞ জন কর সবে ধরম সঞ্চিত,
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত।
বাজায়ে ধ্যানের ঢাক্, সতর্ক হইয়া সদা কর জাগরণ,
বিষম ইন্দ্রিয়-চোর হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম ॥
সংসার অনিত্য দেখি' লইয়াছি ধর্ম্মের শরণ,
—ইন্দ্রিয়ের পঞ্চজনে যে করয়ে জ্ঞানাস্ত্রে নিধন।
অবিদ্যা-নারীরে বাঁধ', রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে,
—পাপ-চণ্ডালের নাশে, নিশ্চয় সে যায় স্বর্গধামে ॥
মস্তক মুণ্ডিত কর, অথবা মুণ্ডিত কর বদন-মণ্ডল
চিত্তের মুণ্ডন বিনা ওসব মুণ্ডনে বল' আছে কিবা ফল।
মুণ্ডিত যে করে চিত্ত, মস্তক মুণ্ডিত জানি তাহারি কেবল ॥
ঐ ৮ম অঙ্ক।

উদ্যানের আশ্রয়দান

গৃহহীন জনে স্থান করিয়া প্রদান,
নিরানন্দে আনন্দ করিয়া বিধান
এই সব তরু করে পুণ্য অনুষ্ঠান।
দুরাত্মা-হৃদয় কিম্বা নব-রাজ্য সম
বিশৃঙ্খল এ উদ্যান তবু মনোরম ॥ ঐ ঐ

কুলশিক্ষা ও স্বভাবচরিত্র

কি হইবে বল ওগো কুলের শিক্ষায়,
স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ যেথায়।
হোক্ না উর্ব্বরক্ষেত্র অতীব সুচারু
বাড়ে না কি তাহে হীন কণ্টকের তরু? ঐ ঐ

আত্মসংযম

সুসংযত মুখ-হস্ত, সুসংযত ইন্দ্রিয়াদি যার
তাকেই মনুষ্য বলি, কি করিতে পারে রাজা তার?
হস্তে তার পরলোক, কাড়ি লয় সাধ্য আছে কার?
ঐ ১ম অঙ্ক।

সুবিচার ও সুবিচারক

সত্যেরে প্রচ্ছন্ন করি'
কহে লোকে কত কথা ন্যায়-পরিচ্যুত,
নিজ দোষ নাহি বলে
মনের বিকারে নিজে হয়ে অভিভূত।
পক্ষ-বিপক্ষের যদি
সহায়ের বলে হয় বলের বর্দ্ধন,
তাহা হলে সুনিশ্চিত
নৃপের নামেতে হয় কলঙ্ক স্পর্শন।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে,
বিচারক-অপবাদ সুলভ জগতে,
গুণের প্রশংসা তাঁর
বহু দূরে অবস্থান করে তাঁহা হতে ॥
ঘুচাইয়া নিজ দোষ
রোষবশে কহে কথা ন্যায়-বিরহিত,
বিচার-আলয়ে যে গো,
উভয় পক্ষের দোষে হইয়া দূষিত
—করে সে বিষম পাপ,
পরলোকে অধোগতি নিশ্চয় তাহার।
—সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক যশোহীন—অপযশই সার ॥
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বক্তা,
নিপুণ মিথ্যার আবিষ্কারে,
ক্রোধশূন্য সমদৃষ্টি
শত্রু-মিত্র উভয় বিচারে;
আচরণ বিচারিয়া উত্তর প্রদান,
অক্ষমে রক্ষণ, শঠে দণ্ডের বিধান,
ধর্ম্মপরায়ণ সদা—লোভের অতীত,
পরতত্ত্ব অন্বেষণে চিত্ত সমাহিত
এইরূপ বিচারক করেন বিচার
কুপিত নৃপের কোপ করিয়া সংহার ॥ ঐ ঐ

আকৃতি ও প্রকৃতি

নাগ, অশ্ব, গো-মনুষ্যে—যার যে আকৃতি।
তারি অনুরূপ সদা হয় গো প্রকৃতি ॥ ঐ ঐ

বিপদের পর বিপদ

যেমনি কুসুম কোন উঠে গো ফুটিয়া
অমনি মধুপকুল আইসে জুটিয়া।
এমনি তো মানুষের বিপদের কালে
অনর্থ পাইয়া ছিদ্র আসে পালে-পালে ॥ ঐ ঐ

সত্যকথন

সত্যে হয় সুখলাভ, পাতকী হয় না কভু সত্যবাদী জন;
ও-অক্ষর হইলেও, সত্যেরে অসত্য দিয়া কোরো না গোপন ॥
ঐ ঐ

উপকারীর দুর্ল্লভতা

সুখীজন-তরে শুধু চিন্তাকুল সবে।
বিপন্নের উপকারী দুর্ল্লভ এ ভবে ॥
উদাসীন পর যে গো, সেও তব বন্ধু হয়
সুখের দশায়।
কিন্তু দুরবস্থা হ'লে, এই সংসার মাঝে
মিত্র পাওয়া দায় ॥
ঐ ১০ম অঙ্ক।

পরলোকগত
৺বিপিনবিহারী ঘোষাল

(শ্রীপদরত্ন ঘোষাল এম-এ)

হড়া-হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সংস্থাপয়িতা—"মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" এবং "হিন্দুশাস্ত্র—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বিপিনবিহারী ঘোষাল জেলা হুগলীর অন্তর্গত হড়া গ্রামে বাঙ্গালা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺গৌরমোহন ঘোষাল প্রকৃত নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন। শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল; আজিও তাঁহার হস্তলিখিত বহুবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও বেদের পুঁথি তাঁহার উত্তরবংশীয়দিগের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বিপিনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঠাকুরদাস ঘোষাল ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটান কলেজে তিনি কিছুকাল অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। তাঁহারও পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগ আদর্শস্থানীয় ছিল। কিন্তু তিনি অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করায় ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বিলুপ্ত হয়।

বিপিনবাবু স্থানীয় মাইনর স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। পরে কলিকাতায় হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদানান্তে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন।

বাল্যকাল হইতেই বিপিনবাবু পিতার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানপিপাসার পূর্ণ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। যখন তিনি কলিকাতায় চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে রত ছিলেন তখন কলিকাতায় ধর্ম্মান্দোলন প্রবল। আদিব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন; এই সমস্ত আন্দোলনে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসে এক প্রবল আঘাত লাগিল; কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ ক্ষুণ্ণ না হইয়া শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি বাটীতে আসিয়া পিতৃদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব।

এই পিতাপুত্র-সংবাদের যতদূর বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যেন ইহা ঠিক উপনিষদ্-কথিত যম-নচিকেতা-সংবাদ; পিতা প্রথমতঃ পুত্রকে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের বিক্ষোভ প্রশমিত হইল না। পরিশেষে পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানউপদেশের যোগ্য পাত্র দেখিয়া পিতা তাঁহাকে তন্ত্র ও উপনিষদোক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। হিন্দুর যে ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া ব্রাহ্মসমাজ জগৎকে উদ্ধারের বার্ত্তা শুনাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন উপযুক্ত সাধক গুরুর নিকট তিনি সেই পূর্ণ অমৃত ভাণ্ডারের সন্ধান পাইলেন। তিনি আজীবন দারপরিগ্রহ করেন নাই, এজন্য আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনবর্গের বহু বাক্যবাণ সহ্য করিয়াছেন। ইহার কৈফিয়ৎ তিনি স্বরচিত "মুক্তি"-নামক গ্রন্থেই দিয়াছেন।

"যে ভাগ্যবান যুবা পার্থিব বিবাহের পূর্ব্বেই প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তিনি যদ্যপি আর তুচ্ছ পার্থিব প্রণয়ে আপনাকে বদ্ধ না করিয়া চিরজীবন অবিবাহিত থাকেন, তবে তাঁহার তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই।" যাহা হউক তিনি বেশী দিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বর্গীয় অমৃতের অংশ লইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। এই চেষ্টার ফলেই হড়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সংস্থাপন। এই সময়েই ১২৮৮ সালে তিনি "মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা আজিও সকল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির পরম আদরের ধন হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় হইতে তিনি মহোৎসাহে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন এবং প্রতিবৎসর শত শত পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি উপায়ে সভার মত ও বক্তব্য সাধারণের নিকট প্রতিপাদন করেন। দেখিতে দেখিতে গ্রামের পর গ্রামে সভার কার্য্য বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অনন্ত

উৎসাহ ও বিশ্বাসে বিমুগ্ধ হইয়া সভ্যের পর সভ্য আসিয়া সভার কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যেই বোয়াখালা, কৃষ্ণনগর, বারহাট্টা, অযোধ্যা, ট্যাঙ্গরা প্রভৃতি স্থানে শাখা সভাসকল প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজেরই অনুরূপ। আজিও ইহার মধ্যে কয়েকটী সভা সঞ্জীবিত থাকিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণ করিতেছে। এই সময়ে তিনি "হিন্দুশাস্ত্র জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড" নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। "মুক্তি" গ্রন্থখানির ন্যায় ইহাও ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুবর্গের অন্যতম সংহিতা বা Book of reference স্বরূপ হইয়া আজিও সর্ব্বজন সমাদৃত রহিয়াছে।

শেষজীবন পর্য্যন্ত বিপিনবাবু এই সভার কার্য্যেই দেহপাত করিয়াছেন। ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের ভিত্তি—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। আমাদের এই বিরোধময় সমাজের মধ্যে ধর্ম্মের প্রাণপ্রদায়িনী শক্তিস্রোত প্রবাহিত করাই জাতীয় উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। বিপিনবাবু এই জাতীয় কার্য্যেই চিরজীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন। এমন কি মৃত্যুর শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এই সভার ও ধর্ম্মপ্রচারের কথাই কহিয়াছেন, এবং শিষ্যবর্গকে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য শেষ অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপে জগতে নীরব ও নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ ও প্রকৃত সাধক জীবনের একখানি সুমোহন চিত্র দেখাইয়া গত ১৩১৬ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে ৫৮ বৎসর বয়সে শিষ্য ও আত্মীয়বর্গের সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল; কেহই জানিত না যে, তিনি এত শীঘ্র ইহলোক ত্যাগ করিবেন। সেইদিন রাত্রে তাঁহার রক্তবমন হইতে আরম্ভ হয়; পরদিবস চিকিৎসকবর্গের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া সন্ধ্যাকালে তিনি ইহলোক হইতে প্রফুল্লচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনও যেরূপ পবিত্র ও কর্ম্মময়, মৃত্যুও তদ্রূপ ভয়শূন্য ও আনন্দময়; সাধকের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই যে কত সুন্দর, বিপিনবাবু তাহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

বিপিনবাবুর জীবনের কয়েকটি বিশেষত্ব আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি; এখানে আরও দুই-একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিব। তিনি আত্ম-প্রচার আদৌ ভালবাসিতেন না। যেখানেই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মের সহিত আত্মনাম জড়িত হইবে সন্দেহ হইত, সেখান হইতেই তিনি সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয়কে তিনি সঙ্কলন মাত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "New Dispensation" পত্রিকা উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে শতমুখে প্রশংসা করিয়া পরিশেষে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন—"The author contents himself with the modest title of a compiler!" তিনি যে সমস্ত পুস্তিকা প্রচার করিতেন তাহাতেও স্বীয় নাম সংযোগ না করিয়া "সভা হইতে প্রকাশিত" বলিয়া প্রকাশ করিতেন। সভার প্রচার কার্য্যের প্রায় তাবৎ ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিয়াও তাহা কোন "হিতৈষী বন্ধু প্রদত্ত" বলিয়া প্রকাশ করিতেন। পাছে কোনও প্রকারে আত্মনাম প্রচার হয় এই ভয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অপরিসীম মনীষা সত্ত্বেও সংবাদপত্রাদিতে কখনও কিছু লিখিতেন না। যে যুগে ও দেশে মানুষ মাত্রেই কর্ম্মের ঢাক বাজাইতে অগ্রসর, এবং যেখানে দেশ ও ভগবানের নামে সকলেই আত্মপ্রচার করিবার প্রয়াসী, সেই যুগে সেই দেশে তাঁহার মত অকপট নিষ্কাম ত্যাগের আদর্শ বড়ই বিরল।

একটী পত্র।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি আপনার তত্ত্ববোধিনী-পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি

৯ই জানুয়ারী ১৯২৮ সন
কলিকাতা। } শ্রীনবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাণের ভাই ও ভগিনীগণ!

যে আদর্শ আমরা পেয়েছি সে হচ্ছে মিলনের আদর্শ; সে হচ্ছে সমন্বয়ের আদর্শ। বিরোধ এসে যখন ভয় দেখায়, বিসম্বাদ যখন কালো মেঘের মত ঘিরে ফেলে, যখন বিপদসঙ্কুল মনে হয়, যখন সমস্ত ব্যর্থ হলো বলে আশঙ্কা হয়, যখন আদর্শ রাখি কি ছাড়ি এই ভয়ে আমরা কাঁপিতে থাকি, তখন বিশ্বাস করতে হবে এই আদর্শকে, তখন বিশ্বাস করতে হবে তাঁর বিধানকে, তখন বিশ্বাস করতে হবে স্বয়ং ভগবানকে, আর জয় করতে হবে সমস্ত প্রেম দিয়ে, অপ্রেমকে। এইঅসীম বিশ্বাসের স্থাপনা চাই।

হে মিলন-মন্ত্রের সহকারীগণ! ভয় নাই। প্রেম নিয়ে অগ্রসর হও। জয় অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবাদে প্রতিবাদের মীমাংসা হয় না; হিংসায় প্রতিহিংসার অনল জ্বলে ওঠে, বহু যুগ ধরে সকল আদর্শের অনুবর্ত্তনকারীরা যুগে যুগে এই কথা বলে গিয়েছেন। তাঁদের কথা শুনে আমাদের চলতে হবে। মিলনের আদর্শ, সমন্বয়ের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকবে। মিলন-মন্ত্রের পথিকগণ অগ্রসর হও।

নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিব্রাহ্মসমাজ-অধ্যক্ষসভার

কার্য্যবিবরণ।

১৬ই পৌষ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ৯৮ ব্রাহ্মসম্বৎ রবিবার।

গত ১৪ই পৌষের আহ্বানপত্র অনুসারে আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল-গৃহে গত ১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী) ৯ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন—

১। শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক।
২। " হরিপদ ত্রিবেদী।
৩। " নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।
৪। " কেদারনাথ দাস গুপ্ত।
৫। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। " সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবনায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত ২৫শে অগ্রহায়ণের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করা হইল এবং পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। মাঘোৎসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। এবারে কিরূপে উৎসব সম্পাদন করা যাইবে তাহা যথোচিত আলোচিত হইয়া নিম্নলিখিতরূপ স্থির হইল:—

(ক) মহর্ষিদেবের তিরোধান-দিবস ৬ই মাঘ শুক্রবার হইতেই এবার উৎসব আরম্ভ হউক।

(খ) ভবানীপুর-সম্মিলনসমাজ, ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজ, বেহালা-ব্রাহ্মসমাজ—প্রভৃতি অপরাপর সমাজের সহিত যথাসম্ভব যোগ রক্ষা করিয়া সম্মিলিতভাবে এবারকার উৎসব-অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইতে পারিলে ভাল হয়।

(গ) অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন আচার্য্যকে উৎসবকালীন আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে ভাল হয়। এবিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের উপর ভার রহিল।

(ঘ) আমাদের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়ালের উপর উৎসবের সঙ্গীত সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার ভার অর্পিত হইল। উঁহারা শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

(ঙ) উৎসবের সুবন্দোবস্তের জন্য নিম্নলিখিত এবং আবশ্যক মনে করিলে অন্যান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্পাদক মহাশয় একটী উৎসব-সমিতি গঠন করিলে ভাল হয়।

(১) শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত (২) শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৪) শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল (৫) শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬) শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ বসু (৭) শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত ও (৮) শ্রীপঞ্চানন রায়।

(চ) উৎসব উপলক্ষে কোনও প্রকাশ্যস্থলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

(ছ) মহর্ষিদেবের প্রাঙ্গণে উৎসব উপলক্ষে একদিন উপাসনা হওয়া উচিত।

(জ) একদিন সঙ্গীতে উপাসনার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

(ঝ) শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস উৎসবের একজন উৎসাহী বন্ধু। এবারকার উৎসবে আমাদের সহিত যোগদানের জন্য তাঁহাকে একখানি অনুরোধ-পত্র লেখা হউক।

৩। অধ্যক্ষসভার সভ্যগণের নব-নির্ব্বাচন আবশ্যক হওয়ায় নিম্নলিখিত নামগুলি মনোনীত হইল। ইহাঁদের সম্মতি লইয়া ইহাঁদিগকে এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্যপদে নিযুক্ত করা হউক।

১। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
৩। শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক।
৪। শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত।
৫। শ্রীহরিপদ ত্রিবেদী।
৬। শ্রীসতিকণ্ঠ মল্লিক।
৭। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস।
৮। ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৯। শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
১০। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।
১১। শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
১২। শ্রীবিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত।
১৪। শ্রীপ্রমোদকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৫। শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
১৬। ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস-সি।
১৭। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৮। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৯। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ।
২০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক।
২১। শ্রীপান্নালাল দে।
২২। শ্রীসরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২৩। শ্রীসারনাথ লাহিড়ী।
২৪। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২৫। শ্রীপঞ্চানন রায়।
২৬। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৭। শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৮। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যক্ষসভার সভ্যদিগের পুনর্নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা সভ্যপদ গ্রহণে স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই সম্পাদক মহাশয় সমাজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক
সম্পাদক।	সভাপতি।
১৬ই পৌষ, ১৩৩৪।	৮।১।২৮

গ্রন্থ-পরিচয়

সন্ধ্যায়—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। হিতৈষণা গ্রন্থাবলী। মূল্য ১০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থকারের আত্মচ্ছায়া বিশেষরূপে প্রতিবিম্বিত। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। রচয়িতার নিতান্ত কোমল হৃদয়—ভগবদ্ভক্তিতে উচ্ছলিত। তিনি সর্ব্বত্র, কি অন্তরে কি বাহ্য-জগতে, ভগবানকেই দেখিতে পান। ভগবৎসান্নিধ্যে থাকিতে, ভগবানে নিমজ্জিত হইতে, ভগবানের ধ্যানে অনুক্ষণ নিরত থাকিতে তাঁহার একান্ত বাসনা। লেখক ভাবুক এবং কবিও বটে। কি সিন্ধুতটে, কি সাগর-বেলায়, কি সূর্য্যাস্তে তিনি ঐশী লীলাই দেখিতে পান। জীবনে শোকতাপও পাইয়াছেন—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র সকলকেই একে একে হারাইয়াছেন। শ্মশানের চিতাধূমেও তাঁহার ভগবদনুরক্তি ঘনীভূত হইয়াছে।

আহ্লাদে, আমোদে শোক তাপে ঈশ্বরই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। "যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" এই ভাবটি যেন তাঁহার মনে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে। সাধকের চিত্তবিকাশ দেখিতে পাইলে, আমরা নিতান্ত সুখানুভব করি।

এডুকেশন গেজেট—২১শে পৌষ, ১০৩৪।

শোক-সংবাদ।

৺ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।—পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বনামধন্যা শ্রীমতি স্বর্ণময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠ জামাতা ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়—যিনি পি, মুখার্জ্জি নামে সর্ব্বত্র খ্যাত—গত ২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥ ঘটিকায় তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে ৫৪নং হাজরা রোডে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। মহর্ষিদেবের দৌহিত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। মাত্র ২॥০ বৎসরের ব্যবধানে ইনি ইহাঁর সুযোগ্যা পত্নীর অনুসরণ করিলেন। বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা ছাড়া ইনি মৃত্যুকালে অপর কোনও আগন্তুক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হন নাই। ফণীবাবু জনহিতৈষণায় প্রবুদ্ধ হইয়া জীবনে শিক্ষাদানব্রতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম অধ্যাপকের পদ লইয়া কলেজে প্রবিষ্ট হন; পরে আপন যোগ্যতায় ও কৃতিত্বে তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টরের উচ্চ পদ লাভ করেন। আমরা ইহাঁর বিয়োগব্যথাকাতর পুত্র পরিজন-দিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত ৮ই পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮॥০ ঘটিকার সময় ৺ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস যথাসময়ে পুষ্পমাল্য ও গন্ধধূপাদির পবিত্র সৌরভে শ্রাদ্ধসভাটী পূর্ণ হইলে সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে 'শয্যাসন' প্রভৃতি ষোড়শ দানসামগ্রী উৎসর্গী-কৃত হইল। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী আরম্ভে ও উপসংহারে দুইটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া সভার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায় বহু গণ্য-মান্য ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

অগ্রহায়ণ মাস, ১৮৪৯ শক।

আয়	৩৯০৬
পূর্ব্বস্থিত	১৫৮৶১
সমষ্টি	৪০৫৮৶৯
ব্যয়	৩৯৬।৩
স্থিত	৯।৶৬

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

বিশেষ কার্য্যের দান	২৲
ঋণগ্রহণ	।৶৬
সস্পেন্স	২০০৲
বণ্ডেড্ অয়ার হাউসের ডিভিডেণ্ড	৬০৲
সমষ্টি	২৬২।৶৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৫৲
হাল	৯॥৴০
বিজ্ঞাপন	২৲
মাশুল	১৶০
সমষ্টি	৫৯।৶০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৫৫৲
কাগজের মূল্য	৩০৸৶০
দপ্তরী	১৲
সমষ্টি	৮৬৸৶০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৸০
মাশুল	।০
	১৲
সর্ব্বসমষ্টি	৩৯০৻৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

গায়ক	৬৫৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বেহারা	১২৲
মেথর	২৲
সরঞ্জামী	১৸৶৬
মাশুল	৫।৵০
Electric	৩৸০
Tax	৬৭॥৵৬
কেরোসিন	॥৶০
মাঘোৎসব	১৫৲
ঋণশোধ	৩৮৸৵০
হাওলাতপ্রদান	৬৲
বারবরদারী	৪৸৵৩
বিবিধ	৫।৴৬
সমষ্টি	২৪৩।৵৯

তত্ত্ববোধিনী।

মাশুল	৪।০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	॥০
মূল্য আদায়ের কমিশন	২৲
অন্যান্য	॥০
সমষ্টি	২২।০

যন্ত্রালয়।

কম্পোজিটর	৫[illegible]৴০
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	১২৲
কাগজতোলা	৬৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
প্রুফকাগজ	।৶৬
কালি	২।৵০
সাজিমাটী	॥০
তৈল	॥০
রুলঢালা	।৩
দপ্তরী	১৲
মাশুল	৴০
তামাক	।৵০
ব্রাস	।৶০
লেই জন্য ময়দা	৴৬
বিবিধ	১১।১
সমষ্টি	১২৯।০

পুস্তকালয়।

বিবিধ	৵৬
মাশুল	১৶০
সমষ্টি	১।৴৬
সর্ব্বসমষ্টি	৩৯৬।৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অষ্টনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ৫৫, আপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করত আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Reg. No. C. 462.

১০১৪ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

মাঘোৎসব-সংখ্যা

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণজিৎনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। মাঘ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০১৪ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

মাঘোৎসব সংখ্যা।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭১। অঞ্জলি—দেবতা পুরুষ মহান।

১। প্রবাসী স্বামীর আগমন ও দর্শনলাভ যেমন পতিব্রতা পত্নী একনিষ্ঠ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ তোমার আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমরা যোড়করে তোমার আরতিগীত গাহিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। কনকতপনের শুভ্র রশ্মি যেমন উষার চতুর্দ্দিক হইতে মসীবর্ণ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তাহার বিমল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, সেইরূপ তোমার বিশুভ্র কিরণরাজি আমাদের অন্তর হইতে পাপতাপ বিদূরিত করিয়া আত্মার বিমল সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে দাও।

২। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে উদ্বেলিত হৃদয়ে তোমার স্তুতিগান করিয়া সকল বিপদ ও সকল অমঙ্গলের হস্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন; প্রবল শত্রুগণও তাঁহাদের কোনই অমঙ্গল সাধন করিতে পারে নাই। তাঁহাদেরই উপদেশ ও অনুশাসনের ফলে আমরা তোমাকে লাভ করিবার পথ উন্মুক্ত দেখিয়াছি। তাঁহারাই আমাদিগকে ভূলোক ও দ্যুলোকে তোমারই বিমল প্রকাশ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদেরই নিকট এই আশ্বাসবাণী শুনিয়াছি যে, তোমার অনন্যভক্তদিগের যোগ ক্ষেম তুমিই বহন কর। আমরা তোমারই একান্ত শরণাগত। তুমি আমাদিগকে গো-অশ্ব ধনরত্ন প্রদান করিয়া শ্রীসম্পদে সুসম্পন্ন কর।

৩। আমরা তোমারই আদেশে কর্ম্মযজ্ঞে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমরা জানি যে, আমাদের সেই কর্ম্মযজ্ঞের মধ্য হইতে তুমিই প্রচুর ধনরত্নরূপ মঙ্গলচরুহস্তে আবির্ভূত হইবে। তোমার প্রসাদস্বরূপ সেই ধনরত্ন লাভ করিয়া আমরা তোমারই নামে গচ্ছিত রাখিব এবং তোমারই আদেশ লইয়া তোমারই প্রিয়কার্য্যসাধনে তাহা ব্যয় করিব।

৪। তোমার মঙ্গলতেজে আমাদের পাপতাপ দগ্ধ হইয়া গেলে আমাদের আত্মা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মলভাব ধারণ করে। বিশ্বস্ত দূতের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রেরক ও নিয়োজক রাজার স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ আত্মার ভিতরেই তোমার শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি প্রকাশ পায়।

৫। তুমি পুরুষ মহান্। তুমিই পালকের পালক। তোমাকে অন্তরাসনে বসাইলে আমাদের রিপুগণ মুহূর্ত্তকালের জন্যও স্থির থাকিতে না

পারিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে পলায়ন করে। তখন তাহাদের বিনাশসাধনে আমাদের আত্মা শতগুণ বেগে অগ্রসর হয়। রিপুগণ ভগবানের বলে বলীয়ান আত্মার সেই প্রবল বেগ সহ্য করিতে পারে না। সেই শত্রুবিজয়ী আত্মার তেজে আমাদের দেহ-মন সকলই আশ্চর্য্যরূপ সতেজ হইয়া উঠে।

৬। যে গৃহকর্ত্তা নিজের গৃহে পরিবারের মধ্যে শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাঁহার গৃহে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে সকলের অজ্ঞানতই জ্ঞানের অগ্নি সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ভক্তির বন্যা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং সে গৃহে কর্ম্মের বিরাম থাকে না। সে পরিবারে অন্নবস্ত্রের কখনই অভাব হয় না। তোমার নামের অজেয় পতাকা বহন করিয়া যে সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় সে বিজয়ীর বেশে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

৭। নদীসকল যেরূপ একই সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়, তুমিই সেইরূপ সকল মনুষ্যের একইমাত্র গতি। এই সত্য না বুঝিয়া আমাদের আত্মীয়স্বজন শত্রুতাসাধনের দ্বারা আমাদের প্রাণে বড়ই আঘাত দিতেছে। আমাদের প্রাণের ইচ্ছা থাকিলেও আমরা তাহাদের মঙ্গলসাধনে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। তুমিই আমাদিগকে বলিয়া দাও, কোন্ পথে চলিলে শত্রুমিত্র সকলের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

৮। জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, জগতসংসার হইতে সমস্ত পাপতাপ বিদূরিত হইয়া পুণ্যের ও ধর্ম্মের তেজ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হউক। তোমার কৃপায় সংসারে দৈন্যদুর্ভিক্ষ চলিয়া গিয়া সুভিক্ষ প্রতিষ্ঠিত হউক। অন্নবস্ত্রের অভাব বিদূরিত হউক। তোমার আশীর্ব্বাদ-লাভে আমাদের দেহে মনে ও আত্মাতে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সন্তানসকল জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্যসাধারণ যশ ও কীর্ত্তি লাভ করুক। তাহাদের কর্ম্মের গুণে জগতে বিবাদকলহের পরিবর্ত্তে, দ্বন্দ্ববিবাদের স্থানে শান্তি নামিয়া আসুক। তাহাদের গৃহ দানযজ্ঞের কোলাহল-কলরবে দিবানিশি ধ্বনিত হউক।

৯। মন অপেক্ষা বেগবান হইলেও তোমার ভক্ত ও তোমার সহিত যোগযুক্ত ব্যতীত অপর কেহ তোমার সে নীরব পদধ্বনি শুনিতে পায় না। তোমারই আদেশে দ্যুলোকে ও ভূলোকে কত না ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের এক অংশ মাত্র কত না আকারে প্রকারে আমাদের হস্তগত হইতেছে এবং আমাদের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতেছে। দেবগণের পুরাকালীন বন্ধু মিত্র ও বরুণের ন্যায় তোমার আদেশে এই সূর্য্য ও এই সাগর আমাদেরও বন্ধুস্বরূপে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেছে।

১০। তুমি আমাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই জানিতেছ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাও যেমন তুমি জান, সেইরূপ আমরাও তোমাকে আমাদের হৃদয়ের যে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি তাহাও তুমি জানিতেছ। উত্তরকালে আমাদের সন্তানেরা তোমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাবান থাকিবে, তাহাও তুমি জান। তোমার নিকট আমরা কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, যেন আমাদের পরিবারের কেহই কখনও তোমার প্রতি সংশয়াত্মা ও অশ্রদ্ধাবান হইয়া বিনাশের পথে অগ্রসর না হয়। তুমি আমাদের পরিবারকে বংশানুক্রমে কখনই পরিত্যাগ করিও না। তুমি তাহাদের চিরসঙ্গী থাকিও। মেঘরাশি ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যকে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত করিলেও যেমন মুহূর্ত্তের পরেই সূর্য্য স্বীয় তেজে সেই মেঘরাশিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া নিজের উজ্জ্বল প্রভায় আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ দুঃখকষ্ট শোকতাপ জরামৃত্যু কিছুকালের জন্য তোমাকে আমাদের চক্ষুর অন্তরাল করিলেও তুমি তোমার স্নেহপ্রেমের কোমল-কঠোর তেজে তাহা দগ্ধ করিয়া তোমার স্বীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিও; আমাদিগকে দুঃখকষ্টে বিদলিত হইতে দিও না, শোকতাপে মুহ্যমান হইতে দিও না; আমাদিগকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান কর।

উৎসবের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে ব্রহ্মোপাসক! যে ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম নিখিল বিশ্বের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের ভিতর দিয়া নিখিল বিশ্ব তোমার দুয়ারে আসিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। চারিদিকে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তুমি আজ সুষুপ্তিসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সে আনন্দকে ব্যর্থ করিয়া তুলিও না; নিজের লুপ্ত চৈতন্যকে জাগাইয়া তোল এবং আনন্দের মূল উৎস সেই আনন্দস্বরূপকে প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়া লও। বর্ত্তমান যুগের নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে আপনাকে মোহান্ধ করিয়া রাখিও না। এই জাগরণকে আরও জাগ্রত করিয়া তুলিবার পক্ষে সহায় হও। ব্রাহ্মসমাজের সেই আদিম প্রচেষ্টার ফলে এদেশে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের একটা সমন্বয়ধারা প্রবাহিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পথে তুমি অর্গলরূপে দাঁড়াইয়া সে ধারাকে অন্যদিকে সরিয়া যাইতে দিও না। দেশে যে উদীয়মান জ্ঞানসূর্য্যের অরুণরশ্মি দেখা দিয়াছে, তুমি যদি মানুষ হও, তোমার অন্তরে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তোমার অন্ধকার কুটীর হইতে বাহির হইয়া আইস—তন্দ্রালস্য দূরে পরিত্যাগ করিয়া জগতের মহানন্দে যোগদান কর এবং জগতের মহাসভায় নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথের সন্ধান কর। ভক্তমণ্ডলীর মুখে আজ যে শ্রদ্ধাভক্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সেই শ্রদ্ধাভক্তির কণামাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনকে ধন্য কর। চারিদিকে চক্ষু খুলিয়া দেখ এবং শোন, চতুর্দ্দিক হইতেই সকল মঙ্গলের নিদান ভগবানের নামে আজ অসংখ্য অসংখ্য মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত হইয়া উঠিতেছে। জ্ঞানে ও ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ দেশবাসী মঙ্গলকর্ম্মে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আর আলস্যশয্যায় শয়ান থাকিও না। যে ভগবান তাঁহাকে জানিয়া পরমানন্দ লাভের অধিকার তোমাকে দিয়াছেন, আজ কায়মনোবাক্যে তাঁহার নামের বিজয় ঘোষণা করিতে থাক—সকলের অগ্রগামী হইয়া মঙ্গলময়ের চরণস্পর্শ লাভের জন্য ছুটিয়া চল। কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়া থাকিও না। যেমন মুখে তাঁহার নামের মহিমা প্রচার করিতে থাকিবে, তেমনি নিজের জীবনের ভিতর দিয়াও, প্রতিদিনের প্রতি নিমেষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়াও ভগবানের পাবনী শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিবে।

মনে রাখিও এই শুভ সন্ধিক্ষণ আর ফিরিয়া আসিবে না। এই শুভমুহূর্ত্তকে হেলায় হারাইয়া বসিলে, দেশের মহা কল্যাণসাধনে এবং তোমার অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তিস্থাপনে যে সহায়তা করিতে পারিতে, হয়তো সমস্ত জীবনে আর তাহা সম্ভবপর হইবে না। তুমি তোমার শীর্ণ দেহের জীর্ণ তরী লইয়াই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়ধারার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়—নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়; যাঁহার কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, তিনিই তোমাকে সহজেই ওপারে লইয়া যাইবেন। আর কেবল কথায় কথায় দিন কটাইলে চলিবে না। জগতে কে কত নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন? পুরাতন কথাই তো নিত্য নূতন বেশে প্রতিদিনই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এখন আবশ্যক হইয়াছে, সেই সকল পুরাতন সত্যকে জীবনে পরিণত করা—কথার রাজ্য হইতে, ভাষার রাজ্য হইতে সেই সকল সত্যকে সংসারের প্রত্যেক বিভাগের প্রতি নিমেষের ঘটনার ভিত্তিরূপে দাঁড় করানো। জানি, সত্যকে এইরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অনেকবার উঠিতে হইবে, আবার অনেকবার পদস্খলনেরও আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই আশঙ্কার কারণে জীবন হইতে সত্যকে দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শিশুদিগের বারম্বার পতনের ন্যায়, আমরাও বারম্বার পদস্খলন হইতেও শিক্ষা লাভ করিয়া সকল বিষয়ে দৃঢ় হইব।

সত্যকে জীবনে পরিণত করিতে গেলে, কেবল নিজের উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। বর্ত্তমানে ভগবান যে বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাতে আমি কেবলমাত্র নিজের উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা কিছুতেই নির্ব্বাহ করিতে পারি না—আমার নিজের পায়ের উপরেও যেমন দাঁড়াইতে শিক্ষা করিতে হইবে, অনেক সময়ে তেমনি অপরের সহায়তাও গ্রহণ করিতে হইবে। অহঙ্কারে কেবল নিজেকেই খুব বড় করিয়া দেখিও না। নিশ্চয় জানিও, ভগবানের জ্ঞান ও শক্তির অগ্নিকণা প্রতি মানবেরই অন্তরে আছে। কাহাকেও নীচু বলিয়া ঘৃণা করিবার অধিকার তোমার নাই। কেবল কথায় নয়, কাজেও, জীবনেও দেখাইতে হইবে যে, তুমি কাহাকেও ঘৃণা কর না। আজ মহা জাগরণের সন্ধিক্ষণে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীই জয়ঘোষ সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র গ্রহণ কর—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি—তাঁহাকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে কেবল কথায় নয়—কথায় ও কাজে, কেবল মুখে নয়, মুখে ও জীবনে। তবেই আমরা দেখিব, অচিরে দেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তবেই দেখিব, দেশ হইতে গৃহবিবাদ, অন্তর্ব্বিচ্ছেদ প্রভৃতি পাপরাশি, অকল্যাণ অমঙ্গল অচিরে অদৃশ্য হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ও

সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানকে সমুদয় হৃদয় দিয়া প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে; ইহাই হইল তাঁহার প্রকৃত উপাসনা; এইরূপ উপাসনা দ্বারাই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। সত্যধর্ম্মের এই মূল সত্য ভারতবাসীর নিকট, হিন্দুজাতির নিকট নূতন নয়—বহু শত শতাব্দী পূর্ব্ব অবধিই ভারতের ঋষিরা আমাদিগকে সত্যধর্ম্মের এই অমোঘ মূল মন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নানা ধর্ম্মবিপ্লবের কারণে, নানা সমাজবিপ্লবের গোলযোগে, নানা রাষ্ট্রবিপ্লবের তাড়নায় সেই মন্ত্র আমাদের চক্ষের অন্তরালে কোথায় যে গিয়া পড়িয়াছিল আমরা বহুকাল যাবৎ তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই; সুতরাং আমরা তাহাকে হৃদয়ে যথাযথরূপে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, অন্তরে তাহাকে পোষণ করিতে পারি নাই। তাই সেই মহামন্ত্র অধুনাতন ভারতবাসীর প্রাণে সম্যক জাগ্রত হইতে পারে নাই, ভালরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সেই অক্ষর অমোঘ মহামন্ত্র মরিবার পদার্থ নয়—উহা অমৃতস্বরূপকে পূজা করিবার উপকরণ—অজর অমর মহামন্ত্র।

বহুশতাব্দী পরে, রাজা রামমোহন রায় সেই মহামন্ত্রের সন্ধান লাভ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক পুণ্য ১১ই মাঘের দিনে এই পুণ্য দেশে তাহাকে পুনরায় সযত্নে প্রোথিত করিলেন। তাঁহার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—আজ যাঁহার তিরোভাবের দিন—সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ মহামন্ত্রের মূলে অমৃতরস সেচন করত উহাকে সযত্নে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—সকল সত্যধর্ম্মের মূল ঐ মহামন্ত্রকে এই পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে ঋষিপদে বরণ করা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার প্রাণপণ যত্নে ঐ মহামন্ত্রকে রক্ষা করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার ফলেই আজ প্রায় শতাব্দী পরে উহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া কেবল বঙ্গদেশকে নয়, কেবল ভারতভূমিকে নয়, কিন্তু সমগ্র জগতবাসীকে আহ্বান করিয়া ফল ও আশ্রয় দিতে উদ্যত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা ঐ মহামন্ত্রকে আমাদের জীবনের প্রতি বিভাগেই প্রয়োগ করিবার অবসর পাইতেছি, এবং প্রয়োগ করিয়া তাহার মূল্য ও সাফল্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।

এই মহামন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্য্যকারিতার ফলেই ভারতবাসী বুঝিয়াছেন এবং প্রচার করিতে পারিতেছেন যে, স্বাধীনতা—সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার। ভগবানের সঙ্গে যিনি প্রত্যক্ষ যোগ উপলব্ধি করিবেন, তিনি তো স্বভাবতই আপনাকে ভগবানের বশে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও নিজের বশে আনিবেন—তাঁহার পক্ষে পরবশ্যতা, কোনও বিষয়ে পরের অধীনতা অসহ্য। এই কারণেই সংসারের সর্ব্ববিধ পরাধীনতার হস্ত হইতে যতদূর সম্ভব মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসীগণ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া প্রীতি করিবার সঙ্গে পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বুঝিয়া নব্যযুগে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই মানবের চরম লক্ষ্য। ভগবৎপূজার ঐ মহামন্ত্রের ভিত্তিতে, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং—পরবশ যাহা কিছু সে সকলই দুঃখের কারণ এবং আত্মবশ যাহা কিছু সে সকলই সুখের কারণ—স্বাধীনতার এই মহাসূত্র ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, একমাত্র ভগবানই আমাদের প্রভু, আমরা একমাত্র তাঁহারই দাস। দাসত্ব করিতে হয়, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহারই দাসত্ব কর—সে দাসত্বের বিনিময়ে মুক্তি লাভ করিবে। নিজের সর্ব্বস্ব যদি নিবেদন করিতে চাও, তবে সকল স্বাধীনতার একমাত্র উৎস, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আকর ভগবানেরই চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া দাও—সেই সর্ব্বস্ব নিবেদনের বিনিময়ে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে।

ভারতবাসীর অন্তরে বাহিরে ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগের ঐ মহামন্ত্র এদেশে নব্যযুগে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিবার ফলেই ভারতবাসীর চক্ষু হইতে অজ্ঞানের মসীলিপ্ত পর্দ্দা খসিয়া গেল—নব্যযুগের ভারতবাসী বুঝিতে পারিল যে, কি বিজ্ঞান, কি প্রজ্ঞান, কি সাংসারিক জ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান, কাহারও কোন প্রকার জ্ঞান অর্জ্জনের পথ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বল, শূদ্র বল, স্ত্রীলোক বল, বা তথাকথিত নিম্নজাতি বল, কাহাকেও, বেদ বল, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র বল, বাইবেল বল, আর কোরাণ বল, কোনও কিছু হইতে সত্য লাভ করিবার পথে, জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পথে কেহই বাধা দিতে পারে না—কাহারও বাধা দিবার অধিকারই নাই। ঐ মহামন্ত্রের উদারতম ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াই নব্যযুগে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম এই মহাসত্য ঘোষণা করিতে সাহস করিলেন যে, জ্ঞান

* মহর্ষির স্বর্গারোহণ-দিন উপলক্ষ্যে ৬ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।

অর্জ্জনের পথে, ভগবানকে লাভ করিবার সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত রাজপথে চলাচল করিবার সকলেরই সমান অধিকার—সেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নাই, উচ্চনীচের ভেদ নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সত্য ঘোষণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই হস্ত বিশেষভাবে প্রকাশিত।

ভগবদুপাসনার ঐ মহামন্ত্র প্রচার করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে এই যে, নব্যযুগে ভারতবাসী উহারই ভিতর দিয়া ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগের সন্ধান লাভ করিল। আমরা বারম্বার বলিতেছি এবং চিরকাল বলিব যে, এই মহামন্ত্র কোন নূতন পদার্থ নয়—ইহা চিরপুরাতন সত্য। পুরাকালে ভারতের ঋষিরা এই সত্যই বলের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ কার্য্যত অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীগণ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে শতবিধ বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবাসী ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের সেই সরল সত্য ভুলিয়া গিয়া সত্যের অপভ্রংশসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রকৃত সত্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়াই হিন্দুসমাজ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন শাস্ত্রজ্ঞানহীন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় হিন্দুসমাজ কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের ন্যায় শুধু সম্মুখ হইতেই আঘাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বাবধি সঞ্চিত ধর্ম্মের সেই সমস্ত বহিরাবরণ বা খোসার উপরেই আত্মরক্ষার জন্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল। এদিকে অপর তিন দিক হইতে প্রলয়ের অগ্নি সমগ্র হিন্দুসমাজকে গ্রাস করিবার জন্য যে ঘনাইয়া আসিতেছে, সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্যই ছিল না। বলিতে কি, ধর্ম্মের সেই সমস্ত খোসাও ক্রমে শুষ্ক ও মলিন হইয়া সমাজবিধ্বংসী সেই প্রলয়াগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন অযথা পৌরোহিত্য, অযথা গুরুবাদ প্রভৃতি স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদক অন্যায় মতামতসকল ভারতবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছিল। ভারতবাসী নিজের জানত ও অজানত স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পরাধীনতার পিচ্ছিল পথে দ্রুতগতিতে নামিয়া চলিল। কিন্তু ভারতভূমি পুণ্য ভূমি—হিন্দুর জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ ভগবানের প্রিয় ধর্ম্মক্ষেত্র। তাই ভারতভূমি পরাধীনতার চরম সীমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্বাধীনতার জন্য কাতর প্রার্থনা তাহার অন্তর ভেদ করিয়া ভগবানের চরণে সমুত্থিত হইল; মৃত্যুর কবলে সম্পূর্ণ পড়িবার পূর্ব্বেই তাহার কাতর কণ্ঠ ভেদ করিয়া অমৃতবিন্দুর জন্য প্রার্থনা ভগবানের কর্ণে প্রবেশ করিল। ভগবানের নিকট হইতে সেই কাতর প্রার্থনার উত্তরে সাড়া পাইয়া ভারতবাসী আশ্বস্ত হইল।

সেই কাতর প্রার্থনার উত্তরে ভগবৎপ্রেরিত হইয়া রাজা রামমোহন রায় ১১ই মাঘের শুভ দিনে পবিত্র ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপিত করিয়া সত্যধর্ম্মের সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি সজোরে নিনাদিত করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ভারতবাসীর সেই কাতর প্রার্থনার উত্তরেই ভগবৎপ্রেরিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়াই সত্যধর্ম্মের এবং তাহারই অপরিহার্য্য অনুষঙ্গী সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল প্রকৃত ভগবদুপাসনার উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। সেই উৎসের অনুসরণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কত শত ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্ত আসিয়া ভারতে ব্রহ্মোপাসনার বন্যা বহাইয়া দিলেন। সেই বন্যা আমাদের অন্তরে যে জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল, সেই জাগরণের ফলে আমরা জানিয়াছি যে, ভগবান আমাদের প্রত্যক্ষ পিতামাতা, এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের যোগবন্ধন নিত্য প্রেমের বন্ধন। আমরা বুঝিয়াছি যে সেই যোগবন্ধন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কোপীনধারণ বা বহুবৎসর ধরিয়া কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে গিরিগুহায় বা গভীর অরণ্যে বাস অপরিহার্য্য নয়। আমরা বুঝিয়াছি যে সেই যোগবন্ধন গৃহের মধ্যে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের স্নেহপ্রেম, দয়াদাক্ষিণ্য, ভক্তিশ্রদ্ধা প্রভৃতির মধ্যে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। আমরা বুঝিয়াছি যে, বিপদের কশাঘাতের মধ্যেও, দুঃখকষ্টের কঠোর তাড়নার মধ্যেও সেই যোগবন্ধন ভগবানের আশীর্ব্বাদের আকারে দেখা দেয়।

পবিত্র ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া, রাজা রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণ ভক্তদিগের জীবনের মধ্য দিয়া, এই মহাসত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে যে ভগবান আছেন—মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা ভগবান আছেন এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনাতে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল। আজ আমরা দেখিতেছি—সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনির উপর প্রতিধ্বনি বিশ্বজগতের আকাশকে স্তরের পর স্তর মুখরিত ও স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে। ঐ মহাসত্যের উপর দাঁড়াইয়া জগতবাসীকে আমাদের ইহা বলিবার অধিকার আছে যে, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা, মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা ভগবান আছেন, ইহাতে নিঃসংশয় হও। তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ পিতামাতা, ইহা স্থির জানিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে

তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনে অগ্রসর হও। আত্মার ভিতরে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর এবং সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া আপ্তকাম হও। তাঁহাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত জানিয়া, সর্ব্বত্র তাঁহারই রাজ্য প্রসারিত জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভর হও। বিস্ফারিতনেত্রে প্রভাতের সূর্য্যকিরণরঞ্জিত এবং নিশীথের জ্যোৎস্নাধবলিত ও অগণ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি কর। মুদিতনেত্রে আত্মার অন্তরে তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও শুদ্ধস্বরূপ দর্শন কর এবং তাঁহার পরিপূর্ণ অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হও।

আজ যাঁহার নামে এই সভা আহূত হইয়াছে, তাঁহার জীবনকে আদর্শ করিয়া নিজের জীবনকে সংগঠিত করিতে চাহিলে আত্মোন্নতিকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নতিসাধনকে, ভগবানের চরণে প্রত্যেকের আত্মবিসর্জ্জনকেই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরিসমাপ্তি বা চরম লক্ষ্য বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যখন সেই প্রাণের দেবতাকে সমুদয় হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতে পারিব; যখন বলহীনের ন্যায়, দুর্ব্বল ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় সকল পরাধীনতার মূল মিথ্যারাশির বোঝা মস্তকে বহন করিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিবার পরিবর্ত্তে সেই সত্যস্বরূপের চরণে মিথ্যারাশি বলিদান করিয়া সরল হৃদয়ে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াইতে পারিব; শত বাধাবিঘ্ন সহস্র দুঃখশোকের সম্মুখেও যখন ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশ জানিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারিব, তখনই দেখিতে পাইব যে, সত্যপালনে দৃঢ়ব্রত ভীষ্মদেবের মুখে যে অমানুষিক স্বর্গীয় প্রভা ক্রীড়া করিয়াছিল, কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব বল ও তেজ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, আমাদেরও হৃদয়ে সেই অপার্থিব বল ও তেজ আসিবে, আমাদেরও মুখে সেই দিব্য প্রভা নামিবে। এই সভায় উপস্থিত বন্ধুগণ যদি নিষ্কামভাবে সত্যপালনে এইরূপ দৃঢ়ব্রত হয়েন, কর্ত্তব্য পালনে যদি এইরূপ নির্ভীকহৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েন, তবেই তাঁহাদের এখানে আসার ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে, এই সভা সার্থক হইবে এবং সেই মহাপুরুষের আত্মার যথার্থ তর্পণ সাধিত হইবে; তবেই আমরা দেশের মলিনতা বিদূরিত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব।

উপসংহারে, যে মহাপুরুষের পরলোকগত আত্মার তর্পণোদ্দেশ্যে আমরা এখানে সবান্ধবে সমাগত হইয়াছি, তাঁহার প্রাণের কথা অন্তরে ধারণ করিয়া গীতার এই উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া পরস্পরকে উৎসাহিত করিতে চাই—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

ভগবানের উপর সমস্ত কর্ম্মফল সন্ন্যস্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হও; মায়াবশীভূত হইও না এবং শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হও।

সত্যধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যে ভগবান সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং যিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতেছেন, সেই ভগবানকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি।

সম্বৎসর ধরিয়া যে মাঘোৎসবের আনন্দসম্ভোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম, আজ সম্বৎসর পরে আবার আমরা সেই মাঘোৎসবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিধাতা জগজ্জননীর চরণতলে আসিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত দাঁড়াইবার আর একটা অবসর পাইয়াছি। এই এক বৎসরের ভিতর কত দুঃখশোক বক্ষের উপকূলে প্রচণ্ড আঘাত দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসরের ভিতর কত বিপদ আপদের প্রবল ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আবার এই এক বৎসরের মধ্যেই কত সুখশান্তির সংবাদ আসিয়া মর্ম্মস্থিত দুঃখবিপদের ঘন অন্ধকার কাটাইয়া দিয়াছে—হৃদয়-আকাশকে মেঘমুক্ত ও নির্ম্মল করিয়া তুলিয়াছে; এই এক বৎসরের মধ্যেই আবার কত আনন্দের সংবাদ প্রাণের নিরাশা নিরানন্দ মুছাইয়া দিয়া শুভ্র কুসুমের মত আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই উৎসবের মাঝে আমাদের সেই দুঃখসুখের দ্বন্দ্ব, হর্ষবিষাদের দ্বন্দ্ব, আশানিরাশার বিবাদ সমস্তই ঘুচিয়া গিয়াছে।

আজ এই উৎসবক্ষেত্রে উৎসবজননীকে বরাভয়-হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখক্লেশ, সমস্ত নিরাশা ও নিরানন্দ, বিষাদের ঘন অন্ধকার, সমস্তই আনন্দের বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই উৎসবক্ষেত্রে জগজ্জননীর মঙ্গলবিধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের সকল বাসনাই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভের আনন্দ আজ আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আজ প্রত্যক্ষ কর, উৎসবজননী আমাদের জন্য তাঁহার অমৃতভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে তাঁহার

* ভবানীপুর-সম্মিলনসমাজে গত ৮ই মাঘ রবিবার বিবৃত।

অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের প্রাণে নূতন বল, নূতন তেজ ও নূতন স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়া বলিতেছেন —বৎসগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; প্রাণের ভিতর নিরাশা ও নিরানন্দকে কিছুমাত্র স্থান দিও না; আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য থাকিয়া তোমাদের মঙ্গলের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া দিতেছি; তোমরা নির্ভয়ে নিজেদের জীবনকে পুণ্যে ও ধর্ম্মে বিভূষিত কর; তোমরা নিজেদের কল্যাণসাধনে সর্ব্বদাই নিরত থাক; শরীরে ও মনে বলসঞ্চয় কর; জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, ভক্তিতে বড় হও;

জননীর এই আহ্বানবাণী অবহেলা করিও না, উপেক্ষা করিও না। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে উৎসবদেবতার চরণে মস্তক অবনত কর—তোমরা দেখিবে, তোমাদের দুঃখদৈন্যের হাহাকার নিমেষে ঘুচিয়া যাইবে। বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতির সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে উপলব্ধি কর, অভাবের পদতলে তোমাদের মস্তক নিত্য লুণ্ঠিত করিতে হইবে না। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর, তোমাদের হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ মলিনতা অন্তর্হিত হইবে, শোকতাপ অপসারিত হইবে; মৃত্যুও তোমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। তাঁহাকে বিশ্বজগতের একমাত্র পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি কর; তাঁহাকে একমাত্র জ্ঞানদাতা গুরু বলিয়া উপলব্ধি কর, তোমাদের সকল সংশয় ছিন্ন হইবে, সকল ভয়ভাবনা বিদূরিত হইবে। তোমাদের হৃদয় মুক্ত আকাশের ন্যায় সমুন্নত হইবে। আভিজাত্যের বৃথা গর্ব্ব তোমাদের হৃদয়কে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করিতে পারিবে না। ভগবৎপ্রীতির বন্যায় তোমাদের শতবিধ মান অভিমান কোথায় ভাসিয়া যাইবে। সকল বিরহবিচ্ছেদের মূল, সকল বিবাদ-বিসম্বাদের মূল সাম্প্রদায়িকতা তখন আর তোমাদের নিকট প্রশ্রয় পাইবে না। মৈত্রীই তখন সকলের প্রতি তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হইবে। রাজাপ্রজা, ধনীনির্ধন, সকলেই তখন তোমাদের নিকট সমান ব্যবহার পাইবে। একই সূর্য্য যেমন উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান ভাবে কিরণ বিতরণ করে; একই ভগবান যেমন পাপীতাপীনির্ব্বিশেষে, সাধুঅসাধুনির্ব্বিশেষে সকলেরই মস্তকে করুণাধারা সমানভাবে বর্ষণ করেন, সেইরূপ তোমাদের হৃদয় তখন সকলেরই জন্য সমান ভাবে উন্মুক্ত হইবে; সকলেই তখন তোমাদেরও হৃদয়ে বিশ্রামের স্থান লাভ করিবে।

সাম্প্রদায়িকতাই এই ভাবের বিরুদ্ধে অর্গলস্বরূপে দণ্ডায়মান। সাম্প্রদায়িকতাই মৈত্রীর মূলোচ্ছেদক এবং বিরোধ-বিবাদ বিরহবিচ্ছেদ আনিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সেদিনকার হিন্দুমুসলমানের বিরোধ এবিষয়ে অলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সেই বিরোধের আগুন সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। বর্ত্তমানে দেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ করা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটী বিষয় সমুজ্জ্বল আকারে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ পায়—একটী হইতেছে বিরোধ-বিবাদ বিদূরিত করিয়া দেশবাসীগণের পরস্পরের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের চেষ্টা, এবং দ্বিতীয় হইতেছে স্বাধীনতার জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের প্রাণের আগ্রহ।

পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের মিলন সংস্থাপিত না হইলে, বিরোধবিবাদ মারামারি কাটাকাটি পরিত্যক্ত না হইলে স্বাধীনতা লাভ তো দূরের কথা, আমাদের নিজেদের উন্নতির আশাই সুদূরপরাহত। পরস্পরের মধ্যে বিরোধবিদ্বেষ থাকিলে, পাঁচজনকে লইয়াই যে সমাজ, সে সমাজের কোন বিষয়েই উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। পরস্পরের প্রতি অন্তরের সহানুভূতি ব্যতীত পরস্পরের উন্নতির জন্য চেষ্টাই আসিতে পারে না। পরস্পরকে প্রীতি করিতে শিক্ষা ব্যতীত সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করা অসম্ভব। এই কারণে দেশের মধ্যে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জাতিনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মিলনের ধারা বহাইবার জন্য যাঁহারা প্রয়াস পাইতেছেন, প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা ঠিক পথে তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন কি না বলিতে পারি না। দেশনেতাগণের অধিকাংশের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে, দেশপ্রীতির সঙ্গে, দেশের কল্যাণকর মঙ্গলবিধায়ক কাজকর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রাখিতে তাঁহারা ইচ্ছুক নহেন—ভয় পান। তাঁহারা এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, দেশের হিতকর সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম্মকে ঢুকাইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধবিবাদ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবার এবং তাহার ফলে সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির অঙ্কুরেই বিলীন হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ধর্ম্মের অযথা প্রভাবে সদনুষ্ঠানসকল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

তাঁহাদের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক তাহা বলিতে পারি না। যতদিন বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজে বর্ত্তমানের মত সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব প্রবল থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মের নামে পদে পদে কথায় কথায় বিবাদ-বিসম্বাদ জ্বলিয়া উঠা আশ্চর্য্য নয়—অসম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িকতার অর্থই হইল অপরের নিজত্বকে আমার নিজের ক্ষুদ্রতার পদে বলিদান করিতে চাওয়া। কিন্তু মানুষের ভিতরে অন্তর্নিহিত এমনই একটা স্বাধীনতার ভাব আছে যে,

তাহাকে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়। সেই কারণেই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের আগুনও সহজেই জলিয়া উঠে।

কিন্তু প্রকৃত সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্মসাধন করিলে বিরোধ বিবাদ কিছুতেই আসিতে পারে না, বরঞ্চ তদ্বিপরীতে মিলনেরই সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত সত্যধর্ম্মে যে লোক যে জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, সে লোক সে জাতির অন্তরে সর্ব্ববিধ বিরোধের পরিবর্ত্তে অটল অটুট শান্তির অধিকারই বিস্তৃত হইতে থাকিবে। এই কারণে চিন্তাশীল অনেকে সত্যধর্ম্মেরই উদ্দেশে বলেন যে, 'উহা সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি, সকল মঙ্গলের নিদান এবং সকল সুখশান্তির আকর', 'উহা সকল শুভ অনুষ্ঠানের সর্ব্বোত্তম প্রবর্ত্তক'। বলা বাহুল্য আমরা এই প্রকার উক্তিসমূহ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। প্রকৃত সত্যধর্ম্মের বাণী এই যে, ভগবানকে প্রীতি কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর; তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার প্রকৃত উপাসনা; এবং এই প্রকার উপাসনাতেই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত। এই উদারতম বাণীর সহিত কাহারও কি কোনও বিরোধ থাকিতে পারে? কখনই নয়। ইহার কোনও অংশেই কোনও প্রকার বিরোধবিবাদের বীজই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। বলিতে কি, কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এই উদারতম অসাম্প্রদায়িক বাণীতে সায় না দিয়া থাকিতে পারেন না। এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের ভিতর আচার ব্যবহারের প্রণালীগত পার্থক্যসমূহকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ করিতে চাহিলেই, সত্যধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের নিজ নিজ ধারণা সমাবেশ করিতে চাহিলেই যত উপধর্ম্মের সৃষ্টি, যত সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি এবং যত বিবাদ-বিসম্বাদ আসিবার সম্ভাবনা আসে।

আমরা অনেক সময়ে ধর্ম্মসাধনের—জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মকে ব্যবহারে আনিবার পার্থক্যমূলক প্রণালীসমূহকে সত্যধর্ম্মের সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া বড়ই ভুল করি। প্রকৃত ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম সাধনের পদ্ধতি এক নহে। সত্যধর্ম্মের মূল প্রাণ হইল—পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগসাধন। কিন্তু সেই ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন হইতে পারে এবং হওয়াই সঙ্গত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন দেশে প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম্মমন্দিরের আকারের ন্যায় সাধনপ্রণালীও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন প্রণালীর ভিতরে সকল বিরোধের একমাত্র শান্তিস্থল এক অখণ্ড সত্যধর্ম্মের ধারাকে কোথাও বা নিগূঢ় অন্তঃসলিলভাবে প্রবাহিত হইতে এবং কোথাও বা প্রকাশ্যভাবে শতধারায় উৎসারিত হইতে দেখা যায়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে কেবল মুখে নয়, কিন্তু যথার্থই অন্তরে ধারণ করিলে, সত্যধর্ম্মকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে আনয়ন করিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা হস্তগত হইবারই সম্ভাবনা, অমঙ্গলের কোন সম্ভাবনাই আসিতে পারে না। সত্যধর্ম্মের মূলোচ্ছেদক সাম্প্রদায়িকতাই সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের নিদান, সর্ব্বপ্রকার অবনতির মূল এবং সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার, একমাত্র হৌক বা না হৌক, সর্ব্বপ্রধান হেতু। সাম্প্রদায়িকতাই উচ্চনীচের মিথ্যা ভেদাভেদ আনয়ন করে, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার অন্যায় অহঙ্কারের সৃষ্টি করে এবং আভিজাত্যের বৃথা গর্ব্বের ফলে কথামালার ভেকের ন্যায় মানুষকে অসঙ্গতরূপ ফাঁপাইয়া তোলে; তাহার পরিণামে মনুষ্যত্ব হারাইয়া মানুষ মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। ধর্ম্মের জন্যই জগতে শতবিধ বিরোধবিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে; ধর্ম্মের নামে কত দেশবিদেশ কত বিভিন্ন জাতি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছে, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, অতএব দেশহিতকর কোনও কার্য্যের সঙ্গে, কোনও অনুষ্ঠানে ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক থাকিতে দেওয়া ঠিক নয়—অনেকের এই যে ধারণা আছে, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত—সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহারা তুরস্ক, চীন, রষিয়া প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দিলেও আমরা তাঁহাদের ঐ ধারণা অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। ঐ সকল দেশের কার্য্যপ্রণালী অতি অল্পদিন মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার পরিণামফল এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ। আমাদের দেশে শত সহস্র বৎসরের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া যে সকল সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেই সকল সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া খুব দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, সত্যধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জীবনের নিয়ামক করিবার ফলে কোথাও কোন বিরোধ আসে নাই, অবনতি ঘটে নাই—তাহার সম্ভাবনাও আসিতে পারে না। উপধর্ম্মের কারণেই বিবাদবিসম্বাদ অবনতি-অবসাদ উপস্থিত হয়।

ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিলেই তাহা উপধর্ম্মে পরিণত হয়। সেই উপধর্ম্ম প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে এবং সেই সঙ্গে মানবসমাজকেও শতখণ্ডে বিখণ্ডিত করে। উপধর্ম্মই বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, মানবদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-কলহ আনয়ন করে, বিরহবিচ্ছেদ লাগাইয়া দেয় এবং চতুর্দ্দিকে মৃত্যুবীজ বিকীর্ণ করিতে

থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয় যে, ধর্ম্মের নামে পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নামে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির উপর সংগঠিত উপধর্ম্মসমূহ কত পাপরাশি কত উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়া কত দেশের, কত জাতির, কত সমাজের ধ্বংসসাধনে সহায়তা করিয়াছে। মানবের ইতিহাসে সেই সকল কথা রক্তদিগ্ধ অক্ষরে লিখিত আছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব প্রবল থাকিতে জীবনের কোন বিভাগেই সর্ব্বতোভাবে উন্নতি-সাধনের চেষ্টা—ধরাধামে স্বর্গরাজ্য আনিবার চেষ্টা বৃথা। সাম্প্রদায়িকতার কারণে হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী কেন, হিন্দুই হিন্দুর সঙ্গে, মুসলমানই মুসলমানের সঙ্গে, খৃষ্টান খৃষ্টানের সঙ্গে মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া সর্ব্বদাই সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত! অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের এবং তাহারই অনুষঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাকে সার্থক করিতে চাহিলে আমাদের সকল যত্ন, সকল চেষ্টা ধর্ম্মের উপর—সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড় করাইতে হইবে।

সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইতে হইবে বলিয়া সমস্ত পার্থক্য যে নির্ম্মূল করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই—বস্তুত নির্ম্মূল করাও সম্ভব নয়। কত সহস্র লক্ষ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই অতীতকালে কত লক্ষ কোটি মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে; বর্ত্তমানেও প্রতি মুহূর্ত্তে কত লক্ষ লক্ষ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে কোন অপর ব্যক্তির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় না—কোথায় একটু পার্থক্য থাকিয়া যায়। সাদৃশ্য সম্পূর্ণ হইলে মানবসমাজের যে কি বিসদৃশ অবস্থা হইত, তাহা কল্পনাতেও আনা দুরূহ। যদি সকল মানুষ এক ও অভিন্ন হইয়া একই মানুষে পরিণত হইত, তবে কোথায় রহিত মানুষের এই বিচিত্র লীলা? সকল বিষয়ে নিজত্ব ছাড়িয়া দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হওয়াকে তো আত্মার এক প্রকার মৃত্যু বলা যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে জীবনীশক্তি থাকিলেই তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিবেই। ঐ একটু-না-একটু পার্থক্য থাকে বলিয়াই মানবের বৈচিত্র্যের মধ্যে কেমন এক সুন্দর সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে বলিয়া আমরা কাহাকেও নিজের বিশেষত্ব মুছিয়া দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে বলি না। ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ এবং তাঁহার ভাবরাশিরও অন্ত নাই। সেই অনন্ত ভাবরাশির এক একটী বিশেষ ধারা এক একটী মানবের অন্তরে নিহিত থাকিয়া বিকসিত হইতে চায়। কাজেই মানবগণের মধ্যে ভাবের পার্থক্য তো থাকিবেই। আমাদের বক্তব্য এই যে, পার্থক্যের জন্য যেন বিবাদের কোন কথা না আসে; পার্থক্যগুলিকে সাম্প্রদায়িকতার আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়া যেন গণ্ডীবদ্ধ করিয়া ফেলা না হয়। সত্যধর্ম্মকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র করিলে, ভগবৎপ্রীতিকে আমাদের সকল কার্য্যের সকল অনুষ্ঠানের নিয়ামক করিলে বিবাদবিসম্বাদের কথা তো আসিতেই পারে না, বরঞ্চ সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে, সমস্ত মতভেদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যধারা প্রবাহিত হইবে।

সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, পৃথিবীর সকল উপধর্ম্মের ভিতরেই সত্যধর্ম্মের ধারা অল্পবিস্তর অন্তঃসলিল আকারে প্রবাহিত হইতেছে। সেই ধারা প্রবাহিত না থাকিলে ঐ সকল উপধর্ম্মের যেটুকু সঞ্জীবনী শক্তি আছে তাহাও সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইত। সত্যধর্ম্মই একমাত্র আত্মার ধর্ম্ম। সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইবে—ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের এবং মানবের হিতসাধনেই তাহার পরিণতি। ইহাই হইল হিন্দুধর্ম্মের চরম শিক্ষা—ইহাই হইল সকল ধর্ম্মেরই চরম শিক্ষা। এই সত্যধর্ম্মে ভারতবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সাম্প্রদায়িক সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ বিদূরিত হইবে এবং ভারতবাসী দ্বেষহিংসা, শতবিধ ভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে পদদলিত করিয়া জগতের মহাসভায় জ্ঞানোজ্জ্বল কর্ম্মোজ্জ্বল ও প্রেমোজ্জ্বল সিংহাসনে বসিবার অধিকার বজায় রাখিতে পারিবে। বর্ত্তমান জাতীয় নবজাগরণের লক্ষণ হইল ছোটখাটো ভেদাভেদ ভুলিয়া মূলমন্ত্রে একতাবদ্ধ হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং পরস্পরের প্রতি সহায়হস্ত বিস্তার করা।

সকল উপধর্ম্মের অন্তরে যে সত্যধর্ম্মের ধারা নিরন্তর প্রবাহিত, বর্ত্তমান যুগের লক্ষণসকল দেখিয়া সেই সত্যধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতেছি। সত্যধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। জগতের চতুর্দ্দিকে ভগবান তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া দিয়াছেন, তাই সত্যধর্ম্মের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই মহাজাগরণ আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার ধর্ম্মবাণীসকল প্রকাশ করিতেছেন; ঐ যে বাহাইধর্ম্মের তরঙ্গ পারস্য দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রভৃতি দূর-দূরান্তরবর্ত্তী দেশেরও উপকূলে আসিয়া লাগিতেছে; ঐ যে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে একটা সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে—এ সকলই তো একই সত্যধর্ম্মের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। নামের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সত্যধর্ম্মকে আবদ্ধ

করিতে যাইও না—আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আমরা হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, হিন্দুসমাজে লালিত-পালিত হইয়াছি, হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাই হিন্দুশাস্ত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠতম যে নাম দিয়াছেন, সেই নাম ধরিয়াই আমরা সত্যধর্ম্মের নাম দিয়াছি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে ভাগবত বা ইসাই বা মুসাই বা অন্য যে কোন ধর্ম্ম বলিয়াই অভিহিত করেন, তাহাতে মানুষের বুঝিবার অসুবিধা ব্যতীত প্রকৃত সত্য-ধর্ম্মের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। ঐ যে তুরস্কদেশে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম্মমত পোষণের স্বাধীনতা বিঘোষিত হইয়াছে ; ঐ যে চীনদেশে ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রনীতির সংযোগরক্ষায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে ; ঐ যে রাষিয়াতে ধর্ম্মের প্রচারকার্য্য একপ্রকার বন্ধ করা হইয়াছে, এ সমস্তই তো সত্যধর্ম্মেরই বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল দেশ ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাবের বা উপধর্ম্মেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, ঐ সকল ঘটনা তাহারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে।

ভগবানের ইচ্ছা এই যে, এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি আবহমানকাল জগদ্‌গুরুর যে পবিত্র আসন অধিকার করিয়া আসিতেছে, এখনও সেই আসন অধিকার করিবে; তাই তাঁহার বিজয়ভেরী বাজাইবার অধিকার দিলেন, তাই তাঁহার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার অধিকার দিলেন এক ভারতবাসীকে। আজ ৯৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন সমগ্র জগৎ সাম্প্রদায়িকতায় ডুবিয়া ছিল, তখন ভগবানের আদেশ পাইয়া সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার একপ্রান্তে ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত করিলেন এবং পুণ্য ১১ই মাঘের পবিত্র দিনে তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সত্যধর্ম্মের বিজয়পতাকা উত্তোলিত করিলেন রাজা রামমোহন রায়। আজ প্রায় শতাব্দী পরে তাহার বিজয়বার্ত্তা জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে সুরু হইয়াছে ; সত্যধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উত্তোলন সার্থক হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শতাব্দীপ্রায় কালের মধ্যেই, প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিবার ফলে নহে, কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা বশতঃ নানা কারণে সত্যধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার কারণেই সত্যধর্ম্মের প্রচারক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজকেও সাম্প্রদায়িকতার তপ্ত নিশ্বাস স্পর্শ করিতে ছাড়ে নাই। সম্প্রতি একটী লোকভোলানো কথা বড়ই বেশী প্রচারিত হইতেছে—সকল ধর্ম্মে সত্য আছে বলিলে নাকি সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় এবং সকল ধর্ম্ম সত্য বলিলে নাকি প্রকৃত উদারতা প্রকাশ পায়। এই শেষোক্ত কথাটী ব্রাহ্মসমাজে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশের অন্যতর কারণ বলিয়া মনে হয়। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে অর্থাৎ সকল উপধর্ম্মের ভিতর সত্যধর্ম্ম অন্তর্নিগূঢ় আছে, এ কথা বলিলে সঙ্কীর্ণতা যে কিরূপে প্রকাশ পায় তাহা আমরা বুঝি না। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, একথা যে খুবই সত্য, তাহা উপধর্ম্মসমূহের সংস্কার সাধনের জন্য মহা-পুরুষগণের আবির্ভাব হইতেই প্রকাশ পায়। সকল ধর্ম্মই সত্য, ইহার অর্থ যদি এই হয় যে জগতে যত কিছু উপধর্ম্ম আছে, তাহার প্রত্যেকটীর প্রত্যেক অংশ সত্য, তবে তাহা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। ইহা অসত্যের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ এবং সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার অন্যতর উৎস। ঐ কথা যদি সত্য হইত, তবে অতি আদিম-কালের প্রচলিত উপধর্ম্মেরও সংস্কার সাধন আবশ্যক হইত না। ঐ কথা যদি সত্য হইত, তবে বিরোধের কথা উঠিতেই পারিত না, বিরোধীদিগের জন্য প্রার্থনারও প্রয়োজন হইত না এবং বিরোধের পরিণামে সমন্বয়সাধনের কথাই আসিতে পারিত না।

যুবক বন্ধুগণ! উপসংহারে তোমাদিগকে বলিতে চাহি যে সম্মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমাদিগের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে যে, তোমরা শ্রেয়কে ধরিয়া চলিতে চাও, অথবা প্রেয়ের পথে চলিতে চাও ; তোমরা জনমতের বিরুদ্ধেও সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া দেশকে সত্যধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিতে চাও, অথবা আমোদ আহ্লাদের সহচর উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাও। তোমাদের নিকট আমার কাতর মিনতি এই যে, মানুষ যতই বড় হৌক না কেন, মানুষের চরণে নিজের সর্ব্বস্ব নিজের আত্মাকে বলিদান করিও না। তোমাদের অন্তরে ভগবান যে শুভবুদ্ধি নিহিত করিয়া দিয়াছেন সেই শুভবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া যথাযথ বিচার পূর্ব্বক শ্রেয়ের পথে চলিতে থাক ; সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভগবানের পতাকা চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া জীবনসংগ্রামে বিজয়লাভ কর ; উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে ভগবানের নামের বিজয়ডঙ্কা সজোরে বাজাইয়া দাও। দূর হইয়া যাক শতবিধ সঙ্কীর্ণতা ; পদদলিত করিয়া দাও সাম্প্রদায়িকতা ও তাহা হইতে উৎপন্ন সহস্র লক্ষ ভেদাভেদ ; আগুন লাগাইয়া দাও অস্পৃশ্যতার বেড়াজালে ; মৃত্যুমুখে পতিত হৌক আভিজাত্যের বৃথা গর্ব্ব। জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে বিচ্ছেদবিরহ আনিবার আর সময় নাই ; তোমাদের শুভবুদ্ধিতে অন্যায় বলিয়া যাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পশ্চাৎপদ হইও না। ভগবানের চরণধূলি মস্তকে ধারণ কর এবং সকল প্রকার সংশয় ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর ও জাগ্রত হও। তোমাদের তেজে দেশের মলিনতা দগ্ধ হইয়া যাক ; তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছায় জগতের কল্যাণ হউক ; তোমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ সকল সাধু ভাবে ও সকল সাধু অনুষ্ঠানে অগ্রণী হউক।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমারই আশ্রিত। আমাদের যাহা কিছু ভুলভ্রান্তি, সমস্তই তোমার করুণাধারায় ধুইয়া দাও। তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদের দেহে বল দাও, মনে ইচ্ছা দাও এবং আত্মাতে শক্তি দাও।

"তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ"।

ভৈরবী—একতালা।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে　　যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে
যিনি তৃণ-তরু-ফুলে ফলেতে　　তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এই নীল-ঘন আকাশে　　এই সুরভিত বাতাসে
রবি-শশী তারা প্রকাশে　　তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে যিনি বাহিরে　　যিনি যখনি যেখানে চাহিরে
ব্যাপ্ত সকল ঠাঁইরে　　তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ দেহে ও মনে শক্তি　　যিনি অন্তরে চির-ভক্তি
যিনি পরম গতি ও মুক্তি　　তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ হৃদয়ে পরা শান্তি　　বাহির ভুবনে কান্তি
যিনি ভোলান্ সকল ভ্রান্তি　　তাঁহারে নমস্কার।
যিনি জন্ম-মরণ ভয়　　করি দেন্ সব ক্ষয়
বিতরেন বরাভয়　　তাঁহারে নমস্কার।
এস সবে তাঁরে জানি　　তাঁরে জীবনেশ মানি
ঘুচে যাক্ যত গ্লানি　　তাঁহারে নমস্কার।
পুণ্য হৃদয়ে তাঁর　　করি পূজা বার বার
কেটে যাক্ মোহ ভার　　তাঁহারে নমস্কার॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

　　　　০　　　　১　　　　২´　　　　৩　　　　০
সা সা II সা -দা পা। দা পা দা। পা দা পা। -া পা পা I মা ণা ণা।
যি নি　অ গ্ নি　তে যি নি　জ লে তে　০ যি নি　শো ভ ন

১　　　　২´　　　　৩　　॥　　০　　　　১
। দা দা পা। মা পা মা। -া মা মা I মা পা মা। মা জ্ঞা রা।
এ ক্ষি তি　ত লে তে　০ যি নি　তৃ ণ ত　রু ফু লে

২´　　　　৩　　　　০　　　　১　　　　২´
। জ্ঞা রা রজ্ঞমজ্ঞা। -রজ্ঞা -াঃ ঋঃ I ঋা ঋা ঋা। জ্ঞা জ্ঞা -ঋা। সা -া -া।
ফ লে তে০০০　০০ ০ ০　তাঁ হা রে　ন ম স্　কা ০ ০

৩　　　　০　　　　১　　　　২´　　　　৩　　　　০
। -া সা সা I ণ্া দ্া দ্া। দ্া দ্া ণ্া। ণ্া সা সা। -া সা সা I দ্া জ্ঞা জ্ঞা।
র্ যি নি　এ ই নী　ল ঘ ন　আ কা শে　০ যি নি　এ ই সু

১　　　　২´　　　　৩　　　　০　　　　১
। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। রা জ্ঞা রজ্ঞা। -মপা -দা -া I পা ণা ণা। দা পা মা।
র ভি ত　বা তা সে০　০০ ০ ০　র বি শ　শী তা রা

২´　　　　৩　　　　০　　　　১　　　　২´
। জ্ঞা জ্ঞা রজ্ঞা। -মা -া -া I জ্ঞা জ্ঞা জঋা। জঋা জঋা -া। সা -া -া।
প্র কা শে০　০ ০ ০　তাঁ হা রে০　ন ম স্　কা ০ ০

৩
। -া সা সা II
র্ 'যি নি'

• ১ ২´ ৩ • ১
II মা -দা দা | দা দা ণা | ণা র্সা র্সা | -া র্সা র্ঋা I ণা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্ঋা র্সা |
অ • ন্ত রে যি নি বা হি রে • যি নি য খ নি যে খা নে

২´ ৩ • ১ ২´
| ণা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা -র্রা র্রর্জ্ঞর্মর্জ্ঞা |
চা হি রে • যি নি ব্যা • প্ত স ক ল ঠাঁ ই রে • • •

৩ • ১ ২´ ৩
| র্রর্জ্ঞা -াঃ -র্ঋঃ I র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্ঋর্জ্ঞা র্ঋর্জ্ঞা -র্ঋা | র্সা -া -া | -া দা দা I
তাঁ হা রে ন ম স্ কা • র্ • যি নি

• ১ ২´ ৩ • ১
I দা র্সা র্সা | র্সা র্ঋা র্সা | ণা -া ণা | -া ণা ণা I ণা -র্সা ণা | ণা দা দা |
এ দে হে ও ম নে শ • ক্তি • যি নি অ • ন্ত রে চি র

২´ ৩ • ১ ২´
| পা -া পা | -া পা পা I মপা পা পা | পা পা জ্ঞা | পা -া পদা |
ভ • ক্তি • যি নি প র ম গ তি ও মু • ক্তি•

৩ • ১ ২´ ৩
-া -া -পা I মা জ্ঞা ঋা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা -া | সা -া -া | -া সা সা II
• • • তাঁ হা রে ন ম স্ কা • র্ • 'যি নি'

• • ১ ২´ ৩ •
II সা সা সা | সা সা সা | সা -া সা | -া -া -রা I জ্ঞা জ্ঞা -া |
এ ক দ রে প রা শা • ন্তি • • • বা হি র্

১ ২´ ৩ • ১
| জ্ঞা মা মা | মা -া মা | -া মা মা I মদা দা -া | দা দা দা |
ভু ব নে কা • ন্তি • যি নি ভো লা ন্ স ক ল

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
| ণা -দা দা | -া -া -ণা I র্সা র্সা র্সা | র্ঋা ণা -া | র্সা -া -া | -া সা সা I
ভ্রা • ন্তি • • • তাঁ হা রে ন ম স্ কা • র • যি নি

• ১ ২´ ৩ •
I সা -জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া -া | -রজ্ঞা -মা -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা |
জ • ন্ম ম র ণ ভ • • • • য় • ক রি দে

১ ২´ ৩ • ১ ২´
| -ঋা ঋা -া | সা -া -া | -া -া -া I দ্া -ণ্া সা | -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা -মা -া |
ন্ স ব্ ক্ষ • • • য় • বি ত রে ন্ ব রা ভ • • •

৩ • ১ ২´ ৩
| -া -া -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞঋা | জ্ঞা ঋা -া | সা -া -া | -া -া -া II
• য় • তাঁ হা রে• ন ম স্ কা • র্ • • •

• ১ ২´ ৩ • ১
II মা দা দা | দা দা ণা | ণা -র্সা র্সা | -া -া -র্ঋা I ণা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্ঋা র্সা |
এ স স বে তাঁ রে জা • নি • • • তাঁ রে জী ব নে শ

২´ ৩ ০ ১ ২´
। ণা -র্সা র্সা । -া -া -া I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞ । -া র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞাঃ -র্রঃ র্রর্জ্ঞর্মর্জ্ঞা ।
মা ॰ নি ॰ ॰ ॰ ঘু চে যা ক্ য ত গ্ল ॰ নি॰॰॰

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্রর্জ্ঞা -াঃ -ঋঃ I ঋা ঋা ঋা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা -ঋা । র্সা -া -া । -া -া -া I
॰ ॰ ॰ তাঁ হা রে ন ম স্ কা ॰ ॰ ॰ র্ ॰

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I দা -র্সা -র্সা । র্সা ঋা র্সা । ণা -া -া । -া -া -া I ণা র্সা র্সা । ণা দা -া ।
পু ॰ ণ্য হৃ দ য়ে তাঁ ॰ ॰ ॰ র্ ॰ ক রি পু আ বা র্

২´ ৩ ০ ১ ২ ৩
। পা -া -া । -া -া -া । পা পা মপা । -জ্ঞা পমা পা । পদা -া -া । -া -া পা I
যা ॰ ॰ ॰ র্ ॰ কে টে যা ক্ মো॰ হ ভা॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র্

০ ১ ২´ ৩
I মা মজ্ঞা জ্ঞঋা । জ্ঞঋা জ্ঞঋা -া । সা -া -া । -া সা সা IIII
তাঁ হা রে ন ম স্ কা ॰ র্ ॰ 'বি নি'

কলিকাতায় চলাফেরা।

(সেকালে আর একালে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

হাবড়ার পুল।

কলিকাতার চলাফেরার বিষয় বলিতে গেলে হাবড়ার পুলের বিষয় দুইচার কথা না বলিলে চলে না। এখন যদি পুলের বাহিরে কোথাও একধারে দাঁড়াইয়া পুলের দিকে, বিশেষত সকালে বেলা ৯টা হইতে ১১টা এবং বৈকালে বেলা ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কেহ দেখেন, এবং ঐ দুই বেলা যে আফিসে যাতায়াতের বেলা, তাহা যদি তিনি না জানেন, তবে তাঁহার নিশ্চয়ই মনে হইবে, কোথাও কোন উৎসব লাগিয়াছে এবং এই জনসংঘ বুঝি সেই উৎসব-ক্ষেত্রে চলিয়াছে বা সেখান হইতে ফিরিতেছে। সেকালে পুলের উপর দিয়া এত লোকের চলাচল ছিল না। সেকালে পোর্টকমিশনরদিগের ষ্টীমার ছিল না, কাজেই যাঁহারা হাবড়ায় যাইতেন, তাঁহারা হয় ছোট ছোট পান্সি করিয়া পার হইতেন, নচেৎ এই পুলের উপর দিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। পুলের উপর যাইতে গেলেই এক পাল্লায় প্রতি লোকের উপর এক পয়সা, প্রতি ঠিকা গাড়ীর উপর তিন আনা এবং প্রতি ঘরের গাড়ীর উপর ছয় আনা দিতে হইত। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, উভয় সহরের মধ্যে যাতায়াতের উপর এত কড়া মাশুল বসাইবার ফলে উভয়ের কোনটীই তেমন বাড়িয়া উঠিতেছিল না। এই মাশুল বসানো হইয়াছিল পুল তৈরির খরচ উঠাইবার জন্য। মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে আমাদের মাতামহের বাড়ী সাঁতরাগাছিতে যাইতে হইত। পুলের মধ্যপথে গাড়ি ধরিয়া দাঁড় করানো হইত—ছেলে বেলায় সেটা বেশ একটু যেন রহস্যকর ব্যাপার বলিয়া আমাদের মজা লাগিত। কিন্তু যখন গাড়ি ধরিয়া ঘুষ পাইবার আশায় আদায়কারীরা হিসাবপত্র ঠিক করিতে বিলম্ব করিত, তখন বড়ই বিরক্ত বোধ হইত। অবশেষে কোন্ বৎসর মনে নাই, শুনিলাম যে পুল তৈয়ারির খরচ উঠিয়া গিয়াও মাশুল হইতে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে বলিয়া মাশুল উঠিয়া যাইবে। শুনিয়া উভয় সহরের, বিশেষত হাবড়ার, অধিবাসীদের অন্তর হইতে আনন্দের একটা কলরোল উঠিয়াছিল। উভয় সহরের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া অনেক পরিবারের লোকেরা বাস করিতেন।

সেকালের প্রকৃত হাবড়া সহরে পৌছাইতে গেলে হাবড়ার পুল হইতে নামিয়াই একটা উপর-পুল বা রেল লাইনের উপর overbridge দিয়া নামিতে হইত। সেই উপরপুলটী বর্ত্তমান উপর-পুলের যায়গায় ছিল না বা ইহার মত সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় ছিল না। সেই উপর-পুলের উপর যাতায়াতের দোহাই দিয়া সেকালের ঠিকা

গাড়ীর গাড়োয়ানরা সাঁতরাগাছিতে সহজে যাইতে চাহিত না—গেলেই যাতায়াতের ভাড়া অনূন্য ৩৲ তিন টাকা চাহিত।

হাবড়ায় বাঘ।

আমার মামারা প্রতিদিন সাঁতরাগাছি হইতে কলিকাতায় কর্ম্ম উপলক্ষে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহাদের কাছে মধ্যে মধ্যে হাবড়ায় বাঘ আসিবার কথা শুনিতাম। সাঁতরাগাছি অথবা বোটানিকেল গার্ডেনে যাইবার পথে রাস্তার দুইধারে আমরা হোগলার সুবিস্তৃত বন ও জলা দেখিয়াছি। শুনিলাম সেই সমস্ত হোগলার বনে নরভুক্ "কেঁদো" বাঘ আসিয়া সময়ে সময়ে লুকাইয়া থাকে। একবার বড় মামা আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ঐ প্রকার একটা হোগলার বনের ধারে মানুষখেগো বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়াছে। হাবড়াবাসীরা ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরাও অনেকদিন পর্য্যন্ত এই কারণে মামার বাড়ী গিয়া আদর সম্ভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অবশেষে কিছুদিন বাদে শুনিলাম যে, বাঘটী বন্দুকের গুলিতে মারা পড়িয়াছে —আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম।

নূতন পুল।

পুরাণ পুল প্রায় ৫০ বৎসর চলিবার হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ার সার ব্রাডফর্ড লেসলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা চলিয়াছে প্রায় তার দেড়া। কাজেই উহার স্থলে একটী নূতন পুল নির্ম্মাণের প্রস্তাব উঠিল। এই সেদিন যে যুদ্ধ হইয়া গেল, সেই সময়ে পুরাতন পুলের উপর দিয়া বর্ত্তমান কালের উপযোগী কামান লইয়া যাইবার কথা হওয়াতে কোন কোন ইঞ্জিনিয়র তাহার বিরুদ্ধে নাকি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাগ্যবশত যুদ্ধ থামিয়া গেল, নচেৎ সেই উপলক্ষে এই নূতন পুল নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে কত অজস্র অর্থ ব্যয় হইত তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গবাসীকে গুরুতর করভার হইতে ভগবান রক্ষা করিলেন। কিন্তু "আমি ছাড়ি তো কমলী ছাড়ে না।" ভগবান ছাড়িলেন, যুদ্ধ থামিল। কিন্তু কমলী ছাড়ে না। আবার সেই নূতন পুলের কথা খুব জোরের সঙ্গে উঠিল। এবার লণ্ডনের টেমস নদীর উপরে যে পুল আছে, তাহার মত পাকা পুল করিবার প্রস্তাব হইল। রাশি রাশি টাকার এক বৃহৎ ফর্দ্দ পেশ হইল। তদানীন্তন লাট সাহেব একটা ভোজে আশা প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার কার্য্য সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় সেই পুলের উপর দিয়া পার হইবেন। কিন্তু ইচ্ছা ও আশা মানবের, কলকাঠি ভগবানের হাতে। মন্ত্রণাসভার সভ্যেরা দেশবাসীকে অতিরিক্ত করভারের দায় হইতে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে সে প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিলেন। নানাবিধ পরামর্শের পর বর্ত্তমান পুলকেই সুদৃঢ়রূপে মেরামত ও একটু প্রশস্ত করিবার প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে এবং সেইমত কার্য্যও চলিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই ভাবে পুলটীকে সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত করা হইলে তাহার উপর দিয়া ট্রামগাড়ীও চলিতে দেওয়া হইবে।

কলিকাতা সমুন্নতি-ন্যাস।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা দূরে থাক, আজ দশকুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও যিনি কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছেন, দশবিশ বৎসর বাদে তিনি বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে তাহার অনেক অংশ কিছুতেই চিনিতে পারিবেন না, ইহা আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলিতে পারি। আমরা তো পুরাতন কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা; নূতন কলিকাতার নূতন রাস্তাঘাট মনের মধ্যে ঠিক করিয়া বসাইয়া লইতে আমাদেরই কয়েক বৎসর লাগিয়া গিয়াছে। ভবানীপুর অঞ্চল এত বেশী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহার নবনির্ম্মিত রাস্তাঘাট আজ পর্য্যন্ত আমাদেরই সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারে নাই। এই দারুণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় Calcutta Improvement Trust বা কলিকাতা সমুন্নতিন্যাসের সৃষ্টি হইতে। আজ বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মহামারীগুলি (প্লেগ, কলেরা ও বসন্ত) করাল বদনে বিচরণ করিতেছিল। সেই সময়ে বোম্বাই সহরের দৃষ্টান্তে কলিকাতাতেও "সমুন্নতিন্যাস" স্থাপন করিয়া "বস্তি"-সমূহের অতিমাত্র বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া এবং সুপ্রশস্ত সুরম্য রাস্তাঘাট খুলিয়া ও মধ্যে মধ্যে সহরের "ফুসফুস"-রূপে বাগান প্রস্তুত করিয়া সহরের উন্নতিসাধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। ক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল—"কলিকাতা সমুন্নতিন্যাস" সংস্থাপিত হইল। ক্রমে উন্নতিসাধনের প্রণালী প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইল, আইন করা হইল এবং নক্সাও প্রস্তুত হইল। ক্রমে ক্রমে যথাবিধান কার্য্যও আরম্ভ হইল। কত লোক যে গৃহহীন হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল গৃহবিতাড়িত ব্যক্তিরা অনেকেই গৃহাদির বিনিময়ে যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত মূল্য হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন না।

মাড়োয়ারীদিগের নব জাগরণ।

যাই হোক, ঐ ন্যাসের বা ট্রষ্টের কার্য্য যখন আরম্ভ হইল, তখন তাহা দেখিবার জিনিষ হইয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে এ বস্তি সে বস্তি অদৃশ্য হইয়া গেল; এক-একটী রাস্তার চিহ্নোট স্বরূপে যে সকল বহু পুরাতন অট্টালিকা বাল্যকাল অবধি দেখিয়া আসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে

সে সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়া গেল—তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। তাহার ভিত্তিভূমির উপর দিয়া হয়তো নূতন রাস্তা চলিয়া গেল, অথবা পুরাতন অট্টালিকার স্থলে আর একটী নবতর সৌধ উঠিল। নূতন রাস্তার ধারে যে সমস্ত সৌধ উঠিয়াছে, তাহার কোনটাই পাঁচতলার কম নয়। যখন হ্যারিসন রোড খুলিবার পর তাহার দুই ধারে চারতলা পাঁচতলা বাড়ী উঠিতে লাগিল, তখন আমরা অবাক হইয়া দেখিতাম যে কি ব্যাপার! কিন্তু এখন এব্যাপার তো যেখানে সেখানে। কেবল তাহাই নয়। আজকাল সাততলা বাড়ীও কয়েকটী দেখা যায়। এখন যেখানে স্মিথ ষ্টানিসষ্ট্রীটের ডাক্তারখানা আছে, সেই বাড়ীটাই কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সাততলা উঠে। উহা মঞ্জুর করা হইবে না বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেসনের প্রধান ইঞ্জিনিয়র স্থির করিয়াছিলেন। শেষে সংবাদ-পত্রে অনেক লেখালেখির পর উহা মঞ্জুর হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীর অধিকাংশই মাড়োয়ারীর অধিকারভুক্ত। আমাদের বাল্যকালে শুনিতাম, মাড়োয়ারীরা অত্যন্ত কৃপণ—এক পয়সা তাঁহাদের মা-বাপ, লক্ষ টাকা রোজগার না হইলে তাঁহারা মশারি ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু আজকাল আর সে কথা খাটে না। বর্ত্তমান জাপান প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে কবিবর হেম বাড়ুয্যে বলিয়াছিলেন—"চীন তাতার অসভ্য জাপান" এবং ঐ সমস্ত দেশকে অসভ্যপর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ঐসকল দেশ কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইতেছে যে, উহারা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ়। সেইরূপ এখন মাড়োয়ারীরা যে ভাবে নানা দিকে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহাতে আর উহাদিগকে কৃপণ বলা চলে না। তাঁহারা যেমন রোজগার করেন, তেমনি ব্যয়ও করেন।

ব্যবসায়ের দুর্নীতি।

তাঁহাদের রোজগারের প্রধান পথ হইল কোম্পানীর কাগজ বা Government promisoory noteএর কেনাবেচা এবং অন্যান্য কলকারখানার কাগজ বা Share কেনাবেচা লইয়া খেলা। কিন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ রোজগারের যে পথ অবলম্বন করেন তাহা সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবিগর্হিত এবং দেশের সমূহ অকল্যাণকর। আমরা আশা করি, তাঁহারা যখন ভারতবাসী, তখন ভারতের অনিষ্টকর কোন রোজগারের পথ অবলম্বন করিবেন না। শুনিয়াছি, বর্ম্মাযুদ্ধে এক মাড়োয়ারী ঘি সরবরাহ করিবার কন্ট্রাক্ট পাইয়াছিলেন। তিনি করিলেন টিনের মুখে দুইটী আলপিনের ছিদ্র। তাহারই একটী দ্বারা ভাল ঘি বাহির করিতে লাগিলেন এবং টিনের ভিতরের শূন্যস্থান ভেজাল তেলের দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এসমস্তই অবশ্য ঘুষের জোরে চলিয়া যায়। এইরূপে শুনিতে পাই, তিনি অনেক লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকালে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে তন্মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা একটা সৎকার্য্যে ব্যয় করিলেন। আজ কয়েক বৎসর হইল, ঘৃতে বড়ই ভেজাল চলিতেছে বলিয়া কলিকাতা সহরে একটা মহা হৈচৈ উঠিল। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে, বেলেঘাটায় এক মাড়োয়ারী ঘৃতে সাপের চর্ব্বি মিশাইবার একটা কারখানাই খুলিয়া বসিয়াছেন! তখন প্রায়শ্চিত্তের ধুম পড়িল—গঙ্গার ঘাটে মুণ্ডিতমস্তক মাড়োয়াড়িদিগের কি ঘটা! কিন্তু ফলে কি হইল? যে ঘিয়ের দাম ছিল প্রতি সের ১৸৹ টাকা, সেই ঘিয়ের দাম একেবারে চড়িয়া গেল প্রতি সের ২৷৷৹ টাকায়; আর শুনিতে পাই যে, ঘিয়ের ভেজাল দিবার প্রথা বিশেষ কিছুই কমে নাই—যেমন ছিল তেমনই আছে!! বাঁকুড়ার অধিবাসীরা ভাল তেল খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছিল—হঠাৎ দেখা গেল, এক মাড়োয়ারি এক মুদির দোকান খুলিয়া খুব সস্তায় ঘি তেল দিতে লাগিল। একটা বিবাহভোজে সেখানকার এক বর্দ্ধিষ্ণু লোক সেই মাড়োয়ারির নিকট তেল লইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে উক্ত বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ওলাউঠা-কল্প রোগে পড়িয়াছিলেন। তখন অনুসন্ধান চলিল যে, কখনও যাহা হয় না, আজ এপ্রকার হইল কেন? অবশেষে সেই মাড়োয়ারির তেলই ইহার কারণ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। তেল পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, সর্ষে তেলের সঙ্গে কুসুমফুলের তেল মিশ্রিত হইয়াছে! মাড়োয়ারিকে ফৌজদারি সোপরদ্দ করিবার কথা হওয়ায় অনেক কাকুতিমিনতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় সে যাত্রায় সে রেহাই পাইল। তাহার পর তাহাকে "বয়কট" করিবার কথা হইল। কিন্তু দরিদ্র বঙ্গবাসী, দরিদ্র পল্লীবাসী অমন সস্তা জিনিষ পাইয়া একঘরে করে কি প্রকারে? না হয়, কুসুমফুলের তেলেই পেটকে সহাইয়া লওয়া যাইবে!! দুর্নীতিপর মাড়োয়ারিগণ যে কি প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য দেশের অমঙ্গল সাধনেও প্রবৃত্ত হয়, তাহাই দেখাইলাম। তাহারা নিজের মরুভূমি ব্যতীত অপর কোন স্থানকে নিজের দেশ বলিয়া মনে স্থান দিতে চায় না। তাই বলিয়া মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে যে সদ্ব্যবসায়ী নাই, তাহা বলি না। সদ্ব্যবসায়ী না থাকিলে জাতি হিসাবে তাঁহারা এতটা উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন না।

জমির মূল্যবৃদ্ধিরোগ।

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে মাড়োয়াড়িগণ নানা উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত

টাকা তাঁহারা জমি কেনা ও বাড়ী নির্ম্মাণে অনেকাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন। মধ্যে একটা রব উঠিয়াছিল যে, যুদ্ধে ইংরাজেরা পরাজিত হইবে। তখন মাড়োয়ারিরা অস্থির হইয়া এটর্ণিদিগের পরামর্শ লইয়া স্থির করিলেন যে, কোম্পানীর কাগজ, এমনকি নগদ টাকাও হাতে রাখা নিরাপদ নয়, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা জমি কিনিয়া রাখিলে ইংরাজরাজ চলিয়া গেলেও তাহা থাকিবে। আর তাঁহাদিগকে পায় কে? একজন যেই ঐ ধুয়া ধরিলেন, সমগ্র মাড়োয়ারী জাত পিছনে পিছনে চলিলেন—উঁহাদিগের মধ্যে সংঘবদ্ধ ভাব অত্যন্ত প্রবল। দেখিতে দেখিতে জমি কিনিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। জমির দাম পূর্ব্বাপেক্ষা পাঁচগুণ, ছয়গুণ, দশবিশগুণ চড়িয়া গেল। এই সময়ে যাঁহারা জমি বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রচুর লাভ করিয়াছিলেন। যোড়াসাঁকো অঞ্চলের যেখানে পূর্ব্বে প্রতি কাঠার হাজার টাকা মূল্য ছিল, এখন সেই স্থলে ১৫।১৮ হাজার দাম হইল। যোড়া-সাঁকোর নিকটবর্ত্তী একস্থানে ২৮ হাজার টাকা মূল্যে প্রতি কাঠা বিক্রয় হইয়াছিল। আমাদের বাল্যকালে সিংহীবাজারের ৩০ বিঘা জমির দর দিয়াছিল ১৫ হাজার টাকা। সেই জমির দর সেদিন ৩ লক্ষ টাকা পাইলেও মালিক ছাড়েন নাই। আমরা তো শুনিয়া হতভম্ব। আর এই প্রকার মূল্য দিয়া কিনিবার লোক একমাত্র মাড়ো-য়ারি। যুদ্ধের সময় এক মাড়োয়ারি অতিরিক্ত অন্যায় করিয়া কোটি কোটি টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে ফৌজদারি মকদ্দমা আনিবার পর্য্যন্ত কথা হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার এক বন্ধু ঐ বিষয়ে আমার সঙ্গে গল্প করিতে থাকায় আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে মকদ্দমা হইলে তাহার কি হইবে? তাহার উত্তরে তিনি হিন্দিতে ভাঙ্গা মোটা গলায় বলিলেন—"ক্যা হোগা? তিন ক্রোর রুপেয়া কামায়া—এক ক্রোর রুপেয়া নদীতে ডাল দেগা।" অর্থাৎ মকদ্দমা পড়িলে এক কোটি টাকা চারিদিকে ঘুষে ছড়াইবেন, তাহা হইলে মকদ্দমা নিশ্চয়ই ফাঁসিয়া যাইবে এবং তাহা হইলেও দুই কোটি টাকা তো হাতে থাকিবে। কিন্তু হায়! ভগবানের বিধান নিক্তির ওজনে বিতরিত হয়—কোথায় গেল সেই তিন কোটি টাকা! বলি রাজার ন্যায় ভগ-বানের দণ্ডভারে সেই কোটিপতিকে আজ অজ্ঞাতবাসের পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। যেদিন শুনিলাম, ক্লাইব ষ্ট্রীটের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান প্রতি কাঠা ৭৫০০০৲ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। এই জমি কিনিবার হিড়িকের নাম হইয়াছিল Land boom বা জমির বৃদ্ধিরোগ। স্বভাবতই এই বৃদ্ধিরোগ বেশী দিন টিকিতে পারিল না—দাম পড়িয়া গেল। এদিকে যে সকল মাড়োয়ারি জমি কিনিয়াছিলেন, তাঁহারা ইতি-পূর্ব্বেই তদুপরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই সকল অট্টালিকার নির্ম্মাণমূল্যের উপযোগী মিউনিসিপাল কর ধার্য্য হইল। কাজেই তাঁহারা জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে চাহিলেন না. তাঁহারা ব্যয়িত অর্থের সুদ এবং কর যাহাতে উঠিয়া আসে সেইমত ভাড়া স্থির করিলেন।

মাড়োয়াড়িদিগের গুণ।

এই সমস্ত কথা বলিয়া মাড়োয়াড়িদিগকে কেবলই দোষার্হ বলিতেছি, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। অপরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া নিজেদের মহা গুণবান মনে করা মূর্খতা। মাড়োয়াড়িদিগের গুণ যথেষ্ট আছে। তাঁহারা যে প্রকার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে শত শতবার নমস্কার করিতে হয়। বাঙ্গালী আমরা যে প্রকার বিলাসী হইয়া উঠিয়াছি, আমাদের পক্ষে সে ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব নয়। আমার কর্ম্মস্থলে আমার অধীনে এক কেরাণী মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন। হঠাৎ একদিন তাঁহাকে দেখি, ফুলদার রেশমী মোজা এবং ডসনের বাড়ীর বার্ণিস করা জুতা পরিয়া আসিয়া-ছেন। অনাহারে ও নানা কুকর্ম্মে শরীরটাকে তো তিনি জীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অথচ এই বাবুয়ানীও চাই; কাজেই ইহলোকের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। মাড়োয়াড়িদিগেরই কল্যাণে অনেক অর্থ ভারতে রক্ষিত হইতে পারিয়াছে—তাঁহারা ব্যবসায়বাণিজ্যের কতক অংশ নিজেদের হাতে না রাখিলে, বোধ হয় শতকরা ৮০।৯০ অংশ ব্যবসায় ইংরা-জের হাতে গিয়া পড়িত এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের চরম সীমায় নামিয়া যাইত সন্দেহ নাই। আমি জানি, একটী মাড়োয়াড়ি কাঁধে কাপড়ের গাঁটরি লইয়া "ফেরি" করিয়া বিক্রয় করিতেন। যখন ভবানী-পুরে সমুদ্রভিন্যাসের কার্য্যফলে বড় বড় অট্টালিকা ভাঙ্গিবার আদেশ হইল, তখন তিনি সেই আদেশ কিনিয়া লইয়া বাড়ীগুলি ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং ইষ্টকাদি হরেক জিনিষ বাছাই করিয়া পৃথক ভাবে বিক্রয় করিতে লাগি-লেন। এবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়ো-জন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বর্ত্তমানে অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা ও লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া বসিয়াছেন। মাড়োয়াড়িরা তাঁহাদের ছেলেদিগকে কিপ্রকারে কষ্টসহিষ্ণু ও ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ করিয়া তোলেন, তাহার একটী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা

বলি। একদিন আষাঢ় মাসে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আমি ট্রামে চড়িয়া যাইতেছি। পথের ধারে দেখি, ৮।৯ বৎসরের এক মাড়োয়াড়ি বালক এক পয়সায় দুইটী দিয়াশলাই বাক্স বলিয়া সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিক্রয় করিতেছে। আমি আমার এক মাড়োয়াড়ি বন্ধুকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ছেলেকে (আমার মনে হইতেছে) তিন আনা পয়সা দৈনিক আনিতে হইবে। তিন আনা পয়সা আনিলে তবে সে পুরো খোরাকী পাইবে; অর্দ্ধেক আনলে অর্দ্ধেক খোরাকী পাইবে। তাহার কম আনিলে অনশনে উপবাসে থাকিতে হইবে। ৫ বৎসর বয়স হইতে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। মাড়োয়াড়িদিগের গদিতে গেলে দেখা যায় যে, অনেকগুলি ছেলে সেখানে বসিয়া সামান্য সামান্য এক আধটু খাতা লিখিতেছে, নকল করিতেছে ইত্যাদি। ইহার ফলে তাহারাও শৈশব অবধি ব্যবসায়ের হাওয়ায় বাড়িতে থাকে। যুদ্ধের পুর্ব্বের কথা বলিলাম; জানি না যুদ্ধের পরে হাতে অনেক টাকা পাইয়াও মাড়োয়াড়িগণ এই ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না।

কেবল মাড়োয়াড়ি কেন, ব্যবসায়ী জাতিরাই এই প্রকারে সন্তানদিগকে শৈশব অবধি ব্যবসায়ের হওয়ায় বাড়িতে দিয়া জাতীয় ধর্ম্ম বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করেন। আমাকে একজন মস্তবড় পার্শি বণিকও বলিয়াছিলেন যে, পার্শিরাও নাকি ৫ বৎসর বয়স হইতেই ছেলেদের ব্যবসায় সম্বন্ধে এক আধটু শিক্ষা দিতে থাকেন। পার্শি-দোকানে গিয়া দেখিয়াছি, ছোট ছোট ছেলেরা ঘুরিতেছে ফিরিতেছে আর শুনিতেছে, কোন্ জিনিস কোন্ দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহাদের পিতামাতা কাহার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ করিতেছেন। শুনিয়াছি, পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার এক পুত্রকে তদানীন্তন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিলাতী শাখায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—পুত্রের বয়স তখন প্রায় ২১ বৎসর। ২১ বৎসর বয়সে কার্য্যে ঢুকাইতে চাহেন শুনিয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ তো অবাক। তাঁহারা বলিলেন—১৪ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক কাহাকেও শিক্ষানবিশরূপে ব্যাঙ্কে লওয়া হয় না। শিক্ষানবিশিতে ঢুকিয়া বৎসর দুই ফটকে বসিয়া দরওয়ানি করিতে হয়; তাহার পর বৎসর-দুই বিভিন্ন বিভাগে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে চিনিতে হয়, তাহার পর বৎসর-চার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষানবিশি করিতে হয়; অর্থাৎ এক কথায় ৮ বৎসর ধরিয়া ব্যাঙ্কের হাওয়ায় তাহাকে গড়িয়া উঠিয়া ২১ বৎসর বয়সে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহার পর ভূপেন্দ্রবাবুর পুত্রকে ব্যাঙ্কে কেন যে লওয়া হইল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল কথা কলিকাতায় চলাফেরার সঙ্গে একটু অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে এগুলি আসিয়া পড়িল, তাই এসকল কথা উত্তর-বংশীয়দের উপকারে আসিতে পারে ভাবিয়া উহা বলিবার এমন সুন্দর অবসর হারাইবার ইচ্ছা হইল না এবং নাতিশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের কাছে ঠাকুরদাদা সাজিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আশা করি, পাঠকবর্গ তজ্জন্য কোন ক্রটী হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন।

সমুন্নতি-ন্যাসের কার্য্যফলে একদিকে বড় বড় রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে, সেই সকল পাদপথের একধারে ছায়াপ্রদ বৃক্ষসকল রোপিত হইতেছে। এই সকল রাজপথ প্রথম প্রস্তুত হইবার সময়ে ইটের খোয়া সুরকিতে জমাট বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তদুপরি পাথরের খোয়া আলকাতরার সঙ্গে মিশাইয়া ঢালা হইয়া রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, জল ও রৌদ্রতাপের ফলে এমন রাস্তাও উচুনীচু হইয়া যায়—ঠিক সমান থাকে না। তখন পরীক্ষার হিসাবে সেই সকল রাস্তার কতক অংশ উঠাইয়া ফেলিয়া পুনরায় নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে—প্রথমে একস্তর ইট বিছাইয়া দেওয়া হইল, তাহার উপর মোটা লোহার জাল ফেলা হইল; তাহার উপরে পাথরের খোয়া বিলাতী মাটির সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রস্থ ঢালা হইল; তাহার উপর আবার একটা লোহার জাল দেওয়া হইল; এবং সকলের উপরে স্ফটিক পাথর বা quarts পাথরের চূর্ণ বিলাতী মাটির সঙ্গে মিশাইয়া প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত পুরু করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল। সেন্ট্রাল এভিনিউ, বর্ত্তমানে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর কতক অংশে এই প্রকারে নির্ম্মিত রাস্তা দেখা যাইবে। এই রাস্তা বোধ হয় শত বৎসরেও বিশেষ কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না। সমুন্নতি-ন্যাসের দ্বারা যে কাজ ভাল হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার কার্য্যফলে কলিকাতায় অসুখবিসুখ যে খুব হ্রাস হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে অন্যায় হইবে। কিন্তু ইহার অছিলায় কলিকাতার পূর্ব্বতন বাসিন্দারা তাঁহাদের জীর্ণ পৈত্রিক ভিটা লইয়া থাকিলেও যে প্রকার করভারে নিপীড়িত হইতেছেন, তাহা বর্ণনার অতীত।

কবি টেনিসন গাহিয়াছেন—"ring out the old and ring in the new"—ঘণ্টা বাজাইয়া পুরাতনকে বিদায় দাও এবং ঘণ্টা বাজাইয়া নূতনকে আহ্বান কর। বিনা চেষ্টাতেই আমরা কবির এই উক্তিকে সার্থক করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের অনেক পুরাতন ধারণা অবস্থার

পরিবর্ত্তনে স্বতই অন্তর্হিত হইতেছে এবং নানাবিধ নবতর ধারণা অন্তরে স্থানলাভ করিতেছে। কে বা ভাবিয়াছিল যে, সম্ভ্রান্ত বঙ্গমহিলা পর্দ্দার অন্তরাল ছিন্ন করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে জনসংঘ ভেদ করিয়া বিচরণ করিতে সাহস করিবেন; ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া কালীঘাট যাদুঘর প্রভৃতি দর্শনার্থ বহির্গত হইবেন? কে বা ভাবিয়াছিল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বঙ্গবধূ স্বহস্তে মোটরগাড়ি হাঁকাইয়া পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিবেন? কে বা জানিত যে, বঙ্গপুরুষেরও পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গমহিলা বিমানযানে আরোহণ করিয়া কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিতে অগ্রসর হইবেন? এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের যে সকল প্রাচীন ধারণা একে একে অন্তর্হিত হইতে চাহিতেছে এবং যে সকল নবীন ধারণা আমাদিগের অন্তরে প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য উদ্যত—যেগুলিকে আমরা প্রাচীন ধারণার স্থলে সযত্নে পোষণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, সেই সকল প্রাচীন বা নবীন ধারণা উহাদের সকলগুলিই যে অবিমিশ্রিত ভাল বা অবিমিশ্রিত মন্দ, আমি তাহা বলি না বা বলিতে পারি না। আমি উপসংহারে উত্তরবংশীয়দিগকে এইটুকু বলিতে চাই যে, তাঁহারা যেন প্রতিক্ষণে ফ্যাসন বা বুদ্‌বুদের মত উত্থিত ঢংয়ের স্রোতে না ভাসিয়া পড়িয়া খুব সাবধানতার সঙ্গে যেন বিচার করেন যে, চলাফেরা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রাচীন ধারণা বা ভাবটী চলিয়া যাইতেছে, সেটী সত্যই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না; এবং যে নবীন ধারণা বা ভাবটী আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে, সেটী প্রকৃতই গ্রহণের যোগ্য কিনা। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন ও নবীন উভয়বিধ ধারণার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে—কবিপ্রসিদ্ধ হংসের ন্যায় আমাদের মন্দটী পরিত্যাগ করিয়া ভালটী গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আমার উত্তরবংশীয় তরুণ যুবকগণের প্রতি অনুরোধ যে, তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে বিচার করিয়া, যাহাতে নিজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, পরিবারের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয় এবং পরিণামে সমাজের ও দেশের শুভ হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহা পরিত্যাজ্য তাহা অকুতোভয়ে পরিত্যাগ করুন, এবং যাহা গ্রহণীয় তাহা সযত্নে গ্রহণ করুন। ভগবানকে সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা এই ভাবে আপনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন। মার্কিন কবি লংফেলোর সহিত এক হৃদয়ে আমি বলি—Act, act in the living present, with a heart within and God overhead। আমি অন্তরের সঙ্গে উত্তরবংশীয় নরোত্তম ঋষিদিগকে আশীর্ব্বাদ করি—তাঁহাদের গন্তব্য পথ শুভ হউক—শুভন্তে পন্থাঃ।

বালক তানসেন।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শরীরের সন্ধিস্থানসমূহে গ্রন্থিসকল আছে বলিয়া এবং তাহার সহিত এক প্রকার স্নেহপদার্থ বিদ্যমান থাকায়, আমরা শরীরকে যেমন সহজে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি, এবং নানারূপে সঞ্চালনাদির দ্বারা তাহাকে কর্ম্মণ্য রাখিতে সক্ষম হই, সেইরূপ আর্য্যসঙ্গীতের সন্ধিস্থানসমূহে, সঙ্গীতজ্ঞ মহাত্মারা গ্রন্থিস্বরূপ হইয়া আছেন বলিয়া এবং তৌর্য্যত্রিক প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি তাঁহাদিগের সুগভীর আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত, আর্য্যসঙ্গীত এখনও পর্য্যন্ত মূর্ত্তিমান হইয়া ভারতে বিরাজ করিতেছে, আমরা নানাপ্রকারে তাহার আলোচনা ও আন্দোলনাদি করিতে সমর্থ হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

এই সঙ্গীতমেধাসম্পন্ন মহাত্মাদিগের মধ্যে তানসেনও অন্যতম। ইনিও ভারতে সঙ্গীতের এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই যুগান্তর আনয়ন করিতে গিয়া অনেকে নির্দ্দয়হস্তে প্রাচীন কীর্ত্তি সকল বিধ্বস্ত করিয়া দেন, এরূপ দেখা যায়, কিন্তু তানসেন সেরূপ করেন নাই, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি সঙ্গীতরাজ্যে স্বেচ্ছাচারী হয়েন নাই। তানসেন প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নায়কদিগের সহগামী হইয়াই, জগৎকে গীতিসুধাবিতরণে তৃপ্ত করিয়াছেন—পূর্ব্ব সূত্র না ছিন্ন করিয়া, তাহাতেই স্বীয় গীতিকাব্যময় নূতন প্রসূনসকল গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব সঙ্গীতাচার্য্যদিগের তানে তিনিও যেন তান যোগ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহার এই সহগত বিনীতভাবের আভাস তাঁহার গীতালোচনায় বুঝিতে পারা যায়;—'তানসেন' নামের "সেন" উপাধিটীতেও এই ভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই "সেন" অর্থে নায়কের সহগামীর ভাব একরূপ স্পষ্ট বিদ্যমান।* বাস্তবিকই তানসেন পূর্ব্বসঙ্গীতাচার্য্যদিগের মার্গ সুন্দররূপে অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই "সেন" উপাধি খুব সম্ভবতঃ তিনি রাজসভায় পাইয়া থাকিবেন। ইহা রাজদরবারেরই উপযুক্ত উপাধি। এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তানসেনের আরেকটী উপাধিও ছিল; সেটী "মিশ্র"। লোকে তাঁহাকে 'তানমিশ্র' নামেও আখ্যাত হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু তানসেন নামটী এরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে

* "সেন" শব্দটী স+ইন হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। স অর্থে সহ এবং ইন অর্থে নায়ক, নেতা।

তাহার প্রভাবে তানমিশ্র নামটী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। তানসেন নামেই তিনি সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ।

তানমিশ্র নামটী বোধ হয় তানসেনের আদি নাম। তিনি বোধ হয় মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মিশ্র উপাধিটী সম্ভবতঃ পৈতৃক উপাধি ছিল। সেন উপাধি পরে, হয় রাজা রামচন্দ্রের সভায় অথবা সম্রাট আকবর সাহার দরবারে লাভ হইয়া থাকিবে। জীবনে তাঁহার উপাধির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'তান' এই নামটীর সম্ভবতঃ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই; কেবল তানসেনের পিতা তানসেনকে ডাকিবার সময়, তান নামটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহার অপভ্রষ্ট আকারে 'তন্নুয়া' নামে সম্বোধন করিতেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে; সকল দেশে, সকল কালে গুরুজনের স্নেহসম্বোধনের বেলায়, শুদ্ধ কথার অনেক সময়ে এইরূপ অপভ্রংশ করিয়া থাকেন।

তানসেনের পিতাও একজন গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীতচর্চ্চা তানসেনের গোষ্ঠীতে নূতন নহে। তাঁহার পিতৃপিতামহ সকলেই প্রায় পুরুষানুক্রমে বরাবর সঙ্গীত সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তানসেন তাঁহাদিগেরই সঙ্গীত সাধনার ফল। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাধনার দরুনই, আমরা তানসেনকে ভারতের 'গুণী' রত্নরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

তানসেনের গোষ্ঠীতে গুরুজনেরা যেমন নিজে যত্ন ও শ্রমসহকারে সঙ্গীতবিদ্যা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত থাকিতেন, সেইরূপ তাঁহারা বালকদিগকেও শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন; তাহাদিগকে না শিখাইয়া তাঁহাদের মন সম্যক্‌রূপে তৃপ্তি লাভ করিত না। তাঁহারা বেশ বুঝিতেন, যে বাল্যকাল হইতে অন্তরের মধ্যে বিদ্যা প্রবেশ করাইলে, সহজে বিদ্যালাভ হয়।

সকল বিদ্যাই প্রথম হইতে অভ্যাস করিলে, তাহা সহজে আয়ত্তাধীন হয়। বিদ্যা শিখিতে গেলে, শৈশবকালই প্রশস্ত আরম্ভকাল। শৈশবে যাহা শিক্ষা করা যায় তাহা মনে বসিয়া যায় ও অত্যন্ত ফলদায়ক হয়; কবি কালিদাসের 'শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং' কথাটী ঠিক; সকল বিদ্যাই বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করা উচিত। যেমন নরম জমীতে বীজ সহজে ফলে, তেমনি বালকদিগের মৃদু মনে বিদ্যাবীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়—সঙ্গীতবিদ্যার তো কথাই নাই। সঙ্গীত তাহারা অন্য বিদ্যা অপেক্ষা অতি সহজে ও শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারে। ইংরাজ কবি পোপ্ বলিয়াছেন;—"বালকেরা গানেরা অপেক্ষা অন্য কোন্ বিষয় বেশী শীঘ্র শিখিতে পারে?"* বালকে গান শীঘ্র শিখিতে পারে, তাহার কারণ ইহাতে তেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, প্রধানতঃ শুধু সুর ও কানের আবশ্যক। ইটালীর সঙ্গীতবিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা বলেন, ভাল গাইয়ে হইতে গেলে, দুইটী বিষয় আবশ্যক, ভাল সুর ও ভাল কান। যাহাদিগের ভাল সুর আছে তাহাদের গানের একশত জিনিশের মধ্যে নিরেনব্বই জিনিস আয়ত্ত। ভাল কানও সঙ্গীতে একটী অত্যাবশ্যক বিষয়।*

বালকেরা প্রথম হইতে নানা সুরে গাহিতে গাহিতে এবং সুর শুনিতে শুনিতে অনায়াসে তাহাদের সুরবোধ জন্মে এবং কান দুরস্ত হইয়া যায়। ইউরোপের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা 'হানডেল' শৈশবকাল হইতেই গীতরসে আকৃষ্ট ও পুষ্ট হওয়াতে, শৈশবেই তাঁহার মধুর সুরবোধ জন্মিয়াছিল। তাহার বলে, তিনি অনেক বাধা সত্বেও স্বীয় চেষ্টায় সঙ্গীতের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তানসেনের পিতা তানসেনকে ছেলেবেলা হইতেই, সঙ্গীতবিদ্যায় ক্ষমতাবান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার যত্নবীজ কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তানসেন কালে ভারতে একজন প্রসিদ্ধ গুণী গায়কের খ্যাতি লাভ করিলেন, বালক 'তন্নুয়া' প্রসিদ্ধ তানসেন হইলেন।

বালক 'তন্নুয়া'কে শিখাইতে গিয়া পিতার অনেক দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তানসেনের পিতা যখন তানসেনকে গান শিখাইবার জন্য সাতিশয় যত্ন করিতেন তখন তিনি গান অবহিত চিত্তে শিখিতেন না, তাই তিনি অত্যন্ত মনোদুঃখে তানসেনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন—বলিলেন "যাও গরু চরাও গে।" গায়কের গোষ্ঠীতে তানসেনের সঙ্গীতে অমনোযোগ—উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিলেন না।

এই পিতৃদণ্ডে তানসেনের শুভ ফল ফলিল, তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত অন্তঃকরণে সঙ্গীতসাধনদণ্ডে দণ্ডী হইয়া উদাসীনবেশে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বালক তানসেনের কতকটা অনুরূপ চিত্র আমরা ইউরোপীয় সঙ্গীতরাজ্যেও দেখিতে পাই; প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ সঙ্গীতকার বিথোভেনও বাল্যবয়সে সঙ্গীতে সেরূপ মনোযোগ দিতেন না; এবং তাহার জন্য তাঁহাকে দণ্ড পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিনিও বড় সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া উঠেন।

* "What can a boy learn sooner than a song?"—POPE.

* "That of the hundred requisites, which constitute a good singer, whoever has a fine voice has ninety-nine of them; a fine ear, however is an important requisite."

এইরূপে দেখা যায়, বাল্যকালে গুরুজনের তাড়নায় অনেক সময়ে শুভ ফল উৎপন্ন হয়; বালক 'তন্নুয়া' পিতৃদণ্ডের ফলেই জগদ্বিখ্যাত 'তানসেন' হইলেন। *

মহাপুরুষ শঙ্কর দেব।

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ দুবরা।)

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের এক প্রান্তস্থিত আসাম দেশে যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে সমগ্র আসাম ধন্য হইল, যিনি অসাধারণ প্রতিভার বলে সমগ্র আসামের সমাজ, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সকলই নিয়মাবদ্ধ করেন, যিনি প্রকৃত সাহিত্য-সেবা দ্বারা অসমীয়া ভাষাকে বহু উন্নত করিয়া তোলেন, যিনি আসামে ধর্ম্মের 'অক্ষয় বট' রোপণ করিয়া গিয়াছেন, যাহার সুশীতল ছায়াতলে বসিয়া অসমীয়া জাতি এই চারি শতাব্দী ধরিয়া প্রাণে শান্তি লাভ করিতেছে, যাহার পুণ্য মহিমার জ্যোতি অসমীয়ার প্রাণে প্রাণে প্রতিভাত, যিনি নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্রে অসমীয়া জাতির প্রাণে নব ভাবের সঞ্চার করিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন, আজ সেই অশেষ গুণসম্পন্ন মহিমামণ্ডিত মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির দিনে তাঁহার চরণে প্রণাম জানাইয়া নিজের জীবন সার্থক করি।

শঙ্করদেবের বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ বলিতে যাওয়া নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশ করা মাত্র; কারণ, যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই তাঁহার অসীম শক্তির ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়; কাজেকাজেই কোন একদিক দিয়া পরিচয় দিতে গেলে সেই পরিচয় অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।

"তোমার জীবনী দেব লিখে এনে সাধ্যকার।
গোটেই অসম-ভূমি বিস্তৃত জীবনী যার॥

সত্য সত্যই বলিতে গেলে তাঁহার জীবনী লেখা অসম্ভব—কোন-না-কোন দিকেই ত্রুটি রহিয়া যাইবে।

আমরা সীমাবদ্ধ মানব। আমাদিগের দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞানশক্তি সমস্তই সীমাবদ্ধ; আমরা চক্ষুর দ্বারা কিছু দূর দেখিতে পাই এবং জ্ঞানও কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহা হইলে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? শঙ্করদেবের প্রতিভা ও জ্ঞানশক্তি উপলব্ধির চেষ্টা লবণ-পুত্তলিকার সাগর-জলের গভীরতা নিরূপণ করার মত তাহাতেই লয় পাইতে হয়। রাত্রিতে অনন্ত আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তথায় অসংখ্য তারকারাজি নিজ নিজ শোভা বিস্তার করিয়া এক অসীম রাজ্যের সৃষ্টি করিতেছে। তাহার আদি নাই অন্ত নাই, যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় সেই দিকেই অসীম অনন্ত; কেহই বলিতে পারে না যে, আমরা যে অংশ দেখিতেছি সেই অংশেই আকাশ আর কোথাও আকাশ নাই; সেই অংশের বর্ণনা করিলেই আকাশের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হইবে। শঙ্কর দেবের বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। তাঁহার বিষয়েও কয়েক কথা বলিয়া কেহ সেই স্থলে Hercules এর খুঁটা পুঁতিতে পারে না; আর তাহা হইইলেও দিনে দিনে কত কথা বাহির হইয়া সেই খুঁটার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিবে এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

এই সকল মহাপুরুষের জীবনী মনে করিলে আমাদিগের সাগরের কথা মনে পড়ে; উভয়ই অসীম, অনন্ত ও গভীর। সাগরের ঢেউ আছে ঝড় আছে, ইঁহাদেরও ভাবের লহর আছে বিপদরূপ ঝড় আছে; সাগরের শক্তি অসীম এবং ইহা পৃথিবীর অশেষ উপকারসাধন করিতেছে, ইঁহারাও অসীম শক্তির দ্বারা জগতে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। সাগরকূলে ভ্রমণ করিলে অন্তঃকরণ পুলকিত ও শরীরের উপকার হয়। এই সকল মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিলে অথবা ইঁহাদের বিষয় চর্চ্চা করিলেও মন পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়, আত্মারও অশেষ কল্যাণ হয়। সাগরকূলে উপবেশন করিয়া একান্ত মনে অস্তগামী সূর্য্যদেবের হিঙ্গুল-বর্ণরঞ্জিত আকাশের এবং তরঙ্গায়িত প্রতিবিম্বের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্ষণেকের জন্য যেরূপ সুখ-দুঃখ ভুলিতে পারা যায় সেইরূপ এই সকল মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়াও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ দর্শনে, তাঁহাদের অসীম শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের সহিত কালক্ষেপণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ওপারের উজ্জ্বল আলোকরাজ্যের জ্যোতি দেখিয়া, তাহার মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে যাইতে প্রস্তুত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিবস নির্ভয় হৃদয়ে কাটাইতে পারা যায়, তাই বলা হইতেছে সাগর-দর্শন ও মহাপুরুষের জীবনী-পাঠ উভয়ই সমান।

জগত পরিবর্ত্তনশীল; সমাজের কোন নিয়মই এক ভাবে চলিয়া আসিতে পারে না; সমাজের সহিত তাহারও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে হইবে। নতুবা ইহা সহস্র গুণে সুন্দর হইলেও পরোক্ষে সমাজের অপকার করিবে। "The old order changeth yielding place to new, And God fulfils himself in manyways Lest one good custom should corrupt the world."

তাহা না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। পৃথিবীর

---

* "পুণ্য"।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্ম অথবা নিয়মই প্রথমতঃ ভাল থাকে। কিন্তু সমাজের স্বার্থপর মানবের হাতে পড়িয়া তাহা চিরন্তন সত্য হইতে ক্রমাগত ভ্রষ্ট হইতে থাকে। তখন সুযোগ পাইয়া স্বার্থপর মানবগণ তাহা পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞানে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী নূতন নূতন অর্থ বাহির করে এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদিগকেও তাহাদের অনুসরণ করিতে বাধ্য করে; ক্রমে তাহা অত্যাচারে পরিণত হয়, তখন বিপ্লব উপস্থিত হয়। সমাজ হইতে ধর্ম্ম অপসারিত হয়। ধর্ম্মের নামে রাশি রাশি পাপ বিক্রীত হয়, পুণ্যের সিংহাসনে পাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজে নরকের বীভৎস অভিনয় আরম্ভ করে এবং সমাজ ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবমান হয়। তখন সমাজ এরূপ একজন লোকের প্রত্যাশা করে, যে নিজের অসীম শক্তির বলে চিরন্তন সত্য প্রকাশ করিয়া, সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়া, সমাজের আদর্শ স্থান অধিকার করিয়া সময়ানুযায়ী গতি নিরূপণ করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইবে। সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের শক্তি অসীম। তাঁহারা সকলেই দেশে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পুনরায় সমাজকে নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের আবির্ভাবেই এক-একটি নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়। দেশের সেই মান্ধাতা-আমলের মরিচা পড়া আচার-ব্যবহারের স্থানে সেই সময়ের সমাজের উপযুক্ত নূতন ধর্ম্ম, নূতন নিয়ম প্রকাশ করেন। এই সকল মহাপুরুষকে সমস্ত দেশ ভক্তিভরে প্রণিপাত করে, তাঁহাদিগকে আরাধনা করে, পূজা করে, তাঁহাদিগের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে। A sage is the instructor of a hundred ages, সত্য কথা। তাঁহাদের দেহত্যাগের পরেও তাঁহাদের উপদেশ লুপ্ত হয় না, তাঁহাদের স্মৃতিসমূহও লুপ্ত হইবে না। ইহা শত শত বৎসর ধরিয়া হাজার হাজার মনে অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিতরণ করিয়া থাকে। খৃষ্ট, মহম্মদ, লুথার, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ—এই সকল উক্ত প্রকারের মহাপুরুষ, ইঁহাদের আবির্ভাবেই দেশ ধন্য হয়।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাপুরুষগণ এই প্রবল শক্তি কোথা হইতে পান? ইহার উত্তর এই যে, যে শক্তির বলে খৃষ্ট, "I am the light of the world, he that followeth me shall not walk in the darkness." বলিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, যে শক্তির বলে হজরত মহম্মদ "লা ইলাহা ইল্লা ল্ল." এবং "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে আরবের মরুভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, যে শক্তির বলে মার্টিন লুথার, "It is the repentance alone that can wash away the sin, no, not the Pope's Indulgence," বলিয়া Catholic জগতে Popeএর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যে শক্তির বলে বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বলিয়া জগতে নির্ব্বাণ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে শক্তির বলে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য "শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং শাস্ত্রকোটিভিঃ। বলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্"এর বিজয়পতাকা ভারতাকাশে উড়াইয়াছিলেন, সেই শক্তির বলেই আসামের তান্ত্রিক যুগেও শঙ্কর দেব "কলিতে নাহি তপ জপ যজ্ঞ তন্ত্র" বলিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জগতে "নামমাহাত্ম্য" প্রচার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন, সমাজের সমস্ত শক্তিই এই মহাপুরুষগণের হস্তেই নিহিত থাকে, কারণ তাঁহারা সমাজের মানস-পুত্র। কত বৎসর ধরিয়া সমাজ তাঁহাদের পথ চাহিয়া রহিয়াছিল। যখন তাঁহারা আবির্ভূত হইলেন, তখন সমাজ সমস্ত শক্তিই তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল এবং তাহার বলেই তাঁহারা সমাজসংস্কারে অগ্রসর হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিও থাকে। ঈশ্বর প্রত্যেককেই এক-একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এই মহাপুরুষগণকে তিনি বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া এবং বিশেষ গুণে বিভূষিত করিয়া অন্যান্য লোকের অপেক্ষা উচ্চ আসন দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ইঁহাদের শরীরে ঈশ্বরের গুণ বিকসিত হয় এবং ইঁহাদিগের দ্বারাই তিনি নিজের মহিমা প্রকাশ করেন।

ইঁহাদিগের পথ নিষ্কণ্টক নহে। যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সমাজের সমস্ত শক্তিই তাঁহাদের আছে, তথাপি কতকগুলি স্বার্থান্ধ মানব তাঁহাদিগের পথে নানারূপ বিঘ্ন উৎপাদন করে।

পৃথিবীতে স্বার্থ একটা বড় মজার বস্তু, আবাল-বৃদ্ধ সকলেই এইরূপ এক-একটি—স্বার্থ লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কাহারও পানে চায় না। আপনাকে লইয়াই সকলে বড় ব্যস্ত; যদি কোনরূপেই তাহারা নিজে ঘুরিতে না পারে অর্থাৎ স্বার্থের মস্তকে আঘাত পড়ে, তাহা হইলে তখনই তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া যাহার জন্য অথবা যে কারণে এইরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। ইহার ফলে ক্রাইষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন, মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন, শঙ্করাচার্য্য কুতার্কিক সকলের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন এবং শঙ্কর দেব প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অশেষ অত্যাচারে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কুচবিহারে পলায়ন করেন। হায়! জগতে সকল মহাপুরুষেরই এই অবস্থা! কিন্তু অবশেষে ধর্ম্মেরই জয় হয়। আজ

এই মহাপুরুষদিগের আসন কত উচ্চে। আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের আসন কোথায়? আজ জগত কাহার জয় গান করিতেছে। সেই মহাপুরুষদিগের না সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের? কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার মনে কর; যাহারা তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগকে তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলেন। ক্রাইষ্ট বলিয়াছিলেন—"Father, Father forgive them, they know not what they are doing." চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন "মারলি মারলি কলসির কানা, তা'বলে কি প্রেম দেব না"; শঙ্কর দেবও কেমন ধীর-গম্ভীর ভাবে তাঁহাদিগকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, শত অত্যাচার সহ্য করিয়া নীরবে নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেহ কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই, যত বাধা পান ততই তাঁহাদিগের উৎসাহ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে কোন সৎকাজ করিতে হইলে শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, নতুবা কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তাহাতে কঠোর সাধনা ও মনের দৃঢ়তা আবশ্যক।

(আগামী বারে সমাপ্য)

নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

সায়ংকাল।

পূরবী—আড়াঠেকা।

হে প্রভু প্রাণে চরণ-পরশ দাও—
কি আনন্দ চিতে জাগে!
ভরি' দেহ-মন চরণ-পরশ দাও।
শোক-ম্লান জরা করি' দূর
হরষিত কর মোর হিয়া।
হে প্রভু প্রাণে চরণ-পরশ দাও।

ক্ষি. না. ঠা.

ভূপালি—ধামার।

জাগিল আমার প্রাণ আজি গানে গানে।
মম চিত্ত 'পরি ঝরিছে আশীষ তাঁহার।
রবি শশী তারক গ্রহ সবে গাহিছে
হরষে আকুলিত নাম তাঁর।
তাঁর শুনিলে নাম হয় লাভ জীবন;
ঐ তাঁর লভি' পদরজ যায় দুখভার।
অকিঞ্চনপ্রভু নিত্য চিত্তে ধরি' রাখি হে—
ডুবি' যাই আনন্দে অপার॥

পূরবী—তেতালা।

আজি আনন্দ সন্ধ্যা নামে—
পবন মুখর কর গানে।
আজি এস মুখে লয়ে কম কান্তি
এস অন্তরে লয়ে সুখ শান্তি
এই তারাভরা আকাশের গানটি
ভরি' লও তব প্রাণে।
আজি ফুটে উঠো সন্ধ্যার ফুলে
দাঁড়াও রে অকূলের কূলে।
আজি দূরে যাক মোহ দূরে যাক ভয়
দূরে যাক ক্ষোভ সব সংশয়
সুরে সুরে আজি ভরুক হৃদ্
ছেয়ে যাক তানে তানে॥

নি. চ. ব.

শ্যাম—একতালা।

পরাণ জাগিল রে—উৎসব পরশে আজি মোর।
চারিদিশি হরষ জাগিয়া হেরি—
সুগন্ধ বহে বায়ু মলয় ভরিয়া গগনে রে;
জয়গান তব উঠে শতকণ্ঠে আজি দশ দিশি বেজে রে;
তারি তানে তানে গাহে প্রাণ শত গান নরনারী আকুলিয়া
প্রীতিসরসে সুতানে রে॥

ক্ষি. না. ঠা.

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

হৃদয়ে তোমারি নাম নিরখি নিতি প্রকাশ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি কোটি তারকভাস।
শক্তি হে অতুল তব এ সুন্দর তব সৃজন।
তোমার বিশ্ব ভকতমুখে ভক্তি-ঘন-উজল।
গিরি-কন্দর ধ্বনিয়া উঠে তোমার নাম গানে।
তোমারি দেব শির' পরি শশী তপন শোভে।
নবজলধরে হে তড়িতছটা গলে তব মালা শোভে।
হেরি' অপরূপ রূপ জগজন-মন মোহে॥

ক্ষি. না. ঠা.

বেহাগ—একতালা।

মন জাগো বিশ্বনাথে আজি এ মধুর উজল রাতে।
তাঁহারে বরি' হৃদয়মাঝে অভয় হও সকল কাজে
চল রে ভুবনে বীরের সাজে দুঃখ-ঝঞ্ঝা রাতে।
জীবনে তাঁহারে বাসরে ভাল জ্বালরে হৃদয়ে
তাঁহারি আলো।
বিশ্বভুবনে তাঁহারে দেখি' ভকতচিত্তে শান্তি এ কি—
চরম দুঃখে পরম সুখী মিলি তাঁহারি সাথে।

নি, চ, ব,

আড়ানা—চৌতাল।

প্রাণের মাঝারে ঝরিছে আজ
নয়ন-আসার হে—শান্ত করি' দাও—
মম হৃদি-সিংহাসনে—এস দেব!
কৃপা করি' শান্তিবচন হে শুনাও।
তব বদনজ্যোতি প্রাণে হেরিয়া
দুখসাগর পাশরিব—তব পদে প্রভু রাখো আমায়
তুমি ত্রিভুবনরঞ্জন—তুমি কঠিন দুখভঞ্জন—
মহেশ তুমি সবার সুখদায়ী॥

ক্ষি না. ঠা.

সিন্ধু খাম্বাজ—তেওরা।

নিভৃত অন্তরে আছে দেবালয়
সেথা ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়
সেথা যে দেবতা জাগেন একা
তাঁরি পায়—নমি আয়—নমি আয়।
সুখের লাগিয়ে মরিস্ রে ঘুরে
সুখ আশে বৃথা যাস্ দূরে দূরে
ব্যথা পেয়ে শেষে আঁখি দুটি ঝুরে
ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়।
অন্তর-ডালি সাজা প্রীতি-ফুলে
হৃদয়-দুয়ার দেরে তুই খুলে
মরমেরি পুরে চা'রে আঁখি তুলে
তুচ্ছ সুখ-দুখ সকলি ভুলে।
গভীর শান্তি নামিবে প্রাণে
ভরিবে হৃদয় কুসুমে গানে
বাজিবে বীণা মধুর তানে
ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়॥

নি. চ. ব,

বাহার—আড়াঠেকা।

আজি মন নাচে ভুলি' দুখ-শোক-পাথার
তব প্রকাশ দেখি' চিত' পরি।
নব গীত নব ভাব উঠে শত ফুটিয়া
হৃদয়ে তোমার নাম ধরি'।

ক্ষি, না, ঠা,

রামপ্রসাদী।

(মন) ভুলিসনেকো আর আপন মায়ে
আমার যে মা বিশ্ব সারা আছেন ছেয়ে (ধুয়া)
দেখরে চেয়ে হৃদয় খুলে
প্রেম খেলে মা'র ভুবন জুড়ে
তারায় তারায় গ্রহে গ্রহে—
মাথা নোয়া মায়ের পায়ে।
দুখের আঁধার যাবে ঘুচে
নয়নের জল যাবে মুছে
বারেক যদি হৃদয়-পাতে
ধরে রাখিস আপন মায়ে।
ছুটে চলরে মায়ের কোলে—
দুলবিনেকো ভবের দোলে;
সকল জ্বালার জ্বালার মাঝে
(তুই) বসে রইবি নিরাময়ে॥

ক্ষি. না. ঠা.

ইমন ভূপালী—তেওরা।

ও মন হৃদয়-গগন জুড়ে এবার প্রদীপ জ্বালা
দেখ্ না চেয়ে তারার মালায় গগন আলা।
পূজার এমন পুণ্য লগন
করিস্ নে রে বৃথা যাপন
চরণ-ধ্যানে হ' নিমগন ধূপধুনা জ্বালা।
প্রেমের অমল পুষ্পে সাজা পূজার ডালা॥
প্রেমের আকর তিনি সবার অন্তরেরি ধন
অন্তরেরি পুষ্প পেলে পরম তুষ্ট হ'ন।
হোক্ না মোদের দীন আয়োজন
কর্‌ব মোরা তাই নিবেদন
লজ্জা মোদের সজ্জা হবে অশ্রু,—মালা
মোদের রিক্ততা এই সাজিয়ে দেব পূজার ডালা॥

নি, চ, ব,

ভীমপলশ্রী—তেতালা।

এগিয়ে চল এগিয়ে চল থেকোনাক আর পড়ে পিছে।
এগিয়ে এস মন্ত্র ধর বেঁচে থেকে ভাই মরা মিছে।
রইবে মত্ত খেলায় কত আপনারে হারায়ে দিয়ে
অপমানভার সবে কত আর চির-দাসখত শিরে নিয়ে।
ভালো কাজে লাগো জোরে ভাইকে ভায়ে তোল ধরে
মায়ের দুঃখ সবাই মিলে দূর করে দাও সাগরপারে।
তা যতদিন পারবে নাকো হাসি খেলা বন্ধ কর।
এক মনেতে খেটে চল মায়ের আশীষ ঝরবে দেখো
হাসি আবার উঠবে বেজে॥

ক্ষি, না, ঠা,

বেদনাবোধ,—না আমোদ-প্রমোদ

[মন্তব্য—আজকাল দিন দিন একটা কুপ্রথা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোনও হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহ আবশ্যক হইলে অমনি আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়া টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা অর্থসংগ্রহ হয়। চিন্তাশীলব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এইভাবে

অর্থসংগ্রহ করিলে দান করিবার নৈতিক ভাব বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানের ভিতর যে সকল অভিনয় এবং পরিণত বয়স্কা বালিকাদিগের নৃত্য প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা আমরা কিছুতেই অনুমোদন করি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে উহার ফলে দেশের নৈতিক অবনতি অনিবার্য্য। সুখের বিষয় যে, সংবাদ পত্রের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং সঞ্জীবনী ইহা বুঝিয়া এইরূপ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস করিয়াছেন। ঐ দুই পত্রিকা ঠিক কথা বলিয়াছেন যে, যখন রাজবন্দীদের হৃদয় যন্ত্রণায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সেই সময়ে তাঁহাদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ প্রকার গীতাদির ব্যবস্থা অত্যন্ত বিসদৃশ ও মর্ম্মন্তুদ। সঞ্জীবনীতে এবিষয়ে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তঃ বোঃ সং]

বাংলা দেশের হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে, একথা আমরা বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। আর সেই স্বতঃপ্রণোদিত সাত্ত্বিক দান নাই—আর সেই সহানুভূতির অমৃত নিঃস্যন্দিনী ধারা প্রবাহিত হয় না,—আর বুঝি মানুষের দুঃখে মানুষের হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় না।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমাদের এই উক্তি মিথ্যা হউক। কিন্তু আজ দেখিতেছি তাহা হইল না!

বাংলাদেশের শতশত যুবক বিনা বিচারে, কেবলমাত্র সন্দেহের বশে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে মানবের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাঁহারা অম্লানবদনে সকল দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছেন। দেশবাসী তাঁহাদিকে শ্রদ্ধার সহিত দেখে। কিন্তু আজ সেই শ্রদ্ধার উপর নিদারুণ আঘাত পড়িয়াছে।

বন্দীদের সাহায্যের জন্য ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ষার বারিধারার মত তাহাতে স্বর্ণ রজতরাশি পতিত হইল না কেন? কোন্ মরুভূমির উষ্ণ বাতাস তাহা শুকাইয়া দিল?' যে গভীর শেলাঘাতে বাংলাদেশের সমগ্র হৃদয় চঞ্চল হইবার কথা,—আজ সেই বেদনার পরিচয় কোথায়?

বন্দীদের সাহায্যার্থ ধনভাণ্ডারের অর্থসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রথমেই আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে;—ইহা কি বাংলাদেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়? না লজ্জার কথা, কলঙ্কের চিহ্ন,—নিষ্ঠুর হৃদয়ের নিদর্শন?

যাহারা সিনেমায়, থিয়েটারে, বিলাস ব্যসনে,—আত্মতৃপ্তির চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয় করে,—তাহারা এই বন্দীর ধনভাণ্ডারে অর্থ দান করে না কেন?—যাহারা সংবাদ-পত্রে, বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বাণী প্রচার করিয়া দেশভক্তি দেখায়, তাহারা এই অর্থভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসে না কেন?—যাহারা স্বরাজের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা কোথায়? যাঁহারা স্বাধীনতার লক্ষ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা নীরব।

তাই আজ লোকদিগকে আমোদপ্রমোদের প্রলোভন দিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি;—বাংলার যুবকগণ,—বাংলার জনসাধারণ, তোমাদের হৃদয় যদি বন্দীর জন্য বেদনায় আকুল হইয়া থাকে, তবে কি তোমাদের পক্ষে আমোদে রত হওয়া শোভা পায়?—অর্ডিনান্সের শেলাঘাত যখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছ, তখন কি যুবতীর নৃত্যকলায় তোমার চিত্ত-বিনোদন হইবে?—তোমাদের হৃদয়ে যদি সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে কি সঙ্গীত-নৈপুণ্যে তোমরা পুলকিত হইতে পার?—বন্দীদের প্রতি যদি তোমাদের বিন্দুমাত্রও মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকে তবে কি তোমরা নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্য একবারও চক্ষু উন্মীলন করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে পার?—বাংলার যুবকগণ—বাংলার ছাত্রগণ,—বাংলার দেশভক্ত জনসাধারণ, তোমরা আমাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান কর।

সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলাগণ আজ নর্ত্তকী ও অভিনেত্রীর ঘৃণিত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থসংগ্রহে আসিয়াছেন, আর বাঙ্গালী, তোমরা বন্দীর দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুর্নীতি ও পাপের প্রশ্রয় দিতে আসিয়াছ,—হায়, ইহার পরেও কি আর অধঃপতন আছে?

কত বন্দী আত্মহত্যা করিয়াছে,—কেহ বা চিরকালের তরে উন্মাদ হইয়াছে, কত বন্দীর পরিবার-পরিজন অনাহারে দিন কাটাইতেছে,—কাহারও পিতামাতা অথবা পত্নী শোক-দুঃখের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন,—কত বন্দী দারুণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন,—তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের কথা প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, আর আজ তোমরা এখানে অভিনয় দেখিতে সমবেত হইয়াছ,—এখানে আমোদ করিতে আসিয়াছ। ছিঃ,—ছিঃ—আর আত্ম-প্রতারণা করিও না,—আর অধঃপাতে যাইও না। যাঁহারা তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, যাঁহারা তোমাদের ভগ্নীস্বরূপা তাঁহারা নৃত্যাভিনয় করিতে আসিয়াছেন,—তোমরা লজ্জায় মস্তক অবনত কর, ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত কর,—ক্ষোভে দুঃখে বক্ষে করাঘাত কর। তোমাদের যদি অর্থ থাকে, তবে ঐ বন্দীর ধনভাণ্ডারে দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। আর পাপের প্রশ্রয় দিও না।

আজ আর কাহাকে তিরস্কার করিব,—কাহার দোষ দিব? ঊর্দ্ধে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে তাহা নিজের দেহেই পতিত হয়। হে বাংলার যুবকগণ, তোমরা আত্মসম্মানের গৌরব করিয়া থাক,—স্বাধীনতার দাবীর মূল্য কত তাহা তোমরা জান। তোমাদের পক্ষে কি এই হীন ও গর্হিত কার্য্য শোভা পায়?

আজ এই সুবৃহৎ প্রাসাদে যখন নৃত্যকারিণীর নৈপুণ্য দর্শন করিয়া দর্শকগণ আনন্দে করতালি দিবেন, তখন মনে রাখিও তোমার বন্দী ভ্রাতার দীর্ঘশ্বাসে সুদূর কারাগারের পাষাণ প্রাচীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে! আজ যখন অভিনেত্রীর আবৃত্তি কৌশলে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পুলকিত হইবেন, তখন মনে রাখিও কোন নির্জ্জন দেশে সঙ্গীহীন অবস্থায় তোমার নির্ব্বাসিত বন্দী ভ্রাতা নীরবে নিশীথে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। আজ যখন তোমরা এখানে আমোদপ্রমোদে মত্ত, তখন মনে রাখিও কোথায় তোমার প্রহরী বেষ্টিত বন্দী ভ্রাতা অনাহারে অনিদ্রায় উদ্বিগ্নচিত্তে দিন কাটাইতেছে। যদি তোমরা মানুষ হও, তবে তোমাদের হৃদয়ের করুণা-ধারাকে সরস করিয়া সত্য সহানুভূতিকে জাগ্রত কর।

আমরা বন্দীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, তোমরা স্বাধীনতার অধিকারের জন্য নির্য্যাতিত হইয়া দেশের সম্মানের পাত্র হইয়াছ। তোমাদের স্বার্থত্যাগ, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম, দৃঢ়সংকল্প, আত্ম-সম্মানজ্ঞান বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। ইহার জন্যই তোমরা সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছ। আজ এই পাপ পন্থার সংগৃহীত অর্থ তোমরা প্রত্যাখ্যান কর। যাহারা দেশভক্তির সহিত আমোদপ্রিয়তার মিশ্রণ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে চাহে, তাহাদের প্রদত্ত অর্থে তোমাদের প্রয়োজন নাই। দুঃখ-কষ্ট যখন বরণ করিয়া লইয়াছ,—তখন অনাহার, উপবাস এ সকল তোমাদের চিরসাথী। আজ বাংলার হৃদয় যদি ব্যাকুল না হয়,—আজ বাঙ্গালী যদি আমোদ-প্রমোদেই ব্যস্ত থাকে,—তবে থাকুক,—তোমরা এই ধনভাণ্ডারের অর্থ গ্রহণ করিয়া তোমাদের পুণ্য দেহে পাপের স্পর্শ করিতে দিও না।*

—

* সঞ্জীবনী—১২ই মাঘ, ১৩৩১।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ভূপালী—ধামার।

জাগিল আমার প্রাণ আজি গানে গানে মম চিতপরি ঝরিছে আশীষ তাঁহার।
রবি শশী তারক গ্রহ সবে গাহিছে হরষে আকুলিত নাম তাঁর।
তাঁর শুনিলে নাম হয় লাভ জীবন ঐ তাঁর লভি পদরজ যায় দুখ ভার।
অকিঞ্চন প্রভু নিত্য চিতে ধরি রাখি হে ডুবি যাই আনন্দে অপার।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

৩ ১´ ০ ২ ০ ৩
। র্সা ধা পা গা I পা রা গরা। গা -া। পা রা। গরা গা -া। রা -া সা -া I
জা গি ল আ মা ০ ০ ০ র ০ প্রা ০ ০ ০ ণ ০ আ ০ জি ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ১´
I সা রসা ধ্া। সা -া। সা -া। সা গাঃ রঃ। গা গমা রা সা I সা রা -া।
গা ০ নে গা ০ নে ০ ম ম ০ চি ত০ প রি ঝ রি ০

০ ২ ০ ৩ ১´ ০ ২
। গা -া। গা -া। পা রা -া। গা পা ধা র্সা I ধা র্সা র্সা। ধা পা। গা পা।
ছে ০ আ ০ ০ ০ ০ শী ০ ষ তাঁ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০
। রা গরা গা।
০ ০০ র্

১´ ০ ২ ০ ৩ ১´
{I গা পা -া। ধা র্সা। র্সা র্সা। র্সর্সা -া -া। র্সা -া র্সা -া I র্সা র্সা ধা।
র ০ ০ বি ০ শ শী তা ০ ০ র ০ ক ০ গ্র হ ০

০ ২ ০ ৩ ১´ ০ ২
। র্সা -া। র্রা -া। র্সা -া র্সর্সা। ধা -া পা -া I} র্গা র্গা -া। র্রা -া। র্সা -া।
স ০ বে ০ গা ০ ০ হি ০ ছে ০ হ র ০ ষে ০ আ ০

• ৩ ১´ • ২´* •

| র্সা ধা র্সা | ধা -া পা -া I গপা ধর্সা -া | ধা পা | গা পা | রা গরা গা II

কু • • লি • ত • না• • • • • ম তাঁ • • • • র

১´ • ২ • ৩ ১´ •

I গা -া -া | গা -া | গা গা | গা পা রা | গা -া গা -া I গপা গা ধা | পা -া |

তাঁ • • র • শু নি লে • • না • ম • হ • • য় •

২ • ৩ ১´ • ২ •

| পা রা | গরা গা -া | রা -া সা -া I সা -া ধা | সা -া | সা -া | স গা রা |

লা ০ ভ০ জী ০ ব • ন • ঐ • • তাঁ ০ র ০ ল ০ •

৩ ১´ • ২ • ৩

| গা -া গা রা I গা পা -া | ধা র্সা | ধা পা | পা রা গা | রা -া সা -া I

ভি • প দ র জ • যা • • য় ছ থ • ভা • র •

১´ • ২ • ৩ ১´ • ২

I সা র্সা া | নসা ধা | র্সা র্সা | র্রা র্সা -া | র্সা -া র্সা -া I র্সা া ধা | র্সা -া | র্রা র্রা |

অ কি • • • ক্ষ ন প্র ভু • নি • ত্য • চি • • তে • ধ রি

• ৩ ১´ • ২ •

| র্সা ধা র্সা | ধা -া পা -া I র্গা -া -া | র্রা -া | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |

রা • • গি ০ হে • ভু • • বি • যা ই আ ন •

৩ ১´ • ২ •

| ধা র্সা ধা পা I গা পধা র্সা | ধা পা | গা পা | রা গরা সা |

• • ন্দে অ পা • • • • • • • • • • র

গ্রন্থপরিচয়।

"সন্ধ্যায়"—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিতৈষণা গ্রন্থাবলী ২৬ ; কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, পৃঃ ১৩৯, মূল্য ১।০।

ঋষিকল্প গ্রন্থকার নাতিদীর্ঘ প্রার্থনার আকারে ভগবচ্চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিয়াছেন। এমন সরল ভাষায় এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত ভক্তপ্রাণের অভিব্যক্তি ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করিবে। শোক-তাপগ্রস্ত দুঃখ-দৈন্য-অভাবক্লিষ্ট সংসারী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে সকলেরই অন্তরের কথা সকলেরই প্রাণের নিবেদন এই ভক্তসাধক আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া ভগবদুদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার মহাশয়ের নিজস্ব বিয়োগব্যথারও প্রকাশ আছে বটে, তাহা আপাত দৃষ্টিতে অবান্তর মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে এমন সার্ব্বজনীন ভাবে সেগুলি প্রকাশ পাইয়াছে যে সকলেই সেগুলিকে আপনার মনে করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—মানসী ও মর্ম্মবাণী মাঘ, ১৩৩৪।

আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি; এইখানি একখানি গদ্যে লিখিত পদ্য গ্রন্থ। ইহার এক-একটী স্তম্ভ এক-একটী কবিতা—ভগবৎপ্রেমিক ভক্তের প্রেমের উচ্ছ্বাস। সমুদ্রের ঢেউটীতে, প্রান্তরের সৌন্দর্য্যে, সান্ধ্য গগনের অনুপম গাম্ভীর্য্যে, এক কথায় প্রায় প্রত্যেক জিনিষে ভগবানের অমৃতময় সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয় হইতে এই উচ্ছ্বাসগুলি বাহির হইয়াছে। ভগবৎপ্রেমের অমৃতময় আস্বাদনের যিনি কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন তিনি এই উচ্ছ্বাসগুলির অমৃতময় রসে বঞ্চিত হইবেন না। পাঠক পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, লেখক ভগবানের কতদূর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহার নিকট জগতের অতি তুচ্ছ জিনিসও আনন্দে পরিপূর্ণ এবং অতি হেয় জিনিষও তাঁহার কাছে আনন্দরাজ্যের সংবাদ লইয়া আইসে। দাঁড়কাকের উদাসপূর্ণ কা—কা ধ্বনিও তাঁহার হৃদয়ে নৈরাশ্যের ভাব না আনিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাস লইয়া আইসে। তিনি সাংসারিক লোক; সংসারের হাসি-কান্না, উঠা-পড়া তাঁহার জীবনে সমস্তই হইয়াছে। এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, পবিত্রতাময় হইয়াছেন, ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পুস্তকখানি তাহারই পরিচয়। ইহা জগতকে এই মহৎ সত্য শিক্ষা দিতেছে যে, এই দুঃখ-সুখময় সংসারই ধর্ম্মসাধনার প্রকৃত স্থান। গ্রন্থকার তাঁহার জীবনের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন। মহর্ষি পৌত্র, কেনই বা না হইবে?

—প্রবাসী, ২৪শে পৌষ, ১৩৩৪।

শোক-সংবাদ।

৺নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়।—পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বনামধন্য পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের দৌহিত্র নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রি ৩॥০ ঘটিকায় তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৩৩ নং ম্যাক্লিওড রোডে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার এই অকালমৃত্যুতে শোকমগ্ন আত্মীয়স্বজন ও তাঁহার স্বনামখ্যাত বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে আমরা সান্ত্বনা প্রদানের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না; ভগবান লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদের এই প্রগাঢ় শোকে শান্তি বিধান করুন।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিরাময়তা।—আমরা গত অগ্রহায়ণ-সংখ্যা পত্রিকায় শঙ্কিত ও ব্যথিত চিত্তে জানাইয়াছিলাম যে, আদিব্রাহ্মসমাজের আজীবন হিতৈষী বন্ধু ও প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বার্দ্ধক্যজনিত পীড়ায় অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন। এবার আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের সেবায় বর্ত্তমান মাঘ হইতে পুনর্ব্বার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভগবান ইঁহাকে দীর্ঘজীবী ও শক্তিমান করিয়া তুলুন।

নিখিল ভারতীয় ব্রাহ্মসম্মিলন।—এবার মাদ্রাজ নগরীতে কংগ্রেস-সপ্তাহে গত ৯ই পৌষ রবিবার হইতে ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চ দিবসব্যাপী 'নিখিল ভারতীয় ব্রাহ্মসম্মিলনের' (All Indisa Thiestic conference) বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন এম-এ, এল-এল-এম। বাঙ্গালা বোম্বাই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে হইতে প্রায় শতাধিক সভ্য সমবেত হইয়াছিলেন। 'দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে' (Southern India Brahmosomaj) গত ৯ই পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ডাঃ আর বেংকটরত্নম্ নাইডু কেটি, এম এ, ডি, এল-টি, মহোদয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। অতঃপর ১১ই পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় স্থানীয় কলেজের সুপ্রশস্ত কক্ষে উহার প্রথম অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। এই স্থানে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হয়। অভিভাষণটী সকল দিক দিয়া সভ্য ও আমন্ত্রিত ভদ্রজনগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। ১২ই পৌষ বুধবার প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘটিকায় অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ এম-এ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত উপাসনা অন্তে যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত দিবস দ্বিপ্রহরে প্রীতিভোজনের অনুষ্ঠান অন্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় স্থানীয় কলেজের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে একটী জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজের বিবিধ সমস্যা ও সমাধানের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, অধ্যাপক পি, রামস্বামী এম-এ ও কে, নটরঞ্জন বি-এ, প্রভৃতি সভ্যগণ। অতঃপর ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার সভার শেষদিবসীয় অধিবেশন ও সমাজমন্দিরে উপাসনা-অন্তে এবৎসরের মত নিখিল ভারতীয় ব্রাহ্মসম্মিলনের অধিবেশন সুসমাপ্ত হয়।

এবার সভায় সভ্যগণ কর্ত্তৃক ৫টী প্রস্তাব উত্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। তাহার প্রথম প্রস্তাবটী এই যে, আসন্ন শতবার্ষিক উৎসবটী যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সম্মিলনে অনুষ্ঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। আমরা এই প্রস্তাবটী সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলি যে সম্মিলন যদি শতবার্ষিক উৎসবের একটা দিনস্থির করিয়া দিতে পারিতেন, তবে আরও ভাল হইত।

শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহোদয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা অংশত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অভিভাষণে দেখিলাম তিনি দুএকটি বিতর্কপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, সকল ধর্ম্মে সত্য আছে কিনা, অথবা সকল ধর্ম্মই সত্য কিনা। তিনি যে ভাবে শেষোক্ত উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে উহা প্রথমোক্ত উক্তিকেই সমর্থন করিতেছে। কারণ সময় ও অবস্থা বিশেষে অমুক ধর্ম্ম সত্য, একথা বলিলে তাহার ভাব দাঁড়ায় এই যে, সেই ধর্ম্মের ভিতর সময় ও অবস্থা-নিরপেক্ষ একটী সত্যধর্ম্ম অন্তর্নিগূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যাহা হউক, আমাদের মতে এরূপ controversial বিষয় উত্থাপিত না করিলেই সভাপতির পক্ষে সুশোভন হইত।

শ্রীরামপুর-ব্রাহ্মসমাজ—গত ১১ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীরামপুর-ব্রাহ্মসমাজের ষট্ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ও 'ভোরের পাখী'র রচয়িতা সুকণ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল এবং সাধারণব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১নং বেনে পাড়া লেনে ভাদুড়ী ভবনের নবনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত দ্বিতল-গৃহে এবার উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উপাসনাগৃহটী পত্র-পুষ্প ও পতাকা দ্বারা মণ্ডিত হইয়া শোভনশ্রী ধারণ করিয়াছিল। প্রভাতে যথারীতি উষাকীর্ত্তন বাহির হয়। অতঃপর সকলে উপাসনাগারে সমবেত হইলে বেলা ৮॥০ ঘটিকায় প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে বালক শিশিরকুমারের স্মৃতি উপলক্ষ্যে বালকবালিকা-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়। এই উভয়কালের উপদেশ ও উপাসনার ভার লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ এবং সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রীমতী মনোরমা দেবী ও শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সমাগত ভদ্রজনগণের আদর-আপ্যায়ন ও তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন অতি সুন্দর হইয়াছিল

উল্টাডাঙ্গা-ব্রাহ্মসমাজ—গত ৮ই পৌষ শনিবার এবার উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত যথাক্রমে নগর-সংকীর্ত্তন, উপাসনা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা ৺ কানাইলাল সেনের স্মৃতিসভা, বার্ষিক সভা ও বালকবালিকা-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সান্ধ্য উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপর। তিনি যথাকালে বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক উপদেশ ও উপাসনাদি করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন আদিব্রাহ্মসমাজের আজীবন অনুরাগী 'ভোরের পাখী'র রচয়িতা সুকণ্ঠ কবি শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল। 'ভবানীপুর সাম্মিলন-সমাজের' দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজও' যে প্রতিবৎসর বিভিন্ন শাখার আচার্য্যগণকে বেদীগ্রহণার্থ আহ্বান করিতেছেন, ইহা অতি সুলক্ষণ। আমরা আশা করি, ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখাও এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে শীঘ্রই যত্নবান হইবেন।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 462.

১০১৫ সংখ্যা　　　　　　১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে　　　　　　চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

২১০ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। ফাল্গুন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

১৭৬৫ শক ৭ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮।

১০১৫ সংখ্যা ১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌-সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৩। অঞ্জলি—সর্ব্বাধিপতি দেবতা।

১। তুমি সৎস্বরূপ ও সনাতন পরব্রহ্ম। তুমি আছ, তাই বিশ্বজগত আছে। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র লইয়া শতকোটী মানব তোমাকে জানিয়া আনন্দিত হই-তেছে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের প্রত্যেক নিমেষ বিশেষভাবে জানিতেছ। তুমিই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য তুমি আমাদিগকে ধন-ধান্য প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর। তুমি অমৃত-স্বরূপ। তুমি আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

২। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রাশি রাশি যাগযজ্ঞ করিয়াও তোমাকে প্রাপ্ত হয় নাই। দেবতারাও তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। যাঁহারা প্রাণের কাতরতা লইয়া তোমার সমীপে উপস্থিত হন এবং তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকেন, তাঁহারাই তোমাকে প্রাপ্ত হন।

৩। হে দীপ্যমান পরমেশ্বর! আমরা তোমাকে সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদের দারিদ্র্য মোচন করিয়া জগতের মহা-সভায় উচ্চ আসন অধিকার করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। তুমি আমাদের মস্তকে অমৃতবারি বর্ষণ কর, আমরা তোমার চরণছায়ায় দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করি।

৪। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের শত্রুগণ ভয়ে কম্পমান হউক। আমাদিগকে তোমার প্রসন্নমুখ দেখাও। আমরা দেবগণের সহিত একহৃদয়ে তোমার শুভগান করিয়া নিত্য তোমার সহিত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ থাকি। তোমা-রই শাসনে অগ্নি, বায়ু ও মেঘের তত্ত্বসকল অবগত হইয়া আমরা তোমাকে জানিবার পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছি।

৫। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের সম্যক আলোচনা দ্বারা তোমাকে জানি-বার পথ আমাদের সম্মুখে কত না উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমাদিগের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর, যেন আমরাও আবার আমাদের উত্তরপুরুষদিগের জন্য সেই পথ আরও বিস্তৃত করিতে পারি। আমাদের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া তোমার নামে

শতবিধ কর্ম্মযজ্ঞ খুলিবার শক্তি ও অধিকার প্রদান কর।

৬। আমরা তোমার সন্তান। আমরা তোমার প্রবর্ত্তিত জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে উন্নত হইবার কতনা চেষ্টা করিতেছি। তোমাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিয়া এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন পূর্ব্বক নিত্য তোমার উপাসনায় নিরত রহিয়াছি। তোমার নিকট করজোড়ে বারবার প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার কর; আমাদিগকে গো-অশ্ব ও প্রচুর ধনধান্য-সমন্বিত কর।

৭। হে অন্তর্য্যামী! তুমি আমাদের সকলই জানিতেছ। আমরা যে কিরূপ দুঃখে কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি তাহা তুমি জান। আমাদিগকে সংসারে যে অবস্থায় আনয়ন করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত ধনসম্পদ না দিলে তোমার সন্তান বলিয়া যে পরিচয় দিতে ভয় হয়। তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধনসম্পদ দাও, যাহাতে আমরা তোমার সংসারে আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারি। আমরা নিরলস হইয়া তোমার কর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইতেছি। আর আমাদিগকে দারিদ্র্যদুঃখে নিমগ্ন রাখিও না।

৮। তোমার শাসনে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমবাহিনী শত শত নদী প্রবাহিত হইয়া ধরণীকে শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল নদীর তীরে শত সহস্র মনুষ্য বাস করিয়া ধনে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়াছে এবং শতবিধ কর্ম্মযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়া মানবসমাজকে উন্নতির অভিমুখীন করিয়াছে। এই সকল নদীর তীরে শত শত গো-অশ্ব প্রভৃতি পশু পালিত হইয়া মানবের হিত-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছে।

৯। এই সকল নদীর তীরে অবস্থিতি করিয়া বহু জ্ঞানী গুণী মানব তোমার সন্ধানে মন-প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন এবং তোমাকে লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্মের কারণে ধরণী পবিত্র হইয়াছে। তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের ধারা আজ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া মানবসমাজকে সজীব রাখিয়াছে। সেই ধারা ধরিয়া আমরা তোমাকে পাইয়া ধন্য হইতেছি।

১০। তুমি অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি যে সকল বস্তু দিয়াছ, তাহাদের প্রত্যেকটাই আমাদিগকে ধনসম্পদে পরিবৃত হইবার কত যে সহায়তা করিতেছে, কেহই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। সেই এক একটি বস্তু হইতে আমরা যে জ্ঞানলাভ করিতেছি, তাহা কতদিকে বিস্তৃত হইয়া বিশ্ব-জগতকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। সেই জ্ঞানের সূত্রে দেবমনুষ্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রেমের এক আশ্চর্য্য বন্ধন পড়িতেছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার, তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার॥

ভগবানের নামে একদিন ভারতের বৃক্ষসুশোভিত তপোবনসকল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী পরে তাঁহারই পবিত্র নামে আমাদের এই ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। যাঁহার আদেশে এই বিরাট ব্রহ্মচক্রের প্রত্যেক ঘটনা মঙ্গলের পথে নিয়মিত হইতেছে; যে পরম পুরুষ সম্মুখের এই অনন্ত আকাশে বিশ্বজগতের প্রাণরূপে আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন; যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে আত্মার আত্মা পরমাত্মারূপে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহারই পবিত্র নামে আজ এই শুভ দিনে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে আমরা সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি। এসো, আজ এই উৎসবক্ষেত্রে তাঁহারই গুণ-গানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিয়া এই উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করি এবং ইহার সার্থকতা সম্পাদন করি।

এই উৎসবের বিশেষত্বটুকু অনেক সময়েই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—অনেক সময়েই এই বিশেষত্ব-টুকু আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এই উৎসব মাঘ মাসে হয় বলিয়া ইহাকে আমরা মাঘোৎসব বলি; ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা ইহাকে ব্রহ্মোৎসব বলি। কিন্তু এই মাঘোৎসবের সঙ্গে নব্যযুগে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়া আমি এই মাঘোৎসবকে বর্ত্তমান যুগে

* গত ১১ই মাঘ প্রাতে আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে বিবৃত।

এদেশের স্বাধীনতার জন্মোৎসব বলিয়াই মনে করি ; এবং সেই কারণেই এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য আমি পিপাসিত নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কি আশ্চর্য্য—ভগবান আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস নিহিত রাখিয়াছেন, তাঁহারই আদেশে সেই স্বাধীনতার উৎস খুলিয়া দিবার ভার পাইলেন—এই পরাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত দুর্ব্বল বঙ্গদেশের অধিবাসী রাজা রামমোহন রায়। আজ ৯৮ বৎসর অতীত হইল, যখন ভারতের অধিবাসীগণ সর্ব্ববিধ পরাধীনতা, বিশেষত আধ্যাত্মিক পরাধীনতার যন্ত্রতলে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট ও জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল ; যখন সেই নিষ্পেষণের যন্ত্রণায়, শত কঠোর বেদনায় ব্যথিত ভারতবাসীর প্রাণ ভেদ করিয়া এক বিন্দু স্বাধীনতার জন্য তাহাদের কাতর প্রার্থনা ঊর্দ্ধমুখে সমুত্থিত হইয়া ভগবানের চরণতল স্পর্শ করিল, তখন ভগবৎপ্রেরিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়, প্রধানত সেই পিপাসাতুর ভারতবাসীর, আনুষঙ্গিকরূপে সমগ্র জগতবাসীর তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম লইয়া সেই স্বাধীনতার উৎস খুলিয়া দিলেন। তাহারই নিদর্শনস্বরূপে তিনি শুভ ১১ই মাঘে এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার নবতর পতাকা জগতের মধ্যে ভারতের মস্তকে সর্ব্বপ্রথম উত্তোলিত করিয়া ভারতভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে সকল যোদ্ধা সেই পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই সেই পতাকার মহিমা অন্তরে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া রাজার বিলাতগমনের পরে একে একে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে উপযুক্ত নেতার অভাবে, যে কয়েকজন যোদ্ধা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও সেই পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া সংঘবদ্ধভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেই দুঃসময়ে—যখন স্বাধীনতার চিহ্ন দেশ হইতে মুছিয়া যাইবার উপক্রম করিল, চারিদিক হইতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতামণ্ডিত হিন্দুসমাজের উপর শতবিধ অস্ত্র নির্দ্দয়ভাবে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু, সকল শত্রুর প্রবল আক্রমণ চলিতে লাগিল—সেই দুঃসময়ে ভগবৎপ্রেরিত হইয়া এই ভারতেরই আর একজন অধিবাসী, এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশেরই আর একজন অধিবাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্নের সম্মুখেও সেই পতাকা অকুতোভয়ে স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া দেশবাসীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে আর একবার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিলেন ; এবং সুদূর অতীতে আজিকার মত আর এক মাঘোৎসবে মানবাত্মার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ঘোষণা করিলেন।

এই ব্রহ্মমন্দির যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত, এই ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গে যাঁহার নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত—ঐ দেখ, সেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আজ এই ব্রহ্মোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া গগনভেদী রবে ঐ স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করিতেছেন। এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকখানি যে মহাপুরুষের অমৃতনিষ্যন্দী ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত,—ঐ দেখ, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আজ এই উৎসবমন্দিরে সভাসীন থাকিয়া বজ্রনির্ঘোষে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথে চলিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করিতেছেন। এই আহ্বান কেবল তাঁহাদের আহ্বান নহে ; তোমাদের অন্তরে যে ভগবান আছেন, তাঁহাদের ভিতর দিয়া ইহা সেই ভগবানেরই আহ্বান জানিবে। ভগবানের আহ্বান শুনিয়া তাঁহারা যেমন এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই ; তাঁহারা যেমন তাঁহাদের সঙ্গী ও সহচর অনুচরদিগের সন্তোষবিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক বোধ করেন নাই, তোমরাও যখন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ভগবানের আহ্বান অন্তরে শ্রবণ করিতেছ, তখন তোমরাও তোমাদের এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া, তোমাদের সহচর অনুচরদের সন্তোষসাধনের প্রতি মনোযোগ না দিয়া ভগবানের আদেশ গ্রহণ কর, স্বাধীনতার সংগ্রামে নির্ভয়ে অবতীর্ণ হও—দ্বিধারহিত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়। কেবল বাহিরের স্বাধীনতার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইলে বিশেষ কোনই ফল হইবে না, যদি তোমরা অন্তরকে স্বাধীন করিয়া বাহিরের সেই স্বাধীনতাকে ধারণ করিবার উপযুক্ত না কর। এই স্বাধীনতালাভ তোমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের হাতে। তোমরা আজই—এখনই—শুধু কথায় নয়, কিন্তু কাজে, অন্তরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দাও—পাপ হইতে, শতবিধ মলিনতা হইতে নিজেদের অন্তরের মুক্তি ঘোষণা কর ; সর্ব্ববিধ সংশয়, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্তি ঘোষণা কর—এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং অন্তরের ও বাহিরের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা তোমাদের হস্তগত হইবে, স্বরাজ তোমাদের হস্তগত হইবে, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ভগবানের বাণী শুনিয়া, তাঁহার আদেশ লইয়া তোমরা যদি এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হও, তবে স্থির জানিও, তোমাদের পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা

নাই। তাঁহাকে যদি বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি বলিয়া উপলব্ধি কর; তাঁহাকে যদি মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা বলিয়া যথার্থই প্রাণের ভিতর বিশ্বাস কর; এবং তাঁহাকে যদি সেনাপতিপদে বরণ করিয়া তাঁহার অপরাজিত পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া তাঁহারই আদেশে জগতের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মসংগ্রামে অবতীর্ণ হও তবে পরাজয়ের কোন কথাই উঠিতে পারে না। সেই যে শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে ভগবৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের পতাকা প্রোথিত করিয়া রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ শতাব্দীপ্রায় পরে তাহা সার্থক হইতে চলিয়াছে—জয়লাভ অদূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিক হইতেই ভগবানের মাভৈরবের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছে; দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র মানবাত্মার স্বাধীনতার বিজয়বার্ত্তা মুক্তকণ্ঠে প্রচারিত হইতেছে। বাল্যকালে চীন তাতার তুরস্ক জাপান প্রভৃতি যে সকল দেশকে আমরা হেয় দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম, আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর কত স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া কত সংগ্রামের ভিতর দিয়া সেই সকল দেশ মানবাত্মার স্বাধীনতার বিজয়ঘোষণা করিবার ফলে জগতের মহাসভায় নিজেদের উপযুক্ত সমুন্নত আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই যে সেদিন ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিল, ইহাও সেই মানবাত্মার স্বাধীনতার বিজয় ঘোষণার জন্য ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। চারিদিকের লক্ষণসকল মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখ—দেখিবে, বিজয়লাভ অদূরবর্ত্তী। এমন শুভ মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইও না, অন্তরে সংশয় ও হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে এতটুকু স্থান দিও না। হৃদয় হইতে নিরাশা ও নিরানন্দকে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও। বিশ্ববিধাতাকে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা এবং তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যের মঙ্গলবিধাতা জানিয়া নির্ভর হও। উপনিষদের ঋষির এই বাক্য সত্য বলিয়া জান যে, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন"—ভগবানকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ভগবানকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

বিজয় যখন নিকটবর্ত্তী, তখন যে ভারতের ঋষিরা সর্ব্বপ্রথম সত্যধর্ম্মের 'দর্শন' পাইয়াছিলেন, সেই ভারতের অধিবাসী তোমরা সত্যধর্ম্মের দুর্গ পরিত্যাগ করিও না। তোমাদের নিরাশা ও নিরানন্দে মুহ্যমান হইবার কোনই কারণ নাই। সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, বিপক্ষবাহিনীর মধ্যে শতবিধ উপধর্ম্মের কারণে বিবাদ কলহ লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা এখন সংশয়ে দোদুল্যমান এবং পরাজয় প্রতীক্ষা করিয়া মুহ্যমান হইয়া আছে। তোমাদের সত্যধর্ম্মের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্তরে দিনে দিনে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে তোমাদের লোকবল অধিক নাই বলিয়া ভীত হইও না। এসময়ে তোমাদের অর্থবলের অভাব বলিয়া রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে চলিবে না। এখন তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে; ধৈর্য্যের সহিত তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ঘাঁটা ধরিয়া তোমাদের সেনাপতির আদেশ অপেক্ষা করিতে হইবে।

লোকবল বা অর্থবলের অভাব দূর করা বড় কঠিন নয়। সমাজের কুসংস্কার কদাচার অনাচার প্রভৃতিকে সমর্থন কর, তোমার লোকের অভাব হইবে না, অর্থের অভাব হইবে না। কুসংস্কার প্রভৃতি অবলম্বনে যাহারা পরিপুষ্ট হইতেছে, কুসংস্কার প্রভৃতি সমর্থনের উপরেই যাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ জীবনযাত্রা নির্ভর করে, তাহাদিগকে তুমি সমর্থন কর, তোমার লোকের অভাব হইবে না, অর্থের অভাব হইবে না। জীর্ণ সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে সত্য কথা বলিও না—অজ্ঞানান্ধদিগকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিও, তোমার লোকের অভাব হইবে না, অর্থের অভাব হইবে না। এই ভাবে মিথ্যা কথার উপর, মিথ্যা ব্যবহারের উপর চলিতে থাকিলে, গতানুগতিকপন্থী লোকেরা, তুমি যে তাহাদের সুখের স্বপ্ন বজায় রাখিলে, তাহারই কৃতজ্ঞতাবশে তোমার অনুসরণ করিবে এবং উৎকোচস্বরূপে তোমাকে প্রচুর অর্থও প্রদান করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনিষ্ট ব্যতীত কোনই ইষ্ট সাধিত হইবে না, সমাজের কোনও মঙ্গল বা উন্নতি সাধিত হইবে না। বরঞ্চ, যে দিন কুসংস্কার প্রভৃতি ভিতরে ভিতরে কুরিয়া খাইবার ফলে সমাজ জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া ভূমিসাৎ হইবে, সেদিন উহা তোমাকেও মৃত্যুমুখে টানিয়া লইবে।

সংসারে ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া ভালমন্দ বিচার না করিয়া জনসাধারণের মতে সায় দিয়া চলা, স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলা খুবই সহজ কথা। এই প্রকার জড় অলস ও নির্জ্জীবের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে প্রতিবেশী কাহারও নিকট কোন বাধা পাইতে হয় না; কোন কার্য্যে নূতন উদ্যম উদ্যোগের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। এইভাবে চলিলে জীবনটা পশুদের সহিত সমানভাবে ভালয়-মন্দয় মিশিয়া একপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া যাইতে পারে—ইহাতে তোমার লোক বা অর্থের অভাবও না হইতে পারে। কিন্তু এ

ভাবে জীবন যাপন করা বা লোক ও অর্থ সংগ্রহ করায় মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় না—ইহা ভীরু কাপুরুষের উপযুক্ত কার্য্য। বাঙ্গালী যখন নানা কারণে মনুষ্যত্ব হারাইয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, সম্ভবত সেই সময়েই পরের উপর অতিমাত্র নির্ভরশীল জড় অলস প্রাণের উপযুক্ত এই প্রবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল—দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ। কিন্তু যে সকল দৃঢ়চিত্ত পূতহৃদয় ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছ, দেশের মঙ্গলসাধনে অগ্রসর হইয়াছ, সাংসারিক সায়-দিয়া-চলা লোকের লোকবল বা অর্থবল দেখিয়া তোমাদের বিচলিত হইলে চলিবে না। বীরধর্ম্মী সত্যধর্ম্মপন্থী তোমাদের জপমন্ত্র হওয়া উচিত—প্রভু সঙ্গে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। লোকলজ্জা বা অভাবের তাড়না, কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া তোমাদিগকে বীরপদভরে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে লাগিয়া থাকিতে হইবে। সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভগবান তোমাদিগকে যে কার্য্যের যে খোঁটায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, ফলাফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া তোমাদের সেই সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার দিকে সমস্ত হৃদয়মন অর্পণ করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস যে, এইভাবে দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যসাধনে যত্নবান হইলে জগৎপ্রভুর মঙ্গলবিধানেই তোমাদের লোকের বা অর্থের অভাব হইবে না। যদি কোন কারণে লোকের বা অর্থের অভাব হয়, তবে সকল ভয়ের যিনি ভয়, যাঁহাকে তোমরা সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছ, তাঁহাকে তোমাদের অভাবের কথা জানাও—তিনিই তোমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, সকল ভয়-ভাবনা দূর করিবেন। তাঁহার আদেশ বলিয়া যাহা অন্তরে উপলব্ধি করিবে তাহাই শিরোধার্য্য করিবে, তাহাই প্রতিপালন করিবে। তাহার জন্য জনমতের বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। সত্যধর্ম্মের সৈনিকের ইহাই কর্ত্তব্য—ইহাতেই তাঁহার বীরত্ব। সত্যধর্ম্মের একমাত্র মন্ত্র এই যে, একমাত্র ভগবানকেই সমুদয় হৃদয় দিয়া প্রীতি করিবে, তাঁহারই অনুগত হইয়া জীবনযাপন করিবে, এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে; যাহা তাঁহার অপ্রিয় বলিয়া জানিবে তাহা পরিত্যাগ করিবে—তাহাতে প্রাণের তন্ত্রী বজায় থাকে থাক, ছিন্ন হয় হৌক।

সত্যই কি জগতে লোকবল ও অর্থবলই সর্ব্বস্ব? তাহা তো সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাহা যদি সত্য হইত, তবে এক কথায় লালাবাবু সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া তোমরা যাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছ সেই সত্যপুরুষের সন্ধানে বহির্গত হইতেন না। লোকবল ও অর্থবলই যদি জগতে সর্ব্বস্ব হইত, তবে যে গ্লাডিয়েটর-বধক্রীড়ার সপক্ষ ছিল রোমের সহস্র সহস্র অধিবাসী, সেই নিষ্ঠুর বধক্রীড়া একজনমাত্র সাধুচরিত্র ব্যক্তির আত্মবলিদানের ফলে রহিত হইতে পারিত না। গ্রীসের ইতিহাসে দেখা যায়, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ মাত্র দুই তিন শত স্পার্টান স্বাধীনতাহরণে উদ্যত লক্ষ লক্ষ অগণিত পারস্য সৈনিকের গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের বড় অসদ্ভাব নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিনেতা বিশ্বামিত্র যখন ধনগর্ব্বে জনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ঋষি বশিষ্ঠকে একক পাইয়া নিজের অধীন করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁহার প্রাণের দেবতা ভগবানের শরণাগত হইলেন। ভগবানের কৃপায় ঋষির তেজে রাজা বিশ্বামিত্রের অগণিত বলও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে জ্ঞানের নবতর দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং সত্যধর্ম্মের প্রতিধ্বনিতে এই মহাবাণী বাজিয়া উঠিল—ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং। কুরুপাণ্ডবের যখন যুদ্ধ লাগিল, তখন কৌরবদিগের তুলনায় পাণ্ডবদিগের লোকবল অর্থবল কত না সামান্য ছিল। কিন্তু ঐ তোমরা যাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছ, পাণ্ডবেরা তাঁহারই শরণাগত হইলেন এবং পরিণামে ভগবানের কৃপায় কৌরবদিগের পরাজয় সাধন করিলেন। সেই অবধি ভারতবাসীর অন্তরে এই মহাবাণী খুদিয়া বসিয়া গেল—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাইবার প্রয়োজন কি? ঐতিহাসিক যুগেও ভগবৎপ্রসাদের জয়লাভ করিবার দৃষ্টান্ত বহুলপরিমাণে দেখা যায়। বিশেষত ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত আছে। বুদ্ধদেব কয়জন লোক লইয়া এবং কত অর্থ লইয়া তাঁহার কর্ম্মবাদী ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন? যিশু খৃষ্টই বা কয়জন লোক লইয়া এবং কত অর্থ লইয়া তাঁহার শান্তিবাদী ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন? চৈতন্যদেবই বা কয়জন লোক লইয়া তাঁহার ভক্তিবাদী ধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন? সকল ধর্ম্মেরই ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অধিকাংশই তাঁহাদের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন মাত্র দশ-বারোটী লোক লইয়া। অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে তাঁহাদের মত-বিশ্বাস প্রচার করিবার জন্য অশেষ যন্ত্রণা অশেষ অত্যাচারও ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি অনেককে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসও ইহার ব্যতিরেকস্থল নহে। আমাদের তো ইহা জানা কথা যে ভক্ত প্রহ্লাদ যেমন তাঁহার অন্তরের ভগবদ্ভক্তি প্রকাশ করিবার ফলে নিজের পিতার নিকটেও অশেষ যন্ত্রণা-

দায়ক শতবিধ অত্যাচার লাভ করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায় যখন সত্যধর্ম্মের অন্তঃস্ফুরিত বাণী সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ করিলেন, তখন তিনিও সেইরূপ পিতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইহা তো জানা কথা যে, রাজা রামমোহন রায় যখন সত্যধর্ম্মপ্রচারে সমস্ত প্রাণ মন ধন নিয়োগ করিলেন, তখন তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র সে কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিয়াছিলেন। সে কার্য্যে তাঁহাকে পর্ব্বতসমান বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন নবতর-ভাবে সত্যধর্ম্মপ্রচারে উদ্যুক্ত হইলেন, তখন তাঁহাকেই বা কয়জন সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তাঁহাকেও কি তাঁহার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেন নাই? তাঁহাকে যে কত বাধা কত বিঘ্নের প্রবল আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল সে সমস্তই তো আজ ভারতবাসী মাত্রেরই জানা কথা। ঐ দুই বীর যদি জনমতের ভয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন, তবে আজ ভারতের আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভের যে আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহা আরও কতকাল যে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত, তাহা কে বলিতে পারে?

বন্ধুগণ! রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের উত্তরাধিকার তোমরা পাইয়াছ; অরণ্যবাসী একনিষ্ঠ ঋষিদিগের উত্তরাধিকার তোমরা পাইয়াছ। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, এই ধর্ম্মধনের অধিকারী হইয়া আজ, যখন জগতবাসী সকলে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তখন সেই সত্যধর্ম্ম ধরিয়া থাকিবার এবং জীবনের সকল কর্ম্মের দ্বারা বীরের ন্যায় তাহা প্রচার করিবার গৌরবপূর্ণ অধিকার হইতে তোমরা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে পার না। তোমরা যদি আজ এবিষয়ে পশ্চাৎপদ হও, তবে ইহা স্থির জানিও যে, তোমাদের সন্তানগণকে মহাবিপ্লবের ভিতর দিয়া ঐ অধিকার লাভ করিতে হইবেই। সত্যধর্ম্ম গ্রহণে পদে পদে কথায় কথায় লঘুগুরু অসংখ্য বাধাবিঘ্ন আসিবে, তাহা তো জানা কথা। আমরা অবশ্যই চাই—সবল ও অদম্য সাহসে পূর্ণহৃদয় তেজস্বী সৈনিকের দল, যাঁহারা প্রবল বাধা-বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না এবং সেই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে দৃঢ়সংকল্প হইবেন। কিন্তু বাধা-বিঘ্নের ভয়ে যাঁহারা প্রকাশ্যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণে অপারক হইবেন, তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না—তাঁহা-দিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিলে তোমাদেরই উপর সেই ঘৃণার প্রতিঘাত লাগিবে।

হে সত্যধর্ম্মের সৈনিক বীর! সত্যধর্ম্মকে তোমরা প্রাণপণে রক্ষা কর—জীবনে পরিণত কর। তোমরা সংঘবদ্ধ হইয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত হও—তোমাদের তেজঃপূর্ণ দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা দগ্ধ হইয়া যাক। সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সাম্প্রদায়িকতার কবলে নিপতিত হওয়া, উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। সংঘের মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা বজায় থাকে, সাম্প্রদায়িকতা কাহারও স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। ভগবানকে সেনাপতি করিয়া শতবিধ শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহিলে, শতবিধ শত্রুর উপহাস মৃত্যুবাণ প্রভৃতি শতবিধ অস্ত্রের ঝনঝনার মধ্যে সত্যধর্ম্মের অপরাজেয় পতাকা উড্ডীন করিতে চাহিলে তোমাদের দেহ সবল করিতে হইবে, মনকে সতেজ রাখিতে হইবে এবং আত্মাকে সর্ব্বদাই অমৃতপুরুষের সহবাসে রাখিতে হইবে, উপনিষদের ঋষি সত্য কথাই বলিয়াছেন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—বলহীন প্রাণহীন নির্জীব মানুষ ভগ-বানকে লাভ করিতে পারে না। তোমরা আপনা-দিগকে অমৃতের পুত্র বলিয়া উপলব্ধি কর; কঠোর অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অমর হও—মৃত্যু এবং মৃত্যুর অনুচর পরাজয় তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তূর্য্যধ্বনিতে যে আহ্বানবাণী শুনাই-য়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলি-তেছি—"তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, উন্নত না হইলে সত্যধর্ম্মকে রক্ষা করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব, এবং সত্যধর্ম্মকে রক্ষা না করিলে ভারতের ও জগতের পতন অবশ্যম্ভাবী।" সত্যধর্ম্ম গ্রহণের উপরেই বিশ্বজগতের উন্নতি ও মঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমেরিকা, কোথায় তুরস্ক আর কোথায় চীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সকল দেশই এই সত্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে।

সত্যধর্ম্মের যোদ্ধা তোমরা—ভগবানের সৈনিক তোমরা। সেই অকিঞ্চনগুরুর নামে জয়ধ্বনি করিয়া সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেল। প্রেমের বন্যায় আভিজাত্যের বৃথা গর্ব্ব, অস্পৃশ্যতাবোধের মলিন পঙ্ক ভাসিয়া যাক। কে তুমি বাঙ্গালী—কে তুমি পাঞ্জাবী—এ সমস্ত দেশবিদেশের ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও। কে তুমি ব্রাহ্মণ—কে তুমি পঞ্চম—এ সমস্ত উচ্চনীচের ভেদা-ভেদ ভুলিয়া যাও। সত্যধর্ম্মের উপাসক যে, তাহাকেও প্রাণের ভিতর ডাকিয়া লও; অভ্যাস বশতঃ সংস্কার বশত সত্যধর্ম্ম গ্রহণে যে অপারক তাহাকেও ভাই বলিয়া ডাকিয়া লও, সাদরভাবে তাহারও ভুলভ্রান্তি বুঝাইয়া দিও, তাহারও অশ্রু মুছাইয়া দিতে ভুলিও না। তোমরা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইও না। তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে দেবতা আছেন, তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরের

বাধা, প্রতি অশ্রুবিন্দু যিনি জানেন, সেই ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর এবং সম্পূর্ণ নির্ভয় হও। তাঁহার বাণী, সত্যধর্ম্মের বাণী আমাদের সকলের অন্তরে নিত্যনব আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সেই বাণীর প্রাচীন জীর্ণ আকারের পরিবর্ত্তে তাহার নবতর আকার হৃদয়ে ধারণ কর; সত্যের জীবনপ্রদ উৎস হইতে অমৃত পান করিয়া তৃপ্তি লাভ কর—প্রাচীন জীর্ণ কূপ হইতে কর্দ্দমমাত্র গ্রহণে তৃপ্তিবোধ করিও না। সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে গেলে বিবাদবিসম্বাদেরও প্রয়োজন নাই। কেবল দৃঢ়তার সহিত আদর্শের প্রতি, তোমরা যাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছ, সেই ভগবানের উপর একান্ত আস্থা চাই, তাঁহার মঙ্গলবিধাতৃত্বে একান্ত নির্ভর চাই। উপধর্ম্মের চরণে এবং উপধর্ম্মের নিত্যসহচর গুরুবাদ প্রভৃতির চরণে আপনাকে বিক্রয় করিও না। সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া বাঁচিয়া মৃতপ্রায় থাকা অপেক্ষা শতবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও ভাল। আজ এই স্বাধীনতা ঘোষণার দিনের ফলাফলের ব্যবস্থা করিবার সমস্ত ভার সেই মঙ্গলবিধাতা পরমপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া ভগবানের পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া, তাঁহার আদেশে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল সত্যধর্ম্মকে রক্ষা ও তাহার সর্ব্বতোভাবে প্রচারের জন্য অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হও—

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

ন্যায়ধর্ম্ম।

(বৈনৈক শিক্ষক)

মনে কর, একটা দোকানে একসের মাখন কিনিতে গিয়াছ। তুমি প্রত্যাশা কর যে, দোকানদার তোমাকে ঠিক ওজনের একসের মাখন দিবে, তোমাকে ঠকাইবে না। আবার দোকানদারও প্রত্যাশা করে যে, তুমি তাহার সঙ্গে যে দর চুক্তি করিয়াছ, তাহার কম মূল্য দিবে না—যথাযথ মূল্য দিবে। সে যদি আন্দাজ করিয়া কমবেশী মাখন দেয়, তাহা তোমার পছন্দ হইবে না, আর তুমি যদি ভুল করিয়া চার আনার স্থলে দুই আনা দাও সেও তাহা পছন্দ করিবে না। দোকানদার ও তুমি তোমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য থাকিবে যে, যেমন জিনিষটী দেওয়া হইবে তাহার যথাযথ মূল্যটীও দেওয়া হইবে। ইহাই হইল ন্যায়ধর্ম্ম। দোকানদার যদি খাঁটি ওজনের বদলে কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করে, অথবা তোমাকে যদি ভেজাল মাখন দেয়, কিম্বা তুমি যদি তাহাকে মেকি টাকা চালাইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাদের উভয়ের দেনা-পাওনার হিসাবটা বিগড়াইয়া গেল; তখন অধর্ম্ম অন্যায় আসিল। সেইপ্রকার দোকানদার যে কারণেই হোক যদি বিভিন্ন খরিদদারের সহিত বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে—কাহাকেও বা একই দামের পরিবর্ত্তে বেশী দেয়, আর কাহাকেও বা কম দেয়, তাহাও তাহার পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইবে। এই কারণে ন্যায়ধর্ম্মের যে চিত্র অঙ্কিত করা হয়, সাধারণত সেই চিত্রে ন্যায়ের মূর্ত্তিকে অন্ধ এবং হস্তে এক দাঁড়িপাল্লা দিয়া আঁকা হয়। কেবল দোকানে জিনিস কিনিবার সময় নয়, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রার পথে, সর্ব্বদাই লেনদেনের কথা আসিয়া পড়ে, কাজেই সর্ব্বদাই ন্যায়ধর্ম্মেরও ব্যবহারের কথা আসিয়া পড়ে।

পিতামাতার কাছে আমরা অনেক জিনিষ পাই—অন্ন, বস্ত্র, খেলানা, রোগের সময় সেবা এবং জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইবার পথে সাহায্য। এই সমস্তের বিনিময়ে আমরা কি দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি? আমাদের দিবার মধ্যে থাকে পিতামাতার বাধ্য হওয়া, তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি রক্ষা করা, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের সেবা করা ইত্যাদি। সেই প্রকার, শিক্ষকেরা আমাদিগকে যে বিদ্যা ও শিক্ষা দেন, তাহার বিনিময়ে আমাদের কর্ত্তব্য মনোযোগের সহিত সেই সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করা। খেলাধুলার ভিতরেও এই ন্যায়ধর্ম্মের ব্যবহারের অবসর পাওয়া যায়।

ন্যায়ধর্ম্মের ব্যবহারের সময় আমাদের ভালবাসাবাসির কথা আসিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। একজনের অপেক্ষা আর একজনকে বেশী ভালবাসা বালকদের পক্ষে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষক যদি এক বালক অপেক্ষা অন্য বালককে বেশী ভালবাসা দেখান, তবে বালকেরা কি তাহা পছন্দ করিবে? কখনই নয়। সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সকল দেশের যে সকল রাজারাজড়াদের অনুগ্রহপাত্র ছিল, সেই সকল দেশের সেই সকল রাজাদের শাসন নীতিবহির্ভূত হইয়া পড়িত। খাঁটি ন্যায়ধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য নয়। রোমের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক বিচারক ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের ছেলের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। রোমকদিগের মধ্যে পরিবারবাৎসল্য বড়ই অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল—মাথায় যদি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

শত্রুদিগের প্রতি অন্যায় অবিচার করিবার জন্য

প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই কারণেই শত্রুদিগের সহিত ব্যবহারকালে মনকে উৎক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া সামঞ্জস্যের উপর দাঁড় করানোই আরও বেশী আবশ্যক। খেলার সময় অনেক স্থলে দেখা যায় যে, নিজেদের দলের লোকের দোষে হার হইল, তখন পরাজিত দল অপর পক্ষের লোকদের উপর পক্ষপাত প্রভৃতি অযথা দোষারোপ করিতে লাগিল। এরকম করা বড়ই অন্যায়। ঐ প্রকার অন্যায়পূর্ব্বক মিথ্যা দোষারোপ করাতে মনে হয় নাকি যে, পরাজিত পক্ষ আবশ্যক মনে করিলে ঐ পক্ষপাত প্রভৃতি দোষে নিজেরা নামিতে পারিত? অনেক সময়ে দেখা যায়, সহপাঠীদের মধ্যে যদি কেহ লেখাপড়ায় উচ্চস্থান অধিকার করিল, তখন অপর এক সহপাঠী ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এপ্রকার মনোভাব বড়ই খারাপ। এ তো দূরের কথা—আমাদের যদি যথার্থ শত্রুও থাকে, যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের অনিষ্টসাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে, তাহাদেরও প্রতি ন্যায়বিচার করিতে আমাদের পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়, তাহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা নিন্দা করা উচিত নয়; বরঞ্চ তাহারা কি ভাবে কোন্ কথা বলিতে চায়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বালকবালিকাদের ছাত্র অবস্থায়ই বোঝা উচিত যে, বড় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে তাহারা ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক মতভেদ দেখিতে পাইবে—তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার নিজের মতের সঙ্গে অন্যের মতভেদ হইবে বলিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়া তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা নিন্দা কুৎসা প্রভৃতি প্রচার করা কর্ত্তব্য নয়। অপরের মতের সঙ্গে সায় দিতে না পারিলেও দ্বেষ-হিংসা বা আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী না হইয়া তাহার বিচার করা উচিত।

নিজের মতের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা এবং অতিরিক্ত আত্মপ্রীতি ন্যায়বিচারে বাধা ঘটায়। আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, অন্যের প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণা ন্যায়বিচারের নিক্তিকে কমবেশী করিতে পারে; কিন্তু তদপেক্ষা বেশী শত্রু হইতেছে অতিরিক্ত আত্মপ্রীতি বা আত্মম্ভরিতা। যে বিচারক উৎকোচ গ্রহণ করে, তাহাকে আমরা যে ঘৃণা করি তাহা খুবই সঙ্গত। আমরা শুনিতে পাই ও পড়ি যে, বিলাতের অনেক বিচারক অনেক বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশীদার আছেন। কাজেই সেই সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কারখানার মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাঁহার পক্ষে ন্যূনাধিক ঝোঁকা অস্বাভাবিক নয়। মনে কর, এক বিচারক কোন বড় মদের কারখানার অংশীদার। এখন সেই বিচারকের কাছে ঐ কারখানার বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইল। বিচারক কোন্ দিকে যাইবেন? মানুষ তো বটে—কাজেই স্বভাবতই তিনি ঐ কারখানার দিকে যদ্দূর সম্ভব টানিয়া চলিবেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ ভাব থাকা বিচারকের পক্ষে অসঙ্গত। শোনা যায়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে টামানি নামে একটা দল আছে, সভা আছে। অনেক বড় লোক, অনেক বিচারক এই দলে আছেন। এই দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে উহারা তাহাকে হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু অনেক বিচারক, অনেক বড়লোক এই দলে থাকাতে ইহারা খুন করিয়াও বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহার ফলে ইহাদের অত্যাচার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু ভারতের প্রাচীন নিয়ম অন্যরূপ। বিচারকদিগের সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন, যাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জনেই নিরত থাকিতেন, অর্থসঞ্চয়ের প্রতি মোটেই দৃষ্টি রাখিতেন না, তাঁহাদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার রাজা বহন করিতেন। এদেশের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় না যে, ঘুষ লইয়া বিচারক অবিচার করিয়াছেন। এদেশের বিচারকেরা ধর্ম্মভাবের উপর দাঁড়াইয়া বিচার করিতেন; পাশ্চাত্য বিচারকেরা নীতিসম্মত কার্য্য বলিয়াই ন্যায়বিচার করেন। কিন্তু নীতির ভিত্ত ধর্ম্মভাব অর্থাৎ ভগবানে শ্রদ্ধা শিথিল থাকিলে নীতির উপর শ্রদ্ধাও দৃঢ় থাকিতে পারে না। তাই পাশ্চাত্য বিচারকদের হাতে অনেক সময় বিচারবিভ্রাট ঘটিয়াছে দেখা যায়। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নীতিবিৎ বৈজ্ঞানিক বেকন ঘুষ লইবার অপরাধে বিচারকের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। আমরা এদেশে দেখি, নানা ভাবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আজকাল অনেক বিচারক উল্টা বিচার করিয়া বসেন। এমন কি, বিচারালয়ের কার্য্যপ্রণালীর দোষে হাইকোর্টেও অনেক বিচারবিভ্রাট ঘটিয়া বসে। কেবল যে বিচারালয়ে বসিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই বিচারক, তাহা নহে, আমরাও প্রত্যেকেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে বিচারক—চাকর-বাকর, ছেলে-পিলে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির নানা কার্য্যে কথায় কথায় তো বিচার করিতে হয়। কাজেই আমাদেরও কোন সূত্রেই ঘুষ লওয়া উচিত নয়। অনেক সময়ে ছেলেরা বড়লোক-ঘেঁষা হয়; বড়লোকের অর্থাৎ ধনী ও মানীর ছেলেকেই খেলার সাথী করে, গরীবের ছেলের দিকে দৃষ্টিই দেয় না। উহা অন্যায়। ধনীর ছেলে আর গরীবের ছেলে, সকলেরই উপর তোমার সমান ব্যবহার করা উচিত। তাহা না করিয়া যদি তুমি ধনীর ছেলের তোষামোদ কর, তাহা

হইলে তাহার আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দেওয়া হইল, কাজেই ন্যায়ের সামঞ্জস্য দাঁড়াইতে পারিল না।

অনেক সময়ে আমরা একজনের উপর রাগ করিয়া আর একজনের উপর "ঝাল ঝাড়ি"। এ থেকেই প্রবাদ আসিয়াছে—উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। হয়তো তোমার বড় ভগ্নী তোমাকে কোন কারণে শাস্তি দিলেন, কিন্তু তুমি তাঁহার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিয়া পারিয়া উঠিলে না—তোমার তাঁহার প্রতি রাগ হইল। তুমি সেই রাগের কারণে হয়তো তোমার ছোট ভগ্নীকে দুই চারি চড় মারিলে। ছোট ভগ্নীর কোনই দোষ নাই—কাজেই সে অবাক হইয়া গেল। এই প্রকার কার্য্যে ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না—ইহাতে অবিচার প্রকাশ পায়। বালকদিগের শিক্ষার ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহারা একজনের দোষে অপর জনের উপর অবিচার না করে।

ন্যায়বিচারের মূল প্রাণ হইল এই যে, বিনা কারণে, কারণ না পাইলে কাহারও উপর কোন বিষয়ে অন্ধ সংস্কার করিয়া না বসা। মনে কর, একটা জিনিষ তোমাদের চক্ষের আড়ালে আছে। সেটা কি, তাহা কি তোমরা বলিতে পার? কখনই না। সেই প্রকার কাহারও বিষয়ে না জানিয়া শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে মতামত স্থির করা, সিদ্ধান্ত করিয়া বসা খুবই অন্যায়। ইহার নাম অন্ধ সংস্কার বা কুসংস্কার। মনে কর, কোন উচ্চজাতীয় ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিল। উচ্চজাতীয় বলিয়া যদি তাহাকে শাস্তি দিবার বিরোধী হও, তবে তাহাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কারণ নামে উচ্চজাতীয় হইলেই কেন সে শাস্তির অযোগ্য, সে বিষয়ে তুমি কোনই সন্ধান করিলে না। আবার যদি কেহ বিদেশী বা অপরিচিত বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন কর, তাহাও তোমার কুসংস্কার বলিতে হইবে, কারণ তুমি তাহার বিষয় কিছুই না জানিয়া শুনিয়া একটা ধারণা করিয়া বসিয়া রহিলে। এই প্রকার কুসংস্কারসমূহ অনেক সময়েই ন্যায়বিচারে ব্যাঘাত জন্মায়।

ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্কেত।*

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

রাজা রামমোহন রায়ের মনে ভাবী ভারতের ছবি।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় তাঁহার নবভারতের আদর্শটি মানসচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বপ্ন এই ছিল যে, ভারতবাসিগণ এক দিন জ্ঞানে ও চরিত্রে উন্নত, চিন্তায় স্বাধীন, সামাজিক কুরীতি ও রাজনৈতিক অধীনতা উভয়ের পাশ হইতে মুক্ত, এবং একতায় বলী হইয়া জগতের মহাজাতি-সকলের সমকক্ষ হইবে, তাহাদের সকল মহান প্রয়াসের সহিত যোগ রক্ষা করিবে। স্বাধীন, সম্মিলিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অগ্রগতিশীল,—এই চারি লক্ষণযুক্ত নবভারত; ইহাই রামমোহনের স্বপ্ন ছিল।

এই স্বাধীন, সম্মিলিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অগ্রগতিশীল নবভারত একযুগে বা এক পুরুষে সৃষ্ট হইবার নহে। ইহার জন্য এক শতাব্দীও কিছুই নয়। ক্ষুদ্র শিখসম্প্রদায়কে একটি যোদ্ধার দল করিয়া গড়িয়া তুলিতে কত শিখগুরুর আত্মবলিদানের প্রয়োজন হইয়াছিল। ক্ষুদ্রায়তন জাপানকে নব-জাপানে পরিণত করিতে কত স্বদেশভক্ত জাপানীর আত্মত্যাগের ও দীর্ঘ কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল। ভারতে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়, বহু সমাজ, বহু ভাষা, এবং জাপানের তুল্য আয়তনবিশিষ্ট বহু বিভিন্ন প্রদেশ। ইহাকে স্বাধীন, সম্মিলিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ও অগ্রগতিশীল নবভারতে পরিণত করিবার জন্য কত যুগের তপস্যা, কত জীবনের আহুতি, হয়তো কত নির্য্যাতন লাঞ্ছনার প্রয়োজন হইবে! কত মহামনা আত্মোৎসর্গশীল নরনারীর জীবন, কত তপস্বীর তপস্যা, কত চরিত্রবানের চরিত্র, কত জ্ঞানীর জ্ঞান, কত ঋষির ভবিষ্য দৃষ্টি, কত কবির উদ্দীপনা, যুগের পর যুগ ও বংশের পর বংশ ধরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে এই নব ভারতের অভ্যুদয় হইবে।

ভারতের জাতীয় জীবনের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা।

এই বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই এই প্রশ্ন অনিবার্য্যরূপে মনে উদিত হয় যে, এমন কি কোনও শক্তি আছে, যাহা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া, এমন বিস্তৃত একটি ভূখণ্ডের সকল মানুষগুলিকে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিবে? যাহা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গীকে এক করিবে? যাহা এক যুগের এক বংশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করিয়া আবার তাহার পরবর্ত্তী যুগের পরবর্ত্তী বংশের মানুষকেও উদ্দীপ্ত করিবে?

শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের মনেও এই প্রশ্নটি উঠিয়াছিল, এবং সেই মনস্বী পুরুষপ্রবরের চিত্তে তখনই এই প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসাটিরও উদয় হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, ধর্ম্মই সেই শক্তি। ধর্ম্ম বিনা অন্য কোনও শক্তির বলে ভারতের জাতীয় জীবন গঠন সম্ভবপর নয়।

রামমোহন রায়ের সময়ে কেহ কেহ বলিতেন, এখনও অনেকে বলেন যে, ভারতে নবজীবনলাভের

* গত ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬। ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিবৃত।

পক্ষে ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, "ধর্ম্মকে এ কার্য্য হইতে যত দূরে রাখা যায়, ততই ভাল"। তাঁহারা দেখাইয়া দেন, "ঐ দেখ, পাশ্চাত্য জাতিসকল কেমন স্বাধীন ও সবল, তাহারা তো ধর্ম্মের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, অনেক সময়ে বরং ধর্ম্মের বাধা অতিক্রম করিয়া, জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও আপন আপন পরাক্রম বিস্তার করিতেছে। আর ভারতবাসীকে ধর্ম্মই নির্বীর্য্য করিয়াছে। ধর্ম্মই শতধা ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।" এ কথার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম তাহা করে নাই, ধর্ম্মের বিকার ও ধর্ম্মের সহিত জড়িত জঞ্জালসকল তাহা করিয়াছে।

পশ্চিমের ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয় জীবনের প্রকৃতিটি কিরূপ, এসিয়াবাসী ও ভারতবাসী কি তাহার যথেষ্ট পরিচয় লাভ করে নাই? সেই ক্ষমতার ঔদ্ধত্য, সেই দুর্ব্বল জাতিসকলের উপরে পীড়ন, সেই অত্যুগ্র আরাম-লোলুপতা, সেই মহাজন ও মজুরের আত্মকলহ,—এ সকলের পথ দিয়া কি আমরাও যাইব? তৎপরে, এ বিষয়ে আর একটি বিবেচ্য কথা এই যে, পশ্চিমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশসকলে, মানুষে-মানুষে ধর্ম্মের, ভাষার, রক্তের, ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য অতি সামান্য। তাহাদের পক্ষে "স্বদেশের স্বার্থ" লইয়া মিলিত হওয়া সহজ। কিন্তু ভারতের অবস্থা অন্যরূপ। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, ভাষার, রক্তের, ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষ একাই একটি মহাদেশ সদৃশ। ভারতে জাতীয় জীবনের ও জাতীয় একতার প্রশ্নটি এত সহজ নহে। রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিতে অথবা বিদেশীর প্রতি বিরাগে মানুষে মানুষে যে মিলন সৃষ্ট হয়, তাহা অগভীর ও ক্ষণস্থায়ী। এ সকল ভাব মানবপ্রকৃতির বহিরঙ্গে, মানব-হৃদয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত। ভারতে জাতীয় জীবন গঠনের জন্য জাতীয় একতা সৃষ্টির জন্য, এমন বস্তু চাই, যাহা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করিয়া বাহিরের পার্থক্যকে ভুলাইয়া দিবে; যাহা হৃদয়কে ঊর্দ্ধে তুলিয়া পার্থক্যের নিম্নভূমিকে তুচ্ছ করিতে শিখাইবে। ইহা ধর্ম্মভাবের কাজ। ধর্ম্মই মানবের অন্তরকে স্পর্শ করিতে, হৃদয়কে উদার, কোমল, শ্রদ্ধাপ্রবণ ও মিলনোৎসুক করিয়া তুলিতে পারেন। অন্য কোনও বস্তুতে সে শক্তি নাই। যে গভীর ও আন্তরিক মিলনের দ্বারা জাতীয় একতা ও জাতীয় নবজীবন রচিত হয়, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর সাধ্য নাই যে সে মিলন সৃষ্টি করে। কোন কোন দেশে রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতার ভিত্তিতে এক প্রকার কুটিল ও ক্রূর প্রকৃতির জাতীয় জীবনের উদ্ভব হইয়াছে। তাহা সহজে ও অল্প সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভারতবাসীর দৃষ্টি কখনও কখনও সেদিকে ধাবিত হয়। কিন্তু আমি মনে করি, ভারতের পক্ষে সে প্রকৃতির জাতীয় জীবন যে অসম্ভব, ইহা বিধাতার বিশেষ কৃপা।

জাতীয় জীবনের জন্য জাতীয় একধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা।

জাতীয় জীবনের জন্য ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন। কিন্তু কিরূপ আকার ও কিরূপ প্রকৃতি ধারণ করিলে ধর্ম্ম এই বিষয় হইতে পারেন? সাম্প্রদায়িকতার ভাবে পূর্ণ থাকিলে কি কোনও ধর্ম্ম এই কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন? বর্ত্তমান কালে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মসকল, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িকতার ভাব রক্ষা করিয়া এবং কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিয়া কি এ কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিবেন? না, দৃষ্টির ও আদর্শের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এই কার্য্যের যোগ্য হইবেন?

শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের মনে ভারতের জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের যে মীমাংসাটি জাগিয়াছিল, তাহা শুধু এই নয় যে জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থানে ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থানে জাতীয় এক ধর্ম্মের প্রয়োজন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে এক বিমল, উদার, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া ভারতের জাতীয় এক-ধর্ম্মের আকার ধারণ করিবে, এবং তাহাই স্বাধীন সম্মিলিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অগ্রগতিশীল নবভারতের সৃষ্টি করিবে। রামমোহন রায়ের স্বপ্নে, নব ভারতের ভিত্তিস্থান ছিল জাতীয় এক-ধর্ম্ম।

একবার আমি একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, জাপানের নবজাগরণের যুগে একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক একজন স্বদেশভক্ত জাপানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনাদের দেশে তো এক-ধর্ম্ম নাই। আপনাদের কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা পূর্ব্বপুরুষপূজক শিন্তো-ধর্ম্মাবলম্বী, কেহ বা খৃষ্টান। ইহাতে কি জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে? আপনারা সকলেই যদি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে জাতীয় নবজীবনের পথ সহজ হইতে পারে।" সেই স্বদেশভক্ত জাপানী উত্তর দিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনি বাহির হইতে দেখিয়া বলিতেছেন যে আমাদের দেশে বহু ধর্ম্ম। প্রকৃত পক্ষে সকল জাপানীর হৃদয়ে একই ধর্ম্ম বিরাজিত। সেই ধর্ম্মের নাম 'জাপান'।" অর্থাৎ জাপানীদের হৃদয়ে ধর্ম্ম ও দেশভক্তি একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

সেই স্বদেশভক্ত জাপানীর উক্তির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ একটি দেশের সকল মানুষকে এক অখণ্ড জাতিতে, এবং একটি মানুষের-মত' মানুষের জাতিতে পরিণত করিতে হইলে, তাহাতে এমন একটি

জাতীয় এক-ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক, যাহা তাহাদের দেশাত্ম-বোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া থাকিবে, যাহা তাহাদের দেশাত্মবোধকে আত্মস্থ ও আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইবে। রামমোহন রায় আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মটি একদিন ভারতের পক্ষে এই-রূপ জাতীয় এক-ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিবে।

সেই দূরদর্শী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা এক শতাব্দী পূর্ব্বে নিজ স্বচ্ছ অন্তরে যাহা বুঝিয়াছিলেন, আজ আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আবার তাহাই নূতন করিয়া "ঠেকিয়া শিখিতেছি"। রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি-রচিত বন্ধনসূত্র ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। দেশের মানুষ এখন বুঝিতেছেন যে, ধর্ম্মের একতা ও ধর্ম্মের মৈত্রীর দ্বারা মিলনের ভাব সঞ্চার করিতে না পারিলে রাজনীতিক্ষেত্রে ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।

চারিদিকে উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবের সূচনা।

রামমোহন রায় যে দিব্যধর্ম্ম আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার লক্ষণ কি? তাহা মহান পরমেশ্বরের এক নামে সকলকে একত্র করে; তাহা বাহ্যপূজা অপেক্ষা অন্তরের শুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করে; তাহা অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতাকেই বর্জ্জন করে, কিন্তু ভাবের ও সাধনার বিচিত্রতাকে সমাদরে স্বীকার করে। ভারতের যে বিচিত্রতা ধর্ম্মদৃষ্টিহীন রাজনৈতিকের চক্ষে পরম বাধাস্বরূপ, সেই বিচিত্রতাতে এই পবিত্র ধর্ম্ম পরম আনন্দই অনুভব করেন।

হে ব্রাহ্মগণ, বিশ্বাস কর, আশা কর, বিধাতার প্রেরিত সেই বিমল ধর্ম্ম ভারতের জাতীয় একধর্ম্মের স্থান একদিন নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। বিধাতা তাঁহার এই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন; তোমরাও তাঁহার এই কার্য্যে আপনাদিগকে উৎসাহের সহিত সমর্পণ কর, এবং বিধাতার জয়ের জন্য বিশ্বাসের সহিত প্রতীক্ষা কর। বিধাতার কাজ ধীরে ধীরে হয়। তাঁহার কার্য্যের জন্য এক শতাব্দী কিছু নয়; শতাব্দী তাঁহার কাছে তুচ্ছ নিমেষ মাত্র। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সাময়িক অনৈক্য, বিবাদ, হিংসা দেখিয়াও ভয় পাইবার কিছু নাই। মানুষ কলহ করিয়া বিধাতার কার্য্য রুদ্ধ করিতে পারে না। বিধাতার এই কার্য্যের লক্ষণ চারিদিকে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভারতভূমিতে যত ধর্ম্ম বিদ্যমান, সকলেই এখন নিজ নিজ অঙ্গ হইতে যুগযুগান্তরের কুসংস্কার ও জঞ্জালরাশি অপসারিত করিতে আগ্রহান্বিত হইতেছেন। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যই ধর্ম্মের সাধন, ঈশ্বর এক ও সকল মানুষ ভাই-ভাই, এই সরল উদার অসাম্প্র-দায়িক ভাবের দিকে সকলে অগ্রসর হইতেছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মই আপনাকে ভারতের সর্ব্বজাতির ও সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের ভাবী এক-ধর্ম্মের আদর্শের সহিত মিলিত করিতে সচেষ্ট হইতেছেন। এমন দিন আসিবে যখন ভারতের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নামে এক উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সাধনা করিবেন; যখন ভারতের সকল নরনারীর ধর্ম্ম নামে ও বাহ্যবিষয়ে এক না হইলেও প্রকৃতিতে ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এক হইয়া যাইবে। সেই যুগে ইহা ভারতের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় হইবে যে ভারতের জাতীয় এক-ধর্ম্মের উপাসকগণ একদেবতার নাম বহু ভাষায় ও বহু প্রণালীতে গান করিবেন। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা সেই দিনের পূর্ব্বাভাস এখনই লাভ করিতেছি। নানা ভাষায় নানা প্রণালীতে ব্রাহ্মগণ অভ্রভেদী হিমগিরির পাদদেশে, তমালতালীবনরাজিনীলা দক্ষিণ-সাগরের বেলা-ভূমিতে, সিন্ধু কাবেরী ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে, একই দেবতার বন্দনা করিতেছেন। ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় একধর্ম্মের উপাসকগণ কেহ বা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া, কেহ বা "লা ইলাহা ইল্লিল্লাহ" বলিয়া, কেহ বা "Our father which art in heaven" বলিয়া নানা ভাবে ও নানা ভাষায় একই দেবতার অর্চনা করিবেন। এ বিচিত্রতা ভারতের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে না, গৌর-বেরই কারণ হইবে।

পরস্পরের ভক্তিরসে নিমজ্জন।

ভারতের ভাবী জাতীয় এক ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, যেমন এই বৈচিত্র্যে ভারতবাসীকে আনন্দিত হইতে বলিতে-ছেন, তেমনি ভারতবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে পরস্প-রের ভক্তিরসে নিমজ্জিত ও অভিষিক্ত হইতে বলিতেছেন। একটি ভাল ব্যঞ্জন রান্না হইলে, আগুনের আঁচে তাহার আলু বেগুন পটোল প্রভৃতি প্রত্যেকটি বস্তুর রস প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে। প্রত্যেকের রসে প্রত্যেকের স্বাদ বাড়ে। সেইরূপ, ভারতের ভাবী জাতীয় ধর্ম্ম চাহেন যে এক প্রবল ধর্ম্মানলে জ্বাল দিয়া ভারতের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানকে পরস্পরের ধর্ম্মরসে সিক্ত করিয়া সিদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। এমন করিয়া ফেলিবেন যে ভারতীয় হিন্দুকে চাখিলে তাহার মধ্যে মুস্‌লিম ও খ্রীষ্টীয় ভক্তিরসের স্বাদ পাওয়া যায়, ভারতীয় মুসলিমকে চাখিলে তাহার মধ্যে উপ-নিষদের, বুদ্ধের, চৈতন্যদেবের স্বাদ পাওয়া যায়, ভারতীয় খ্রীষ্টানকে চাখিলে তাহার মধ্যে হিন্দু ও মুসল-মানের সমুদয় সাধনার স্বাদ পাওয়া যায়। বল দেখি, ব্রাহ্মগণ, রামমোহন রায় কি সেই রকম একজন মানুষ ছিলেন না? ভারতবর্ষ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, জগৎ তাঁহাকে চাখিয়া দেখিয়াছে, তাঁহার মধ্যে উপনিষদের স্বাদ, সূফী সাধনার স্বাদ, খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বাদ

কেমন চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল। দেখ কি রকম মানুষ চায়, ভারতে জাতীয় জীবনের জন্য কি-রকম মানুষ চাই, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ে কিরূপ প্রকৃতির কিরূপ ধাতুর মানুষ সকল প্রস্তুত হইলে দেশে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার নিদর্শন রামমোহন রায়। এ বিষয়ে তিনি শুধু উপদেষ্টা নহেন, তিনি স্বয়ং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একে অন্যের সাধনায় সঙ্গী হইয়া পরস্পরের ভক্তি ধারায় অবগাহন করিলে, একে অন্যের ভক্তিরসে মজিলে, আর কি ভাইয়ে ভাইয়ে অমিল থাকিতে পারে? তাই বলি, এদেশের জন্য চাই রামমোহন রায়ের মত মানুষ, এ দেশের জন্য চাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত উদার ভক্তি-ধর্ম্মের আদর্শ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ভারতের অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম ভারতের হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয় সম্প্রদায়কে কি বলিয়া আহ্বান করেন? হিন্দুসমাজ তো ব্রাহ্মসমাজের জননী। সেই জননীকে ব্রাহ্মসমাজ বলেন, "মা তোমারই আবহমান কালের সাধনাকে মার্জ্জিত করিলে তাহা মানবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও ভারতের জাতীয় একধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া কেমন উজ্জ্বল হয়, কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তাহা তুমি আজ আনন্দের সহিত দেখ। ব্রাহ্মসমাজ তোমারই সন্তান। তোমার এই সন্তানের কৃতিত্বে ও কীর্ত্তিতে তোমারই গৌরব। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ ভারতের জাতীয়-এক-ধর্ম্ম হইবেন বলিয়া নব-ভারতের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা যে বিমলতর আকারে তোমারই ধর্ম্ম, তাহা তুমি গৌরবের সঙ্গে অনুভব কর।"

তেমনি মুসলমান ভাইদের আমরা বলিব, "ভাই, এ ধর্ম্মকে পর ব'লে মনে ক'রোনা। ইহাকে শুধু হিন্দুদের একটি আন্দোলন ব'লে দেখো না। তোমার সেই একেশ্বরবাদ, তোমার শহীদগণের জ্বলন্ত ইমান্, তোমার সংসার ত্যাগী তপস্বী ভক্তের প্রাণের বস্তু যে ইস্‌লাম, তাহাকে তোমরা বিশুদ্ধ ও সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে নিয়ে এস। দেখ্‌তে পাবে, তাই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাই ভারতে জাতীয় এক-ধর্ম্ম। দেখ্‌বে আমরা তোমাদের পর নই। দেখ্‌বে তোমাদের সব মহাপুরুষগণের ধর্ম্ম-সাধনার ধারা আমরাও কেমন অনুপ্রাণিত হই।"

তেমনি খৃষ্টান ভাইদের আমরা বলিব, "তোমরা তোমাদের ধর্ম্মকে creedএর জঞ্জাল হ'তে মুক্ত ক'রে, উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে নিয়ে এস। দেখবে, যীশু যে পিতার ইচ্ছা পালনকে ধর্ম্মের প্রধান স্থানে রেখেছিলেন, আমাদেরও তাই মূলমন্ত্র। দেখবে, আমাদের নবযুগের ঋষিমুখে সেই সত্যই উচ্চারিত হ'য়েছে,—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। দেখবে, তোমাদের 'Our Father which art in Heaven' আমাদের কণ্ঠকেও কেমন ভক্তিসিক্ত করে। দেখবে, তোমাদের সকল সাধু-ভক্তগণের জ্বলন্ত জীবনের ও জ্বলন্ত মরণের দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাণকেও কত বলশালী করে।"

ভারতের জাতীয়-এক-ধর্ম্ম এইরূপে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, সকলের অন্তরতম গভীরতম ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকলকে মিলিত করিবেন। ইহার প্রথম প্রকাশ ব্রাহ্মধর্ম্মের আকারে ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যেই হইয়াছে বটে। কিন্তু ভারতের মুসলমানের ও খৃষ্টানের ধর্ম্ম যখন নবীভূত হইয়া ভারতের জাতীয় এক-ধর্ম্মের আকার ধারণ করিবে, তখন তাহাদিগকে আমরা গ্রাস করিব, কিংবা তাহারা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রোখিত পূজার মন্ত্রটিকে গ্রহণ করিবে, এ কল্পনা রামমোহন রায় করেন নাই। আমরা বলি, নাম, ভাষা, পূজার প্রণালী—এসকল বাহিরের কথা। এ সকল এক হইলে ভাল, এক না হইলেও ক্ষতি নাই।

ঐক্যের কল্পনা মানুষের বড় প্রিয় কাজ। আমরা আমাদের কল্পনাকে রামমোহন রায়ের অপেক্ষাও দূরতর ভবিষ্যতে প্রসারিত করিয়া দিতে পারি। আমরা একথা ভাবিতে পারি, বিধাতার বিধানে দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে এমন দিনও আসিবে যখন সমগ্র ভারত জাতিতে, বংশে, রক্তে এক হইয়া যাইবে, এক ভাষায় কথা কহিবে, একই প্রণালীতে একের উপাসনা করিবে,—সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম এক নাম গ্রহণ করিবে। ইহা হয়তো বর্ত্তমান যুগে জীবিত মানুষের চেষ্টায় হইবে না; ইহা হয়তো আমাদের দৃষ্টির ও আমাদের সাধ্যের অতীত সুদূর ভবিষ্যতের কাল্পনিক ছবি মাত্র। কিন্তু ভাষার, রক্তের, ও নামের একতা এইরূপ বহুদূরের বস্তু হইলেও, ভাবের চিন্তার, ও উদার ভক্তির একতা তত দূরের বস্তু নহে। যে দিন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম, নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও, এক উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিবেন, সে দিনটি তত দূরে নয়। এই উদার মিলনের আদর্শটি বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি পতাকার ন্যায়, আমাদের মানস-চক্ষে এখনই ভাসিতেছে। সেই পতাকাতলে পৌঁছিবার জন্য বিধাতার আহ্বান এখনই শোনা যাইতেছে। সে উদার মিলনের ছবি এখনই ব্রাহ্মসমাজের নরনারীর মানস ছবি হইয়াছে। সেই উদার মিলনই ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখের যুগের সাধনার বস্তু।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধের প্রথম অঙ্কে যখন ইংরাজ-পক্ষে বহু সেনা ক্ষয় হইতেছিল, দলবদ্ধ এক এক ব্যূহের সম্মুখের সেনাপংক্তি যখন শত্রুর কামানের গোলায় আঘাতে বার

বার লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, তখন সেনাপতি ওয়েলিংটন প্রত্যেক দলকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখ-পংক্তির স্থান নির্দ্দেশক পতাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতে বলিতেছিলেন। যে সময়ে কেবল তাঁহার দৃঢ়স্বরে উচ্চারিত সংক্ষিপ্ত আদেশ "File up, bring up" অনবরত শোনা যাইতেছিল। ভারতক্ষেত্রে বিধাতার সেইরূপ একটি আদেশ ধ্বনিত হইতেছে। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ডাকিয়া বলিতেছেন, "এগিয়ে এস! ভারতের জাতীয় একধর্ম্মে পরিণত হইবার যে-ভূমি, যে-রেখা, সেখানে আসিয়া সজ্জিত হও।" এই-রেখায় পৌঁছিতে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় যত বিলম্ব করিবেন, তাঁহার পক্ষে ভারতের ভবিষ্যৎকে গঠন করিয়া দিবার গৌরবময় অধিকার লাভ করা ততই সুদূরপরাহত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যদি কোন গৌরব থাকে, তবে তাহা এই যে, ইনি সেই রেখাতে বিধাতাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই পতাকাতলে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মের সাধনা ও মণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল আসিলেই কি লক্ষ্য সিদ্ধ হইল? তাহা নয়। এই বিমল উদার ধর্ম্মের দ্বারা জীবনকে নবভাবে গঠন করা চাই, ধর্ম্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আন্তরিক বিমল উপাসনাই ধর্ম্মের সাধনা। তাহাই মানবজীবনকে সফল করে, মানবসমাজকে উন্নত করে, মানবজাতিকে নবজীবন দান করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান কাজ, মানুষকে ঈশ্বরের চরণাশ্রয়ে লইয়া আসা, এবং ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া। এটি ইহার চিরদিনের কাজ, ইহার সকল যুগের ও সকল অবস্থার কাজ। এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, হিন্দুমুসলমান-খ্রীষ্টান, যদি সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতটি গ্রহণ করেন, যদি একদিন ভারতের সব সম্প্রদায় এক হইয়া যায়, তাহা হইলেও কি মানুষকে ঈশ্বরচরণে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন থাকিবে না? মানবমনে কি তখন পাপ-প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম থাকিবে না? তখন কি মানুষকে দুঃখে বিপদে ভয়ে সেই পরমাশ্রয়ের আশ্রয়ে স্থাপন করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? মানবহৃদয়ে মহত্ত্বের সহিত ক্ষুদ্রতার, ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত প্রবৃত্তির যে চিরদিনের দ্বন্দ্ব, তাহা কি তখন নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে? তাহা নয়। ঈশ্বরচরণে মানুষকে বসিতে না শিখাইলে, ঈশ্বরের সরল ও বিমল উপাসনা মানুষকে না শিখাইলে, ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালন-মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত না করিলে, মানুষকে কে দৃঢ় রাখিবে, তাহার হৃদয়ে কে বল সঞ্চার করিবে? যত দিন এ জগতে মানুষ মানুষ, যতদিন মানুষের অন্তরে পবিত্রতার, মহত্ত্বের, মনুষ্যত্বের, দেবত্বের আদর্শ সকল বিদ্যমান আছে, অপর দিকে যতদিন মানুষের ভাগ্যে পাপ, আদর্শ হইতে স্খলন, এবং পাপের জন্য অনুতাপ ও অশ্রুজল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষকে পরমেশ্বরের চরণাশ্রয়ে লইয়া আসিবার জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিবে।

ধর্ম্ম তাঁহার এই সুমহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করেন, ধর্ম্মমণ্ডলীর দ্বারা। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় নেতা ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ব্রত প্রবর্ত্তিত করিয়া, সামাজিক উপাসনাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে উৎসব ও সঙ্গত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মমণ্ডলীর গাঢ়তা সম্পাদনের জন্য এত যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত মাঘোৎসবে আজ আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। এখন যে "ব্রাহ্মসমাজ" বলিতে আমরা আর শুধু একটা উপাসনামন্দির বুঝি না, আমরা বুঝি একটি ধর্ম্মমণ্ডলী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে এই ধারাটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমণ্ডলী কাহাকে বলে? ধর্ম্মমণ্ডলী বলে সেই প্রতিষ্ঠানকে, যেখানে মানুষেরা আত্মায় আত্মায় ঘনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরচরণে বসে; যেখানে একের প্রাণের ঈশ্বরানুরাগ অপরের প্রাণে সংক্রান্ত হয়; যেখানে একজনের সাধুতা ও বীরত্ব দেখিয়া অপর দশজন সাধুতা ও বীরত্ব-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। পরিবারে একটি শিশুর সংক্রামক রোগ হইলে ডাক্তার আর পাঁচটিকে সেখান হইতে সরাইয়া দেন; কারণ ঘনিষ্ঠ পরিবার রোগ সংক্রান্ত করিবার পক্ষে অনুকূল স্থান। তেমনি ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী, ধর্ম্মভাব সংক্রান্ত করিবার পক্ষে অনুকূল স্থান। তাই ব্রাহ্মগণ, ঘনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের নাম ও দয়া আস্বাদন করিবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয়ে শান্তি ও শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য, পরস্পরের সাহায্যে অন্তরের সংগ্রামে বল লাভ করিবার জন্য একটি ধর্ম্মমণ্ডলীর আকার ধারণ করিয়াছেন, একটি "সমাজ" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বা চরিত্র যদি শুধু জান্‌বার কি বোঝ্‌বার কি বল্‌বার বস্তু হ'ত, তবে ব্রাহ্মেরা দেশের আর সকলের মধ্যেই মিশে থেকে, দেশের মধ্যেই ডুবে থেকে, তলিয়ে থেকে, লুকিয়ে থেকে এবং কেবল মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে একত্র হ'য়ে, ধর্ম্মের চর্চ্চা কর্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু ধর্ম্ম এবং চরিত্র তো কেবল চর্চ্চা কর্‌বার, আলোচনা কর্‌বার বস্তু নয়। এ সকল যে জীবনে ফলাবার জিনিস, এ সকল যে প্রকৃতিতে বসাবার জিনিস; এ সকল যে হৃদয়ে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, পলে-পলে তিল তিল ক'রে সঞ্চারিত ক'রেও সঞ্চিত ক'রে নেবার জিনিস। এ বস্তু সঞ্চয় কর্‌বার জন্য, এ ধর্ম্মধন সংগ্রহ কর্‌বার জন্য, উপযুক্ত

সঙ্গ চাই, উপযুক্ত গৃহ-পরিবার চাই, উপযুক্ত দল চাই। তাই ব্রাহ্মসমাজ "সমাজ" হয়েছেন। দেশ থেকে পৃথক হ'বার উদ্দেশ্যে নয়; কিন্তু ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" যাতে মানুষের জীবনে ফলিত হ'য়ে শক্তিময় হ'তে পারে, অগ্নিময় হ'তে পারে, যাতে তাহা সহস্রের মধ্যে সংক্রান্ত হ'বার, বংশানুক্রমে প্রবাহিত হ'বার ও যুগে যুগে ভারতকে অনুপ্রাণিত করবার শক্তিটি লাভ করতে পারে, তারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ "সমাজ" হ'য়েছেন।

আশাশীল হও।

বন্ধুগণ, আমি আজ আমার নিবেদন শেষ করি আশার কথা ব'লে। যাঁরা নিরাশার প্রবক্তা, prophets of despair, আমি তাঁদের দলে নই। আমি ভারতের ইতিহাস প'ড়ে কোন দিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারিনি যে, ভারতে একদিন একজাতীয়ত্বের গৌরবময় অবস্থাটি ছিল, আর তা হ'তে সে ক্রমশঃ স্খলিত হ'য়েছে। বরং তার বিপরীত কথাই সত্য। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভারতের ইতিহাসের ঘটনাধারার ফলে ভারতে নানা বিচিত্রতা, নানা বিভিন্নতা জন্মেছে। কিন্তু কালের রেখা ধরে দেখে এসো, দেখবে, বিধাতার কৃপায় মিলনের দিকে, একীকরণের দিকে একটি গতি এই সমুদয় ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে সুস্পষ্ট। যুগে যুগে বিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি যেন ভারতক্ষেত্রে মিলনের একটি উজ্জ্বল রেখা টানিয়া আসতেছে। মানব-রচিত যত বাধা,—যথা আর্য্যজাতির পুরোহিতগণের অত্যধিক বাহ্যশুচিতার আড়ম্বর ও তৎপ্রসূত জাতিভেদ, মুসলমানের সেমিটিক সভ্যতাপ্রসূত অত্যধিক স্বজাতিপ্রিয়তা, খ্রীষ্টানের বিজেতৃ-সুলভ স্বাতন্ত্র্য,—মানবরচিত এই সমুদয় বাধাকে অতিক্রম করিয়া, এই সমুদয় বাধাকে কর্ত্তন করিয়া, বিধাতার অঙ্কিত ঐ মিলনরেখাটি যুগযুগান্তর ধরিয়া স্থির অবিরাম গতিতে ভারতের ইতিহাসে চলিয়া আসিতেছে। বিধাতা এই জন্য হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করিয়া তাহাদের উভয়ের ভাব ও সাধনাকে মিলাইয়া দিয়া, মধ্যযুগের কত ভক্তকে জন্ম দিয়াছিলেন। এই জন্য রাজশ্রেষ্ঠ আকবরের উদয়, এই জন্য কবীর নানক চৈতন্যের অভ্যুদয়, এই জন্য রামমোহনের অভ্যুদয়, এই জন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সমুদ্ভব। বন্ধুগণ! বিধাতার এই বিধান দর্শন কর, আশান্বিত হও, আশস্ত হও। দেশের অতীত ইতিহাসকে এই আশার দৃষ্টিতে পাঠ কর, তাহা হইতে আশার শিক্ষা লও। দেশের বর্ত্তমান ইতিহাসকে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল ইতিহাসকে, এই আশার চক্ষে দর্শন কর, দেশের ভবিষ্যৎকে আশাপূর্ণচিত্তে কল্পনা কর।

আজ ভগবানের চরণে আমরা এই প্রার্থনাই করি,—তিনি আমাদিগকে আশা-মন্ত্রে দীক্ষা দিন। সমগ্র দেশকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজকে তিনি ত্যাগের বীর্য্য, উন্নত শির, অনন্ত বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনন্ত আশা দিয়ে অনু-প্রাণিত করুন। হে দুর্গমপথে প্রথম যাত্রী ব্রাহ্মসমাজ, ভীত হ'য়োনা। তোমার অতীতের অপমান নির্য্যাতন দুঃখ, তোমার সকল বীরত্ব ও ত্যাগ, সকল নিষ্ঠা ও আত্মসংযম, একজন দর্শন করছেন। তিনি ভারতের ভাগ্যবিধাতা; তিনি সর্ব্বমানবের সর্ব্বযুগের বিধাতা। শতাব্দী আসে, শতাব্দী যায়, তাঁর বিধান প্রতিহত হয় না, তাঁর কৃপার প্রবাহ শুষ্ক হয় না। আমরা যেন তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখে, তাঁর চরণে নির্ভর রেখে, আশা ও উৎসাহ ভরে, দৃঢ়পদে, আপনার পথে অগ্রসর হ'তে পারি, বিধাতা আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

হে ভারতের প্রভু, হে ব্রাহ্মসমাজের প্রভু, তোমার চরণে এই ভিক্ষা করি, আমাদের দৃষ্টি যেন তোমার উপরে স্থির থাকে। অবোধ মানব যতই ভেদ সৃষ্টি করুক, তুমি তোমার এক প্রেমে সকলকে বাঁধিতেছ। অবোধ আমরা ধীরে ধীরে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতেছি। তোমার এক নামে তোমার এক প্রেমে সকলে এক হইব, তাহার আয়োজন তুমি করিতেছ। তুমি ভারতকে আশীর্ব্বাদ কর, তুমি ব্রাহ্মসমাজকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আশাপূর্ণ অন্তরে, তোমার উপরে নির্ভর রাখিয়া, বর্ষে বর্ষে শতাব্দীতে শতাব্দীতে ব্রাহ্ম-সমাজ তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারে।

নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

বেদগান।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি
জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি।
ওষধি বনস্পতি সবার দেবতা যিনি
তাঁহারে ভক্তিভরে নমি নমি সদা নমি
নমি নমি সদা নমি—নমি নমি সদা নমি॥

ভৈরব—আড়াঠেকা।

তব পদে প্রভু সঁপিনু হে ভকতিমালা
লও তুমি তুলিয়া তাহে প্রেমকরে।
শ্রবণ কর ফুটিয়া উঠে কত না সঙ্গীত
ধরি' তোমার নাম চিরন্তন সখা হে চিত্তকমলে॥

দ্বি, না, ঠা,

ভৈরবী—দাদরা।

এই যে প্রভাত-আলো এই যে কল-পাখী
এই যে সবুজ শাখী চিত্ত কোথায়?
এই যে শ্যামল তৃণ এই যে ফুলের রাশি
হাওয়ার কল বাঁশী চিত্ত কোথায়?
এই যে রবির কিরণ মেঘের সজল কালো
রাতের জ্যোৎস্না-আলো চিত্ত কোথায়?
আনন্দেরি ধারা বইছে পাগল পারা
ধরণী তায় হারা চিত্ত কোথায়?
এই যে তাঁহার পরশ সকল দুঃখে সুখে
বীণা বাজায় বুকে চিত্ত কোথায়?
ডাক আসে যে তাঁর ভেঙ্গে সকল দ্বার
খোঁজ করে আমার চিত্ত কোথায়?

নি, চ, ব,

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রাণমন সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্যামী
তোমা নাথ যেই চাহে তাহে দাও অচল শরণ।
তব প্রথম তেজ দেব অসংখ্য ভুবন সৃজিল
সকল পাপ অজ্ঞান দূরিল প্রীতি তব হে অতুলন॥
গাহিছে গুণ অশেষ সুর মানব দেবেশ তব
অন্ত কেহ নাহি পায়।
চিত্তে দাও ভক্তি অচল দাওহে কৃপা আনন্দ
নাহি কিছু যাচি আর, তুমি মোর হে দারিদ্র্য-হরণ॥

ক্ষি, না, ঠা,

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এ কার বাজিয়া উঠিল বাঁশরী মোর পরাণ ভরে।
চিত্তকমল সকল ভুলিল—
অসীম মাঝে হারালরে আপনারে॥

ক্ষি, না, ঠা,

গুর্জ্জরী টোড়ী—তেওরা।

ধন্য বিশ্বনাথ তারক অযুতমালা।
কণ্ঠ শোভিত করে বিরাজিত।
সত্যরূপে সতত বিরাজিত
অন্ত তোমার অন্ত কোথা।
তুমি আদি পুরাণ সব-পাপ-হারী
প্রাণ সবারি শঙ্কর দীনের হরহে ব্যথা।
ধরি চরণ কৃপা করি' পাপতাপ বিদূরি হে
রহিও চিতে সদা॥

ক্ষি, না, ঠা,

জৌনপুরি—একতালা।

রিক্ত করিয়া লবে গো আমায়
তোমার সুধায় ভরিবে
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে
সকল হৃদয় হরিবে।
তাই তো গো তুমি ধন জন মান
সব হতে কাড়ি লইলে এ প্রাণ
অশ্রু-সলিলে ধুলে দুনয়ান
আপন যে মোরে করিবে।
তাই ভাল মোর তাই ভাল
নয়নের জল এই ভাল
তব সনে যদি দরশন মিলে
বিষজ্বালা আরো আরো ঢালো
দাও দাও মোরে বেদনার দান
বেদনার রঙে রাঙা হোক প্রাণ
বক্ষ-শোণিতে বাহিরাক গান
সে হার কণ্ঠে পরিবে॥

নি, চ, ব,

গৌড় সারং—তেতালা।

নির্ম্মল মুখ তব দেখাও আজ
সব ভয় দূর হয়
দেখি' ওমুখ হে।
এস হে এস নাথ
ডাকি যোড়করে
তোমারি শরণ পেলে
ভুলি সব দুখ হে॥

ক্ষি, না, ঠা,

উপদেশ।*

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আজকে সামনে যা কিছু আছে তার কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আজকার দিনে আমাদের কর্ম্ম ঠিক যে এখানে—এ কথা মনে করলে ভুল মনে করা হবে। বহু বহু যুগ বিস্তৃত আমাদের প্রাঙ্গণ—বহু দিনের বহু তপস্বী, বহু দিনের বহু সাধক নিত্য কালের প্রাঙ্গণে যে নিত্য উৎসব সমাধা করেছেন, সেই উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করতে হবে। কালে কালে যুগে যুগে যে আহ্বান সমস্ত মানবচিত্তে এই উৎসবের নিমন্ত্রণ-বাণী প্রচার করেছে, সেই উৎসব-ক্ষেত্রে আজকে

* গত ১১ই মাঘ, বুধবার সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

নিজেকে ধ্যানের দ্বারা উপস্থিত করতে হবে। তবে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের সমস্ত আয়োজনের সার্থকতা। আজ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করতে হবে—কি আনন্দের মন্ত্র উঠছে, কি আনন্দের সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হচ্ছে—নিত্য কালের চিত্তের মধ্যে। সমস্ত উৎসব চলছে সেই নিত্যকালের উৎসবের প্রাঙ্গণ লক্ষ্য করে অনাদি কাল থেকে।

যে আলোক প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্য আমাদের দ্বারে উপস্থিত করছে, তার অনুরূপ আলোক আমাদের প্রাঙ্গণে যখন জ্বলে উঠবে, তখন মিলন হবে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের। সেই সম্পূর্ণ মিলনের জন্য যত কিছু তপস্যা, যত কিছু সাধনা, যত কিছু বেদনা, যত কিছু অশান্তি, যত কিছু বিরোধ, যত কিছু দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, রক্তপাত—সমস্তের মধ্য দিয়ে, দুর্গম কণ্টকময় পথের ভিতর দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। আমরা যে চরম কথা বলতে পারলাম না, যার উপযুক্ত বাণী নাই—ঋষিরা বলেছেন—যেখান থেকে বাণী ফিরে আসে, বাণী যেখানে পৌঁছায় না, সেই নিয়ে আমাদের আনন্দ। সকল দিকে সংসারে তার পরিচয় পাচ্ছি। যদি এমন হত, কখনও তার কোন আভাস না পেতাম, তাহলে একথাগুলি প্রলাপের মত হত; সংসার-পথে চলতে চলতে প্রতিদিন এই অনির্ব্বচনীয়ের স্পর্শ পদে পদে, বারে বারে পেয়েছি বলে মানুষ এত সাহস করে বলেছে—তার কাছ থেকে বাক্য-মন ফিরে আসে। তাকে আনন্দের মধ্যে যিনি পেয়েছেন, তার ভয় নাই, ভয় নাই!

আমরা কত বস্তু দেখছি—চোখে দেখছি, কাণে শুনছি, স্পর্শ দ্বারা জানছি; কিন্তু ফুল ফুল, একে কেমন করে জানব? এর ভিতর যে অনির্ব্বচনীয় কিছু আছে তাহা অমন করে বলতে পারি না। অতখানি আছে, ততখানি নাই, বলে লাভ নাই। ফুলের অতখানি দল, অতখানি গন্ধ, অতখানি তার বর্ণ কিছুই বলা হয় না। সমস্তকে অতিক্রম করে ফুলের আরো কি আছে। একটা শব্দ শুনলাম, এটাকে বোঝা শক্ত নয়, একটা কিছু ঘটেছে। যে জন্য শব্দ হল—তার সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে পারি। আমার জানার মধ্যে সে কিন্তু সীমাবদ্ধ হয়। যখন সঙ্গীত শুনি তখন সে কথা বলব না। শব্দের পর শব্দ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা নয়। সমস্ত শব্দের সমবায়ের চেয়ে বেশী—এই সঙ্গীত—অনেক বেশী—অসীম। শুধু বস্তুজগৎ নয়—সকল বস্তুর অতীত অনন্তকে যখন দেখলাম, গানের মধ্যে সকল ধারণার অতীত কিছু যখন শুনতে পেলাম, তখন সেখানে এমন কিছু পেলাম, যা শব্দ গন্ধ দ্বারা পরিমাণ করে কোন মতে বিশ্লেষণ করে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি না।

একটা পরিপূর্ণতার স্বাদ সংসারে দিনে দিনে পদে পদে পাচ্ছি। প্রতিদিন আকাশে সূর্য্যরশ্মির মধ্যে, নক্ষত্র-মণ্ডলীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, প্রিয়জনের মুখে, শিশুর হাসিতে, পথে চলতে চলতে, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই অনির্ব্বচনীয়কে স্পর্শ করতে করতে চলেছি। সে কে, সে কি, কোথা থেকে এল, তার আশ্রয় কোথায়, এ কথা না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না মানুষ। যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করেছে তখন সাধক বলেছেন—ফুলের মধ্যে যে আনন্দকে দেখছ, আমার আত্মার মধ্যে সে আনন্দই ঐ সুন্দরকে দেখেছে, প্রিয়-জনের মুখের মধ্যে সে আনন্দে তিনি বিরাজিত। গন্ধে বর্ণে গানে প্রেমে প্রাণে নানাভাবে যিনি দেখা দিচ্ছেন, ধরা দিচ্ছেন না, সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ অথচ সকলের চেয়ে যাকে ধরতে পারি না, যাকে সর্ব্বদা দেখছি, নানা মানুষের মধ্যে, ইতিহাসের পর্ব্বে পর্ব্বে যাঁকে দেখতে পাচ্ছি তাঁর আনন্দ, তাঁর রূপ, তাঁর সৌন্দর্য্য, তাঁর আবির্ভাব, এবং তাঁর সত্তা তাঁর নিভৃত নিকেতন পরিপূর্ণ করে রয়েছে। যাঁর অধিষ্ঠানে সমস্ত পরিপূর্ণ, সেই অনির্ব্বচনীয়ের আবির্ভাবকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেছেন—এই যে দীপ জ্বলছে—এই রকম করে সর্ব্বত্র তাঁর প্রকাশ রয়েছে। যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং তাঁর সাম্য-মন্ত্র সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই তরঙ্গ যাদের চিত্তের মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তারা বলেছে ছন্দের সঙ্গে অন্তরের ধ্বনি সম্মিলিত হউক, পরিপূর্ণ হউক; তবে উৎসব। সে উৎসব কালে কালে হচ্ছে, কত জায়গায়, কত নিভৃতে, কত অরণ্যে, কত গুহায়, কত প্রান্তরে, কত লোকালয়ে, কত নির্জ্জন ঘরের মধ্যে—কত সাধকের অন্তঃকরণকে সে সরস ক'রে, বিকশিত ক'রে তুলেছে। সমস্ত বিশ্বের দিকে তাকাও—মানুষের অন্তরের ভিতর যেখানে যেখানে আলো জ্বলেছে—কত জায়গায় কত নিরক্ষর দীন-দরিদ্র অজ্ঞাতজন—ইতিহাসে যার নাম নেই, যে চিরদিন অখ্যাত থাকবে, তাদের হৃদয়ের উৎসব নীরবতার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকে।

কত জায়গায় এমন কত সাধক কত তপস্বী রয়েছেন, তাদের সকলের তপস্যা, সকলের প্রার্থনা, সকলের গান, সকলের জাগরণকে অন্তরের ভিতর যেন আজ অনুভব করি। এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মধ্যে তাঁদের সকলের আবির্ভাব হউক। সমস্ত মানবের জাগরিত চিত্তকে আজ আহ্বান করি, সমস্ত মানবের জাগরিত চিত্ত যদি আজ এখানে আসন গ্রহণ করেন তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন, থাকবেন, সে আনন্দের পরিপূর্ণতার অন্ত থাকবে না। আমরা যে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে পাচ্ছি, মানুষ তার মালা গাঁথতে চেষ্টা করছে। মানুষ প্রিয়জনের মুখে আনন্দ

দেখছে, সঙ্গীতে যে আনন্দ পাচ্ছে, কাব্যের মধ্যে যে রস পাচ্ছে তার মালা গাঁথছে কেন? তাঁর গলায় দিতে হবে। একদিন চরণ-পূজা সমাধা হবে। সমস্ত যেন তাঁর চরণে দিতে পারে, সেজন্য মানুষ দুর্গম পথে যাত্রা করেছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার পা, দীর্ঘ রাত্রি শুকতার ভিতর দিয়ে চলে এসেছে, নিরাশা আসেনি। ক্ষণে ক্ষণে গভীর বেদনা এসেছে, ভূমিকম্প হয়েছে, মানুষের লোকালয়ে বিদ্বেষ-বিরোধ জেগে উঠেছে, তবু নিরাশা আসেনি, তবু পূজা বন্ধ হয়নি, তবু অর্ঘ্য এনেছে, ধূপ-দীপ জ্বেলেছে। মন্দিরে মন্দিরে গৃহে গৃহে কত প্রার্থনা উঠেছে। কত নামে কত ভাষায় মানুষ তাঁকে ডেকেছে। সে উৎসব শুধু এখানে নয়, সব জায়গায়— নিত্য প্রাঙ্গণে, মানুষের হৃদয়প্রাঙ্গণে, চিত্তপ্রাঙ্গণে চলেছে। গভীর রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন দেখি ভক্তের দরজা রুদ্ধ হয়নি। এই মুহূর্তে তাঁদের তপস্যার হোমানল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছে নিবেদন করছে, বলছে—যে মুহূর্তে নিদ্রা থেকে জেগে উঠবে, দেখবে মানুষের অন্তরের আসন খোলা আছে, আমার হয়ে তারা প্রণাম করছে। আমি যে প্রণাম ভুলেছি, সে প্রণাম সমস্ত মানুষের হয়ে তারা দিচ্ছে। অনেকে আছেন, তাঁহাদের নাম জানি না, তাঁদের বিরোধিতা করেছি, বিদ্রূপ করেছি, অশ্রদ্ধা করেছি, অবহেলা করেছি, তাঁরা আমাদের হয়ে পূজা করেছেন, চিরদিন তাঁরা মানুষের উপাসনার আসন প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মানুষের ইতিহাস বলছে, অনেকের ভিতর এককে দেখতে হবে; তাহলে এমনি করে শতদল পদ্মকে দেখতে পাবে, আমাদের ইতিহাসের ভিতর তাকে বিকশিত দেখতে পাবে। অনেকের ভিতর এককে দেখবার জন্য আমাদের ডাক পড়েছে। মধ্যযুগে তারা বিরোধকে মানে নি। হিন্দু-মুসলমানের কঠিন বিরোধকে মানে নি। সেই বিরোধের মধ্যে, দ্বন্দ্বের মধ্যে, দ্বন্দ্বের অতীত একককে দেখেছে। এখানে ভারতবর্ষের পূজা, ভারতবর্ষের ধ্যান সফল হয়েছে। ভারতবর্ষের সাধকেরা সমস্ত বিরোধের মধ্যে অদ্বিতীয়কে দেখেছে, অশুভের মধ্যে শুভকে দ্বন্দ্বের মধ্যে শান্তিকে, বৈচিত্র্যের মধ্যে অনির্বচনীয়কে দেখেছে। তারা নিরক্ষর, সংস্কৃত ভাষা পড়েনি, শাস্ত্র জানে না; পূজা-পদ্ধতি, আচরণ-আমন্ত্রণ তারা জানে না। যেমন করে তারার মধ্যে, ফুলের মধ্যে অনির্বচনীয় মাধুর্য্যের রসে তিনি দেখা দিয়েছেন, তেমনি করে অনেকের মধ্যে এক হয়েও তাঁদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছেন। অনেকের মধ্যে এককে দেখবার সাধনা মানুষের ইতিহাসে বহুকাল থেকে চলে আসছে। পদে পদে অনেক বিরুদ্ধ ভাবের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে, তুফান উঠেছে। তুফান যখন ওঠে, তখন আমরা একককে হারিয়ে ফেলি। সেই তুফানের ভিতর দিয়ে কর্ণধার বলেন, মাভৈঃ—ভয় নাই।

আমাদের মধ্যে উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়নি স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে বলব না ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের গভীরতম নিভৃত উৎসব-গৃহে মিলনমন্ত্রের যে গান উঠেছে, স্তব্ধ হয়ে বসলে হৃদয়ের মাঝে তার ঝঙ্কার শোনা যায়। বহু তীর্থের ধারা এক উৎসে মিলিত হয়ে পবিত্র হয়েছে। সেই পুণ্য উৎসে ভারতবর্ষের স্নান। আমাদের যতই দুর্ভাগ্য অভাব ত্রুটী থাকুক না কেন—আমরা একা নই, আজকের দিনে এই মুহূর্তে সকল মানবের বাণী উঠছে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে—এ কথাটী আজ হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।*

সায়ংকাল।

১

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তর-মন্দির-প্রাঙ্গণে
ঐ তব এল আহ্বান॥
চেয়ে দেখ মঙ্গল রাতি
জ্বালি দিল উৎসব বাতি,
স্তব্ধ এ সংসার প্রান্তে
ধরো তব বন্দন গান॥
কর্ম্মের কলরব ক্লান্ত,
করো তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে,
নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ,
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ॥

২

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে,
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে॥
বসন্ত সমীরে, তোমার
ফুল-ফুটানো বাণী
দিক্ পরাণে আনি,
ডাকো তোমার নিখিল উৎসবে॥
মিলন শতদলে
তোমার প্রেমের অরূপ মূর্ত্তি দেখাও ভুবন তলে।

---

* সায়ংকালের সঙ্গীতগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত।

সবার সাথে মিলাও আমায়
ভুলাও অহঙ্কার,
খুলাও রুদ্ধ দ্বার,
পূর্ণ করো প্রণতি-গৌরবে ॥

৩

নীরবে আছ কেন
বাহির দুয়ারে।
আঁধার লাগে চোখে
দেখিনা তুহারে ॥
সময় হেলো জানি
নিকটে ল'বে টানি,
আমার তরীখানি
ভাসাবে জুয়ারে ॥
সফল হোক্ প্রাণ
এ শুভ লগনে,
সকল তারা তাই
গাহুক্ গগনে।
করগো সচকিত
আলোকে পুলকিত
স্বপন-নিমীলিত
হৃদয় গুহারে ॥

৪

তোমার আমার এই
বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি
সুরে সুরে তালে তালে ॥
এখনো পরাণ মাঝে
গোপনে বেদনা বাজে,
এবার সেবার কাজে
ডেকে লও সন্ধ্যাকালে ॥
বিশ্ব হতে থাকি দূরে
অন্তরের অন্তঃপুরে,
চেতনা জড়ায়ে থাকে,
ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ-সুখ আপনারি,
সে বোঝা হয়েছে ভারি,
যেন সে সঁপিতে পারি
চরম পূজার থালে ॥

৫

আঁধারি এল ব'লে
তাই ত ঘরে উঠ্‌ল আলো জ্ব'লে ॥
ভুলেছিলেম দিনে,
রাতে নিলেম চিনে,
জেনেছি কার লীলা আমার
বক্ষদোলায় দোলে ॥
ঘুমহারা মোর বনে
বিহঙ্গগান জাগ্‌ল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ
হয়েছে নিস্তব্ধ
বসন্তবায় মোরে জাগায়
পল্লব কল্লোলে ॥

৬

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি
বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবন-গানে ॥
গগনে তব বিমল নীল,
হৃদয়ে ল'ব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে ॥
বাজায় উষা নিশীথ-কূলে যে গীত-ভাষা,
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মত সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে ॥

৭

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে ॥
দুঃখে শোকে নিন্দা পরিবাদে,
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে ॥
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে,
বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে।
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে,
জীবন তার বাধায় না ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার পরপারে ॥

৮

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে'
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে ॥
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানিনা কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে ॥

৯

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥
কি অচেনা কুসুমের গন্ধে
কি গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥
সহসা দারুণ দুখ তাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন,
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥

১০

জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে।
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে॥
সেথায় প্রেমের চরম সাধন,
যায় খসে তার সকল বাঁধন,
আমার হৃদয়-পাখীর গগন তোমার হৃদয়-দেশে॥
ওগো জানি আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তি মাঝে ক্লান্তি হারা।
আমার দেহে ধরার পরশ,
তোমার সুধায় হলো সরস,
আমার ধূলারি ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে॥

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

১

গৌড়সারঙ্গ—তেতালা।

নির্ম্মল মুখ তব দেখাও আজ
সব ভয় দূর হয় দেখি ও মুখ হে।
এসো হে এসো নাথ ডাকি জোড় করে
তোমারি শরণ পেলে ভুলি সব দুখ হে॥

গান – শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

০ ১ ২´ ৩
II পা -া মা গা। রগা রা সা ন্া I সা গা -া রা। মা -া গা -া।
নি ০ র্ম্ম ল মু খ ত ব দে খা ০ ও আ ০ জ ০

০ ১ ২´ ৩
। গা ক্মা পা পা। ক্মা পা পা পা I পা ধনা র্সা না। ধা পা মগা রগা II
স ব ভ য় দূ র হ য় দে খি০ ০ ও মু খ হে০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I পা -া নধা না। র্সা র্সা র্সা -া I র্সা র্সা র্সা না। ধা না ধপামপা -া I
এ ০ সো০ হে এ সো না থ্ ডা কি জো ড় ক ০ রে০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I পা নধা র্সনা র্রা। র্সা নর্সা ধা পা I ক্মা পা ধা না। ক্মা পা মগা রগা IIII
তো মা০ রি ০ শ র ণ০ পে লে ভু লি স ব দু খ হে০ ০ ০

২

সিন্ধু খাম্বাজ—তেওরা।

নিভৃত অন্তরে আছে দেবালয়
সেথা ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়
সেথা যে দেবতা জাগেন একা
তাঁরি পায়—নমি আয়—নমি আয়।
সুখের লাগিয়ে মরিস্ রে ঘুরে
সুখ আশে বৃথা যাস্ দূরে দূরে
ব্যথা পেয়ে শেষে আঁখি দুটি ঝুরে
ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়।

অন্তর-ডালি সাজা প্রীতি-ফুলে
হৃদয়-দুয়ার দেরে তুই খুলে
মরমেরি পুরে চা'রে আঁখি তুলে
তুচ্ছ সুখ-দুখ সকলি ভুলে।
গভীর শান্তি নামিবে প্রাণে
ভরিবে হৃদয় কুসুমে গানে
বাজিবে বীণা মধুর তানে
ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II র্সা র্সা র্সা। র্সণধা -ণা। ধা পা I মা মা পা। মজ্ঞা -া। রা -া I
নি ভৃ ত অ•• ন্ ত রে আ ছে দে বা • • ল য়

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা ধ্। ণ্ঃ -রঃ। র্রা -া I রসা -রা মজ্ঞা। -া -াস। সা সা I
সে থা ফি রে • আ য় ফি• রে আ• য় • ফি রে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -পা -া। -া -া। -া -া I না না না। না না। র্সনা -ধপা I
আ • • • • য় • সে থা, যে দে ব তা • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা ধনা -র্সর্রা। নধাঃ -র্সঃ। র্সা -া I সা সা রা। -া -া। সা রা I
জা গে• •ন্ এ • কা • তাঁ রি পা • য় ন মি

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা -জ্ঞা -া। -া -াস। সা সা I সা -পা -া। -া -া। -া -া II
আ • • • য় ন মি আ • • • • য় •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{না না না। না না। র্সনা -ধপা I পা ধনা -র্সর্রা। নধাঃ -র্সঃ। র্সা র্সা I
সু খে র লা গি য়ে • • • ম রি• •স্ রে • ঘু রে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধা র্সা র্সা। র্সণা -া। ধা ণা I পধা -ণর্সা র্সণা। পধা -ণা। ধা পা} I
সু খ আ শে • বৃ থা যা• •স্ দূ রে • দূ রে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা ধা ণা। পা -ধা। ধা ধা I ণা র্সা র্সা। র্সণধা -ণা। ধা পা I
ব্য থা পে য়ে • শে ষে আঁ খি দু টি• • • ঝু রে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা রা। -া -া। সা রা I মা -জ্ঞা -া। -া -াস। সা সা I
ফি রে আ • য় ফি রে আ • • • য় ফি রে

১´ ২ ৩
I সা -পা -া। -া -া। -া -া II
আ • • • • য় •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II[সা -া সা | রসা -ণ্ধা | ধা ধা I র্গা র্রা সা | র্রা -া | সা র্রা I
অ • ন্ধ র• •• তা লি সা জা ই তি • ফু লে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্রা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা -া | জ্ঞা -া I রজ্ঞা -মা মজ্ঞা | মজ্ঞা -া | র্রা সা I
ব দ র হু • মা র দে• • রে• তু ই খু লে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা পা পা | ণা র্সা | মা মা I পা -ধণা ধা | ণা -া | ধা পা I
ম র মে রি • পু রে চা রে• আঁ খি • ফু লে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধণা -র্সা র্সা | ণা ধা | পা -া I মা জ্ঞা রা | সরা -মজ্ঞা | রা -া II
ফু• • ল্ল মু খ দু খ্ স ক লি ভু• •• লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{ণনা না না | না -া | র্সনা -ধপা I র্সা র্সা র্রা | না -র্স | র্সা -া I
গ ভী র শা • ন্তি• •• না মি বে প্রা • ণে •

১´ ২´ ৩ ১´ ২ ৩
I পর্সা পর্সা ণা | ধা -া | পধা পমা I ধা র্সা ণা | পধা -পধা | পা -া}I
ভ রি বে হৃ • দ• •য় কু সু মে গা• •• নে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা ধা ণা | পাঃ -ধঃ | ধা -া I ণা র্সা ণা | পধা -পধা | পা -া I
বা জি বে বী • ণা • ম ধু র তা• •• নে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা রা | -া -া | সা রা I মা -জ্ঞা -া | -া -াস | সা সা I
ফি রে আ • য় ফি রে আ • • • য় ফি রে

১´ ২ ৩
I সা -পা -া | -া -া | -া -া IIII
আ • • • য় • •

মহাপুরুষ শঙ্করদেব।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

২

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ দুয়রা)

শঙ্কর দেবের ধর্ম্মের বিষয় অধিক না বলিয়া ইহাই বলিলে হইবে যে, তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মে ভক্তিমার্গের প্রাধান্য অধিক ; কারণ, এই ধর্ম্ম সকলের জন্য ; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ইহা একচেটে সম্পত্তি এবং সংসারী হইয়াও এই ধর্ম্ম আচরণ করা যায়। জ্ঞানমার্গ সকলের পক্ষে সুগম নহে, এবং বিশেষতঃ সেই মার্গের নীরস "নেতি নেতি" কয়জনই বা বুঝিতে পারে ? শঙ্করদেব নিজেকে ঈশ্বরের দাস বলিতেন। কাজে কাজেই ভৃত্যে পক্ষে নিজ প্রভুর প্রতি ভক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ইহা সরল আড়ম্বরশূন্য ও উদার, ইহাতে দাম্ভিকতা অথবা অহঙ্কার নাই।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"॥

আপনাকে তৃণ অপেক্ষা নীচ মনে করিবে, তরুর
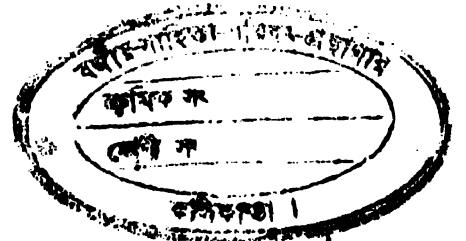
মত সহিষ্ণু হইয়া, সম্মান না খুঁজিয়া অপরকে সম্মান করিয়া হরিনাম কীর্তন করিতে হয়; এই ভক্তি, মাত্র ভক্তির জন্যই, মুক্তির জন্য ভক্তিকেও এখানে সকাম ভক্তি বলিয়া ধরা হয়।

"মুক্তিত নিস্পৃহ যিটো, সেহি ভকতক নমো
রসময়ী মাগোহোঁ ভকতি।"

ভক্তকে এইরূপ হইতে হইবে যে তাহার মুক্তিতেও স্পৃহা থাকিবে না, অর্থাৎ সে সংসারে ভক্তির ব্যবসা করিতে চায় না। 'আমি নিজে অমৃত না হইয়া সর্ব্বদাই অমৃতের আস্বাদন করিব।' এই ভাবই ভক্তদের স্বভাব। মিঠাই সকলেই খাইতে ভালবাসে, কিন্তু কেহই মিঠাই হইতে চাহে না। এই জন্য প্রকৃত ভক্তবৃন্দ জ্ঞানমার্গের "সোঽহং"-ভাব ভালবাসেন না, তাঁহারা জ্ঞানকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করেন। ভক্তিরত্নাবলীতে আছে—

ভকতির মহিমা দেখিও অদ্ভুত।
ভৈল কৃতকৃত্য যিটো জীয়ন্তে মুকুত॥
তথাপিতো প্রার্থনা করয় ভকতিক।
জানিয়া আনন্দ অতি মোক্ষতো অধিক॥

স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিমার্গের বিষয়ে বলিতেছেন—

"He (the Bhakta) soon through the mercy of the Lord, reaches a plane where pedantic and powerless reason is left far behind, and the mere intellectual groping through the dark gives place to the daylight of direct perception. He no more reasons and believes, he almost perceives. He no more argues, he sees. And is not this seeing God, feeling God, and enjoying God, higher than everything else? Nag Bhaktas have not been wanting who have maintained that it is higher then even Maksha—liberation." ইহা শঙ্কর দেবেরও মত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শঙ্করদেবের ধর্ম্ম ছোট বড় সকলের জন্য, সেই জন্যই ইহাতে ভক্তিই প্রধান বস্তু। শঙ্করদেবের 'নামঘরে' বেড়া দেওয়া ছিল না, একটা উন্মুক্ত প্রান্তরের মত। সকলেই সেখানে 'নাম' লইতে পারিত। সমাজের নিম্নশ্রেণী—যাহাদিগকে আজও সকলে ঘৃণা করে তাহারাও শঙ্করের 'নামঘরে' আশ্রয় পাইয়াছিল,—তাহারাও বুঝিয়াছিল যে ভগবানের এই সুন্দর হর্ম্ম্যে তাহাদেরও একখণ্ড ন্যায্য স্থান আছে, তাহারা একেবারে ঘৃণ্য হেয় পদার্থ নহে, ঈশ্বরের নিকট তাহাদেরও অধিকার আছে। ইহাদের জন্য শঙ্করের প্রাণ কাঁদিয়াছিল এবং তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ধর্ম্মের জোরেই ইহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারা যাইবে, সেই মতই তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কিসের অভাব ছিল? তিনি ভূঞার সন্তান, ধন-সম্পত্তি সকলই ছিল, তাঁহার সুখে কাল কাটিত, তবে কেন তিনি বিষয়-বাসনা মান-সম্ভ্রম সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শত অত্যাচার ভোগ করিয়াও এই পথের পথিক হইয়াছিলেন? কারণ তাঁহার হৃদয়ে মানবপ্রীতি মানবসেবা প্রবল ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সমাজের উন্নতি করিতে হইলে ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া উপরে নজর দিলে চলিবে না। উপর ও নীচে দুই দিক সমান করিতে হইবে, নতুবা সমাজের ঊর্দ্ধাংশ ভারি হইয়া অর্থাৎ Top-heavy হইয়া সমাজ উল্টাইয়া যাইবে। সেই জন্যই শঙ্করদেব ধর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে সকলকেই বন্ধন করিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল মহাপুরুষই মর্ম্মে মর্ম্মে সমাজের জন্য অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ ইঁহারাই ঈশ্বরপ্রেরিত মানবসমাজের মানসসন্তান। "To whom belong the men of genius, if not to thee O people? They do belong to thee, they are thy sons and thy fathers thou givest birth to them, and they search thee. They open in thy chaos vistas of light. As children have drunk it thy breasts. They have missed in the universal matric of humanity. Each of thy phases, O people is an avatar." ইঁহারাই সমাজের মুক্ত পুরুষ। সাংসারিক বন্ধনের অতীত। ইঁহারা জলে মাখন থাকার মত সংসারে বাস করেন মাত্র, ইঁহাদের ভেদাভেদ নাই, নিজত্ব নাই, অহং-ভাব লোপ পাইয়াছে, ইহাঁরাই জগতে এক সময়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

ইহাঁরাই সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে চিনিয়াছিলেন।

মহাপুরুষগণের হৃদয় উদার, তাহাতে সংকীর্ণতার লেশ মাত্র নাই। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়দ্বার সর্ব্বদাই সকলের জন্যই উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। Come into me, oh ye sufferers, I shall give the rest, ক্রাইষ্টের এই বাণী যখন প্রতীচ্য জগতে ঘোষিত হইয়াছিল, তখন দলে দলে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বন্দীগণ সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই শান্তিলাভ করিয়াছিল।

আপন আপন উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণের উপর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। শঙ্করদেব রাজগুরু হওয়ার সম্মানও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ উন্নতির সহিত ইতর জাতিকেও উন্নত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে সমাজের সাধারণ ইতর লোকদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়; তাহারা সমাজে নিপীড়িত জাতি, সেই জন্য Emerson বলিয়াছিলেন—

"Why are the masses from the dawn of the History down trodden by the kings and the power?" অথচ তাহাদের উপরেই সমাজ নির্ভর করিতেছে। দেশে যুদ্ধ হইতেছে তাহারা যুদ্ধ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছে। তাহারাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ধনীদিগের আহার জোগাইতেছে; আর ধনীগণ কি করিতেছেন? ধনীগণ তাহাদের উপর রাজা হইয়া তাহাদের বলেই বলীয়ান হইয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা কয়জন করিয়াছেন? মুখ খুলিয়া তাহারা কথা বলিতে পারে না। শত সহস্র বৎসর সমাজের অত্যাচারের বোঝা তাহারা নীরবে বহন করিতেছে—তাহাদের আশাও নাই আর ভরসাও নাই "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে;" সেই জন্যই Victor Hugo দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "At the hour of civilisation through which we are now passing and which is still so sombre, the miserable's name is man; he is agonising in all climes and he is groaning in all languages." কিন্তু আমরা ইহা একবারও ভাবিয়া দেখি নাই যে আজ যাহাদিগকে আমরা নীচে ফেলিয়া দিয়াছি, এক সময়ে যে আমাদিগকেও তাহাদের সমান হইতে হইবে এবং তাহারাও আমাদের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া আমাদিগকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিবে। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে, তবু কোলে দাও নাই স্থান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

* * * * * *

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

আমাদের শঙ্কর দেবও এই কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ধর্ম্মনীতি ও সদাচার শিক্ষার একটি মহান্ আদর্শে তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আজ কোথায় সেই শঙ্কর দেবের সমাজ? কোথায় সেই আদর্শ? সেই পথ হইতে আমরা এখন কত দূরে আসিয়াছি, আমরা নিজের সুখ-দুঃখেই বিভোর।

আমাদের ভ্রাতাদের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে সময় নাই। যদি আমারা দেশের উন্নতি বিধান করিতে চাই তবে এস, নিজ নিজ স্বার্থ বলি দিয়া মহাপুরুষ শঙ্কর দেব যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া সকলকে প্রেমসূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করি। আর সময় নাই। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। আজ জগতের সকল জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এস আমরাও ভাই-বন্ধু সকলকে লইয়া তাহাদের অনুসরণ করি, তাহাদের ওজর আপত্তি সকলই শুনিয়া তাহাদের মঙ্গল কামনা করি—তাহাদিগের কার্য্যে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া উচ্চ আদর্শে তাহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করি। "The mob is the human race in misery. Sacrifice to it thy gold and thy blood which is more than thy gold and thy thought, which is more than thy blood and thy love, which is more than thy thought, Sacrifice to it everything except justice."

"মানবী জীবন, দিয়া উটুবাই,
মানবী করম সোঁতে,
মানুহর মরম, বুজিরা মানুহে,
ধরম যে মরমতে।
মানুহেই লগ, মানুহেই সঙ্গ,
মানুহেই পরাৎপর,
এই যে পৃথিবী, স্বর্গতো অধিক,
মানুহর নিজাপী ঘর।
মানুহেই দেব মানুহেই সেব
মানুহর বিনে নাই কেব,
করা পূজা অর্ঘ, পাদোদকলে—,
জয় জয় মানব দেব।"

শঙ্কর দেবের মানবসেবার এই মহান্ আদর্শ আমা-

দিগের সকলের হৃদয়ে জাগরূক থাকুক, ভয় নাই—জাতীয় যুদ্ধে আমাদিগের জয়লাভ হইবে।

উপসংহারে এই বলিতে চাই যে আসাম শঙ্করদেবের নিকট সকল বিষয়ে ঋণী। আসামের ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, সদাচার—এই সমস্ত কাহার? শঙ্করদেবের 'কীর্ত্তন ঘোষার' মত সাহিত্যকাননে কয়টি ফুল আছে? যে দিকেই চাও সে দিকেই শঙ্করদেবের জয়-জয়কার। আসামের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রতিদিন শঙ্করদেবের গুণ কীর্ত্তন হইতেছে। গ্রাম ছাড়িয়া জঙ্গলে যাও, সেখানেও দূরবর্ত্তী মহিষপালকের মুখনিঃসৃত শঙ্করের সুর শুনিতে পাইবে। আসামের সমস্ত জীবন শঙ্করময়। প্রকৃতির বুকে কান পাতিয়া শুন—সেখানেও তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিতেছে। তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদিগের মন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে। আমাদিগের মন উচ্চ করিতে হইলে মনের সংকীর্ণতা দূর করিতে হইলে এবং আমাদের পরবর্ত্তী ভ্রাতৃবর্গকে আরও উদার ও মহান্ এবং দেশকে আরও উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে এই মহাপুরুষের প্রতি ভক্তি ও পূজা করা এবং তাঁহার মহতী কার্য্যাবলী সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আজ আসাম-ভূমি পার্থিব ধনে পার্থিব হিসাবে দরিদ্র বটে, কিন্তু এই মহাপুরুষ যে—অপার্থিব ধন,—উচ্চ সাহিত্য, সদাচার সন্নীতির প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন অসমীয়া জাতি তাহা জীবনেও শোধ দিতে পারিবে না।

ভক্তিরে ও পচে হিয়া, ধীর যোগীবর,
অসীম সাধনা তব পরিলে মনত,
নিমাত নীরহে চাও একেঠিরে,
তোমারে তুলনা দেব তুমি জগতত,

সত্যই শঙ্করদেবের তুলনা শঙ্করদেবেই, ধন্য তুমি আসাম! তোমার গর্ভে এইরূপ একজন মহাপুরুষের জন্ম হইল, ধন্য তুমি অসমীয়া জাতি! এইরূপ একজন মহাপুরুষের সহায় পাইয়াছ, এইরূপ একজন মহাপুরুষের দ্বারা গঠিত হইয়াছ এবং যাহার জন্য আজ তুমি জগতে অসমীয়া বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছ। আজ এইরূপ একজন মহাপুরুষের স্মৃতিতে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শত শত প্রণাম করি।

"নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।" *

—

* অসমীয়া ভাষায় "বাঁহী"-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং তাহা হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত।

আদিব্রাহ্মসমাজ-অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

১৫ই মাঘ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ—৯৮ ব্রাহ্মসম্বৎ, রবিবার।

গত ১৩ই মাঘের আহ্বানপত্র অনুসারে শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে (২ নং চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর) ১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারি) প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

(১) শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক; (২) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক; (৩) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (৪) ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস, সি; (৫) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ; (৬) শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি; (৭) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (৮) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত; (৯) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল।

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। গত ১৬ পৌষের অধ্যক্ষসভার বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অবৈতনিক হিসাবপরীক্ষক করা আলোচিত হইল।

ইনি আসামবেঙ্গল রেলওয়ের অডিটরের কাজ করিতেন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

স্থির হইল, যোগেন্দ্র বাবুকে আপাতত এক বৎসরের জন্য অবৈতনিক হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত করা হোক। তিনি এই কার্য্য করিতে স্বীকার করিতেছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি মাসে অনধিক এক দিনের জন্য তাঁহার হুগলী হইতে সমাজে আসিবার পাথেয় দেওয়া নির্দ্ধারিত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, এই দুইজনকে অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত করা হইল।

৫। অধ্যক্ষদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপরিচালনার জন্য একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—নিম্নলিখিত অধ্যক্ষদিগকে লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হউক—(১) শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (২) শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক, (৩) শ্রীসিতিকণ্ঠ

মল্লিক, (৪) শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, (৫) শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, (৬) শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (কর্ম্মাধ্যক্ষ), (৭) শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, (৮) ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, (৯) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (১০) শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক) এবং (১১) শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহঃ সম্পাদক)।

৬। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ট্রষ্টীনিয়োগের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

বর্ত্তমানে ২ জন ট্রষ্টী আছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর উপর ট্রষ্টী হইবার উপযুক্ত তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধান করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, জষ্টিস শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি হাইকোর্টের জজ থাকিয়া কোন ধর্ম্মসমাজের কোন পদ বা কার্য্যভার গ্রহণে অসমর্থ বলিয়া ট্রষ্টী হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। সমাজের ট্রষ্টীপদের প্রকৃত মর্য্যাদা রাখিতে চাহিলে আদিব্রাহ্মসমাজের মতানুযায়ী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকেই ট্রষ্টী করা উচিত। বাহিরে এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী বলিলেন যে, তাঁহার মতে (১) অল্পবয়স্ক ও শ্রমপটু যুবককে ট্রষ্টী করা উচিত, যিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজে প্রাণের সহিত উদ্যম সহকারে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারেন; (২) এমন লোককে ট্রষ্টী করা উচিত, যিনি আদিব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাহার অনুষ্ঠানাদির ভিতর দিয়া লালিত-পালিত এবং যিনি আদিব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন ও যত্নবান হইবেন; (৩) আদিব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ব্যতীত বাহির হইতে অনানুষ্ঠানিক কাহাকেও ট্রষ্টী নিয়োগ করা সঙ্গত নহে, বরং ঐরূপ নিয়োগে আদিব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। তাঁহার চক্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত এমন কোন লোক পড়িতেছেন না, যাঁহার সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত সকলেই দেখিতেছেন যে, ক্ষেমেন্দ্রবাবু সমাজের মঙ্গলের জন্য এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নতিকল্পে কিরূপ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন।

এই প্রকার কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্যতর ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার জন্য বর্ত্তমান ট্রষ্টীদিগকে অনুরোধ করা হোক। শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক উহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, বাহিরের লোককে ট্রষ্টী করা উচিত। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কেদারবাবুর সহিত একমত প্রকাশ করিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ধারা বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকিয়া ট্রষ্টীপদ গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন, বাহিরের এমন কোন উপযুক্ত লোকের নাম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইলে তাহাতে তাঁহারা অসমর্থ হইলেন। তখন ডাক্তার চৌধুরীর প্রস্তাব সম্বন্ধে পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করা হইল। কেদার বাবু ও হেমেন্দ্র বাবু ব্যতীত অপর সকলেই একবাক্যে ডাক্তার চৌধুরীর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

স্থির হইল শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ট্রষ্টী করিবার জন্য বর্ত্তমান ট্রষ্টীদিগকে অনুরোধ করা হোক।

পরিশেষে ডাক্তার চৌধুরী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক
সম্পাদক	সভাপতি
১৫ই মাঘ, ১৮৪৯ শক।	১৫ই মাঘ, ১৮৪৯ শক।

অষ্টনবতিতম ব্রহ্মোৎসব।

গত ৭ই পৌষ শুক্রবার প্রাতে মহর্ষিদেবের দীক্ষা-দিবস উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অনেকে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহদ্বারে, সেখান হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এবং শেষে মহর্ষিভবনের উপাসনামণ্ডপে আসিয়া যথারীতি প্রার্থনা ও উপাসনাদি করেন। অতঃপর তথায় কমলালেবু ও সন্দেশে জলযোগ করিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথের গৃহে পুনর্ব্বার সকলে সমবেত হন এবং তথায় পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও প্রীতিবিনিময় পূর্ব্বক সকলে বিদায় গ্রহণ করেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবুও সকলকে কমলালেবু ও সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা মিষ্টমুখ করাইয়া মহর্ষিদেবের ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর ৯ই পৌষ ও ১১ই পৌষ আদিব্রাহ্মসমাজের সহযোগিতায় উল্টাডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই দুই উৎসবের মধ্যে আমরা আসন্ন মহোৎসবে পরস্পর-সহযোগিতার নূতন ইঙ্গিত লাভ করিয়া সুখী হইলাম।

৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে ৮২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে' সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় একটী জনসভা আহূত হয়। ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রখ্যাতনামা বক্তা এখানে বক্তৃতা করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তথায় "মহর্ষিদেব ও সত্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী

নাতিদীর্ঘ সুন্দর প্রস্তাব পাঠ করেন এবং উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে উহা পুস্তিকাকারে বিতরিত হয়। তাঁহার এই সুন্দর প্রস্তাবটী তত্ত্ববোধিনীর গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের নিকট ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের আহ্বান আসিয়াছিল। এতদুপলক্ষ্যে গত ৮ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় তথায় ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে তিনি "সত্যধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা" বিষয়ে যে সময়োপযোগী উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তত্ত্ববোধিনীর গত মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী বাণী দেবী, আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

১০ই মাঘ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬॥ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল্। সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। যথারীতি সঙ্গীত হইয়া যাইবার পর আচার্য্য সতীশচন্দ্র সমবেত জনগণকে উদ্বোধিত করিলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন। সর্ব্বশেষে সতীশচন্দ্র তাঁহার শান্তস্নিগ্ধ স্বরে 'জাতীয় ভারতের জীবনগঠনে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্কেত' বিষয়ে একটী সুন্দর প্রস্তাব পাঠ করেন। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইল। আমরা তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ সুচিন্তিত সুন্দর রচনাটী ভারতের জনসাধারণকে পুনঃ পুনঃ পাঠ ও অনুধ্যান করিতে অনুরোধ করি। ভারতের একজাতীয়ত্ব-সমস্যার একটী সুন্দর সমাধান তাঁহারা ইহার মধ্যে পাইবেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উৎসব-আয়োজন আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরেই হইয়াছিল। পুষ্প-পত্রে ও ফুলমালায় মন্দিরটী উৎসবোচিত শোভন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। ১১ই মাঘের পুণ্যতম প্রভাত সানাইয়ের স্নিগ্ধ সুরে ও ধূপ-ধূনার পবিত্র গন্ধে হৃদয়ে হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের আবাহন আনিয়া দিল। বেলা ৮ ঘটিকার সময় সমবেত কণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—'যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু'। সঙ্গীতান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণ করিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বাণী দেবী দুইটী গান করিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ গম্ভীর কণ্ঠে তাঁহার উদ্বোধনী বাণী শুনাইলেন। শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার সুকণ্ঠে একটী গান করিবার পর স্বাধ্যায়ান্তে সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ এবং বাণী দেবী ভৈরবী রাগিণীতে দুইটী গান করিয়া প্রাণ ভক্তিসিক্ত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় ও সবল কণ্ঠে 'স্বাধীনতা ঘোষণা' বিষয়ে যে উপদেশ দান করিলেন, তাহা যেমন উৎসাহোদ্দীপক তেমনই পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে ব্যাকুলতার জ্বালাময়ী অগ্নিশিখায় দেদীপ্যমান। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে উহা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর যথারীতি চারিটী সঙ্গীত হইবার পর উপাসনাকার্য্য সমাপ্ত হইল। সর্ব্বশেষে রামপ্রসাদী সুরের 'পাল তুলে দাও ভাসাও তরী' গানটী সমবেত কণ্ঠে গীত হইয়া সকলের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছিল।

সায়ংকালের উৎসব যথারীতি মহর্ষিদেবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম-এ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় ভক্ত কবি রজ্জবজীর 'দোহা' অবলম্বনে তাঁহার উদ্বোধনী বাণী শুনাইয়াছিলেন। যথারীতি স্বাধ্যায়ান্তে রবীন্দ্রনাথ একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ দান করেন। আমরা তাহার সংগৃহীত সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

এবার সায়ংকালের সব কয়টী গানই রবীন্দ্রনাথের নূতন রচনা; শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক উহা গীত হইয়াছিল। আমরা সায়ং-প্রাতঃকালের নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি পাঠকগণের উপভোগার্থ স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ডাঃ শ্রীনবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের যত্নে ও চেষ্টায় "সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবের" আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের 'নিউপার্কে' সুপ্রশস্ত মণ্ডপ রচনা করিয়া গত ২১শে, ২২শে, ও ২৩শে মাঘ দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ২১শে মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বক্তাগণের বক্তৃতার আয়োজন এবং সন্ধ্যায় আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উপাসনায় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন, আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন, সুকণ্ঠ কবি শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ও উদীয়মান গায়ক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনের পর যথারীতি স্বাধ্যায়ান্তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় একটী নাতিদীর্ঘ উপদেশে মিলনের উপযোগিতা বুঝাইয়াছিলেন। ২২শে মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে প্রথমতঃ নির্ম্মলচন্দ্রের কয়েকটী বেদগানের পর একেশ্বরবাদী ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বকীয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। আবেস্তাপন্থী পারসীক, ত্রিপিটকপন্থী বৌদ্ধ, কোরাণপন্থী মুসলমান, বাইবেলপন্থী খৃষ্টান, নানকপন্থী শিখ ও বেদপন্থী আর্য্য প্রভৃতি ভারতের বহু-বিচিত্র বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন সাম্প্রদায়িক ভাব বিসর্জ্জন দিয়া একই মণ্ডপে বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসে তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। নবযুগের প্রারম্ভে যে মহাপুরুষের মানসলোক জ্যোতির্ম্ময় করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক সত্যরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজকার এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে সেই রাজা রামমোহন রায়ের ও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তীগণের প্রাণের ইচ্ছা যে সফল হইতে চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিপ্রহরে একটী সার্ব্বজনীন ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে পূর্ব্বদিনের মত বক্তৃতা ও সন্ধ্যায় নববিধানসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা হইয়াছিল। ২৩শে মাঘ সোমবারের অপরাহ্নে পুনর্ব্বার বক্তৃতা অন্তে 'শান্তিবাচন'-পূর্ব্বক এবারকার মত 'সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসব' সুসম্পন্ন হয়।

গ্রন্থপরিচয়।

জয়দেব—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে। মূল্য ১৲ টাকা প্রকাশকের নাম বা ঠিকানা দেখিতে পাইলাম না। গ্রন্থখানি ডবল ক্রাউন আকারে ১৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আমি গ্রন্থখানি সমস্ত পাঠ করিলাম। পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ তিনি আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটী ভাল সংস্করণ জীবনী ও সমালোচনা সহ প্রকাশ করিবার বহুকাল যাবৎ আমার ইচ্ছা ছিল, সময়াভাবে ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, ভগবান উহার ভার যোগ্যতর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমি ফেনাইয়া ফেনাইয়া গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না, গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার মনে যে বক্তব্যগুলি উদয় হইয়াছে, সেইগুলি আমি সরল ভাবে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

আজ পর্য্যন্ত জয়দেব সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, বোধহয় সে সমস্তই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও জয়দেবের জীবনী প্রভৃতি সম্বন্ধে সংগৃহীত উপকরণাদিতে গুরুভার। লেখক জয়দেবের জন্মভূমি সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন তাহা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে আমাদের ন্যায় সকলেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, কেন্দুবিল্ব গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি। গ্রন্থকার গীতগোবিন্দের উদারদৃষ্টিতে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। উহাতে অশ্লীলতা আসিবার তিনি যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহার সহিত সর্ব্বাংশে একমত হইতে না পারিলেও, তাহা অনেকাংশে যথার্থ মনে করি। সর্ব্বাপেক্ষা এই একটী নূতন কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, জয়দেব একজন ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের যুক্তিগুলি পড়িলে মনে হয়, সত্যই তো তিনি একজন ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন; যদিও তাঁহার প্রচারপ্রণালীর সহিত আমরা সায় দিতে পারি না। এই প্রসঙ্গসূত্রে তিনি বঙ্গের সমসাময়িক অবস্থার যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা বড়ই ঠিক হইয়াছে। তিনি যে পর্ব্ববিশেষে স্ত্রীলোকের মধ্যে চাল ডুবাইয়া খাওয়া ব্রতরক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা শুনিয়াছি, যশোহর অঞ্চলেও তান্ত্রিক পরিবারসমূহের মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

গ্রন্থের মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। লেখক গ্রন্থে তাঁহার যুক্তিগুলি যে শৃঙ্খলায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই শৃঙ্খলা আর একটু পরিপাটী হইলে সাধারণ পাঠকের মনে যুক্তিগুলি খুদিয়া বসিবার সুবিধা হইত। মোটের উপর বলিতে পারি, যাঁহারা জয়দেব সম্বন্ধে, এবং তাঁহার গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বড়ই মূল্যবান।

হিমালয়-পরিভ্রমণ—শ্রীরত্নমালা দেবী লিখিত ও শ্রীবিজয়গোপাল মুখার্জ্জি (মুঙ্গের) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লিখিত নাই—সম্ভবত বিতরণের উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া।

গ্রন্থকর্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ 'শিশুশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী। উপযুক্ত মাতামহের উপযুক্ত দৌহিত্রী। আজকালকার ছেলেমেয়েদের অনেকেই হয়তো অবগত নহেন যে, বীটনবিদ্যালয় খুলিবার পর যখন ছাত্রী পাওয়া যাইতেছিল না, তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং আমার মাতামহ ৺ হরদেব

চট্টোপাধ্যায়, এই দুইজন মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথম নিজেদের কন্যাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া প্রাণের উদারতা ও সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন। ৺কাদম্বিনী মহাশয়ের দৌহিত্রী যে এই গ্রন্থের রচয়িত্রী হইবেন তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। আশ্চর্য এই যে, তাঁহার ন্যায় বঙ্গরমণী দুর্ব্বল দেহ লইয়া কেবল অটল বিশ্বাসের বলে কি প্রকারে বদরীনারায়ণ গিয়া অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসিলেন। গ্রন্থখানি তাঁহার সেই অটল ভগবদ্বিশ্বাসের সুন্দর নিদর্শন। গ্রন্থখানির প্রশংসা বা অপ্রশংসার কথা বলিয়া সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। বোধ হয় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে রচয়িত্রীকে বারবার নমস্কার করিতেছি এবং আমার প্রাণে সংসার-ত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যসাধনার ইচ্ছা প্রবলরূপে জাগিয়া উঠিতেছে। গ্রন্থখানির একটী বিশেষ গুণ এই যে, বাজে কথা নাই বলিলেই হয়, পথের কথা পথিকদিগের সুবিধার জন্য খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীক্ষি, না, ঠা,

পুরীর মন্দির সম্বন্ধে গুটিকত নূতন কথা।—কাশী গোধূলিয়া—ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল-শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতির কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর কিছুদিন পুরীতে অবস্থিতি করিয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সহিত পুরীর মন্দির সম্বন্ধে যে মৌখিক আলোচনা করিয়াছিলেন, শ্রীশবাবু এই পুস্তিকায় তাহারই একটী লিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, পুরীর মন্দির বৌদ্ধ মন্দির। কিন্তু রাজা এই গতানুগতিক পথে না গিয়া এ সম্বন্ধে একটী নূতন দিগ্দর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিহাস ও শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পাণ্ডাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত মৌখিক ও পূজাপদ্ধতির বিবরণ হইতে তিনি এই এক আনুমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, পুরীর মন্দির শক্তি-মন্দির—শ্রীমন্দির; এবং কেবল এই দিক দিয়াই পুরীধামের শ্রীক্ষেত্র নামান্তর সুসঙ্গত হয়। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্ত শিষ্য উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র দেবকেই তিনি শক্তিমন্দিরের এই বর্ত্তমান পরিণতির প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন। ইহার স্বপক্ষে তিনি যে-সব প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তিতর্কের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে উৎকলের ভক্ত ও মতানুবর্ত্তিগণের প্রাণে একটু আঘাত লাগিতে পারে সত্য; তবে আমাদের মনে হয়, কেবল এই কারণে তাঁহার এই নূতন সিদ্ধান্তের প্রতি অবহেলা না দেখাইয়া পণ্ডিতসমাজের উচিত যে একান্ত নিরপেক্ষভাবে উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা।

শ্রীসু. চ. চৌ.

—

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

বিবাহ।—বিগত ১৭ই মাঘ, মঙ্গলবার রাত্রি ৯ম ঘটিকার শুভ লগ্নে কলিকাতা নগরীতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমিয়া দেবীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহসভায় বহু গণ্যমান্য নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান এই নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শোক-সংবাদ।

৺পশুপতিনাথ শাস্ত্রী।—গত ২১শে মাঘ, শনিবার রজনীর শেষ প্রহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্ ডি মহাশয় তাঁহার কলিকাতা নগরীর বাগবাজারের বাস-বাটীতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় হঠাৎ অকালে পরলোক গত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প বয়সেই ইনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে যাহাতে লোকের সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এজন্য তিনি কলিকাতাপ্রবাসী পণ্ডিতসমাজের সহযোগিতায় সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত উহার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

—

আদিব্রাহ্মসমাজের

আয় ও ব্যয়।

পৌষ মাস, ১৮৪৯ শক।

আয়	৫১১॥৵০
পূর্ব্বস্থিত	৯॥৶৩
সমষ্টি	৫২২১৩
ব্যয়	৫২১।৶৩
স্থিত	৸৵০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	১০০৲
বিশেষ কার্য্যের দান	১১৲
হাওলাত জমা	৬৲
হাওলাত আদায়	৬৲
ঋণগ্রহণ	১২৭॥৵০
সস্‌পেন্স	২০০৲
সমষ্টি	৪৫০॥৵০

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৫৲
হাল	৭৲
বিজ্ঞাপন	২৪৲
মাশুল	৸৵০
সমষ্টি	৩৬৸৵০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৯৲
কাগজের মূল্য	১৫॥০
সমষ্টি	২৪॥০

পুস্তকালয়।

মাশুল	॥০
সর্ব্বসমষ্টি	৫১২॥/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্য	১০৲
গায়ক	৩০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বেহারা	১২৲
মেথর	২৲
সন্ন্যাসী	৷৶০
মাশুল	॥৶০
Electric	৫।৶০
আলো মেরামত	১৻৬
কেরোসিন	৸/৯
পুষ্পকার্য্য	৬৸/০
মাঘোৎসব	॥০
ঋণশোধ	১০৫॥০
হাওলাত শোধ	৫৲
হাওলাতপ্রদান	৪॥০
কারবরদারী	১॥৵৯
বিবিধ	১॥৶০
বিশেষ কার্য্যের দান	১৬।০
সমষ্টি	২১৯৶০

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজ	৪৯॥৶০
মাশুল	৪।৯
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	২৭৸৵০
মূল্য আদায়ের কমিশন	১৲
অন্যান্য	॥/০
সমষ্টি	৯৮।৶৯

যন্ত্রালয়।

প্রিন্টার	২৮৲
কম্পোজিটর	৪৭৲
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	১২৲
কাগজতোলা	৬৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
জলপানী	৷/০
প্রুফকাগজ	২/০
ছাপার কাগজ	৫১/৩
কালি	১৸০
তৈল	॥৵০
সাজিমাটী	॥০
রুলটানা	॥৬
দপ্তরী	৭।০
অক্ষর ক্রয়	৪৵০
মাশুল	৻৬
তামাক	।৵০
লেই জন্য ময়দা	৵৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৪৵৬
বিবিধ	২।৶৩
সমষ্টি	২০৩।৵৯

পুস্তকালয়।

মাশুল	।৶০
সর্ব্বসমষ্টি	৫২১।৶৬

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত

"সন্ধ্যায়" সম্বন্ধে মাসিক পত্রের অভিমত।

স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম, সুস্বাদু সুরসাল ফল, সুপেয় জল ভোগ করিয়া ও সুকোমল রাজহস্তে সেবিত হইয়াও যেমন তাহা জন্মভিটপাতে যাইবার জন্য লালায়িত হয়, সেইরূপ বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আনন্দময় পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, জীবাত্মা পরম পুরুষ পরমাত্মারই অংশ-বিশেষ এবং তাহাই এই আত্মার জন্মস্থান। বিবেকী ব্যক্তি উচ্চ প্রাসাদে বাস করিয়া, রাজভোগ্য সুস্বাদু খাদ্য উপভোগ করিয়া, সকল দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াও কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত অচ্ছেদ্য মিলনই তাঁহারা পরম সুখ ও পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভক্তকবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার জীবনের সন্ধ্যায় "সন্ধ্যায়" সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বৈতরণীর পার প্রভৃতির ভাব ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত করিয়া তুলে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রচার যত অধিক হয় ততই দেশ ও সমাজের মঙ্গল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।　　　　শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ,—১৩৩৪।

(সর্ব্বপ্রকার গীতবাদ্য-বিষয়ক একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কলাবিদগণ কর্ত্তৃক ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে মতামত ও তাল, লয়, মাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ উপদেশ, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, ৺ রজনীকান্ত সেন, ডি, এল, রায়, গোঁসাইজী প্রভৃতি দেশ-বিখ্যাত মনীষিবৃন্দের গান ও তাহার স্বরলিপি, থিয়েটার ও আধুনিক মনোমুগ্ধকর গানের ও হিন্দুস্থানী গৎ ও গানের তাল ও বাট-সহ গঠিত সঠিক স্বরলিপি, ইংরাজী গানের বাংলা গঠিত স্বরলিপি প্রভৃতি, বিখ্যাত কবি ও লেখক-লেখিকার প্রবন্ধ এবং চমৎকার ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রাদিতে সুশোভিত হইয়া প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইয়া থাকে।

বিনা শিক্ষকে অনায়াসে হারমোনিয়ম, বেহালা, সেতার, এস্রাজ ও গান প্রভৃতি সঠিক শিক্ষা করিতে হইলে আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

প্রতি সংখ্যা মূল্য ।০ আনা মাত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা।

প্রকাশক
আর, বি, দাস।
৮। সি, লালবাজার ষ্ট্রীট
টেলিগ্রাম—আর্বিদাস। টেলিফোন ৪৩৫ কলিকাতা।

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 452.

১০১৬ সংখ্যা

১৮৪৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৪। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৪। কলিগতাব্দ ৫০২৮। চৈত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৫তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৮। সম্বৎ ১৯৮৪। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৪৯। সাল ১৩৩৪।

অঞ্জলি।

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৯৪ অঞ্জলি—বিচারক দেবতা।

১। আমাদের প্রাপ্য পৈত্রিক ধন ছলে বলে কৌশলে আমাদের জ্ঞাতিগণ হরণ করিয়া লইয়াছে। তুমি বিচারপতি। তোমার সূক্ষ্ম বিচারে আমাদের যাহা প্রাপ্য তাহা আমাদিগকে ফিরাইয়া দাও। তুমি অন্নদাতা। শত্রুগণকে আমাদের মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে দিও না। তুমিই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তোমারই ধর্ম্মশাসনে সকল সংসারে সদসৎ কর্ম্মের পার্থক্য বজায় রহিয়াছে। তুমিই আমাদের নেতা। তুমিই আমাদের পরম বন্ধু। তুমিই আমাদের গৃহদেবতা। তুমিই আমাদের পূজা নিত্য গ্রহণ কর; আমাদের গৃহ ধর্ম্মে কর্ম্মে ও জ্ঞানে পরিপুষ্ট হউক, শ্রী-বিভূষিত হউক।

২। তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত বিশ্বজগতকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছ। তোমার দৃষ্টি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরমাণু অবধি মানবাত্মা পর্য্যন্ত এবং মানব অবধি উন্নততর জীব—দেব, যক্ষ প্রভৃতি সকলেরই উপর সমভাবে নিপতিত আছে। তুমি পাপপুণ্যের যথাযথ দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিয়া সকলকেই তোমার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছ। এই পরি-বর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে তুমিই একমাত্র অপরি-বর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য। তুমিই একমাত্র সকল সুখ ও কল্যাণের আকর। তুমিই একমাত্র দেব-মানবের সম্ভজনীয়।

৩। তুমি স্বীয় মহিমায় তোমার এই ব্রহ্মচক্র ধারণ করিয়া রহিয়াছ। বিপদে দুঃখে তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু। সম্পদে ও সুখে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়। তুমি আমাদের একমাত্র পিতামাতা। আমরা যেন তোমাকেই একমাত্র পিতামাতা জানিয়া পিতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় তোমার স্নেহ প্রেম লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হই। তুমিই একমাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আমরাও যেন তোমারই আদর্শে আমাদের জীবনকে শুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারি। পতিব্রতা সতীর হৃদয় যেমন নিষ্কলঙ্ক হয়, আমাদেরও চিত্ত যেন সেই প্রকার কলঙ্কনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ জলের ন্যায় নির্ম্মল আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হয়।

৪। বুভুক্ষু ব্যক্তি যেমন আহার্য্য দ্রব্যের ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া সমস্তই গ্রাস করিতে থাকে, সেইরূপ সংসারের শতবিধ উপদ্রব আমাকে

গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আমার অন্তরে নিরন্তর তোমার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রজ্বলিত রাখিয়া সমস্ত উপদ্রবকে আমা হইতে শতহস্ত দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমাকে আমাদের পিতামাতা সখা ও সুহৃৎ জানিয়া নির্ভয় হইয়া গিয়াছি এবং সকল বিপদ আপদের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আমাদিগকে অন্নজল নিয়তই প্রদান করিতেছ। তোমারই আদর্শে আমরাও যেন দীন-দুঃখীর মধ্যে অন্নজল বিতরণ করিয়া পৃথিবী হইতে দৈন্য, দারিদ্র্য দুঃখ বিদূরিত করিতে পরাংমুখ না হই। তুমি আমাদিগের *প্রাণের প্রাণ; বিশ্বজগত* তোমা হইতেই প্রাণলাভ করিয়াছে। তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগকে ধনরত্নে পরিপুষ্ট কর, যাহাতে আমরা তোমার সন্তানের উপযুক্ত হইয়া সকলের সম্মুখে বাহির হইতে পারি।

৫। হে অগ্রণী, তোমার আদেশে আমাদের অনেকে ধনরত্ন আহরণে নিযুক্ত হইয়াছে। সেই ধনরত্নের সাহায্যে তাহারা অপর শত শত লোকের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। তোমার আদেশে অপর অনেকে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সহজে জনসাধারণের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছে। আবার তোমারই আদেশে অপর অনেকে তোমার অমোঘ নাম প্রচারে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। তুমি তাহাদের সকলকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান কর এবং তাহাদের প্রত্যেককে দেহে বলিষ্ঠ, জ্ঞানে গরিষ্ঠ ও ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া দাও। শত্রুগণ যেন আমাদিগের মুখের গ্রাস হরণ করিতে না পারে। তোমার প্রেরিত অন্নজলে পরিপুষ্ট হইয়া আমরা যেন তোমার মহিমা শতকণ্ঠে কীর্ত্তন করি।

৬। আমাদের গাভীগণকে পয়স্বিনী করিয়া দাও, যাহাতে তাহাদের দুগ্ধ পান করিয়া আমরা শত্রুগণকে পরাজয় করিবার উপযুক্ত বীর্য্য ও তেজ লাভ করিতে পারি। তোমারই আদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাহিনী নদীসকল দূরবর্ত্তী দেশসকলকেও শস্যশ্যামল করে এবং তোমারই আদেশে সেই সকল দেশের শস্য আহার করিয়া গাভীগুলি আমাদিগকে প্রচুর দুগ্ধ দান করে।

৭। হে দীপ্যমান পরমেশ্বর! তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের আর কেহই সহায় নাই। যাঁহারা তোমাকে ধরিয়া আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদেরও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। অরুণ-বর্ণ উষা যখন আমাদিগকে সুখনিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করে, তখনও তুমি আমাদের নিত্য সহায় থাক; আবার নিশায় যখন নিদ্রালাভের জন্য সুখশয্যা গ্রহণে প্রেরণ কর, তখনও তুমি আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া আমাদিগকে শতবিধ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা কর এবং নীরবে আমাদের বলবিধানের ব্যবস্থা কর।

৮। তুমি আমাদিগের অন্তরে সর্ব্বদাই তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে উৎসাহ প্রদান করিতেছ। আমরা তোমার সেই উৎসাহবাণী শুনিয়া কর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিরলসভাবে অগ্রসর হইতেছি। তুমি আমাদের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিয়া দাও, তুমি আমাদের গৃহ ধনরত্নে পূর্ণ কর। তোমার রুদ্র-তেজে আমাদিগকে দগ্ধ করিও না। ভূর্লোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ, এই তিন লোক তুমি যেমন রক্ষা করিতেছ, সেইরূপ তুমি আমাদের প্রত্যেককে তোমার মঙ্গল পক্ষপুটের ছায়াতে নিয়ত রক্ষা কর।

৯। তুমি অমোঘশক্তি। তোমার শক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া সকল রিপুগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিব। তাহারা আমাদের প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দিকে দিকে পলায়ন করিবে। আমাদের সন্তানগণ বংশানুক্রমে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও একনিষ্ঠ থাকিয়া, অর্থে জ্ঞানে মানে কর্ম্মে ও ধর্ম্মে, সকল বিষয়ে যেন সমাজের ও দেশের এবং জগতের অগ্রণী হয়। আমাদের সন্তানেরা দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হৌক।

১০। তুমি সর্ব্বদর্শী ও মনের নিয়ন্তা। তুমি আমাদের অন্তরে এরূপ বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা তোমার গ্রহণের উপযুক্ত বন্দনাগীত সকল রচনা করিতে পারি। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি। তুমিই আমাদের একমাত্র সম্ভজনীয়।

তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মে জ্ঞানে ও কর্ম্মে ধনী করিয়া দাও, যাহাতে আমরা তোমারই প্রিয়কার্য্য জগতের মঙ্গলসাধন করিয়া আমাদের জীবনকে ধন্য করিতে পারি।

দেশাত্মবোধে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা

(জনৈক শিক্ষক)

দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে চাহিলে দেশের মধ্যে সমগ্র দেশের জন্য কতকগুলি সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভারতের রাজধানী কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি নামে একটী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই কেবল বঙ্গদেশ নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতের অধিবাসী মাত্রেই ইহার জন্য গৌরব অনুভব ও প্রকাশ করিবার অধিকারী। এই যে আগ্রায় তাজমহল আছে, যাহা দেখিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষে আগমন করে—হোক না কেন উহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, আমরা বঙ্গবাসী হইলেও ভারতবাসী বলিয়া তাহার জন্য গৌরব অনুভব ও প্রকাশ করিবার অধিকারী। কিন্তু বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস না করিলে যেমন বার্দ্ধক্যে বিদ্যা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না, সেই প্রকার প্রত্যেকের নিজ নিজ নগরে নিজ নিজ পল্লীতে সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানে অগ্রসর না হইলে, নিজ নিজ নগর ও পল্লী সম্বন্ধে দেশাত্মবোধ জাগ্রত না করিলে সমগ্র দেশের জন্য দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা সহজ হয় না। নিজ নিজ পল্লী ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন-কল্পে সাধারণের হিতকর যে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা মাত্র দুই একটী বিষয় উল্লেখ করিব।

আমরা কলিকাতায় থাকি। কলিকাতায় দমকল বা বহ্নিব্রিগেডের বিষয় সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ট্রামগাড়ী বল, মোটরগাড়ী বল, এ সমস্তই আমাদের দৃষ্টির নিত্যবিষয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া উহারা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু দমকলগুলি প্রয়োজন হইলেই বাহির হয়। তাহার উপর, বাহির হইলেই ঐ যে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া যায়; ঐ যে নিয়ম আছে, দমকল বাহির হইলেই তাহার সম্মুখের পথ লাট সাহেবকেও ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে, এই সকল কারণে উহা আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বড় বড় সহরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাই জানেন যে, সহরে প্রায়ই বহ্নিবারক ব্যবস্থা রাখা হয়। কয়েকটী দমকল গাড়ী, জলদিবার রবরের সুদীর্ঘ নল, কয়েকজন আঁটসাঁট চটপটে লোক এবং অন্যান্য কয়েকটী উপকরণ—এই সমস্ত লইয়া এই ব্যবস্থা। ইংরাজীতে ইহার সাধারণ নাম Fire-brigade; বাংলায় আমরা ইহাকে দমকল বা বহ্নিব্রিগেড বলিতে পারি।

প্রায়ই দেখা যায়, কোন স্থানে একটা সহর উঠিবার বহু পূর্ব্বে সেখানে কয়েকটী কুটীর মাত্র দেখা দেয়; দুই একটী কুটীর দেখা দিতে দিতেই ক্রমে দশ বিশখানি কুটীর দেখা দেয়। তখন একটী পল্লীর উদ্ভব হইল। তারপর, সেখানে যদি চলাচলের সুবিধা হয়, যাতায়াতের সুবিধা হয়, আহারাদি সুলভ হয়, তখন সেখানে লোকজনের সমাগম বাড়িতে থাকে। ভাল রাস্তাঘাট যেন লোকজনকে ডাকিয়া আনে। কাঁচা রাস্তা হইলে মোটরগাড়ীর যাতায়াতের সুবিধা হয় না, পাকা রাস্তা হইলে সুবিধা হয়। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, যে পল্লীতে পাকা রাস্তা হইবে, সেখানে মোটরগাড়ী যাতায়াত করিতে পারিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের যাতায়াত বাড়িবে; দেখিতে দেখিতে পল্লীটী সহরে পরিবর্ত্তিত হইবার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সেই পল্লীতে ঘরবাড়ীর সংখ্যাও বাড়িতে থাকে, দেখিতে দেখিতে দুইদশ খানা পাকা বাড়ীও নির্ম্মিত হইতে থাকে; দোকান-পসার বেশ জমিয়া যায়। তখন স্বতই সেই পল্লী সহর হইয়া দাঁড়ায়।

অন্য দেশের কথা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ীই "ছিটেবেড়ায়" প্রস্তুত, অর্থাৎ বাঁশ ও কাদার দেওয়াল এবং খড় বা উলুঘাসের "চাল" বা ছাউনি। গ্রীষ্মকালে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর উত্তাপে এই এই সমস্ত ঘরবাড়ীগুলি শুষ্ককণ্ঠ রোগীর মত টাঁ টাঁ করিতে থাকে। উহাদের প্রত্যেক কাঠিটী পর্য্যন্ত এমন শুকাইয়া উঠে যে, একটুখানি আগুনের ফিনকি লাগিলেই দেখিতে দেখিতে উহা জ্বলিয়া উঠে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঘরটাই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ভস্মে পরিণত হয়—নিভানো দায় হয়। অনেক সময়ে ফিনকি লাগিবারও প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি যে ছাদের উলুঘাস বা খড়গুলি এমনই শুকাইয়া অগ্নিমুখী হইয়া থাকে যে, প্রবল বাতাসের বলে যেটুকু ঘর্ষণ হয়, সেইটুকু ঘর্ষণেরই ফলে অনেক স্থলে গৃহবাসীদের অজ্ঞাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠে। ফিনকি উড়িয়া চালে আগুন লাগিতেও বড় বেশী বিলম্ব হয় না। ঘরগুলি প্রায়ই নিচু করিয়া নির্ম্মিত হয়। হয়তো ঘরে রান্না হইতেছে,

বাতাসের জোরে দৈবাৎ একটা ফিনকি চালে লাগিতে কতক্ষণ? একবার লাগিলে আর রক্ষা নাই—দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহখানির যথাসর্ব্বস্বের চিহ্ন মাত্রও থাকে না।

পল্লীগ্রামের ঐ প্রকার ছিটেবেড়ার ঘরগুলি আবার প্রায়ই গায়ে-গায়ে লাগালাগি করিয়া নির্ম্মিত হয়। চোর-ডাকাতের ভয় আছে; রোগশোকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও উৎসবে আমোদে পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক হয়; তাই পল্লীবাসীগণ পরস্পর হইতে বেশী দূরে দূরে ছাড়াছাড়ি থাকিতে ইচ্ছা করে না, যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকিতে চায়। আমরা দেখিয়াছি পল্লীর মোড়ল বা প্রধান ব্যক্তির ঘরবাটীর চারিধারে অন্যান্য ব্যক্তির ঘর নির্ম্মিত হয়—নিকটেই একটী ভাল কূপ, বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় থাকে। কিন্তু ঐ প্রকার গায়ে-গায়ে ঘর প্রস্তুত করিবার ফলে অনেক সময়ে কোন একটা ঘরে আগুন লাগিলে সমস্ত পল্লীকে বাঁচান দুরূহ হয়। এই প্রকার একটী দৃশ্য একবার আমার নয়নপথে পড়িয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি একবার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে পাল্কীযোগে চলিয়াছিলাম। ভীষণ উত্তাপ, ব্যক্ত করা যায় না। তখন বৈকাল বেলা, আন্দাজ ৫টা বাজিয়াছে। সহসা দেখি, কিছু দূরে একটী পল্লীর এক অংশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম, পল্লীর বালকবালিকারা কোন প্রকার অগ্ন্যুৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছে। পল্লীগ্রামের ভীষণ দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বালকবালিকাদের নিত্য আনন্দকোলাহলটুকুই বড় মিষ্ট লাগে—কিন্তু করভারের প্রপীড়নে সে আনন্দটুও বুঝি আর থাকে না। যাক্, আমি উহাকে অগ্ন্যুৎসব ভাবিয়া ব্যাপারটা কি, উন্মুখ হইয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে আমার সঙ্গীয় কর্ম্মচারী আমাকে বলিল—আগুন লাগিয়াছে। আমার দুঃখ-প্রকাশের অবসরও ছিল না। দেখিতে দেখিতে আগুন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত পল্লীটী অগ্নিসাৎ হইল এবং প্রায় শতাবধি লোক গৃহহীন অবস্থায় কিছুকাল দিন যাপন করিতে বাধ্য হইল। পল্লীগ্রামে আগুন লাগিলে নিভাইবার প্রধান অসুবিধা এই যে, গ্রীষ্মকালে, যে সময়ে আগুন লাগিবার ভয় বেশী, ঠিক সেই সময়েই পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্ত জলাশয় এমন শুকাইয়া যায় যে, অনেক স্থানে গরু মানুষ প্রভৃতি জীবজন্তু পানীয় জলটুকুও পায় না।

একটী পল্লী পুড়িয়া ছাই হইল—ধরিলাম, তাহার ফলে পাঁচদশ হাজার টাকা লোকসান হইল। এই পাঁচ-দশ হাজার টাকা কেবল অধিবাসীদের খাট-বিছানা, গহনাপত্র, ধান-খড় প্রভৃতির দাম ধরিয়া বলিলাম। কিন্তু এই ভাবে পল্লীগ্রাম অগ্নিসাৎ হইবার ফলে কত যে, অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার বিলুপ্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশের অনেক জ্ঞানী গুণী অধ্যাপক-পণ্ডিত পল্লীগ্রামেই বাস করেন এবং ছিটে-বেড়ার ঘরেই তাঁদের পুঁথি প্রভৃতি জ্ঞান অর্জ্জন ও বিতরণের সম্বল রাখিয়া থাকেন। এই প্রকার ঘরেই তাঁহাদের পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগেরও রচিত ও সংগৃহীত পুঁথি গ্রন্থ প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে। পল্লী বা এই প্রকার অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের গৃহাদি ভস্মসাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অমূল্য গ্রন্থ ও পুঁথিগুলি বিনষ্ট হইলে তাহার মূল্য কে স্থির করিতে পারে? টাকার মানদণ্ডে তাহার মূল্য স্থির হইতে পারে না। আমি জানি, মেদিনীপুরের অন্যতর শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের গৃহ এবং এবং সঞ্চিত পুঁথিগুলি আগুন লাগিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ একটী পণ্ডিতের কথা বলি কেন—এরূপ ঘটনা যে প্রতি মুহূর্ত্তে সংঘটিত হয় না ইহাই আশ্চর্য্য।

যাই হোক, ধরা গেল, এক-একটী মাঝারী রকমের পল্লী বিনষ্ট হইলে পাঁচদশ হাজার টাকা লোকসান হইল। কিন্তু বড় বড় সহরে এক-একটা অট্টালিকাই নির্ম্মিত হয় পাঁচ-দশ লক্ষ টাকায়। সেখানে একটা বড় বাড়ীতে আগুন লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই-চারিখানি বাড়ী পুড়িয়া গেলে কত টাকার যে ক্ষতি হয়, তাহা গণনা করা সহজ নয়। কয়েক মাস হইল সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের এক নগরে আগুন লাগিবার ফলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে, চার পাঁচ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে ইত্যাদি। ঐ সমস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার ব্যয়ই তো হইল লক্ষ লক্ষ টাকা। তদ্ব্যতীত ঐ সমস্ত অট্টালিকায় সঞ্চিত থাকে বহুমূল্য শিল্পসম্ভার—যাহা একবার নষ্ট হইলে হয়তো কোটী মুদ্রাতেও পুনঃস্থাপিত করা যাইতে পারেই না।

এত টাকার ক্ষতি সহ্য করা তো সহজ কথা নয়। এইরূপ ক্ষতির ফলে লোকেরা স্থির করে যে, ইহার প্রতি-বিধান করা আবশ্যক। প্রতিবিধান করিতে গেলে দুইটী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—এক কিসে আগুন না লাগে; দ্বিতীয়, আগুন লাগিলে কিসে সহজে নিভানো যায়। আগুন না লাগার ব্যবস্থা নানা উপায়ে করিলেও দৈবক্রমে আগুন লাগা যে একেবারে বন্ধ করা যায়, তাহা মনে হয় না। কিন্তু আগুন লাগিলে তাহা নিভাইবার ব্যবস্থা করা মানুষের চেষ্টাসাপেক্ষ বটে, কিন্তু অনেকটা আয়ত্ত ও সম্ভব।

এই যে বহ্নিবারক ব্যবস্থা করা উচিত—ইহার ব্যয়-ভার বহন করিবে কে? এক-একটা দমকলের দামই

অনেকের দশবিশ হাজার টাকা। পাঁচ-দশখানা দমকল রাখিতে গেলে তো প্রায় একলক্ষ টাকা পড়িয়া যায়। তদ্ব্যতীত লোকজনের মাহিনা আছে এবং অন্যান্য নানা-বিধ খরচ আছে। আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশের যে কোন সহর ধর, সেখানে কয় জন এমন ধনী আছেন যাঁহারা কোন্ কালে কোন্ বাড়ীতে আগুন লাগিবে ভাবিয়া একলাখ দুইলাখ টাকা অনায়াসে ব্যয় করিতে পারেন বা ইচ্ছা করিবেন? টাকা থাকিলেও, ইনি বলিবেন, আমি কেন সমস্ত খরচ বহন করিব? উনি বলিবেন, আমিই বা কেন করিব? সত্যই তো, একজন লোকই বা সমস্ত খরচ বহন করিবেন কেন? যে কোন বাড়ীতেই আগুন লাগুক না কেন, তাহার আশে পাশে সকলেরই বাড়ীতে আগুন ছড়াইয়া পড়িবার তো ভয় আছে। কাজেই আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা করিবার ভার পল্লী বা সহরের একজনের উপর না গ্যস্ত করিয়া সকলেরই উপর সেই ভার দেওয়া এবং সকলেরই সেই ভার লওয়া কর্ত্তব্য।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে আগুন লাগিয়াছিল। সেকালে লণ্ডনের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত হইত তখন আগুন নিভাইবার ব্যবস্থাও বিশেষ কিছু ছিল না। দেখিতে দেখিতে আগুন গৃহ হইতে গৃহান্তরে লাফাইয়া চলিতে লাগিল, এবং গৃহের পর গৃহ উদরস্থ করিতে লাগিল। ড্যানিয়েল ডিফো নামক বিলাতের তদানীন্তন এক গ্রন্থকার, যিনি সুপ্রসিদ্ধ রবিন্‌সন্ ক্রুশো নামক গ্রন্থের রচয়িতা, তিনি তাঁহার এক গ্রন্থে এই ঘটনার এক ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই ঘটনার ভীষণ আকার The great fire of London বা লণ্ডনের ভীষণ অগ্নিকাণ্ড এই নাম হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। সে সময়ে বিলাতে বহ্নিনিবারক ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না বলিয়াই এইরূপ ভীষণ কাণ্ড হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় নিমতলার কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়া অধিকাংশ কাঠের গোলা তো ভস্মীভূত হইয়া গেলই, সেই সঙ্গে পল্লীর অনেক গৃহস্থের গৃহও অগ্নিমুখে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। শোনা যায়, প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত সেই আগুনের গরম অনুভূত হইয়াছিল। নিমতলার নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসাদ ঘোষ বাবুদের বাড়ীরও কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছিল এবং তন্মধ্যস্থ অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান চিত্রাদি বিনষ্ট হইয়াছিল। উক্ত পল্লীর যাহা কিছু বাঁচিয়া গিয়াছিল, তাহা একমাত্র বহ্নিব্রিগেডের কল্যাণে।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম এবং যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, বহ্নিবারক ব্যবস্থার ব্যয় একজনের উপর সম্পূর্ণ ফেলা অসঙ্গত। বহ্নিব্রিগেডের দমকল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি যে কিপ্রকার সুপরিষ্কৃত রাখা উচিত ও রাখা হয়, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বোঝা যাইবে না। এবিষয়ে একটুও অবহেলা করিলে চলিবে না। কখন কোথায় আগুন লাগে তাহার তো ঠিকানা নাই; আগুন লাগার সংবাদ পাইলেই ছুটিতে হইবে, বহ্নিব্রিগেডকে সর্ব্বদাই এই ভাবে প্রস্তুত থাকিতে হয়। শেষ মুহূর্ত্তে বলিলে চলিবে না যে, গাড়ীর চাকা ঠিক নাই বলিয়া গাড়ী চলিতেছে না বা রবার নলে ফুটা হইয়া গিয়াছে বলিয়া জল ঠিক মত দিতে পারা যাইবে না। পাছে এতটুকু বিলম্ব হয়, তাই রাত্রে যে লোকদের উপর দমকল বাহির করা ও অকুস্থলে লইয়া যাওয়ার ভার থাকে, তাহারা পোষাকপরিচ্ছদ পরিয়া সদাপ্রস্তুতভাবে ঘুমাইতে বাধ্য হয়। আগুনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলেই যে যাহার নিজ নিজ খোঁটায় গিয়া দাঁড়াইবে এবং চকিতের মধ্যে দমকল গাড়ী ছুটিয়া চলিবে। পূর্ব্বে দমকলের গাড়ীগুলো ঘোড়ায় টানিত; এখন তাহার স্থলে মোটর গাড়ী হইয়াছে। সুবিধা যথেষ্ট হইয়াছে—ঘোড়ার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয় না; যখন ইচ্ছা তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে মোটর গাড়ী চালাইবারও ব্যবস্থা করা যায়, আর তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে অকুস্থলে দ্রুতগতিতে পৌঁছিয়াও যায়।

বহ্নিবারণ ব্যবস্থায় ধনীদরিদ্রের বিচার করা হয় না। বিচার করিলে চলিতে পারে না। দরিদ্রের ঘরেও আগুন লাগিলে যেমন তাহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইতে পারে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ধনীর গৃহে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা আসে, ধনীর গৃহেও সেইরূপ আগুন লাগিলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইতে পারে এবং পার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্রের গৃহেও আগুন লাগিবার সম্ভাবনা আসে। কাজেই, যাহারই গৃহে আগুন লাগুক, বহ্নিব্রিগেডের সমানভাবেই তাহা নিভাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সমস্ত সহর বা পল্লীর মঙ্গলের জন্যই এই সমস্ত উদ্যোগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এখানে একজনের মঙ্গলে সকলেরই মঙ্গল। এখনকার বহ্নিব্রিগেডকে কার্য্যকারিতার যথাসাধ্য উচ্চতম স্থানে রাখা হয়। এখানকার যন্ত্রপাতি, বহ্নিব্রিগেডের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাক লাগিয়া যায়, অবাক হইতে হয়। এখন যে ভাবে লম্বা লম্বা সিঁড়ি লাগাইয়া বহ্নি-ব্রিগেডের দল আগুনলাগা বাড়ী হইতে মানুষ পশু প্রভৃতির উদ্ধার সাধন করে, তাহা দেখিলে তাহাদিগকে দেবতা বলিতে ইচ্ছা হয়। সময়ে সময়ে ব্রিগেডের লোক এইপ্রকার উদ্ধারসাধন করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে জানিয়াও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হয় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে বিলাতে আগুননিভানো কার্য্য অধিকাংশস্থলেই বীমাকোম্পানিদিগেরই হস্তে ছিল।

তাহার ফলে, যে গৃহগুলি বীমাবদ্ধ থাকিত, সেই গুলিই তাহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হইত। জনসাধারণের তাহাতে খুব বেশী সাহায্য হইত না। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক পল্লী বা প্রত্যেক সহরের প্রত্যেক অধিবাসীরই আগুন নিভাইবার ব্যবস্থাকল্পে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কি উপায়ে এই সকল ব্যবস্থায় জনসাধারণ সাহায্য করিতে পারে? ইহার সর্ব্বপ্রধান উপায়—এই ব্যবস্থার জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা। চাঁদা দিবে কে? আমার একটা টুকরো জমি পড়িয়া আছে। তাহার এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুটীর, অপর পার্শ্বে সুবৃহৎ অট্টালিকা। আমি দেখিলাম, আমার জমিতে আগুন লাগিবার মত কিছুই নাই; কুটীরবাসী দেখিল তাহার একখানি কুটীর পুড়িয়া গেলে দশবিশ টাকার ক্ষতি হইতে পারে, তাহার জন্য সে দশ বিশ টাকা চাঁদা দিতে পারে না; কিন্তু অট্টালিকার অধিকারী দেখিল তাহার বাড়ীতে আগুন লাগিলে তাহাকে অনেক টাকার লোকসান সহ্য করিতে হইবে; কাজেই সে ব্যক্তি বহ্নিবারক ব্যবস্থায় বিশেষ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। আজ আমার জমি পতিত আছে, কাল যদি একটা কুটীর উঠাই—তখন্? কুটীরবাসীর পক্ষে কম চাঁদা দিতে চাওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই প্রকার সাত-পাঁচ ভাবিয়া সহরবাসীরা স্থির করিল, যে সহরে বহ্নিবারক ব্যবস্থা রাখা হইবে, সেই সহরের সকল অধিবাসীকেই জমি বা গৃহের মূল্যের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হইবে। একজন না দিলে অপর পাঁচ জন মিলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়াইবে। এই প্রকারে আইন-কানুনের সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক সহরবাসীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বহ্নিব্রিগেডের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে, সহরবাসীরও এবিষয়ে সেইরূপ কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। বহ্নিব্রিগেডের যন্ত্রপাতি যাহাতে খুব ভাল থাকে, তাহার লোকজন যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, যাহাতে অসন্তুষ্টভাবে দিনযাপন করিতে বাধ্য না হয়, সেদিকে প্রত্যেক সহরবাসীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আজ যাহারা বালকবালিকা আছে, কাল তাহারাই তো সংসারপরিচালন ভার গ্রহণ করিবে। সুতরাং বাল্যকাল অবধিই বালকবালিকাদিগকে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

বহ্নিব্রিগেডে যাহারা ভর্ত্তি হয়, তাহাদিগকে কঠোর disciplineএ থাকিতে হয়। সহরের কোন্ দিকে কি আছে এবং মোটামুটি সহরের সঙ্গে তাহাদের পরিচিত থাকা উচিত। আজকাল স্থানে স্থানে যেমন চিঠির বাক্স রাখা হয়, সেইরূপ রাস্তার মাঝে মাঝে অগ্নি "থাম্বা" রাখা থাকে। পল্লীর কোথাও আগুন লাগিলে সেই থাম্বার লাগানো হাতল ঘুরাইয়া দিলেই বহ্নিব্রিগেডের আস্তানায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, বহ্নিব্রিগেডের দল তড়াক করিয়া লাফাইয়া প্রাচীরসংলগ্ন নক্সায় দেখিয়া লয় যে, কোন্ দিক হইতে ঘণ্টা বাজিল—এইরূপ নানাবিধ ইঙ্গিত হইতে বুঝিয়া লয় যে, কোন্ দিকে আগুন লাগিয়াছে, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী বাহির করিয়া তড়িৎবেগে অকুস্থলে ছুটিতে থাকে। দমকলব্রিগেডে অধিকাংশ স্থলে জাহাজের নাবিকদিগকেই লওয়া হয়, কারণ তাহারা কঠোর disciplineএ অভ্যস্ত। ব্রিগেডে লোক লইতে হয়, যাহারা খুব মজবুত অথচ তৎপর। ইহাদিগকে সিঁড়ি দ্বারা জীবজন্তু মানুষদিগকে আগুনলাগা গৃহ হইতে কি প্রণালীতে তৎপরতার সহিত নামাইতে হইবে, সে বিষয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে পূর্ব্বাবধিই শিক্ষা করিতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেখে—বহ্নিব্রিগেডের ঘণ্টা শুনিলেই পথিক বল, গাড়ীঘোড়া বল, সকলেই রাস্তার মধ্যস্থল ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া যায়, আর দমকলের গাড়ী বিদ্যুতের বেগে হুস করিয়া চলিয়া গেল; দেখিয়া ভাবে—কি মজা। কিন্তু বহ্নিব্রিগেডের জীবনটা সমস্তই মজার নয়—অনেক সময়েই বিপদসঙ্কুল।

দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার সহায় হিসাবে আমরা বহ্নিব্রিগেডের বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বলিলাম, কারণ এবিষয়ে আমরা দেখিয়াছি, তিন চার বৎসর বয়স্ক বালকেরও দৃষ্টি সহজে পতিত হয়—ঐ লাল লাল গাড়ী, পিতলের চকচকে ভাব, এইগুলি সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সুতরাং তাহাদের মনে এবিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠাও স্বাভাবিক।

পল্লীগ্রাম বা সহর সকল স্থানেরই উপযোগী আর একটী সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব—সেটী সাধারণ পাঠাগার। একটী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে পল্লীবাসী বা সহরবাসী সকলেরই অধিকার জন্মে। সহরবাসী কোন ধনী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের জন্য একটী পাঠাগার খুলিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইল না। ঐ পাঠাগার হইতে যে জ্ঞান অর্জ্জনের সুবিধা আছে, তাহা হইতে সাধারণ ব্যক্তি তো বঞ্চিত হইল। তদ্ব্যতীত একজনের পক্ষে অগণিত মুদ্রা ব্যয় করিয়া পাঠাগারের সৃষ্টি করা যত সহজ, দশজন সহরবাসী মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া পাঠাগার করা তদপেক্ষা অনেক সহজ—এ প্রকার ব্যয় করিতে কাহারও বড় একটা গায়ে লাগে না। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও আনন্দলাভে সাহায্য করা হয়। এরূপ পাঠাগারে গোলমাল নাই, ঘণ্টাধ্বনি নাই, আওয়াজ নাই, কাজেই বহ্নিব্রিগেডের মত পাঠাগারস্থাপন বালকবালিকার দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ না করিলেও, ইহার

পরিণামফল তাহাদের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক। একটু লেখাপড়া শিখিলেই তো অনেক ছেলের আরও ভাল ভাল বহি পড়িবার আগ্রহ হয়। এই রকম বহির ছোট পাঠাগার ছোট ছেলেদের জন্য খোলা রাখিলে তাহাদের যে কি উপকার করা হয় তাহা বলা যায় না। ছোট ছেলেমেয়েদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, এই সকল পাঠাগার তাহাদের প্রত্যেকের পাঠাগার। পাঠাগারের প্রতি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের যত্ন আনাইতে হইবে। তাহাদিগকে আরও বুঝাইতে হইবে, এই সকল পাঠাগার ও তাহার পুস্তকগুলি একদিক দিয়া তাহাদের প্রত্যেকের হইলেও একটী বহিও নষ্ট করা উচিত নয়, হারাণো উচিত নয়, কারণ এগুলি যেমন তাহাদের প্রত্যেকের, তেমনি সেগুলি সহরবাসী সকলের।

আজকাল বিলাতের এক-একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের সাধারণ পাঠাগারে যত সংখ্যক বহি এবং যত প্রকারের ভাল ভাল বহি থাকিতে দেখা যায়, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে লণ্ডনের সাধারণ পাঠাগারেও তত সংখ্যক এবং তত প্রকারের বহি থাকিত না। শুনিলে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ইহা সত্য যে, ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হেনরির সময়ে সাধারণ পাঠাগারে একটী মাত্র বহি থাকিত—সেটী বাইবেল। সাধারণ পাঠাগারটী বোধ হয় স্থানীয় গির্জ্জার একটী অংশে স্থাপিত হইত। ঐ বাইবেলখানি সেই পাঠাগারের একটী ডেস্কে শিকল দিয়া বাঁধা থাকিত। অনেক লোক যদি পড়িতে আসিত, তবে তাহাদিগকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত—একটীর পর একটী করিয়া পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণ পড়িবার অধিকার পাইত। পাঠাগারে কেবলমাত্র বাইবেল রাখিবার কথায় আলেকজাণ্ড্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পাঠাগারধ্বংসের গল্প মনে পড়ে। অনেকের মতে গল্পটী সত্য নহে। গল্পটী এই—উক্ত নগর মিশরের অন্যতর রাজধানী ছিল এবং উক্ত নগরে একটী লক্ষ লক্ষ গ্রন্থসমন্বিত সুবৃহৎ পাঠাগার সংস্থিত ছিল। যখন উক্ত নগর মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইল, তখন তাহাদিগের নেতা উক্ত পাঠাগারধ্বংসের আদেশ দিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি তাঁহার আদেশের এই যুক্তি দিয়াছিলেন যে, ঐ পাঠাগারের পুস্তকগুলিতে যাহা আছে তাহা যদি কোরাণে থাকে, তবে ঐ পুস্তকগুলি সঞ্চিত রাখা নিষ্প্রয়োজন; আর যদি ঐ পুস্তকগুলিতে যাহা আছে, তাহা যদি কোরাণে না থাকে, তবে সেগুলিকে কোরাণের বিরোধী বলিয়া ধরিতে হইবে, কাজেই ঐ পুস্তকগুলির বিনাশসাধনই প্রার্থনীয়—সুতরাং যেদিক দিয়া ধরা যাউক, পাঠাগারের পুস্তকগুলি অগ্নিসাৎ করাই শ্রেয়স্কর। বোধ হয় এই প্রকার কোন যুক্তিবলে অষ্টম হেনরির সময়েও সাধারণ পাঠাগারে একমাত্র বাইবেল গ্রন্থ রক্ষা করা সঙ্গত বলিয়া বোধগম্য হইয়াছিল। আমাদের দেশে, বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে এপ্রকার গোঁড়ামীর কোনও দৃষ্টান্ত পাই না।

দুইটী শুমঙ্গল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দিলাম; কিন্তু এরূপ অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতে পারে—বিদ্যালয়, জলের কল, যাদুঘর বা museum, চিড়িয়াখানা বা zoo ইত্যাদি। সাধারণের হিতজনক এই সকল অনুষ্ঠানে সহরবাসীদের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। নিজ নিজ সহরের বা পল্লীগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ না করি, সাহায্য না করি, তবে দেশের হিতকর বৃহত্তর কার্য্যসমূহে কি প্রকারে হৃদয় মন নিয়োগ করিতে পারিব? নিজের মঙ্গল হইতে যেমন পরিবারের, পরিবার হইতে যেমন সমাজের, এবং সমাজ হইতে দেশের মঙ্গলসাধনে অগ্রসর হইতে হয়, সেইরূপ প্রকৃত দেশাত্মবোধ অন্তরে জাগ্রত করিতে চাহিলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলেই তাহা সহজ হয়। আমি উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে যে, দেশাত্মবোধের জাগরণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উপযোগিতা আছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

গুর্জ্জরী টোড়ী—তেওড়া।

ধন্য বিশ্বনাথ তারক অযুত বালা
কণ্ঠ শোভিত করে বিরাজিত
সত্য রূপে সতত বিরাজিত
অন্ত তোমার অন্ত কোথা?

তুমি আদি পুরাণ সব পাপ হারী
প্রাণ সবারি শঙ্কর দীনের হর হে ব্যথা
ধরি চরণ কৃপা করি পাপ তাপ সব বিদূরি হে,
রহিও চিত্তে সদা।

গান শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩' ১´ ২ ৩
I দা -া দা। দা -া। পদা -া I পা -া মা। জ্ঞা মা। পা -া I
ধ • ন্য বি • শ্ব • না • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ণদা -া -া। ণদা -া। পা পা I মা দা দা। ণা -া। র্সা -া I
স্ব • • ভা • র ক অ যু ত মা • না •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ণর্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্ঋা র্ঋা। র্সা র্সা I ণদা -া দা। ণদা -া। পা মা I
ক • • ই শো ভি ত ক রে • বি রা • জি ত

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা -া দা। ণদা -া। জ্ঞা -া I জ্ঞমা জ্ঞা জ্ঞা। ঋা ঋা। সা সা I
স • ত্য হ • পে • স ত ত বি রা জি ত

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -া সা। মা -া। পা পা I দা -া দা। ণদা -া। পা -া I
অ • ন্ত তো • মা র অ • ন্ত কো • থা •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{ I পা -া মা। ণদা -া। ণা ণা I র্সা -া র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা I
তু • মি আ • দি পু রা • ণ স ব পা প

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সাঃ র্ঋাঃ ণা। র্সা -া। র্জ্ঞা র্ঋা I র্ঋা -া র্সা। ণা -া। দা দা } I
হা • রী প্রা • ণ স বা • রি শ • ঙ্ক র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা পা। পা মা। পা ণা I ণা -া -া। দা -া। পা -া I
দী নে র হ র হে ব্য থা • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -া মা। ণদা -া। ণা ণা I ণা র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া I
ধ • রি চ • র ণ কৃ পা • ক • রি •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া ণা। র্সা -া। র্জ্ঞা -া I র্ঋা -া র্সা। র্সাঃ ণঃ। র্সা র্ঋা I
পা • প তা • প • স • ব বি • দূ রি

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা ণা দা। পা মা। জ্ঞা ঋা I সা -া -া। র্সাঃ ণঃ। র্সা র্ঋা I
হে • • • • • • • • • র • হি ও

১´ ২ ৩
I র্সা -া ণা। দা -া। পা -া IIII
চি • ত্তে স • দা •

খাম্বাজ—চৌতাল।

বংশী ধ্বনি গো তোমার বাজিছে হৃৎ বৃন্দাবনে
মগ্ন বধির যেন কর‍যে বৃথা তব না শুনি আহ্বান
রহিয়া রহিয়া মরমেতে জাগে যেন দামিনী চমকিত
নাম তব নারে ধরি বাঁধিবারে মম পরাণ
এসো হে এসো চিদাসনে আদিত্য বরণ অরূপ অতনু
ভক্তি দাও শক্তি দাও কলুষ হরণ নাথ হে
চরণ ধরিয়া যাহে উত্তরিতে পারি ভবসিন্ধু
তব নয়নে রাখি হে অনিমেষ দুই মম নয়ান।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি শ্রীবাণীদেবী।

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II না -া। র্সা -া। র্সনা র্রা। র্সা -া। ণা ধা। :প: মা I
বং ০ শী ০ ধ্ব০ নি গো ০ তো মা ০ ০ র

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I গা মা। পা ধা। র্সা -া। মা -া। গা মা। পা মা I
বা ০ জি ছে হৃ ৎ বৃ ০ ন্দা ০ ব নে

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I গমা রা। সা সা। মা গা। মা ণধা। ণধা না। র্সা র্সা I
ম০ ০ গ্ন ব ধি র যে ন০ ০০ ক র যে

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্মা। র্গা র্মা। র্রা র্সর্সা। র্সনা র্রা। র্সা ণধা। ণপা ধা I
বৃ থা ত ব না ০০ শু০ নি আ হ্বা ০০ ন

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
{ I মা মা। ণধা না। র্সা র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা। র্সনা র্সা I
র হি য়া০ র হি য়া ম র মে তে জা০ ০

০ ২ ০ ৩ ৪
I র্রা -া। র্সা র্সা। র্সা :ন:। র্রা র্সা। র্সা ণা। ধপা ধা I }
গে ০ যে ন দা ০ মি নী চ ম কি০ ত

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সণা :ধ:। পমমা -া। গা মা। ণধা ণধা। না র্সা। নর্সা র্সা I
না ।০ ম০০ ০ ত ব না০ ০০ রে ধ ০০ রি

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্মা। র্গা র্মা। র্রা র্সা। না র্রা। র্সা ণধা। ণপা ধা II
বাঁ ০ ধি বা ০ রে ম ম প রা ০০ ণ

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্সা। না র্সা। -া র্রা। র্সা -া। ণা ধা। :প: মা I
এ সো হে এ ০ সো চি ০ দা স ০০ নে

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মা পা। পা র্সা। ণা ধা। মমা গমা। রা রা। সা সা I
আ দি ত্য ব র ণ অ রূ০ ০ প অ ত নু

+	০	২	০	৩	৪
I মা -া |	গা মা |	পা পা |	মা গা |	মা রা |	-া সা I
ভ	ক্তি দা	০ ও	শ ০	ক্তি দা	০ ও

+	০	২	০	৩	৪
I সা -া |	মা গা |	গা মামা |	পা র্সা |	-া ণা |	ধা -া I
ক ০	লু ষ	০ হ র	ণ না	০ থ	হে

+	০	২	০	৩	৪
I ধা ণা |	পা ধা |	-া না |	র্সা -া |	না র্সা |	-া র্সা I
চ ০	র ণ	০ ধ	ম্রি ০	য়া যা	০ হে

+	০	২	০	৩	৪
I র্সা র্সা |	র্রা র্রা |	র্সা র্সা |	র্সা নর্রা |	র্সা ণা |	ধপা ধা I
উ ত	রি তে	পা রি	ভ ০ ০	ব সি	০ ০ ন্ধু

+	০	২	০	৩	৪
I র্সণা ধা |	মা -া |	গা মা |	ণধা ণধা |	না র্সা |	নর্সা র্সা I
ত ০	ব ০	ন য়	নে ০ ০ ০	রা খি	০ ০ হে

+	০	২	০	৩	৪
I র্সা র্মা |	র্গা র্মা |	র্রা র্সা |	র্সনা র্রা |	র্সা ণা |	ধপা ধা I[I]
অ নি	মে ষ	দু ই	ম ০ ম	ন য়া	০ ০ ন

ধর্ম্মসাধনে সন্ন্যাস আশ্রম।*

(৺ ঈশানচন্দ্র বসু)

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। ধর্ম্মে আনন্দ আছে। তবে ধর্ম্মের আচরণে লোক বিমুখ হয় কেন? তাহার কারণ এই যে ধর্ম্মিষ্ঠ লোকেরা তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সুতরাং তজ্জনিত আনন্দ সম্যক উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। যাঁহারা তাঁহাদের অনুগমন করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা ঐ আদর্শভূত লোকদিগের চরিত্রে ও ব্যবহারে ধর্ম্মানন্দের পরিচয় পান না। অতএব আনন্দস্বরূপ পবিত্র পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি যায় না। তাঁহাদের বিশ্বাস খর্ব্ব হয়, মন চঞ্চল হয়, ধর্ম্মের প্রতি ঔদাস্য জন্মে, তাঁহাদের কষ্ট সার হয়।

সর্ব্বত্যাগী না হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; তাঁহার ধর্ম্মামৃত লাভ হয় না; ইহা মানবমণ্ডলীর সাধারণ প্রত্যয়। এই সাধারণ বা সর্ব্বজনীন প্রত্যয় এত প্রবল যে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে অনেককে কেবল লোকের শিক্ষার নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

উক্ত সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার-পরম্পরায় হিন্দুদিগের এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, ধর্ম্মের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি তাহা এই সন্ন্যাসীরাই প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রথম সময়ে লোকের এই প্রতিবাদ ছিল যে ব্রহ্মজ্ঞান সন্ন্যাসধর্ম্ম-সিদ্ধ; গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করিতে পারে না। রামমোহন রায় মনু-সংহিতার বচন ধরিয়া তাহার উত্তর দেন—

> জ্ঞানেনৈবাপরা বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
> জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ॥
>
> —মনু ৪।২৪

কতকগুলি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা (গার্হস্থ্য-বিহিত) এই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উপনিষৎরূপ জ্ঞানচক্ষু সহকারে দেখিতে পান যে জ্ঞানই এই সকল যজ্ঞের মূল কারণ।

এই শ্লোক, ইহার টীকা-লিখিত বেদসন্ন্যাসী গৃহস্থ-দিগের কথা এবং বৈক্ক, বাচক্নবী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির উদাহরণ দ্বারা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন

---

* ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মগণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে রাজা রাম-মোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি আমৃত্যু ব্রাহ্মসমাজের সেবাকেই স্বীয় জীবন ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার 'দপ্তর' অনুসন্ধানে কয়েকটী অপ্রকাশিত পুরাতন রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে; উহাদের মধ্যে একটি আজই আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তঃ সং

যে সর্ব্বাশ্রমী ও অনাশ্রমী, সকলেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। গৃহস্থ হইয়াও লোক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, বিতর্কিত বিষয়ের এই মীমাংসা স্থাপন হইয়াছিল।

মনুষ্যজীবনের চারি আশ্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথম, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা। দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম অর্থাৎ বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, ধনোপার্জ্জন ইত্যাদি সংসারের তাবৎ কর্ম্মের অবস্থা। তৃতীয়, বানপ্রস্থাশ্রম অর্থাৎ সংসারব্রতের সমাপ্তিসাধনের অবস্থা। চতুর্থ, সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বস্বত্যাগের অবস্থা।

এই চারি আশ্রম বা চারি অবস্থাই ধর্ম্মসাধনাত্মক। লোক বয়ঃক্রমানুসারে চারি অবস্থাতে উত্তরোত্তর ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। এতন্মধ্যে গার্হস্থ্য নামক আশ্রম বা অবস্থাকে প্রধান বলা যায়; যেহেতু অপর তিন আশ্রমের লোক গৃহস্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম প্রতীক্ষা করেন। ব্রহ্মজ্ঞান এই চারি আশ্রমেরই মূল।

এই চতুরবস্থা-সিদ্ধ আশ্রম-ধর্ম্ম স্থাপন নিমিত্ত প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রভূত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলে পরিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ সমুদিত হইয়াছে। ইহাতে কোন আশ্রমের বিধান নাই বটে, কিন্তু সকল-আশ্রম-সিদ্ধ ধর্ম্ম গৃহস্থ ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে। কারণ গৃহস্থ হইতে সকল আশ্রমের উৎপত্তি হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথমাবস্থায় যখন এক্ষণকার সুপ্রসিদ্ধ, তখনকার নবীন যুবক, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত সভাতে বক্তৃতা করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন, তখনও তাঁহার সংস্কার ছিল যে ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইলে সন্ন্যাসের পদ্ধতি আরম্ভ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই তরুণ অবস্থায় ইহার প্রকৃতির পরিচয় নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। তখন কেহ নিশ্চিত বুঝিতে পারেন নাই যে ব্রাহ্মসমাজের গতি কোন্ দিকে যাইবে।

পরে নানা প্রকার বিচার ও আচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে গৃহস্থের ধর্ম্ম তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের মনে এই প্রত্যয় বদ্ধমূল হইয়া আছে যে ঈশ্বরের সহিত বিষয়ভোগের বিরোধী সম্পর্ক। এই প্রত্যয় বশতঃ এদেশীয়েরা এখনও ভাবেন, বিষয়ী লোকেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন না; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়েন না।

বিষয়ী লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আত্মসংযমাদি দ্বারা ধর্ম্মের কেমন উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহার উদাহরণ এপর্য্যন্ত অধিক প্রদর্শিত হয় নাই। চির সংস্কারানুযায়ী সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি লোকের যে আকর্ষণ আছে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও তাহার বল প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ন্যায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সন্ন্যাস বেশে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ঐরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আর এক ব্যক্তি উক্তরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার নূতন নাম সত্যানন্দ স্বামী।

বাঙ্গালী (হিন্দু) দিগের মধ্যে আর একব্যক্তি পরিব্রাজক ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহার পরিবর্ত্তিত নাম কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

বাঙ্গালী হিন্দুসম্প্রদায়ের আর এক ব্যক্তি সম্প্রতি আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়া হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মানুগত নাম বিবেকানন্দ স্বামী।

এই গোস্বামী ও স্বামী মহোদয়গণের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য জুটিয়াছেন। গৃহস্থেরা সহজে মনে করিতেছেন, এই মহাত্মা ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইঁহারা প্রণম্য, ইঁহারা গুরু, ইঁহারাই ধর্ম্মের উপদেষ্টা।

শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসাচার্য্যের শিষ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস শ্রীমৎকেশবচন্দ্রকেও শিক্ষা দিয়া সন্ন্যাস বেশ পরাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। বিবেকানন্দ স্বামীর ন্যায় উক্ত পরমহংস স্বামীর আরও ১৯ জন শিষ্য আছেন। তাঁহারা ঐরূপ সন্ন্যাসীর দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উপদেশ-পুস্তক সমালোচনা করিয়া থিও সাফিষ্ট পত্রিকায় লিখিত আছে :—

The gist of the whole document is a supplication that a band of ascetic missionaries of his own stamp may be formed, to cover all India in their wanderings to expound religious themes, and, adove all, set the example of consistent living.

আমরা এই সন্ন্যাসীগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বা যতি বা আচার্য্য, যে নামে তাঁহারা আপনাদিগকে অভিহিত করেন, আমরা তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা সহস্র শিষ্যে পরিবৃত থাকুন। যুবকেরা নবোদ্যমে নানা দিকে প্রধাবিত হইতে পারেন এবং বহুবিধ দুঃসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। "শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু"

এই বলিয়া আমরা অবশ্যই তাঁহাদের সাধু কামনার সিদ্ধি বাঞ্ছা করিব ; কিন্তু বিবেকানন্দ স্বামীজী যে সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে চাহেন, তাহা যথার্থ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন :—

"Similarly, these man-gods show what the Hindu relingion is. They show the character, the power and the possbilities of that racial tree which.................culture by centuries and has borne the buffets of a thousand years of hurricaue and still stands with unimpaired vigour of eternal youth.

বাস্তবিক, সন্ন্যাসধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাদের শ্রেষ্ঠতম অংশ বলা যায় না। হিন্দুধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

সংসারের সকল ভার গৃহস্থের উপর বর্ত্তে। তাঁহাকে যথাবিধি সেই ভার বহন করিতে হয়। ক্রমশঃ উর্দ্ধতর ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই গৃহস্থেরাই বলিতে পারেন মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ ধর্ম্ম কি?

এই জন্য মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্মত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এই বিধি আছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে এই শাস্ত্রবাক্যকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্ম বিবৃত করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরোদ্দেশে সর্ব্বত্যাগী হইবেন। আবার ঈশ্বরেরই প্রিয় কার্য্য বলিয়া নিঃস্বার্থ মনে সংসারের কর্ম্ম করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ।

যিনি পুত্র-পরিবারাদির ভার হইতে মুক্ত হইয়া অন্য প্রকারে লোকের সেবা করিয়া জীবন ক্ষেপণ করিতে চাহেন, তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সেই বংশের নিকট তাঁহার যে ঋণ আছে, তাহা যথাসাধ্য শোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। পুত্র-পরিবারাদি যাহা তাঁহার বর্ত্তমান থাকে তাহাদের প্রতি তাঁহার যে যে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিয়া আপনাকে অঋণী বিবেচনা করিলে তবে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিবেন।

কিন্তু আর একটী কথা আছে। যাহা সৎকর্ম্ম, তাহা ব্রতবৎ দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আচরণ করিতে হয়, তদ্ভিন্ন কোন কঠিন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। ধর্ম্মশিক্ষাদান সেইরূপ একটী ব্রতবিশেষ। তাহা নিষ্ঠা সহকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শুদ্ধরূপে সম্পাদন করিতে হয়। তজ্জন্য অবকাশ আবশ্যক। যে সময় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে সময়ে অন্য কার্য্যের বিরতি অবশ্যই ঘটিবে। সমাজ তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

কিন্তু এরূপ শিক্ষক কোনমতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মসঙ্গত অর্থোপার্জ্জনাদি কার্য্যের অবমাননা করিবেন না। পক্ষান্তরে গৃহস্থেরাও ধর্ম্মশিক্ষকের অকিঞ্চনত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিবেন না। ধর্ম্মশিক্ষক সম্মানিত হইলে তবে তাঁহার শিক্ষাদান কার্য্যকর হইবে। অতএব ধর্ম্মোপদেষ্টার সর্ব্বোপরি অধিক মর্য্যাদা স্বীকার করিতে হইবে।

পরিচ্ছদাদি বিষয়ে ধর্ম্মোপদেশকের কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকাই উচিত। যেহেতু তিনিও সাধারণ গৃহস্থের মধ্যগত। অন্তঃকরণের অকিঞ্চনত্ব লক্ষণেই তিনি সকলের নিকট বিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য মান্য ও পূজাস্পদ হইবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এবম্বিধ ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রয়োজন অস্বীকার করেন না। এই প্রয়োজনের নিতান্ত প্রযুক্ত হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে পুরোহিত, বংশে বংশে গুরু এবং দেশে দেশে সাধু সন্তদিগের এক এক মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মের শিক্ষক। ধর্ম্মের উপদেশ এবং ধর্ম্মোপাসনা পক্ষে সহায়তা ভিন্ন ইঁহাদের অন্য কর্ম্ম নাই। যে কার্য্যের জন্য এতগুলি ধর্ম্মশিক্ষকের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার প্রয়োজন হয়, দশ বিশ জনের দ্বারা তাহার কতটুকু সাধিত হইবে?

এই হিন্দুধর্ম্ম কালপ্রবাহে যে দোষাশ্রিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন জন্যই সেই সনাতন ধর্ম্মের ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, লোক সত্য মিথ্যা, সার-অসার নির্ব্বাচনে চক্ষুষ্মান হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এদেশে যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেষ্টা শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা গুরুপদবাচ্য হইয়াছেন। গুরুগণ ধর্ম্মশিক্ষা ব্যপদেশে কেবল শিষ্যের বিত্ত শোষণ করিতেন। তন্ত্রোক্তি দ্বারা তাহা স্পষ্ট জানা গেল। তন্ত্রের বচন এই :—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভো হি গুরু র্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

এই বচনের আলোচনাতে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা গুরুর গুণ সর্ব্বত্র বিদিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কতক-ফলও হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারের প্রবলতা বশতঃ তাহার সম্যক ফল হইতেছে না, এখনও গুরুত্ব ও পৌরোহিত্য অনেকটা অলস অনভিজ্ঞ লোকের কার্য্য হইয়া আছে, এখনও বিস্তর সন্ন্যাসী কেবল ভিখারী মাত্র। যাঁহারা

নূতনতর যতি সন্ন্যাসী ইত্যাদি শ্রেণীর সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারাও কালক্রমে ঐরূপ কোন দোষাশ্রিত হইবেন কিনা বলা যায় না। আমরা চাই :—

১। শাস্ত্রগুলির উত্তম ব্যাখ্যা হউক।

২। দেশের গুরু-পুরোহিত ও বালক-বালিকাগণের শিক্ষকগণ দ্বারা শাস্ত্রের অনুশীলন হউক।

৩। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পালন দ্বারা চরিত্র গঠিত হউক।

৪। লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হউক।

৫। শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের নামে, প্রাচীন ঋষি আচার্য্য ও ভক্তদিগের নামে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হউক।

৬। দেশের সাধারণ লোকে এই শিক্ষার পরীক্ষক ও পরিচালক হউন। তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ঋণানি ত্রীণপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ—প্রাচীন ঋষিদিগের এই এক উপদেশ আছে। যখন দেখিবে যে সংসারের আবশ্যক কর্ম্ম এক প্রকার সমাধা হইয়াছে, যখন পরলোকের দিকে অধিকতর অগ্রসর বিবেচনা করিবে, তখন নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা একান্ত প্রার্থনীয় হইবে। শেষ বয়সের তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়।

তখন—

নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ।

এই মনুবচন অনুসারে গৃহেই থাকুন আর তীর্থবাস করুন, তিনি ঈশ্বরচিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিবেন। তখন নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তার অবকাশপ্রাপ্তি লোকের পক্ষে এক প্রকার সৌভাগ্যের চিহ্ন এবং তাহার বিপরীত তাহার দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বিবেচনা করিতে হয়।

তদনন্তর সর্ব্বত্যাগের অবস্থা। রঘুবংশকার কবিও তৎসম্বন্ধে এই আদর্শ দেখাইয়াছেন।

সংসারে অকলঙ্কিত জীবন যাপন করিয়া শেষ বয়সে ঈশ্বরাবলম্বনে তিনি যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন, সংসারের লোক তাহার যতটুকু জানিতে পারে তাহাতেই তাহার উপকার হইবে। তাঁহার শেষ জীবনের উজ্জ্বল পথ ও বিমল আনন্দলাভের নিমিত্ত অপর সকলে চেষ্টা করিবে।

সংস্কৃত ভাষার সংক্ষেপ ইতিহাস ও তাহার প্রকৃত পরিণতি।

(শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী)

সংস্কৃতভাষা দেবভাষা—বাস্তবিক ইহা দিব্যচরিত্র ঋষি-মুনি ও তাঁহাদের বংশধরগণেরই ভাষা। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ ভাষা জগতে আছে কি না জানি না। ঋষিমুনিগণ শুদ্ধ ও পবিত্র ছিলেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় অশুদ্ধ ও অপূর্ণ নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কথিত ভাষাও যে শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছু নাই।

সংস্কৃতভাষার বর্ণমালা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। উচ্চারণস্থানের ক্রমিক সন্নিবেশ অনুসারে বর্ণমালা সাজান হইয়াছে। শব্দ বা ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণগুলি বায়ুর অভিঘাত দ্বারা মুখগহ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। কণ্ঠে তাহা প্রথমে অভিহত হয়; সুতরাং কণ্ঠ্যবর্ণ ক-বর্গ প্রথমে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কণ্ঠের পরে তালুর স্থান, তাই তালব্য বর্ণ চ-বর্গ ক-বর্গের পরে স্থাপিত হইয়াছে। মূর্দ্ধার স্থান তালুর পরে সুতরাং মূর্দ্ধন্য বর্ণ ট-বর্গ চ-বর্গের পরে স্থাপিত। তার পর দন্ত ও ওষ্ঠ, তাই দন্ত্যবর্ণ ত-বর্গ ও ওষ্ঠ্যবর্ণ প-বর্গ পরে পরে স্থান লাভ করিয়াছে। শব্দ উচ্চারণের এইগুলিই মূল স্থান, তাই ব্যঞ্জনের বর্গগুলি উচ্চারণ-স্থানের ক্রমিক সন্নিবেশ অনুসারে পরে পরে স্থাপিত হইয়াছে। স্বরবর্ণের প্রধান উচ্চারণস্থান তিনটী—কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ; তাই অ, ই, উ ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। ব্যঞ্জনের অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব দুই স্বরের বিলোম যোগে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাদের জাতিপাত হওয়ায় স্বরবর্ণের স্থানচ্যুত হইয়া ব্যঞ্জনের শেষে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্বরবর্ণের ঋ, ঌ রি লি বা লৃ রূপে উচ্চারিত হয়। এই দুটীতে ব্যঞ্জনবর্ণ যোগের লেশ থাকায় ইহারা শুদ্ধ স্বরবর্ণ উর পরে স্থাপিত হইয়াছে। এ ঐ ও ঔ চারিটী যুক্ত স্বরবর্ণ, তাই ইহাদের স্বরবর্ণের শেষে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাম ক্রোধ বা শোকে মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে যে ধ্বনি নিঃসৃত হয় উহা উষ্মবর্ণ দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। এগুলি রিপুর মধ্যে গণ্য; এই কারণে উষ্মবর্ণগুলি বর্ণমালার সর্ব্বশেষে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষার সৃষ্টির সময় এইরূপ সজ্জিত আকারে বর্ণমালা সৃষ্ট হয় কি না তাহা জানি না, সম্ভবতঃ তাহা হয় নাই; তবে ইহা নিশ্চিত যে ঋষিগণ এক-একটী শুদ্ধ বর্ণই উচ্চারণ করিতেন—একটী বর্ণ দ্বারা একটীমাত্র শুদ্ধ অবিকৃত ধ্বনি স্ফুরিত করিতেন। তাহাই কাল-প্রবাহে সজ্জিত বর্ণমালার আকার পরিগ্রহ করে।

কতকাল পূর্ব্বে এই বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এই বর্ণসমষ্টি দ্বারা যে ভাষার উৎপত্তি হয়, সেই পরিশুদ্ধ ভাষাতেই ঋগ্বেদ রচিত। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনাকাল অবধারিত হইলে সেই ভাষার উৎপত্তির স্থূল সময়ও নিরূপিত হইতে পারে। ঋগ্বেদ এক সময়ে রচিত হয় নাই। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঋষিগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের অভিব্যক্তিরূপ

রচনার পূর্ব্ব। মন্ত্রপাঠ কালে ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগের বিশেষ ভাবে উল্লেখ দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইতেছে *। এগুলির উল্লেখ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হয় যে পরবর্ত্তী ঋষিবংশ পূর্ব্বতনগণের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জনাই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান।

বিশেষজ্ঞগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে কলির প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হয়; সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে যে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। ভাষাপ্রকাশক বর্ণ বা অক্ষর সে কালেরও পূর্ব্বে যে সৃষ্ট হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋষিগণ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ও চিন্তাশীল ছিলেন। সাধারণ মনুষ্যই কোন কঠিন বিষয়ের সাধন কল্পে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে সেই বিষয় লাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, ঋষিদের ত কথাই নাই। যে ঋষিগণ বহু কাল পূর্ব্বে চিত্ত একনিষ্ঠ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সাধনপ্রণালী যোগকর্ম্মের গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া চিত্তের অলৌকিকী শক্তির জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাষার ভাবপ্রকাশক বর্ণমালার আকার প্রদান করা কঠিন কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের অনুমান, সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিমূলক বর্ণের আকারও কল্পিত হইয়াছিল।

ভগবান ব্যাসদেব দ্বাপর-শেষে ও বর্ত্তমান কলির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই ঋগ্বেদের বর্ত্তমান সজ্জিত আকার প্রদান করেন। তিনি তিন বৎসরে মহাভারত রচনা সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং তাঁহার সময় যে লিখনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপিচ কোন রচিত বিষয় কালের পূর্ব্বাপর অনুসারে সজ্জিত করাও বর্ণমালার সদ্ভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনার পূর্ব্বে ঋষিবংশের মুখে মুখে থাকিয়া 'শ্রুতি' নামের সার্থকতা প্রকাশ করিলেও ব্যাসদেবের সময়ের পূর্ব্ব হইতে উহা যে লিখিত আকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। তিনিই ইহাকে পূজ্য ঋষিরচয়িতৃগণের প্রাদুর্ভাব-কাল অনুসারে সজ্জিত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

ভগবান ব্যাসদেবের প্রায় ১০০ বৎসর পরে ভগবান পাণিনি বৈদিক ভাষা ও সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়ন তাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্যের তুল্য-কালভাবিক লিখিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ভগবান পাণিনি যে যাজ্ঞবল্ক্যের সমকালবর্ত্তী মুনি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের শতপথ ব্রাহ্মণে জ্যোতিষিক গণনার উল্লেখ আছে। তাহার দ্বারা তাঁহার সময় নিশ্চিত করিতে পারা যায়। তাঁহার সময় বসন্তিক বিষুবান (Vernal equinox) কৃত্তিকা নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে উহা পূর্ব্ব ভাদ্রপদার মধ্যস্থলে সংঘটিত হইতেছে; সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে বিষুবান প্রায় (কৃত্তিকার যোগতারা ৩৭°৩০+ ২২°৩০´)=৬০´´ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের সময় ঋতুর যে সময়পরিবর্ত্তন হইত বর্ত্তমান সময়ে তাহার প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে সেই ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইহা জ্যোতিশ্চক্রের প্রহেলিকা। কারণ নির্দ্দেশ করা বৃথা। এরূপ ঘটিতেছে, তাহা জ্যোতিষীগণ পূর্ব্ব গণনার সহিত মিলাইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গ্রীনদেশীয় জ্যোতিষী হিপার্কস (Hipparcus) উহা প্রথমে প্রচার করেন। আমাদের বরাহ-মিহিরও উহা বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় জ্যোতিষীগণের মতে বিষুবান প্রায় ৭২ বৎসরে এক অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে; সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৪৩২০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ২৪০০ বৎসরে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে ভগবান পাণিনিও খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব প্রায় ২৪০০ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হন। অতএব পাশ্চাত্য লেখকগণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুবর্ত্তী দেশীয় লেখকগণ পাণিনির যে খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৯০০ বা ৬০০ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহা সর্ব্বথা অশ্রদ্ধেয়।

ভাষার বহুল প্রচার না হইলে ব্যাকরণের আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। সুতরাং ভগবান পাণিনির সময় যে সংস্কৃত ভাষা চরম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে অনেক প্রাচীন বৈয়াকরণের মতোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেও মুনিগণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে "ছান্দস" ও "ভাষা" বলিয়া দুই কথার প্রয়োগ করিয়াছেন। ছান্দস দ্বারা বৈদিক সংস্কৃত ও ভাষার দ্বারা সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা বুঝাইতেছে; সুতরাং তাঁহার সময়ে যে সংস্কৃত ভাষা কথাবার্ত্তার ভাষা ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এবং ছান্দস বা ঋগ্বেদীয় সংস্কৃত যে অপ্রচলিত ও প্রাচীনভাষারূপে দাঁড়াইয়াছিল তাহারও সন্দেহ নাই। যাস্কের নিরুক্ত সে কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

পাণিনির ভাষা শব্দে সংস্কৃত শব্দ সংযোগ করা সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী মনীষীগণের কার্য্য। সম্ভবতঃ তাঁহারাই ইহাকে "দেবভাষা" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। দেব অর্থে কেবল যে অমর্ত্ত্য স্বর্গবাসী উৎকৃষ্ট-যোনি তাহাই নহে,

* গায়ত্রী মন্ত্রপাঠ কালে 'বিশ্বামিত্র ঋষি গায়ত্রী ছন্দ সূর্য্য দেবতা ওঁ প্রাণায়ামে বিনিয়োগ' বলিতে হয়। সুতরাং গায়ত্রী-মন্ত্রের রচয়িতা বিশ্বামিত্র, উহা সূর্য্যদেবের স্তুতি; উহাকে ব্রহ্মস্তুতিতে পরিণত করা যাজ্ঞবল্ক্যের কাজ। তাঁহার বৃহদারণ্যকে তাহার ব্যাখ্যা আছে।

উহার অন্তর্গত অর্থ "যাহা দীপ্তিমান" "যাহা প্রকাশিত হইয়া আছে" এই অর্থে রূপবান্ কীর্ত্তিমান্ মাত্রেই দেব-শব্দের অর্থ হইতে পারে। ছান্দস অর্থাৎ ঋগ্বেদ ঋষিগণের রচিত কীর্ত্তি। তাঁহারা ভারতের পুণ্য জগতে ঐ কীর্ত্তি রাখিয়া দীপ্তিমান হইয়া আছেন। সুতরাং তাঁহারা যে "দেব" ইহা নিশ্চিত হইতেছে। আবার পরবর্ত্তী স্মৃতি-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, স্বর্গবাসী দেবগণ ঋষিগণের সন্তান সুতরাং তাঁহারা "দেবতা" হইতেও পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। এই সকল কারণে পরবর্ত্তী বংশের নিকট বেদ রামায়ণ মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতির ভাষা দেব বা সংস্কৃত বা পরিশুদ্ধ ভাষা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সজীব ভাষারই পরিবর্ত্তন হয়। বৈদিক ঋষিগণের সময়ে বেদের প্রাচীন সংস্কৃতই কথাবার্ত্তার ভাষা ছিল। যাস্কের নিরুক্ত ও নির্ঘণ্টু তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। একই শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার সজীব ভাষাতেই ঘটিয়া থাকে—প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষায় তাহা ঘটিতে পারে না। যাস্কের নির্ঘণ্টুতে এইরূপ বৈদিক শব্দের সংগ্রহ আছে। নিরুক্তে শব্দ অবলম্বন করিয়া যাস্ক ভাষ্যকারের ন্যায় বিচার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যরচনাপ্রণালী পরবর্ত্তী কালের চাণক্য মুনির বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের রচনাপ্রণালী হইতে ভিন্ন—একটী দুর্ব্বোধ অপরটী সহজবোধ্য। ইহার দ্বারা উভয়ের সময়ের সংস্কৃত ভাষার অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। যাস্কের সময় যে সংস্কৃত কথাবার্ত্তার ভাষা ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু চাণক্যের সময় তাহা অপ্রচলিত হইয়াছে; উহা ব্যাকরণের নিগড়ে স্থির হইয়া গিয়াছে।

যজুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। উহার ভাষা ঋগ্বেদীয় সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন; সুতরাং উহা যে ঋগ্বেদের বহু বহু কাল পরে রচিত হইতে আরব্ধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। যজুর্ব্বেদ রচনার প্রায় সমকালে ভগবান বাল্মীকি ভগবান ব্যাসদেব ও বৈবস্বত মনু প্রাদুর্ভূত হন। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা দেখিতেছি ইহা প্রাচীন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ মাত্র—প্রাচীন দুর্ব্বোধ সংস্কৃত নূতন সহজ সংস্কৃতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারতের প্রাচীন টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র মহাভারতের এরূপ প্রাচীন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা সহজে বোধগম্য হয় না। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ঐরূপ দুর্ব্বোধ সংস্কৃত ব্যাসদেবের সময় কথাবার্ত্তার ভাষা ছিল। ব্যাসদেবের সংস্কৃতের দুই একটী নিদর্শন মহাভারতে অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে। ভগবদ্গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায় তাহার একটী। জতুগৃহদাহ পর্ব্বে বিদুর যে ম্লেচ্ছ ভাষার কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেন তাহায় পৈচাও ভাবে সংস্কৃতে বর্ণন তাহার আর একটী। সম্ভবতঃ মহাভারতের ব্যাসকূট প্রাচীন সংস্কৃতেরই উদাহরণ। বোধ হয় বেদাঙ্গগুলিও প্রাচীন সংস্কৃতের নিদর্শন। ছন্দঃসূত্র-প্রণেতা পিঙ্গলের কথা কোথাও কোথাও দুর্ব্বোধ দৃষ্ট হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষও দুর্ব্বোধ। ইহা লগধের রচনা।

ইহাদেরই পরে সম্ভবতঃ সংস্কৃতভাষা প্রাদেশিক প্রাকৃতে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের সময় উহা দেশময় চলিত ভাষা হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি সেই সহজবোধ্য ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সংস্কৃতে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই, ইহা অজ্ঞ ও মূর্খের কথা। ত্রিপিটকের অন্তর্গত তাঁহার কথিত পালি "ধর্ম্মপদ" গ্রন্থ এই উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উহাতে বেদত্রয়, ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃত ভাষা তিনটীর প্রতিই সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।

যখন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ মনীষিগণ সংস্কৃত ভাষাকে স্থির ও প্রচলিত রাখিবার জন্য চিন্তিত হন এবং উহাকে সজীব রাখিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহারাই চেষ্টা করিয়া সাধারণের শিক্ষাস্থানীয় প্রাচীন রামায়ণ মহাভারত মনুসংহিতায় সহজ সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া যান। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের মনীষিগণই অন্যস্মৃতিও সহজ সংস্কৃতেই প্রচার করেন। এই সময়েই বোধহয় প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যবহৃত হইতে আরব্ধ হয়। একটী উদাহরণ দিই—গৃহ শব্দের প্রাকৃতরূপ কোন প্রদেশে গেহ আবার কোন প্রদেশে ঘর হইয়াছে। মৃচ্ছকটীকের ইতরজাতীয় শকারের মুখের ঘর আবার "ঘডং" হইয়াছিল। সে যাহা হউক এই গেহ শব্দ সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়।

বুদ্ধদেবের সময় প্রাকৃত ভাষার বহুল প্রচার হইয়াছিল। প্রতি প্রদেশেই প্রাকৃতের অল্প-স্বল্প বিভিন্নতা লক্ষ্য হইত। বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মমত পাটলিপুত্রে প্রচলিত প্রাকৃতেই প্রচার করেন। সংস্কৃত পাটলি শব্দই প্রাকৃতে "পালি" আকার ধারণ করিয়াছে। পাটলিপুত্রের প্রাকৃত উজ্জয়িনীর প্রাকৃত হইতে অল্প স্বল্প বিভিন্ন ছিল। একটী উদাহরণ দিই—ধম্মপদে সংস্কৃত তৃষ্ণা শব্দ তন্হা ও কৃষ্ণশব্দ কন্হারূপে কথিত হইয়াছে। এই দুই শব্দ উজ্জয়িনীর প্রাকৃতে তিস্না ও কিস্নো বা কসনং রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আবার পঞ্চনদের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাহীক বা পিশাচ জাতি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনেক বিকৃত আকার সম্পাদন করিয়াছিল। তাহারা গো শব্দকে "গোণা" মনুষ্য শব্দকে "মনুষ্যানা" আর

শব্দকে "অশ্বন." আকার প্রদান করিয়াছিল। এবং এইরূপে তাহার ভাষায় অনেক বিকৃতাকার ও অনাচার অনুপ্রবেশিত করিয়াছিল। তাহাদের প্রাকৃত পৈশাচী বলিয়া কথিত এবং তাহা পরবর্ত্তীকালে নাটকের একটী রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপরি উক্ত "গোণা" প্রভৃতি শব্দ ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে; সুতরাং উহা যে কোন "পিশাচ"বংশীয় ঋষির রচনা তাহার সন্দেহ নাই—উহাকে বৈদিক ঋষিবংশের রচনা বলিয়া অনুমান ও গ্রহণ করা অদূরদর্শীর কাজ। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানগণের কথিত বাংলায় যেমন বিকৃত ও যাবনিক শব্দের সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পৈশাচী প্রাকৃতেও পিশাচগণের কথা বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহারাই সুবিধা পাইয়া সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক অশুদ্ধ অনুপ্রবেশিত করিয়া "আর্ষ" প্রয়োগ বলিয়া প্রচার করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছিল; তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এই সকল বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে পূজ্যপাদ ঋষিগণের কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃতই ছিল। ইউরোপীয় ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুবর্ত্তী দেশীয়গণের মতানুসারে প্রাকৃতের সংস্কার সাধন করিয়া মূল সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয় নাই!! ইহা যেমন বিসদৃশ তেমনি অসম্ভব। যদি উহা অন্য দেশের পক্ষে অসম্ভব হয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষেও তাহা অসম্ভব হইবে তাহার সন্দেহ নাই—ভারত ইংরাজের অধীন বলিয়া ইংরাজ বা ইউরোপীয়গণের যথেচ্ছমত বেদবাক্য স্বরূপ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইউরোপীয়গণ বলেন, ল্যাটিন ফরাসী ও ইটালী ভাষার জননী অর্থাৎ ল্যাটিনই কালক্রমে ফরাসী ইটালী ভাষায় পরিণত হয়। এইরূপেই সংস্কৃতই কাল সহকারে প্রাকৃতে পরিণত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাকৃতের জননী, সুতরাং ফরাসী বা ইটালী মূলভাষা স্বীকার করিয়া ল্যাটিনকে ঐ দুইটীর সংস্কৃত আকার বলা যেমন বাতুলের প্রলাপ, প্রাকৃতকে মূল ভাষা স্বীকার করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে তাহার সাধু বা শিষ্ট-সম্মতরূপ বলা তেমনি মূর্খের প্রলাপ। এই প্রাদেশিক প্রাকৃতই আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাসমূহের পরিণতি বা তাহার জননী।

এই হইল ভাষার সময় নিরূপণ করিবার একটী উপায়। দ্বিতীয় উপায় তাহার "রীতির" প্রতি বিচার। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করি আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ সকল বিষয় ঠিক সেই ভাবে যে মনোভাব প্রকাশ করিতেন তাহা কখন হইতে পারে না—তাহা যে অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইত তাহা নিশ্চিত। এইরূপে যখন প্রাকৃত প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা ছিল, তখন ভাব প্রকাশ করা যে বর্ত্তমান সময় হইতে বহু বিভিন্নরূপে সম্পন্ন হইত তাহার সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে তখন মনোভাব সংস্কৃতে প্রকাশ করিবার রীতিও যে সংস্কৃতের সজীব অবস্থার রীতি হইতে বিভিন্ন ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কালিদাসের সময় প্রাকৃত কথোপকথনের ভাষা ছিল। তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলায় তাহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। তিনি অনেক সহজ ও সুন্দর প্রাকৃত ছন্দ দ্বারা তাঁহার নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার দ্বারা মৃতভাষায় মনোভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু রচনায় সরলতা ও স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইতে পারে না। কালিদাসের বহুকাল পরবর্ত্তী কবি ভবভূতির নাটকে একটীও প্রাকৃত ছন্দ নাই। রত্নাবলী নাটকে একটী মাত্র প্রাকৃত ছন্দ রত্নাবলীর মুখে দুইবার স্থাপিত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা যে ইঁহাদের সময় ভারতের উত্তরাখণ্ডে অপ্রচলিত হইয়াছিল ইহার দ্বারা এই কথা স্বতঃপ্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের রচনা অনুসারে তিনটী রীতি প্রচলিত হয়—বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। বৈদর্ভী রীতিতে অল্পপ্রাণ সহজ উচ্চার্য্য সরল শব্দ ব্যবহৃত হয়। গৌড়ী রীতিতে মহাপ্রাণ সমাসবহুল খটমটে শব্দ ব্যবহৃত হয়। পাঞ্চালী রীতিতে উভয় রীতির মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, মহারাজ ভোজদেবের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ গ্রন্থে লাটী ও আবন্তী বলিয়া আরও দুই রীতি সংযুক্ত হইয়াছে। এই রীতির নাম অনুসারে বেশ বোধ হইতেছে যে, তৎ তৎ দেশের লোকগণ সেই সেই রূপভাবে কথোপকথনে ব্যবহার করিত। এই নির্দ্দেশ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, কালিদাস মগধবাসী হইয়াও বৈদর্ভী রীতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভবভূতি বিদর্ভদেশবাসী হইয়া গৌড়ী রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং রত্নাবলী-লেখক কান্যকুব্জবাসী হইয়া পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী উভয় রীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এই হইল লেখক বা তাঁহার রচিত সংস্কৃতের সময় নিরূপণ করিবার দ্বিতীয় উপায়। লেখক বা তাঁহার রচনার সময় নিরূপণের তৃতীয় উপায় হইল, তাঁহার ভাব ব্যক্ত করিবার রীতি বা ধরণ। ভাষার আদিম সময়ে ভাবব্যক্তি যেমন সহজ ও স্বাভাবিকরূপে নিষ্পন্ন হয়, পরবর্ত্তী কালে সেরূপ হয় না—তখন ভাব প্রকাশে ভাষায় কৃত্রিমতা ও জটিলতা উভয় আসিয়া পড়ে। একটী উদাহরণ দিয়া আমার কথা স্পষ্ট করিয়া দিতেছি।—

মহাভারতে লিখিত আছে যে, ধ্রুবমণ্ডলের নাম "শিশু-

মার"। এই নক্ষত্রমণ্ডলে ৭টী নক্ষত্র আছে, ধ্রুব পুচ্ছ-প্রান্তে অবস্থিত; তারপর দুই নক্ষত্রও পুচ্ছের অংশ; তারপর চারিটী নক্ষত্র চতুষ্কোণাকারে অবস্থিত—ইহাই জলজন্তু শিশুমারের দেহরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই কল্পনায় মহাভারতের তৎস্থলের লেখকের কোন বিসদৃশতা দৃষ্ট হইতেছে না। যদি চারিনক্ষত্র সমষ্টির অবস্থিতি অনুসারে অশ্বের গ্রীবা ও মুখ কল্পনা করিয়া অশ্বিনী নক্ষত্রের নামকরণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শিশুমারের আকৃতি কল্পনা করিয়া ধ্রুবমণ্ডলেরও উক্ত নাম প্রদত্ত হইতে পারে, ইহাতে প্রাচীন কবির সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতাই রক্ষিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে উত্তানপাদ রাজার কথা আছে। তাঁহার পুত্রের নাম ধ্রুব। ভাগবতে ধ্রুব ঔত্তানপাদ বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। এস্থলে বিবেক শক্তি ও বুদ্ধি উভয় পরিচালিত করিয়া দেখিতে হইবে যে, সত্যসত্যই কি উত্তানপাদ নামে কোন রাজা ছিলেন এবং ধ্রুব নামে তাঁহার কোন পুত্র ছিলেন? যদি বা ইতিহাসে ঐ নামে যে কোন রাজা থাকেন থাকুন কিন্তু ধ্রুব নক্ষত্রের যে ঐ নামে কোন পিতা থাকিতে পারেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। ধ্রুবমণ্ডলকে ইংরাজিতে Ursa minoris বা small bear ক্ষুদ্র ঋক্ষ বলে। ইহা আমাদের উত্তরাখণ্ডের অক্ষাংশে (২৩°।২৪° অংশ) বৎসরের সর্ব্ব সময়েই উত্তরাকাশে ক্ষিতিজের উপরে জাগরিত দৃষ্ট হয়। যখন রাত্রির কোন সময়ে ধ্রুবমণ্ডলের চারিটী নক্ষত্র উর্দ্ধে দৃষ্ট হয় তখন বোধ হয় যেন কোন সুপ্ত মনুষ্য দুইটী পদ উচ্চে স্থাপিত করিয়া রহিয়াছে। এস্থলে ধ্রুব, তাহার মস্তক ও চারিটী নক্ষত্র উচ্ছ্বিত পদ বা উত্তানপাদ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক ধ্রুবমণ্ডলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটীকে পিতা ও অপরটীকে তাঁহার অনাদৃত পুত্র কল্পনা করা হইয়াছে। এবং এই কল্পনার শিথিল ভিত্তির উপরই আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এস্থলে ধীরভাবে বিচার করুন যে, মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত কি এক লেখক ভগবান ব্যাসদেবেরই রচনা? উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত ছন্দে গ্রথিত, উভয় গ্রন্থেই সংস্কৃতের মাধুরী পাঠকের চিত্ত হরণ করে। তিনি স্থূলদর্শী হইলে বলিবেন, উভয় গ্রন্থ ব্যাসদেবের লেখনীপ্রসূত, কিন্তু সুক্ষ্মদর্শী হইলে তাহা বলিবেন না। এই উত্তানপাদের আখ্যায়িকাই তাঁহার মনকে সন্দেহদোলায় ফেলিয়া খট্‌কা লাগাইয়া ধীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত করিবে। এস্থলে মহাভারত-লেখকের স্বাভাবিকতা এবং বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের লেখকদ্বয়ের অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হইতেছে; সুতরাং মহাভারত-লেখক এবং বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতলেখক-দ্বয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। একটী বহু প্রাচীন রচনা, অপর দুইটী আধুনিক কালের লেখনীপ্রসূত। একটী শিষ্টসম্মত শব্দসম্ভারে বিভূষিত, অপর দুইটী "আর্ষ প্রয়োগের" বাহুল্যে কলুষিত। আর্ষ প্রয়োগের অর্থ ঋষিগণের লিখিত চ্যুতসংস্কৃত। আমরা মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে চ্যুতসংস্কৃত রচনা বিরল, কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্রে উহার ছড়াছড়ি। ইহা দ্বারা বেশ প্রকাশিত হইতেছে যে, যাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত ছিল সেই ঋষিগণ তাঁহাদের রচনা শুদ্ধ সংস্কৃতেই করিয়াছিলেন, কিন্তু ঋষিস্মন্য আধুনিক লেখকগণই অশুদ্ধ সংস্কৃত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের টীকাকারগণ সেই অপপ্রয়োগকে ছান্দস ও আর্ষ প্রয়োগ নাম দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের দৃঢ় মত হইয়াছে যে প্রাচীন ঋষি মুনিরা শিষ্টসম্মতিবিরুদ্ধ অপপ্রয়োগ ব্যবহার করেন নাই। আপনাকে ব্যাস নামে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক আধুনিক পুরাণকারগণই সেরূপ অপপ্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মপুরাণ সকল পুরাণ হইতে প্রাচীন। ইহা বিন্ধ্যবাসী সাংখ্যমতাবলম্বী শিষ্টগণের রচনা। ইহাতে অপপ্রয়োগ নাই। কালিদাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নাগার্জ্জুনের সময় জৈমিনি বাদরায়ণ কৌষীতক ভরদ্বাজ ভৃগু প্রভৃতি নামধারীগণ আপনাদিগকে ঋষিরূপে প্রচার করিয়া যাবতীয় ভারতীয় শাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থ কলুষিত করিয়া দেন। কোন কোন মুনিপ্রণীত গ্রন্থকে রক্ষা করিবার জন্য তৎকালের শিষ্টগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা উহাঁদিগের বিরাগভাজন হন। একটী উদাহরণ দিই।—শৌনক নামে জনৈক ধার্ম্মিক শিষ্টের বেদের উপর প্রাতিশাখ্য ও চরণব্যূহ আছে তাহা শাস্ত্র-পাঠক মাত্রেই শুনিয়া থাকিবেন। এই প্রাতিশাখ্যে ঋগ্বেদের শাখানির্দ্দেশ ও তাহার ঋক্ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কৃষ্ণ শুক্ল, যজুঃ সামবেদ ও অথর্ব্ব বেদের ছন্দসংখ্যা ও কাণ্ডসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। চরণব্যূহে বেদ ও বৈদিক অঙ্গ উপবেদের কথা লিখিত হইয়াছে এবং প্রতি বেদের রূপ ও জাতিনির্দ্দেশ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই নির্দ্দেশ দ্বারা শৌনক পবিত্র বেদ, তাহার অঙ্গ ও উপবেদ কলুষিত করিবার পথ একরূপ নিরস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ভৃগু বাদরায়ণ প্রভৃতির বড়ই গাত্রদাহ ঘটিয়াছিল। বাদরায়ণ তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি শৌনককে "কাপেয়" অর্থাৎ কপি বা বানরীর পুত্র বলিয়াছেন ও তাঁহার অথর্ব্ববেদীয় সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দান না করার নিন্দা করিয়াছেন। অপিচ কৌশল করিয়া চরণব্যূহের অনুরূপ একটী "পারাশরী চরণব্যূহ" দাঁড়

কল্পাইয়াছিলেন। উহাতে অথর্ব্ব বেদের জাতিনির্দ্দেশে বিকল্পে প্রশংসা আছে। ইহার দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উহারা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কলুষিত করিতে কিরূপ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাদরায়ণ ব্যাস নামেও পরিচিত। ব্যাসের পিতা পরাশর, সুতরাং পারাশরী নাম দিয়া শৌনকের চরণব্যূহই অল্প পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ করায় যে বাদরায়ণের চাতুরী প্রকটিত হইতেছে, তাহার সন্দেহ আছে কি? এই পারাশরী চরণব্যূহ শব্দকল্পদ্রুমে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। শৌনকের প্রাতিশাখ্য ও চরণব্যূহ বাচস্পত্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ জয়াদিত্যের বৃত্তিরচনা। কাশিকা-বৃত্তির দ্বারা তিনি পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র ও গণপাঠ-গুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া যান। কিন্তু গণপাঠে বাদরায়ণ নামের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। উহা যে পরবর্ত্তিকালের প্রক্ষেপ তাহার সন্দেহ নাই। ইঁহার শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর অনেক সুন্দর বৃত্তি ছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালে বিদ্বেষী গণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। কপিলদেবের তত্ত্বসমাসের উপর ইঁহারই নির্নামা বৃত্তি আছে তাহা ৺কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের দ্বারা পাঠকের গোচরীভূত হইয়াছে। ইঁহারই ভগবদ্গীতার উপর সুন্দর বৃত্তি ছিল, তাহা শঙ্করা-চার্য্য ভাষ্যরচনার দ্বারা ধ্বংসমুখে পাতিত করিয়া গিয়াছেন এবং স্থলবিশেষে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা তুলনা করিয়া পাঠ করিলে তাহা স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়ে *।

এইরূপে হিন্দুর শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর অনেক দৌরাত্ম্য হইয়া গিয়াছে। ইহা পুনঃ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। সংস্কৃত ভাষার পরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমার অনুমান মতে উপরি-উক্ত ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। অপিচ আমাদের অনুমান যে সত্য ভিত্তির উপর স্থিত সংস্কৃত ভাষার ধীর অনুশীলক মাত্রেই স্বয়ং তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। নিম্নে আমরা সংস্কৃত ভাষার ক্রমবিকাশরূপ উপরি-উক্ত মতের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম।

সংস্কৃত বর্ণমালা।—কত পূর্ব্ব সময় হইতে, সৃষ্ট ও প্রচলিত তাহা তমসাচ্ছন্ন। অন্ততঃ বর্ত্তমান সময় হইতে ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র বৎসর।

ঋগ্বেদের সংস্কৃত।—বর্ত্তমান কলির প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার রচনা আরম্ভ হয় এবং দ্বাপর শেষে ভগবান ব্যাসদেব কর্ত্তৃক ইহা ঋষিবংশের সম্প্রদায়ানুসারে সজ্জিত হয়।

মহাভারত-রামায়ণের সংস্কৃত—দ্বাপর শেষে এই দুই গ্রন্থ রচিত হয়। রামায়ণ বোধ হয় মহাভারতের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। মহাভারত কলির ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩ বৎসর পরে রচিত হয়।

মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ।—কলির প্রায় ৬৫৩ বৎসর পরে বৈশম্পায়ন প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তাঁহার সহযোগী মুনিবৃন্দের সহিত মিলিয়া ব্যাসদেবের মূলভারতে আখ্যায়িকা সংযুক্ত করিয়া ইহাকে মহাভারত নামপ্রদান করেন। পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়ের আনুকূল্যে সম্ভবতঃ ইহা সম্পন্ন হয়।

পাণিনির ব্যাকরণ।—বৈশম্পায়ন প্রভৃতির রচিত মহা-ভারতের যে সংস্কৃত এবং ঋগ্বেদের যে সংস্কৃত এই উভয় অবলম্বন করিয়া পাণিনি কলির প্রায় ৭০০ বৎসরে তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তাঁহার ব্যাকরণে ঋগ্বেদীয় সংস্কৃত ছান্দস নামে এবং প্রচলিত সাহিত্য ও কথাবার্ত্তার সংস্কৃত ভাষা বলিয়া কথিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ী মুনিঋষি ও তাঁহাদের গোত্রের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বেদাঙ্গের ভাষা।—পাণিনির সময় প্রচলিত সংস্কৃতেরই ভাব এগুলিতে লক্ষিত হয়। নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির পূর্ব্ববর্তিক। জ্যোতিষপ্রণেতা লগধ তাঁহার পরভবিক। ইহার প্রাদুর্ভাবকাল Davis সাহেবের মতে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসর। ছন্দ-সূত্রকার পিঙ্গল লগধের সমসাময়িক বা পর-ভবিক জানিবার উপায় নাই। কল্পকার আশ্বলায়ন সম্ভবতঃ লগধের সময়ের মুনি। ইহাঁর রচনা গদ্যে।

প্রাকৃত ভাষা।—সম্ভবত আশ্বলায়ন প্রভৃতির পরে প্রাদে-শিক প্রাকৃতের অভ্যুদয় হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের সময় উহা দেশপ্রচলিত ভাষায় পরিণত হয়। তিনি খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৬২৩ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তিনি রাজধানী পাটলীপুত্রের ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করেন—উহাই প্রাকৃতে "পালি" নাম পরিগ্রহ করে।

প্রাকৃতের প্রভাব।—খৃষ্টাব্দের ও শকের প্রারম্ভে প্রাকৃত ভাষার বহুল প্রচার থাকে। দাক্ষিণাত্যের শক-ভূপতিগণ প্রাকৃতেই তাঁহাদের শাসনাদি প্রদান করিতেন।

প্রাদেশিক ভাষা।—শকের পর প্রায় ৩০০।৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতে আন্তর্জাতিক বিপ্লব প্রবহমান থাকে। এই সময়ে ভারত নানাজাতীয় বহিঃশত্রু

* "ভগবদ্গীতা তাহার সময় ও বিচার" নামক আমার ভিন্ন প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকে। তখন কি ভাষা ছিল কিছু বুঝা যায় না। প্রাকৃতের পরিণতিতে প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল কি না তাহাও জানিবার ও বুঝিবার উপায় নাই। ভারতের উত্তরাখণ্ডের এই ভাব। দাক্ষিণাত্যে শুনা যায় তখনও প্রাকৃত প্রচলিত ভাষা। এরূপও শুনা যায় যে, কোঙ্কনের রাজা অবিনয় ৩৯২ শকে ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের প্রাকৃত ভাষায় টীকা প্রণয়ন করেন। ৫০০ শকের আলঙ্কারিক ও কবি দণ্ডীও মহারাষ্ট্র ভাষাকে "প্রকৃষ্ট প্রাকৃত" বলিয়া গিয়াছেন। এই মহারাষ্ট্র প্রাকৃতেই ৭০০ শকের লেখক বালরামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা রাজশেখর তাঁহার কর্পূর-মঞ্জরী রচনা করেন। ১১০০ শকের ধারা-নগরীর অধিপতি ভাস্করাচার্য্যের পুত্রকে যে ভূমিশাসন দেন উহা মহারাঠী ভাষায় লিখিত সুতরাং ৭০০ ও ১১০০ শকের মধ্যে কোন সময়ে প্রাকৃত পরিণত হইয়া প্রাচীন মহারাঠী ভাষার আকার ধারণ করে। পৃথ্বীরাজ খৃষ্টাব্দ ১১৯১ সালে নিহত হন। তাঁহার বংশবর্ণনকারী চাঁদকবি প্রাচীন হিন্দী ভাষায় তাঁহার পৃথ্বিরাজরাসো রচনা করেন; সুতরাং তাহার পূর্ব্বে প্রাকৃতের পরিণতিতে হিন্দী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপে "পালি"র পরিণতিতে মাগধীয় হিন্দী ও বাঙ্গালার উৎপত্তি অনুমান করিতে পারা যায়। *

শিক্ষাভিমান ও দাসত্ব।

(শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

আজকাল শিক্ষিত ভদ্রসমাজে—বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের সকলেরই এখন লক্ষ্য এক চাকরি। এই চাকরিজীবী ব্যক্তিগণ আজ দুঃখ-দারিদ্র্যের যে সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যিনি যত বড়ই চাকরি করুন না কেন, যিনি যত অর্থই উপার্জ্জন করুন না কেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, কাহারও সুখে বা স্বচ্ছন্দে দিন যায় না। কিন্তু এই চাকরির এমনই মোহিনী শক্তি যে, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও আগ্রহ বা চেষ্টা দেখা যায় না। নিজেরা ভুক্তভোগী হইয়া, ঠেকিয়া শিখিয়াও সতর্ক না হইয়া বরং পরবর্ত্তী সন্তানগণকে সেই দাসত্বই শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। অভিভাবকগণ নিজ নিজ সন্তানগণকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার মানসে নিজেরা না খাইয়া না পরিয়া কত প্রকার অভাব-অনাটন অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা বড় বড় উপাধিও সংগ্রহ হইল সত্য, কিন্তু এখন তাহারা কি করিয়া তাহাদের নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিবে? তাহার উপায় কে তাহাদিগকে বলিয়া দিবে? চাকরির বাজার যে কিরূপ তাহা সাধারণের কাহারও অবিদিত নাই।

এখন এই সব শিক্ষিত বেকার যুবকগণের সাংসারিক মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক মতিগতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

এখানে আমার একটী কথা বলিবার আছে। যাঁহারা ধনী বা আজন্ম সুখের সংসারে লালিত-পালিত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র—ইহা কেবল মধ্যবিত্ত ভদ্রনামধারী গৃহস্থের উদ্দেশে বলা হইতেছে। এই সব শিক্ষিত যুবকগণ যেমন একদিকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সুশিক্ষিত হইতেছেন, তেমনি অপরদিকে তাঁহাদের এই শিক্ষাভিমান এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, তাঁহারা সামান্য কোন ছোট খাটো ব্যবসা বা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে অপমান বোধ করেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা অবস্থার অতিরিক্ত বাবুয়ানা করিতে শিখিয়াছেন। এখন তাঁহারা স্বহস্তে হাট বাজার করা বা কোন দ্রব্য হাতে করিয়া গৃহে লইয়া যাওয়াও নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন। চারি আনা বা ছয় আনার বাজার করিতে হইলে ছয় পয়সা বা দুই আনা মুটে ভাড়া দেন। এইখানে অনেক দিনের একটী ঘটনা মনে পড়িল—এটী পূজ্যপাদ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সহিত সম্পৃক্ত। উহা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন আজ-কালের মত এত ট্রাম, রিক্স বা মোটরবাস হয় নাই। রাত্রি ৮টা কি ৯টা, হাওড়া ষ্টেশনে দুইটী যুবক স্বদেশ হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন—ঘটনাচক্রে ঐদিন ঐ ট্রেণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া দেখেন যে, উক্ত যুবকদ্বয়ের সহিত কয়টী কুলীর বচসা হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে মাত্র একটী ছোট ট্রাঙ্ক, ৫।৭ সেরের বেশী ভার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। মুটিয়ারা পাঁচ আনার কমে সুখিয়াষ্ট্রীট যাইবে না, যুবকদ্বয়ও তিন আনার বেশী দিবেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সকল বিষয় শুনিয়া যখন দেখিলেন যে যুবকদ্বয় শেষে সেই পাঁচ আনাতেই রাজী হয় হয়, তখন তিনি বলিলেন, "দেখ বাবুরা, আমি গরিব মানুষ, আমারও বাড়ী সুখিয়াষ্ট্রীটের কাছে, আমায় চারি আনা দিলে আমি উহা তোমাদের বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে পারি।" ইহা শুনিয়া উক্ত যুবকদ্বয় যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলেন তাহা লিখিয়া

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহারা যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। সে যাহা হউক, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ট্রাঙ্কটী হতে ঝুলাইয়া লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাঁহাদের মেসে উহা পৌঁছাইয়া দিলেন। পরে তাঁহারা পূর্ব্বকথামত চারি আনা পয়সা দিতে গেলে, তিনি বলিলেন, "আমি এমন কোন পরিশ্রম করি নাই যে, তাহার জন্য পারিশ্রমিক লইব।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা তো অবাক্! এ কেমন মুটিয়া, মোট আনিয়া পয়সা লইতে চায় না, এ পাগল নাকি? পরে তিনি তো কিছুতেই পয়সা লইবেন না, তাঁহারাও ছাড়িবেন না। এইরূপ গোলমাল শুনিয়া মেসের যত ছাত্র একত্র হইয়া ব্যাপার জানিতে চাহিলে উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিনিতে পারিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং উক্ত যুবকদ্বয়কে যথোচিত ভৎর্সনা করিল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "দেখ তোমরা বিদেশে লেখাপড়া শিখিতে আসিয়াছ, তোমাদের অভিভাবকেরা কত অভাব-অনাটন স্বীকার করিয়া তোমাদের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রমার্জ্জিত কষ্টলব্ধ অর্থ কি এই ভাবে অপব্যয় করা উচিত? যে ট্রাঙ্কটী আমি এই বৃদ্ধবয়সে অবলীলাক্রমে আনিতে পারিলাম, তোমরা দুইজন যুবক—নীরোগ সুস্থদেহ—তোমাদের পক্ষে কি ইহা এতই ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় আমরাও বলি, আজকাল সহরবাসী নব্য যুবকদের জন্য পল্লী হইতে অভিভাবকেরা যে সকল অর্থ প্রেরণ করেন তাহা কি উঁহারা ঠিক ভাবে ব্যয় করেন? না তাহার পরিবর্ত্তে অবস্থার অতিরিক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, বায়স্কোপ-থিয়েটার, চা-সিগারেট, অথবা রং বেরংয়ের চুল ছাঁটা ইত্যাদিতে অপব্যয় করিয়া অভিভাবকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকেন?

তারপর অবস্থানুরূপ শিক্ষার পরিসমাপ্তির পর এই সব যুবকগণ বাহির হইলেন চাকরির চেষ্টায়—কিন্তু কোথায় চাকুরি? দুই মাস, ছয় মাস, দু' বৎসর, চার বৎসর কেবলই ঘোরাঘুরি হাঁটাহাঁটি—চাকুরি মিলিল না!!! চাকুরি মিলিল না বটে, কিন্তু অভিভাবকগণের তাহাতে পরিত্রাণ নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে ছেলেরা এক-একজন চাকরি করিয়া গাদা গাদা টাকা আনিবে, তখন মনের সুখে পায়ের উপর পা দিয়া ছেলেদের রোজগার ভোগ করিবেন। কিন্তু হায় হায়, এ কি—যেখানেই যাও—উত্তর পাইবে "No vaccancy!" তাই আবার বলি অভিভাবকের পরিত্রাণ নাই—এখনও ছেলেদের আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং উপরি-উক্ত বাজে খরচও তাঁহাদের যোগাইতেই হইবে। তবে সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশকরা ছেলেদের অভিভাবকেরা একদিকে-দেশ জুড়ের সুদ আদায় করিতে শিক্ষা করিয়াছেন—সেটা হইতেছে বিবাহের যৌতুক আদায়ের ছলে স্বকুটুম্বের রক্ত-শোষণ করা।

তাই বলি চাকরির মোহ ত্যাগ কর, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিক্ষা কর। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া অবস্থানুযায়ী ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যে মনঃসংযোগ কর, নিজের বাড়ীর আবর্জ্জনা নিজে পরিষ্কার করিতে শিক্ষা কর, আবশ্যক হইলে লাঙ্গল-কোদাল ধরিতে ইতস্তত করিও না। আজ ভারতের বড়ই দুর্দ্দিন! ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি! গৃহে অন্ন নাই, মনে শান্তি নাই, একগুণে চতুর্গুণ ব্যয় করিয়াও খাঁটী জিনিষ দুষ্প্রাপ্য। শরীর পোষণের উপযোগী আহার্য্য অভাবে ঘরে ঘরে যক্ষ্মা, টাইফয়েড রোগে কত শত আশা-ভরসারস্থল ফুটন্ত ফুলগুলি অকালে কালকবলিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার উপর আমার সাক্ষাৎ কৃতান্তসম ম্যালেরিয়া তো আছেনই। সম্প্রতি কাগজে দেখিলাম, পূর্ব্ববঙ্গে এক ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের একটী স্ত্রীলোক দারিদ্র্যের নিপীড়নে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা গড়পারের একটী ভদ্রলোক আফিসের চাকরি যাওয়ায় স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনে অপারক হইয়া সারকুলার রোডস্থিত 'ফেডারেসন পার্কে' রাত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া চাকরিজীবনের অবসান করিয়াছিলেন। ভগবানের এই বিশাল রাজ্যে এক চাকরি ছাড়া আমাদের আর কি গন্তব্য পথ নাই?

ভারতের আশা-ভরসার স্থল শিক্ষিত সন্তানগণ, তোমাদের সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্য সকল রহিয়াছে। তোমাদের অভিভাবকগণের পরিশ্রান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক মুখের দিকে একবার তাকাও। তাঁহাদিগকে আর কিছুদিন বাঁচিতে দাও—ভাবনাচিন্তার হস্ত হইতে মুক্তি দাও। তোমরা মানুষ হও, পাঁচ জনের কাছে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে শিখ, বিজাতীয় সভ্যতা ও অসার আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ কর। বিজাতীয় অনুকরণ ও শিক্ষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া এস, তোমাদের জন্য কত রকম উপজীবিকা ভগবান তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তোমরা কেবল চক্ষু খুলিয়া দেখিয়া কুড়াইয়া লও। দেখিবে, আবার তোমাদের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইবে। তোমাদের অভিভাবকগণের বিষাদমাখা শুষ্ক মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিবে।

এখন আমি একটী নিরক্ষর অন্ত্যজ জাতি স্বধর্ম্মাবলম্বী বালকের উক্তি দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উক্তিটীর এক-বর্ণ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে।

আসাম প্রদেশের কোন গণ্ডগ্রামে অনেকগুলি নীচ-জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা মৎস্যজীবী। সেখানে তাহারা "মীরি" বলিয়া অভিহিত। এখানে খ্রীষ্টান মিশনরীরা অনেকবার স্কুল বা পাঠশালা খুলিয়াছেন, কিন্তু অধিক দিন যাইতে না যাইতেই তাহা উঠিয়া যায়। বেশী দিন স্থায়ী হয় না। এ কারণ মিশনরী কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিলেন যে, ঐ দেশস্থ কোন শান্ত ও সুবুদ্ধি বালককে এদেশে আনিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া পরে তাহার দ্বারা সেখানে স্কুল স্থাপন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা এখান হইতে একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে উক্ত ভার দিয়া তাঁহাকে আসামে প্রেরণ করিলেন। তিনি অনেক চেষ্টার পর একটী চালাক-চতুর ছোকরাকে মনোনীত করিয়া তাহাকে তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে তাহার যাহা কিছু ব্যয়ভার সমস্তই মিশন হইতে দেওয়া হইবে। উক্ত 'মীরি'-বালক খুব মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিল এবং বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এরে বাবু! তুই কত টাকা মাহিনা পাস্" ?

মিশনরী বাবু। পঞ্চাশ টাকা।

মীরি বালক। তোর কে কে আছে?

মি—বা। আমার বাপ, মা, তিনটী ছেলে, দুটী মেয়ে।

মী—বা। তোর ঘরবাড়ী আছে?

মি—বা। না, আমি কলিকাতায় ভাড়া দিয়া থাকি।

মী—বা। কত ভাড়া দিস্?

মি—বা। পনর টাকা।

মীরিবালক এবার বাবুটীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ অর্থহীন ভাবে চাহিয়া রহিল, পরে বলিতে লাগিল;—

"হ্যাঁরে বাবু, তুই কি আমাকে বাবু বানাতে চাস্? তুই লেখা-পড়া শিখে কি করিয়েছিস্, তুই কি মনের সুখে আছিস্? বল্ দেখি, এখন তোর বাপ মা জরু ছেলে মেয়ে কি কচ্ছে? কার হয় তো বেমো হয়েছে, কেউ হয় তো কোথাও ছটফট্ করছে, আর তোকে দেখবার জন্যে কত কষ্ট করছে, তাকি তুই দেখতে পাচ্ছিস? তুই পঞ্চাশ টাকার জন্যে বাপ মা ছেলে মেয়ে সবকে ছেড়ে এই সুদূর আসামে এসেছিস্, হা-পয়সা হা-পয়সা করতে। আমাকে কি এমনি করাতে চাস্? না আমি তা পারব না। আমার বুড়া বাপ-মাকে আমি এক দণ্ড না দেখতে পেলে আমার মন কেমন করে। আমার সামনে এই ব্রহ্মপুত্র নদী, যখন ইচ্ছে হয় মাছ ধরি, বাজারে বিক্রি করে পয়সা পাই। যখন পয়সা থাকে, তখন মনের সুখে বাঁশী বাজাই। নদীর কিনারায় আমার বাড়ী, পিছনে খানিক জমি আছে, তাতে গাছ লাগাই, বাজার করতে হয় না। মরাই-ভরা ধান আছে, খোঁয়াড়ে ছোট-বড় অনেক বকরী আছে, গোয়ালভর্ত্তি ভইষ ও গাই আছে, দুধ ঘিউ কিনতে হয় না—আমি কি এসব ছেড়ে তোর মত বাবু সেজে লেখা-পড়া শিখে হা-পয়সা হা-পয়সা করে বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াব? আমি এমন বেকুব নই।"

মীরিবালকের উত্তর শুনিয়া উক্ত কর্ম্মচারীর আর প্রত্যুত্তর করিবার ক্ষমতা রহিল না। তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া মিসনরী সাহেবকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা জনাইলেন। শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "মীরিবালক একটা ক্ষুদ্র দার্শনিক বটে।"

Robindra Nath Tagore.*

Just before the birth of Robindra Nath Tagore, the world poet, the mind of Maharshi Devendra Nath Tagore was full of higher poetical thoughts. He had practically immersed himself in the poetical thoughts of the Upanishads and the renowned Muslim poets, Hafiz and others. The child reflects the mind of the father at the time of his birth. That Robindra Nath inherited the noble ideas and thoughts expressed in his poems which have made him so great from his saintly father, there is no doubt. There was also another factor which contributed to his glorious merits. It is the prayer of the late Babu Rajnarayan Basu, minister of the Adi Brahmo Samaj, who was to Maharshi as Nitai was to Gouranga. We quote this prayer which was offered 60 years ago at Bithur (near Cawnpore) which is known as the Tapobana of the great Valmiki for the edification of our readers. It will convince all believers in the efficacy of Prayer that a true Prayer never goes in vain. God hears it and fulfils it.

"O Lord! When shall in our midst shine a poet having the extraordinary poetic

* The Message January, 1828.

genius like Valmiki ! A poet, who as Valmiki reeled out the sweet music of his poetry in extolment of the name of Rama, will sing thy name the tune of which is a thousand [illegible] ter. No mortal monarch [illegible] theme of his lay but he will [illegible] praise of the One, the [illegible] reat, the Monarch of [illegible] om imperial power and [illegible] lay down their sceptres and seek for bliss ! Neither Ajodhya, nor Deccan nor Ceylon will be the extreme scope of his description but he will extend its range throughout the length and breadth of the boundless universe ! He will not like Valmiki fuse irrational and speculative interprolations with the actual events, but he will lay down the sterling truths ! How does the nebula of planets still bring forth other planets and stars, how does the sun revolve round another distant luminary, how has the earth transformed itself into this stage from the state of molten metallic mass, with what a huge congestion of wonders is inpregnated the lower strata of the earth, what strange things are lying upon the surface of the earth, what wonderful creatures reside in the fathoms of the vast ocean, all these he will describe with his superhuman poetic genius. He will describe in immortal lines the infinite creation of God differing in nature from place to place due to the variation in time and clime. He will bestow such a blissful touch upon all his poems that while chanting them people will realise perfect joy. He will effuse such a music from the flute of nature that the mortal creation will listen to it in rapt attention and it will seem as it were that it is the wafting strain of some heavenly spirit gliding down upon earth. O, when shall such a poet appear in our midst ! Surely, God will some day fulfil this longing of ours."

নানা কথা।

২৪০০০ লোককে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সন্তানের পিতার বয়স যদি ৩৫ এবং মায়ের ৩০ হয়, তবে সেই সন্তানই অধিক শক্তিশালী হয়। (সম্মিলনী ১৭ ফাল্গুন ১৩৩৪)।

[টীকা—আমাদের মনুসংহিতায় এবং সুশ্রুতসংহিতায় ইহারই অনুরূপ উক্তি আছে]

উইলেননর্ফের (Willennorf) ওয়াসান গিরিপথে অনুসন্ধানের ফলে অধ্যাপক বয়ার (Prof. Boyer) ২৫০০০ পচিশ হাজার বৎসরের পুরাতন একটী হস্তীদন্তের নারীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্ত্তিটী ১০ ইঞ্চি উচ্চ। ইহা একটি প্রকাণ্ড হস্তীদন্তের নিম্নাংশ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সেই দন্তটীর অবশিষ্টাংশ ইহার নিকটেই পাওয়া গিয়াছে। (সম্মিলনী ১৭ ফাল্গুন ১৩৩৩)।

[টীকা—ভাবিলে অবাক হইতে হয় যে, এই ২৫ হাজার বৎসরেরও কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর উপরে উচ্চ দরের সভ্যতা বহিয়া গিয়াছিল। বহুকালাবধি সে প্রকার সভ্যতা বিদ্যমান না থাকিলে এ প্রকার কারুকার্য্য সম্ভবপর হইত না।

গ্রন্থপরিচয়।

সীতাচিত্র—হিমালয়-ভ্রমণ, ঝরা ফুল প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। মুঙ্গেরপ্রবাসী শ্রীবিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

সীতা ভারতবর্ষের গৌরব-মহিমামণ্ডিত আদর্শ নারী। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে প্রকার সরল ও মধুর ভাষায় সীতার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংযম আত্মত্যাগ এবং অসামান্য পতিভক্তির জীবন্ত চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রত্যেক হিন্দুললনার এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থ পাঠে সীতার মহনীয় পবিত্র চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে।

শোক-সংবাদ।

পণ্ডিতপ্রবর ৺শশধর তর্কচূড়ামণি।—গত ১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর ৺শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহার বহরমপুরের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নব্য বাঙ্গালায় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরিচয় অনেকে সবিশেষ অবগত নহেন; কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সমাজে ইহাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। যদিও ইনি মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহাঁর কোনও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তথাপি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অভিমুখে বিপথগামী যুবকদিগের মতিগতি ফিরাইবার জন্য আদিব্রহ্মসমাজ যে ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও সেই ধারাকে প্রবল রাখিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকটা সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন।